অনার্য দামোদর

প্রফুল্ল কুমার সিংহ

প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ১৯৫৮ ॥ বৈশাখ, ১৩৬৫

প্রকাশক
তপন দে
৩ সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রাকর
এন. গোস্বামী
নিউ নারায়ণী প্রেস
১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

পরিবেশক
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ
উদয় চক্রবর্তী

১৯৫৬ সালের ধর্মঘটী শ্রমিকদের উদ্দেশে

ভূমিকা

কয়লা কুঠির কালো যবনিকার অন্তরালে বহু ইতিহাস, বহু মানুষ, বহু লোকাচার এবং কিংবদন্তী। সেই ঐতিহাসিক পটভূমিতে যে সব ক্রান্তিকাল ছিল সেই সম-সাময়িক কালের চরিত্র, ঘটনা সমাজ ও শিল্প নিয়ে পাঁচ-ছটি উপন্যাস রচনার মাস্টার প্ল্যান মোতাবেক মহাকালের ঘোড়া—১ম ও ২য় খণ্ড কয়লা কুঠির আদি পর্ব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ট্রেড ডিপ্রেশনের পর্ব পর্যন্ত বিধৃত হয়েছে।

শিল্প বিপ্লবের গতি সঞ্চার ও স্বাধীনতা উত্তর পর্বে কয়লা অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাণপণ সংগ্রামের সত্যনিষ্ঠ বিবরণ দাখিল করেছি অনার্য দামোদর উপন্যাসে।

আমি কয়লা অঞ্চলের মাটির মানুষ। ১৯৫৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল কোল কোম্পানীতে মাইনিং অ্যাপ্রেনটিশ হয়ে খাদে ঢুকেছিলাম। তখন ১৯৫৬ সালের এক মাস ব্যাপী ধর্মঘটের স্মৃতি একেবারে তাজা। শ্রমিক, মালিক, নেতা ও দালালদিকে দেখার সুযোগ পেলাম।

সেই থেকে বীজাকারে ভ্রূণাকারে যে বিষয়-ভাবনা, কাহিনী, সংলাপ, চরিত্র ও বিবর্তনের ধারা আমার মগজে ক্রমাগত জাল বুনে যাচ্ছিল তাই এক এক করে ছাপার অক্ষরে পাঠকদের সামনে হাজির হচ্ছে।

উক্ত উপন্যাসগুলি সপ্তাহ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং মহাকালের ঘোড়া—১ম খণ্ড তাঁরা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন সেজন্য সপ্তাহের সম্পাদকমণ্ডলী ও কর্মীদিকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রী শিবব্রত গাঙ্গুলী বহু ক্লেশ স্বীকার করে মহাকালের ঘোড়া—২য় খণ্ড ও এই বইটি প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করেছেন সেজন্য তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রফুল্ল কুমার সিংহ

অনার্য দামোদর

ভোঁ-ও-ও-ও

বয়লার হাউস থেকে একটানা বেজে যাচ্ছে হুইসল্। ছুটে যাচ্ছে যন্ত্র জগতের কুশীলবগণ। তাদের কাছে তুচ্ছ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার নৈসর্গিক বাধা বিপত্তি; তুচ্ছ আহার নিদ্রা ও মৈথুনের দৈনন্দিনতা। পালি শেষ ও পালি শুরুর এক একটি ভোঁ আশ্চর্যভাবে চারিয়ে আছে রক্তে, মজ্জায় ও হৃদয়ে।

ছুটছে বাবু, ছুটছে কারিগর, ছুটছে কুলি মজুর, লোডার, টালোয়ান। মাঘ মাসের রাত বারোটায় কন্‌কনে শীতের বাতাসে হাড় পাঁজর ঠন্ ঠন্ করে বাজছে। ঘরের মধ্যে পড়ে আছে বুকের ওম ধরা বিছানা, যুবতী বৌয়ের কোল, বাল-বাচ্চা বুতরু। সেদিকে তাকাবার অবসর নেই। কলের বাঁশি বেজে গেছে।

কিন্তু কেন?

কি তাৎপর্য যন্ত্র জীবনের বিপুল বিস্তৃত যান্ত্রিক শব্দ মালার? কারণ ভোঁ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাবে হাজিরা খাতা। যে আধ ঘণ্টার মধ্যে হাজির হবে তার নামে হাজিরা লেখা হবে। সে কাজ করবে। হপ্তার শেষে শ্রমের দাম পাবে। তাই দিয়ে কিনবে চাল-গম-তেল-নুন কাপড়-চোপড় কত কী! চলবে জীবন। কত তার প্রয়োজন। অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, মাথার ওপর আচ্ছাদন চাই। চাই লজ্জার আবরণ, হৃদয়ের ভালবাসা। চলমান গাড়ি চলমান পৃথিবীর বুকে চলে—কিন্তু তার জন্য চাই জ্বালানি।

এমনিভাবেই জীবনের ব্যাখ্যা করে অনন্ত শর্মা। থার্ড ইয়ারের মাইনিং ট্রেনি। অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে মুণ্ডা বাতির আলোতে লিখে রাখে কয়লা কুলিদের জীবনচর্যা।

সুড়ঙ্গের চালু পথে দশ বারোজন কুলির সঙ্গে বসে আছে ও। ওরা সব খাদের লোডার। কাঠখোট্টা লাহাঙ্গা জোয়ান। নোংরা নোংরা মেঝের উপর লম্ববান। অবসর সময়ে অনন্ত ওদের কানে মন্ত্র দেয়।

মানুষের অধিকার, শ্রমের মূল্য, শোষণের জাল, একতাবদ্ধ সংগ্রামের ক্ষমতা নিয়ে কথা বলে। ওরা ভালবাসে, ওর কথা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়, উত্তেজিত হয়। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ডাক শোনে হৃদয়ের স্পন্দনে। প্রবহমান শোণিত ধারায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ওঠে।

ভারতবর্ষের আটশো কয়লা খনিতে পাঁচ লক্ষাধিক শ্রমিকের মধ্যে একটি অনন্ত শর্মা আর কতটুকু? কিন্তু সে যদি স্ফুলিঙ্গ হয়? তাহলে পুঞ্জীভূত দাহ্য পদার্থে সৃষ্টি করতে পারে দাবানল।

সময় বড় বলবান। মহাকাল সৃষ্টি করে চরিত্র। কয়লা কুঠির অগ্নিগর্ভ সময়ে এমন কত অনন্ত শর্মা সঙ্গোপনে বেড়ে উঠেছে। কত আয়াসে তারা সংগ্রহ করছে জীবনের অভিজ্ঞতা। পোড় খাচ্ছে, সিদ্ধ হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে মানুষ। তৈরি করছে জমিন। যেখানে আবাদ হবে শোষণ মুক্ত সমাজের।

বৃটিশ চলে গেছে। কিন্তু বৃটিশ রাজের তৈরি শোষণের জালি তেমনি আছে। আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী হয়ে আছে কয়লা কুলির সমাজ। ওর মাথায় ঝোড়া চড়িয়ে দিয়ে ডি. ডি. সাহেব ভালই করেছেন। না হলে সে হাড়ে হাড়ে বুঝত না একটা লোডারকে একাকী ঘন ফুট কয়লা দুটি গাড়িতে বোঝাই করতে কত মেহনত করতে হয়, কত ঘাম ফেলতে হয়।

শুধু কি ঝোড়া বয়েই খালাস? তা নয়। আলোহীন, বাতাস মন্থর, মাথার উপর ছাদ পড় পড়। নীচে কোথাও এক হাঁটু জল তার মধ্যে থেকে কয়লা ছেঁকে তোলা, কোথাও তিনশো ফুট দূরে ট্রাম লাইন, কোথাও দেড়শো ফুট চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। কোথাও বা এত গরম যে কাজ করতে করতে পেটে ব্যথা ধরে যায়।

কোম্পানীর ট্রেনিং স্কীম মোতাবেক ছয় মাস লোডারের কাজ করতে হবে। প্রথম প্রথম ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। সে গরীবের ছেলে সবই সয়ে নিয়েছিল কিন্তু ওব বন্ধু কমলেন্দু অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন ডি. ডি. সাহেবের কাছে দরবার করতে গিয়েছিল স্যার। লোডারের কাজ তো আমাদের দ্বারা হচ্ছে না। বড় কঠিন কাজ।

উনি বলেছিলেন—ওহে কাজ করতে না পারছো তো বাড়ি চলে যাও। কোম্পানী তোমাদের জন্য দানছত্র খোলেনি।

বড় আঘাত লেগেছিল অনন্তর অন্তরে। কোম্পানী দানছত্র খোলেনি ঠিকই কিন্তু ওরা তো ট্রেনি। মাসিক স্টাইপেণ্ড পায়। গাড়ি ভরলেও তো তার দাম পাবে না। ঠিক আছে—তোমাদের দয়া মাগতে যাব না।

বড়ই গোঁয়ার ছেলেটা, ডি. ডি. সাহেবের উপর রাগ নিজের উপরেই ঝাড়ছে। একটা লোডার দলের সঙ্গে সমান তালে কাজ করছে।

ইনচার্জ বাবু এসে দাঁড়ালেন ওর কাছেই। ওর নাম ধনুক ধারী ঝা। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা। গোঁপজোড়া সাদা। পরনে খাকি হাফ প্যাণ্ট ও গেঞ্জি। মাথায় হেলমেট। বাঁ হাতে ক্যাপল্যাম্পের হেডপীস। ডান হাতে তিনফুট লম্বা লাঠি। কোমরের বেল্টে ঝুলছে খাদের গ্যাস চেক করার ফ্লেম সেফটি ল্যাম্প। বৃটিশ জমানার ছাপমারা মাইনিং ম্যান। তাকে ডাকলেন—অনন্তবাবু।

কাগজ কলম প্যাণ্টের হিপ পকেটে রেখে অনন্ত উঠে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল—নমস্তে ইনচার্জবাবু!

খাদের ভিতরে আলাদা আলাদা সেকশ্যান। এক একটির দায়িত্বে একজন

ইনচার্জবাবু। তার অধীনে মাইনিংবাবু। এই তুজনের দাপটেই সারা সেকশ্যানের কুলি মজুর কম্পমান।

পালি শুরুর পয়লা ডুলিতে মাইনিংবাবু খাদে নামেন। ইনচার্জবাবু আসেন লোকজন, জিনিস পত্র বিলি ব্যবস্থা করে। তারপর সবকে তেড়ে নিয়ে আসেন সেকশ্যানে। কাজ শুরু হয়ে যায়। কোল কাটিং মেসিনের কাটানী, ড্রিল দিয়ে হোল, বারুদ আওয়াজ, ট্রাম লাইনে খালি গাড়ি দেওয়া ইত্যাদি চলতে থাকে পর্যায়ক্রমে।

সারা খাদ বারুদের ধোঁয়ায় ভরে যায়, অসহ্য গরম, তার মধ্যে লোডাররা মাথায় ঝোড়া নিয়ে তুপ তুপ করে চলে।

পর পর কয়েক মাস একই পালিতে একই সেকশ্যানে কাজ করার দরুন ইনচার্জবাবুর সঙ্গে ওর ভাব জমে গেছে। তাই উনি বললেন, আপনি তো বহুত পড়া লিখা জানা আদমী। আমার সঙ্গে যাবেন ?

—কেন ? কি হয়েছে ?

—সাতাশ নম্বর পছিয়াতে গ্যাস বেরিয়েছে। ডি. ডি. সাহেব উপর থেকে খবর পাঠিয়েছে এক্ষুণি ইন্স্পেকশন করে রিপোর্ট পাঠাও।

—তাহলে তো ব্যাপারটি গুরুতর।

—হ্যাঁ ভাই। চলুন গ্যাস দেখে আসবেন।

গ্যাস দেখার অদম্য কৌতুহলে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। তুজনে আগে পিছে ঢালু পথ বেয়ে নীচে নামছে। ২৭ নম্বর পৌছে ডান দিকে বাঁক নিল।

অনন্ত জানতে চাইল সাতাশ নম্বরে গ্যাস বেরুনোর পিছনে কোনো রহস্য আছে কিনা। উনি বেশ ব্যাখ্যা করেই বুঝিয়ে দিলেন।

আগে তো খোলা চাঙনী ছিল। মানে এখন যেমন কয়লা কেটে নিয়ে ফাঁকা জায়গা বালি দিয়ে ভরাট করা হয় তখন তা হয়নি।

ছাব্বিশ নম্বর থেকে ত্রিশ নম্বর পর্যন্ত একটা প্যানেলে পিলার কাটিং হচ্ছিল। এমনিতেই তো গ্যাসী খাদ। তারপরে হয়ে গেল স্পনটেনিয়াস হিটিং। আগুন ধরে গেল। তখন ডি. ডি. সাহেব পুরো প্যানেলটা সীল করিয়ে দিলেন। ছাব্বিশ নম্বর থেকে ত্রিশ নম্বর পর্যন্ত পাঁচটা সুড়ঙ্গের মুখ তিনফুট পর পর তুটো ইঁটের দেওয়াল দিয়ে বন্ধ করিয়েছিলেন। এখন যদি সাতাস নম্বর থেকে গ্যাস বেরোয় তাহলে তো বিপদ বটেই।

কথা বলতে বলতেই ওরা সাতাশ নম্বর লেভেলে পৌছে গেল। পর পর পাঁচটা কয়লার কাঁথি পার হবার পর ইঁটের দেওয়াল চোখে পড়ল। কিন্তু তার আগে থেকেই শাঁ শাঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। উনি দাঁড়ালেন।

বললেন—ভাই ! আর এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। গ্যাস তো খুব জোরেই বেরুচ্ছে। কাছে গেলে জান নিয়ে ফেরা দায় হবে।

বলতে বলতে উনি ওঁর হাতের ফ্লেম সেফটি ল্যাম্পটা তুলে ধরলেন। অন্য বাতিগুলি নিভিয়ে দেওয়া হলো। আর কি আশ্চর্য! বাতির ভিতর নীল আলোর একটা মন্দির তৈরি হয়ে গেল। ক্রমশ তা বেড়ে লম্বা হলো। নীল শিখার ধারে ধারে হলুদ আলোর ফুলঝুরি। তারপর হঠাৎই দমকা বাতাসের মতো গ্যাসটা এত জোরে এল যে বাতিটার ভিতর মুহূর্তের জন্য দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল এবং ঝট্ করে একটা শব্দ হয়েই নিভে গেল।

ওঁনি চট্ করে দু'পা পিছিয়ে বাতিটা নীচে নামিয়ে বললেন—দেখা তো বাতিকা অন্দর বিস্ফোট হো গয়া।

—বাপরে! যত সুন্দর তত মারাত্মক।

—চলিয়ে—বাহার চলিয়ে।

সেই পুরনো জায়গাটিতে এসে ইনচার্জবাবু বললেন—থোড়া লিখ দিজিয়ে ভাই। হামারা আংরেজী লিখা ঠিক নেহী হোতা।

অনন্ত খস্ খস্ করে লিখল—সিরিয়াস ব্লো অফ গ্যাসেস। কামিং আউট ফ্রম দ্যা স্টপিং উইথ এ সাউণ্ড লাইক হুইসল্। টেস্টেড বাই ফ্লেম সেফটি ল্যাম্প। এক্সপ্লোশান অকারড ইন ল্যাম্প। ওয়াণ্ট র‍্যাপিড অ্যাকশন।

উনি বললেন—হ্যাঁ। বহুত ঠিক।

একটা লোক মারফৎ খবর পাঠিয়ে দিলেন ডি. ডি. সাহেবের কাছে। উনি চলে গেলেন রেজিংয়ের কাজে।

অনন্ত পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বের করে গ্যাস টেস্ট করার দৃশ্যটিকেই লিখতে শুরু করে দিল। ঘন অন্ধকার প্রেক্ষাপটে সুতোর মতো নীল আলোর রেখা ক্রমশ হয়ে গেল একটা মন্দির তারই সৌন্দর্য বর্ণনা এবং সেই সঙ্গে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া যা অনায়াসে ঘটে যেতে পারে যদি পেয়ে যায় দাহ্য পদার্থ এবং অক্সিজেন। তাতো খাদেই আছে। ঐ স্ফুলিঙ্গটি যদি বাইরে ঘটত তবেই বিস্ফোরণ।

খাদের কাজে ডি. ডি. সাহেবের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভীষণ সজাগ। রাত বারোটায় যখন অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন তখন চাপরাশীর ডাকে ঘুম ভেঙেছিল। সেকেণ্ড ইনচার্জবাবুর রিপোর্ট পড়েই জামা-প্যান্ট জুতো পরতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

বিউটিরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দারুণ সুন্দর বুকের উপর শায়াটাকে টেনে তুলে জিজ্ঞাসা করেছিল—এত রাত্রে কোথায় যাবে ?

—খাদে গ্যাস হয়ে গেছে। আমাকে যেতেই হবে।

বিউটি মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল—বাসায় আসো কি জন্য ? খাদেই একটা খাটিয়া পেতে থাকতে পারো। হরদম খাদ—আর খাদ।

খুবই বিরক্ত হয়েছিল। একে তো ঘুমের জন্য সাধ্য সাধনা করতে হয় তবে

যদি ঘুম আসে। তারপর তা যদি মধ্যরাতে ভেঙে যায় তাহলে ভোররাত পর্যন্ত আর ঘুম আসবে না।

ডি. ডি. সাহেব বাতিঘরে বসেছিলেন উদ্‌গ্রীব প্রতিক্ষায়। ওর মনে বিপদের আশঙ্কা। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এইরকম ধরনের ভাবনায় আক্রান্ত।

অনন্তর লেখা রিপোর্টটি পড়েই হুকুম দিলেন—আমার বাতি লাঠি টুপি রেডি কর। খাদে যাব।

উনি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন—খাদ থেকে লোকজন উঠিয়ে দেবার জন্য। ঐ লোকটিকেই সেই হুকুমটি লিখে ইনচার্জবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ডি. সি. সাহেবের কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন—সাতাশ নম্বর স্টপিংয়ে ফাটল ধরার দরুন পুরনো চাঁদনীর বিষাক্ত গ্যাসের সঙ্গে ফায়ার ড্যাম্প গ্যাস বেরিয়ে আসছে। ব্যাপারটি গুরুতর। এটা চলতে দিলে পুরো খাদ বিষাক্ত গ্যাসে ভরে যাবে। সেজন্য লোকজন উঠিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছি। তুমি অবিলম্বে ম্যানেজার, এজেণ্ট, সি. এম. ই., মাইনস অফিস ও রেসকিউ স্টেশনে খবর দাও। সাতাশ নম্বর স্টপিং এক্ষুণি সিল করতে রেসকিউ ব্রিগেড চাই। আর্জেণ্ট কল দাও। আমি খাদে যাচ্ছি। বলা যায় না লোকজনও বিপদগ্রস্ত হতে পারে। ভেরী আর্জেণ্ট।

বাতি বেঁধে পিট টপে এসে হাঁক দিলেন ঘণ্টাওলা। মারো তিন ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা মানে লোকজন ওঠানামার সঙ্কেত বিনিময়। গুলু লুনিয়া মানে গৈরীর বাপ ঘণ্টাওলা। সে কাজটা অতি দ্রুত সেরে ফেলল। ডি. ডি. সাহেবকে নিয়ে সর সর করে ডুলি নেমে গেল।

সেকশনে তখন লোক ওঠাবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। অনন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ইনচার্জ ও মাইনিংবাবু ঐ সেকশনের কোনায় কোনায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। লোকজনকে খুঁজে পেতে উপরে পাঠাবার জন্য। রাত পালির ব্যাপার। দু'একজন ছুটকো বিরহী, ফাঁকিবাজ লেবার কোথাও পড়ে পড়ে ঘুমোতেও পারে।

ডি. ডি. সাহেব আসামাত্র সবাই তটস্থ। উনি বললেন—হড়বড় করিস না ধীরে সুস্থে উঠে যা।

অনন্তকে দেখতে পেয়ে বললেন—তোমারও নাইট শিফট নাকি?

—হ্যাঁ স্যার। আমিই তো রিপোর্টটা লিখলাম।

—তাই বুঝি? হ্যাঁ—তাইতো! ধনুকধারী এত বিদ্যে পাবে কোথায়?

রিপোর্টটা পকেট থেকে বের করে একবার দেখে নিয়ে বললেন—চল তাহলে দেখে আসি। একসেট টিম্বারম্যান আর ব্রাটিশ ক্লথ নিতে হবে।

একটি খুঁটো মিস্ত্রী, দুটি কুলি, ডি. ডি. সাহেব এবং অনন্ত।

ডি. ডি. সাহেব সবার আগে আগে হাঁটছেন। সাতাশ নম্বরে পৌঁছে গন্ধ শুঁকেই বললেন—এ-হে-হে! বাতাসটা ফাউল হয়ে গেছে।

—ফিরে যাবেন ?

—হ্যাঁ।

টিম্বারম্যানদেরকে বললেন—তোরা এই খানেই একটা আড়া আড়ি ব্রাটিশ ক্লথের স্টপিং তৈরি কর। তাতে যতটুকু আটক হয়।

ওরা কাজ শুরু করতে না করতেই ভিতরে একটা বড় পড় পড় শব্দ হলো। উনি বললেন—পালা পালা—

নিজেও দু'পা পিছিয়ে গেলেন। টিম্বারম্যানরা পড়ি কি মরি করে চড়াই ভেঙে দৌড়তে শুরু করে দিল। ভিতর থেকে আবার একটা বড় রকমের শব্দ ভেসে এল বেশ একটু সময় নিয়ে।

উনি বললেন—বোধহয় চাল ভেঙে পড়ল। চল—জলদি চল।

আগে ডি. ডি. সাহেব, পিছনে অনন্ত। অনেক আগে টিম্বারম্যানরা। চড়াই ভেঙে উঠতে গিয়ে ডি. ডি. সাহেব আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেলেন। অনন্তর বুকের ভিতরটা হাঁস ফাঁস করছে। কি রকম জ্বালা এবং অস্বস্তি। মথাটা ঘোর হয়ে আছে। যেন কত না নেশা করেছে। ঠিক এমন অনুভূতির সঙ্গে কখনো পরিচিত ছিল না ও।

ডি. ডি. সাহেব বললেন—অনন্ত! আমার পেটে গ্যাস ঢুকে গেছে। তোমার কিছু হয়নি তো ?

—বড় কষ্ট হচ্ছে স্যার।

—চলো। এটা রিটার্ন জোন। বাতাস বেরুবার রাস্তা। তাই গ্যাস তাড়া করে আসছে। কোনো রকমে বাতাস ঢুকবার রাস্তায় যেতে হবে। না হলে মৃত্যু।

এ্যাঁ। অনন্ত আঁতকে উঠল। পড়ি কি মরি করে চলছে। সামনে ডি. ডি. সাহেব কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছেন। অনেক আগে টিম্বারম্যানদের বাতিগুলি তিনটি চলমান আলোক বিন্দুর মতো ধীরে ধীরে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

বহু কষ্টে চার পিলার উঠল। অনন্তর আর পা উঠছে না। বিষাক্ত গ্যাসের ক্রিয়ায় ফুসফুসটা ফুলে উঠেছে। বাতাসের ক্ষুধা মিটছে না। কি করে মিটবে ? একবার শ্বাস টানলে যতটা বাতাস ঢুকছে ততটা তো অকসিজেন নেই। সহজ-ভাবে শ্বাসক্রিয়া চলছে না! দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

পর পর দু'বার ফ্যস্ট-এড কম্পিটিশনে ফাস্ট প্রাইজ পেয়ে এটা বুঝবার মতো শিক্ষা ওর হয়েছে। কিন্তু শিখে ক্রি করবে ?

ডি. ডি. সাহেব কয়লার পিলারে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভীষণভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—অনন্ত! এটা তেইশ নম্বর লেভেল। ষোলো নম্বরে ফাটক আছে। গুনে গুনে যাও। ষোলো নম্বরে পৌঁছলেই ডানদিকে ঘুরবে।

ফাটক খুলে ওপরে যেতে পারলেই জীবন। এপারে মৃত্যু। যা—ও—পড়ে যাচ্ছিলেন।

—স্যার!

অনন্ত ওকে ধরে ফেলল। অতবড় একটা লাশ ওর পক্ষে যোগান দিয়ে তুলে ধরা সহজ কথা নয়। তবু সে প্রাণপণে টাল সামনে নিল। ওঁর বা হাতটা নিজের কাঁধের উপরে নিয়ে বলল—আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলুন স্যার।

—তুমি ছেলেমানুষ। এই তো জীবনের শুরু। এখনও যেটুকু দম আছে তাতে করে ষোলো নম্বরে পৌঁছে যেতে পারবে। তুমি বাঁচো অনন্ত—আমার এখানেই শেষ।

অনন্তর কাঁধে ভর দিয়ে আরও এক পিলার উঠলেন। তারপর জিভটা বেরিয়ে গেল। চোখ দুটো যেন ফুটে যাচ্ছে। সারামুখ বিকৃত। কি অসীম যন্ত্রণা হচ্ছে ভিতরে।

অনন্ত কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছে। বুকটা ফেটে যাচ্ছে। তবু সে প্রাণপণে এগুবার চেষ্টা করছে। পা আগে উঠছে না।

দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রায় মিনিট দশেক খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পর মনে হলো এবার শ্বাস নিতে পারবে।

বলল আর একবার জোর লাগান স্যার।

ডি. ডি. সাহেবের মুখটা বেঁকে গেছে। টুপিটা পড়ে গেছে।

বাতির মাউথ পিসটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে।

বহু কষ্টে বললেন—আমি পারবো না। তুমি যাও। তোমার দিদিকে বলো—খাদের মানুষটা খাদেই রয়ে গেল।

অনন্ত মাথা নীচু করে হাঁফাচ্ছিল। চোখ তুলে তাকাল।

অনেকক্ষণ দম নিয়ে উনি বললেন—আমার কোনো বংশ নেই যে পিণ্ড দেবে। তোমার দিদি একা হয়ে পড়বে। পাঁচটা শিয়াল কুকুর ছিঁড়ে খাবে। এই দুঃখ নিয়েই মরতে হচ্ছে।

বলতে বলতে এলিয়ে পড়লেন।

অনন্ত আর্তনাদ করে উঠল—স্যার!

—ওঃ! আজ যদি নিজের রক্ত মাংসের একটা শিকড় থাকত—উঃ কত সেধেছিলাম—উঃ। ভগবান!

বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন। অনন্তর আর সাধ্য নেই যে ওঁকে তুলে ধরে। বলল—হাতে পায়ে ভর দিয়ে চলুন স্যার। বুকে চাপ কম লাগবে।

জীবনটা যে কি ধাতু দিয়ে তৈরি কে জানে? সহজে খাঁচা ছাড়া হতে চায় না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যায়। অলৌকিক শক্তি ভর করে হাড় পাঁজরের গাঁটে গাঁটে।

হাতে পায়ে ভর দিয়ে ঘষটে ঘষটে চলতে লাগলেন। আরও ছুটো পিলার। এটা আঠারো নম্বর।

অনন্ত বলল—স্যার আঠারো নম্বর। আর ছু'পিলার।

—তুমি যাও। কচি জীবনটা নষ্ট করো না। আঃ।

চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল। একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে উপুড় হয়ে মেঝের সঙ্গে মিশে গেলেন।

অনন্তরও ধাত ডুবছে। চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। বহুকষ্টে বাতির ফোকাস দিল ডি. ডি. সাহেবের মুখে। ওঁর বুকে হাত দিয়ে দেখল এখনো হৃদপিণ্ড চলছে।

তাহলে কি করবে। জীবন্ত মানুষটাকে ফেলে দিয়ে যাবে? কিন্তু সেই বা যাবে কী করে? তারও চোখের সামনেটা ঝিল মিল করছে। অনেকটা ধরতে পারছে না। কানেও শুনতে পাচ্ছে না। মুখটা যতদূর সম্ভব হাঁ করে শ্বাস নিতে চাইছে—তবু বাতাস ঢুকছে না।

না—না! সব না। জীবনটা বেবাক না হয়ে যাচ্ছে।

মা—মাগো মরার আগে তোমার মুখটা দেখতে পেলাম না মা! নেশাগ্রস্ত ভূতের মতো ডি. ডি. সাহেবকে ধরে ঘষটাতে ঘষটাতে খানিকটা এগিয়ে ধড়াস করে পড়ে গেল।

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বুকফাটা ডাক দিলো…মা…

দুই

—মা—মাগো—

—অনন্ত!

দূরাগত ধ্বনি তরঙ্গ। সাগরের ওপার থেকে মা ডাকছেন মিষ্টি স্বরে। তার কপালে স্নেহ কোমল একটি হাত। অনেক রাত হয়েছে। মা জেগে আছেন শিয়রে। তাঁর চোখ ছুটি সিক্ত। মুখের রেখায় ব্যাকুল আর্তি। মা বুঝি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন।

—মা—মাগো—

—অনন্ত!

আবার সেই মিষ্টি স্বর। তবে কি সত্যিই মা এসেছেন? এই খাদের অন্ধকারে। এবড়ো খেবড়ো কালো পাথরে। কাঠ খুঁটো নোংরা আবর্জনার মধ্যে।

—মা—মাগো—

—অনন্ত!

এই ভয়ানক গ্যাসের মধ্যে তুমি কেন এলে মা ? এখানে এলে কেউ জীবনে বাঁচে না। আমাকে আশীর্বাদ কর মা। বড় আক্ষেপ ছিল মরার আগে তোমার মুখটা দেখতে পেলাম না।

—অনন্ত! অনন্ত!

—এ্যাঁ!

—সিস্টার। অনন্তর জ্ঞান ফিরেছে। ডাক্তারবাবুকে খবর দিন।

—কে ?

—চোখ মেলে তাকাও অনন্ত! আমি তোমার দিদি—বিউটিদি।

—আপনি খাদে এলেন কি করে ?

—এটা খাদ নয়। হাসপাতাল।

—অনন্তর জ্ঞান ফিরেছে দিদি ?

সুবীর ঢুকলো। পিছনে কমলেন্দু।

সুবীর ওকে ধরে ঝাঁকি দিলো—কি রে? তাকিয়ে দ্যাখ। আমরা সবাই আছি। আমি, কমলেন্দু, দীপক, সুমিতদা, ডাক্তারদা, ডাক্তার বৌদি, বিউটিদি।

—আমার মা কই ?

—তোর মাকে আনতে লোক গেছে। কাল সকালে আসবেন।

—আমি যে এক্ষুণি মাকে দেখলাম।

—ভুল দেখেছিস।

—সেকি ? তাহলে—

—তুই বিউটিদিকে দেখেছিস।

বাইরে ফিকে অন্ধকার। ভিতরে মৃদু আলো। নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো আছে। শ্বাস বইছে ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে অনন্তর জ্ঞান ফিরে এল পরিষ্কারভাবে।

জিজ্ঞাসা করল—ডি. ডি. সাহেব কোথায় ?

ঐতো পাশের বেডে।

—কেমন আছেন ?

—এখনো জ্ঞান ফেরেনি।

অনন্ত কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ডাক্তার বৌদি বললেন—খুব বেঁচে গেলে ভাইটি। যা ভয় পেয়েছিলাম। যাক্। ফাঁড়া কেটে গেল। তোমার মা-বাবার পুণ্যের জোর আছে।

তখনো ওর দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়নি। বলল—দিদি!

—হ্যাঁ ভাইটি!

—ডি. ডি. সাহেব ভালো হবেন তো ?

ডাক্তারবাবু এলেন হাসপাতালের ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে। উনিই বললেন—নিশ্চয়।

পেসেণ্ট দেখে ডাক্তরবাবু বললেন—হ্যাঁ। বিপদ কেটে গেছে।

অক্সিজেনের নলটা খুলে দিলেন। বললেন—গরম চা কিংবা কফি দিন। একটু পর ফলের রস দেবেন। ঘণ্টা খানেক পর তুধ দেবেন।

—এখন কটা বাজে?

—রাত নটা।

—আমাদেরকে হাসপাতালে কে আনল?

—আমরাই এনেছি। অবশ্য রেসকিউ টিম তোমাদেরকে খাদ থেকে তুলে এনেছিল।

—রেসকিউ টিম?

—হ্যা।

সে এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। খাদে গ্যাস। ডি. ডি. সাহেব ওঠেননি। আবার খুঁটো মিস্ত্রী রিপোর্ট দিল—সাহেব ও অনন্তবাবু তাদের পিছনে আসছিল। কি জানি গ্যাস লেগে গেল কি না?

গ্যাসে ওরাও আক্রান্ত হয়েছিল। তবে উপরে উঠতে পেরেছিল এই যা। ডি. ডি সাহেব নিজের উদ্ধারের পথও নিজে করে গিয়েছিলেন ডি. সি. কে চিঠি দিয়ে। উনি সেই মোতাবেক খবরটা দিতে বিলম্ব করেননি। দলে ম্যানেজার, এজেণ্ট, ডাক্তার, ইনজিনিয়ার; গাড়ি, এম্বুলেন্স, রেসকিউ টিম এসে পড়েছিল যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গেই।

হৈ হৈ ব্যাপার! রেসকিউ টিম অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে খাদে নেমে গিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকা ডি. ডি. ও অনন্তকে নোডকস অ্যাপারেটাস দিয়ে অক্সিজেন দিয়েছিলেন। আরটিফিশিয়াল রেসপিরেশন দিতেই শ্বাসক্রিয়া চালু হয়েছিল। স্ট্রেচারে তুলে তুজনকেই নিয়ে এসেছিলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এত কাজ হয়ে গিয়েছিল। আর দেরি হলে ওদের বাঁচবার সম্ভাবনা ফুরিয়ে যেত। কারণ নাড়ী ও শ্বাসক্রিয়া ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল।

এতক্ষণে গোটা খাদ বিষাক্ত গ্যাসে ভরে গেছে। ডি. ডি. সাহেব যদি অত দ্রুত লোক ওঠাবার সিদ্ধান্ত না নিতেন তাহলে খাদটা ভরে যেত মৃতদেহের স্তূপে।

আবার অনন্ত যদি ঠেলেঠুলে ডি. ডি. সাহেবকে এতটা তুলে না আনতো তাহলে ওঁরও ইন্তেকাল হয়ে যেত। কারণ গ্যাসের প্রকোপটা নীচ থেকে উপরে উঠে আসছিল। কাজেই নীচের দিকেই এর প্রাবল্য ছিল বেশী।

রেসকিউ টিমের ক্যাপটেন বাতাসের যে নমুনা সংগ্রহ করে এনেছিল তা থেকেই এসব তথ্য জানা গেছে।

ডি. ডি. সাহেবের জ্ঞান ফিরল রাত বারোটার সময়। অর্থাৎ গ্যাসে আক্রান্ত হবার বাইশ ঘণ্টা পর।

বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ ঘোলাটে অবস্থার মধ্যে কাটার পর যখন বিউটিকে চিনতে পারলেন তখন ওঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। চোখের জল মুছে দিয়ে বিউটি বলল কেমন লাগছে?

—অদ্ভুত! আমি কি বেঁচে আছি?

—হ্যাঁ!

—আশ্চর্য!

—বিশ্বাস হচ্ছে না?

—না।

—আমাকে দেখেও।

—মরবার সময়েও তো আমি তোমাকেই দেখছিলাম।

—কফিটা খাও।

ডাক্তারবাবু অক্সিজেনের নল খুলে দিয়ে কফি খেতে অনুরোধ করলে বিউটি চামচে করে কফি খাইয়ে দিল।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে আবার চোখ মেললেন। বললেন—ঐ ছেলেটা—অনন্ত। সে কোথায় আছে?

অনন্ত বলল—আপনার পাশের বেডেই আছি স্যার।

—ভালো আছ তো?

—হ্যাঁ স্যার।

—ঈশ্বর তোমাকে নিশ্চয় ভালো রাখবেন।

সেটা ছিল ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড। ওদের জ্ঞান ফিরে স্বাভাবিক হতেই ডাক্তারবাবু তাদের বেড ট্রান্সফার করে দিলেন। এবার দুজনের দু'জায়গা। পদাধিকার বলে ডি. ডি. সাহেব অফিসার্স কেবিনের হক্‌দার। সেই রকমই ব্যবস্থা হয়েছে। আর অনন্তর জন্য জেনারেল ওয়ার্ডের বেড।

সুবীর, কমলেন্দুরা ডি. ডি. সাহেবের জ্ঞান ফেরার পর চলে গেছে। বিউটি একা দুটি পেশেন্টের দেখা শোনা করছে। সে ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করল ওদের দুজনকে কেবিনে দেওয়ার জন্য।

তাতে আর অপত্তি কি? অফিসার নিজে যদি রাজি থাকেন।

কাজেই ডি. ডি.-র জন্য নির্দিষ্ট কেবিনে আর একটি বেড পেতে দেওয়া হল।

কেবিনটি বেশ বড়। দুদিকে দুটি বেড। তার সঙ্গে সমকোণে বসানো একটি সোফা। পেশেন্টরা বেডে। বিউটি সোফায়। আধশোয়া হয়ে চোখ বুজে

আছে। বাইরেটায় ঘুমের আবেশ কিন্তু ভিতরটা জেগে আছে। কত কথা মনে পড়ছে।

এই মানুষটাকে তো কোনোদিন মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি। ভালও বাসেনি। অথচ ওর মৃতপ্রায় শরীরটাকে যখন কম্বল ঢাকা দিয়ে খাদ থেকে তুলে নিয়ে এল তখন মনে হয়েছিল জীবনটা শূন্য হয়ে গেল। কামুক, মদ্যপ, হিংস্র, বদমায়েশ যাইহোক তবু তো সেই তার মাথার উপর ছিল। আজ ছটা বছর একসঙ্গে ঘর করছে। প্রতিরাত্রে একসঙ্গে শুচ্ছে। সঙ্গম করছে। তবু কি একটা আকর্ষণ জন্মাবে না ?

হয়তো জন্মেছে। না হলে এতটা ব্যাকুল হয়ে পড়ত না। গতকাল রাত্রি দুটো থেকে আজকের ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ঠায় বসে থাকতো না। কি অসীম উদ্বেগে সময় কেটেছে। মিনিটকে মনে হয়েছে ঘণ্টা। ঘণ্টাকে দিন। ঘুম নেই, খাওয়া নেই, স্নান নেই। এক কাপড়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। বিয়ে করা বৌ এর চেয়ে কি বেশী করত ?

বিউটি বাথরুম থেকে ফিরে এসে সোফাতেই বসল। ওর গা-টা ঘিন্ ঘিন্ করছিল। যে শরীর পারফিউমের মদির সুবাসে ভরে থাকে তা থেকে ঘামের গন্ধ বেরুচ্ছে। হলেই বা শীতকাল। শরীরের সন্ধিস্থলগুলি পুনঃ পুনঃ ঘর্মাক্ত হয়েই ছিল। নাক সিঁটকে সোফাতে মাথাটা এলিয়ে ছিল। শাড়িটা একেবারে লাট খেয়ে গেছে। সিঁথিতে বাসি সিঁদুর। কপালের উপর চুল উড়ছে। এমন অবস্থায় সে কখনো থাকেনি। কিন্তু এসব কথা মনেই ছিল না।

গভীর আলস্যের মধ্যেই মনস্থির করে ফেলল সকালে সুবীর আসবে বলে গেছে। ও এলেই একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে পেশেণ্ট দুটিকে নিয়ে কলিয়ারী চলে যাবে। অনন্তকে দিন কয়েক নিজের কাছে রাখবে।

অকাতরে ঘুমুচ্ছে ওরা।

তিন

বাইরে রোদ ঝলমল করছে। বিউটি বাংলোতে গেছে। কমলেন্দু এল জাহ্নবী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। ফিস্ ফিস্ করে বলল—ওরা ঘুমুচ্ছে মাসিমা।

—আচ্ছা ঘুমোক।

উনি টুলটা নিয়ে অনন্তর মুখের কাছে বসলেন। অসীম মমতায় ওর মুখটিতে হাত বুলিয়ে দিলেন। মায়ের হাতের ছোঁয়াতে কি যেন যাদু আছে। ধীরে ধীরে জেগে উঠল অনন্ত। চোখ মেলে তাকালো। হেসে বলল—মা!

—কি হয়েছিল বাবা ?

—খাদে গ্যাস লেগেছিল মা।

—ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। তোর বন্ধু যখন খবরটা দিল তখন আমি আর আমাতে ছিলাম না।

—জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম মা।

মাতা ও পুত্রের মধ্যে কত না মমতামেদুর, উদ্বেগ ব্যাকুল কথোপকথন। ডি. ডি. সাহেবর ঘুম ভেঙেছিল। অনন্তর মায়ের সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি বললেন—বীর প্রসবিনী জননী আপনি। আপনাকে নমস্কার। কত সাহস ওর। নিজের জীবন তুচ্ছ করে আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে তুলে এনেছে।

পুত্রের বীরত্বে কোন মায়ের না গর্ব হয়? তিনিও গর্ববোধ করলেন।

অনন্ত বলল—তোমাকে দেখলাম মা। এতেই আমি সেরে উঠব। তুমি কেন উপোস দিয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকবে? বাড়ি যাও। কমল পৌঁছে দেবে।

কমলেন্দু বলল—হ্যাঁ মাসিমা। চলুন।

ছেলেকে ছেড়ে যেতে ওঁর মন সরছে না। কিন্তু যেতে তো হবেই।

বললেন—অনন্ত! এত বিপজ্জনক কাজ নাই বা করলি বাবা। তোর জন্য গ্রামের হাইস্কুল তো খোলাই আছে। ওখানেই মাস্টারি করবি।

অনন্ত বলল—আমি কি সারাজীবন মায়ের কোলেই বসে থাকব মা?

উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা! তিনি যে কাকে কি কাজে নিয়োজিত করবেন—মানুষের কি সাধ্য যে তার হদিশ পায়।

হাসপাতালের ভিড় বেলা একটা পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে আসে। খাওয়া দাওয়ার পর রোগীরাও কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ ঝিমুচ্ছে। ডি. ডি. সাহেব জীবনে তো কখনো বিশ্রাম পান না। তাই হাসপাতালের অলস প্রহরগুলি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিচ্ছেন।

অনন্তর চোখেও তন্দ্রার ঘোর। শরীর দুর্বল। ডুবে আছে ভাবনায়। ঝুম ঝুম শব্দ বাজল কানে। স্বপ্ন না বাস্তব কে জানে। অনন্ত চোখ বুজে আছে। কিন্তু তার পায়ের উপর মৃদু কোমল স্পর্শের অনুভূতি পাচ্ছে। ঠুং ঠাং চুড়ির বাদ্য শুনছে। খুব ভালো লাগছে ওর। সুখ সুখ ভাব জাগছে মনে। সেই আমেজে চোখের পাতা মেলল।

হলুদ রাঙা শাড়ি পরা একটি কিশোরী তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। কপাল থেকে প্রায় তালু পর্যন্ত লম্বা সিঁথি বরাবর গোলা সিঁদুরের দাগ। সেই তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কাঁচের চুড়ি রিন্ ঠিন্ শব্দে বাজছে।

অস্ফুট কণ্ঠে বলল—গৌরী! তুই।

গৌরী চোখ তুলে তাকাল। গভীর কালো দুটি টানা ভুরু টঙ্কার দিল। অনন্ত বলল, আয়,। এদিকে আয়।

গৌরী মুখের কাছে এসে দাঁড়াল। অনন্ত বলল—কোথা থেকে এলি?

—স্কুল থেকে।

—এ সময়ে ?

হ্যাঁ। টিফিনে পালিয়ে এলাম।

—কেন রে ?

—তোমাকে দেখতে।

অনন্ত হাসল। কোনো উত্তর জোগাল না। গৈরীকেই ভালভাবে দেখল। ঢল ঢল লাবন্যময় মুখ। দুজনেই চুপ চাপ।

দুম করে গৈরী বলে বসল—তুমি আমার কে হও অনন্ত দা ?

অনন্ত হকচকিয়ে গেল। একটু থেমে বলল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন রে ?

—কি জানি ?

—তোর বুঝি আমার উপরে খুব টান পড়ে গেছে ?

হ্যাঁ তো।

অকপট স্বীকারোক্তি। অনন্তর বুকে দুন্দুভি বেজে উঠল।

গৈরী বলল—যখন থেকে শুনেছি খাদে গ্যাস লেগে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছ তখন থেকেই তোমার জন্য মনটা ছটফট করছিল।

অনন্ত হাসল। ওর হাতের একটি চুড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল।

বলল—এখন শান্ত হল ?

—হ্যাঁ। বড্ড ভয় পেয়েছিলাম।

—আর ভয় নেই।

—তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাও। আমি তোমার জন্য পীর সাহেবের দরগায় সিন্নী চড়াবো।

—ওরে বাব্বাঃ। মানত করে বসে আছিস ?

—তা করব না ? তুমি আমার মান রেখেছো তা কি ভুলবার বটে ?

ওর পায়ের উপর কম্বলটা ঢাকা দিয়ে মল ঝুমঝুম করে চলে গেল। অনন্তর মনে হলো একরাশ ফুলের সুবাস অথবা মধুর সঙ্গীতের মূর্ছনা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। গৈরী আরো একটু থাকল না কেন ?

বিকেলে সাহেব সুবোরা এলেন ডি. ডি. সাহেবকে দেখতে। বিউটি তখন বিউটিফুল হয়ে ফিরে এসেছে। সাহেবরা তারই স্তাবকতা করছেন। এ তার রূপের গরব।

অথচ কত সহজে সে অনন্তর দিদি হয়ে গেছে। এই বিউটিকে সে আগে চিনতো না। এই ডি. ডি. সাহেবকেও নয়। বিপদকালেই বোধহয় মানুষ মানুষের আপন হয়।

ডাঃ সেন বিউটির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বললেন—গ্যাস পয়জনের একটা

মারাত্মক প্রতিক্রিয়া আছে। পালমোনারী সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে সব চেক-আপ না হওয়া পর্যন্ত পেশেন্টদের ছাড়া হবে না।

অগত্যাই ওদেরকে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হলো। শুয়ে শুয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অনন্ত। নিদ্রাহীন রাত্রে ভাবনায় ডুবে যায়। জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রথম অভিজ্ঞতার স্মৃতি কেউ ভোলে কেউ ভোলে না। অনন্ত তার ব্যতিক্রম নয়। সে মগ্ন হয় স্মৃতিলিপির পাতায়।

দামোদর অনার্য নদ। গৈরিক জলধারা অপার আনন্দে বয়ে যাচ্ছে কত না তরঙ্গ ভঙ্গে। দক্ষিণ পশ্চিম দিগন্তে পঞ্চকোট পাহাড়ের সুনীল প্রেক্ষাপট। পরপারে মানভূমের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঝাঁকড়া মাথা তালবীথি, পাতাঝরা পলাশ, মহুয়া।

মকর সংক্রান্তির দিন। মাথার উপর দীপ্ত সূর্য। সম্মুখে প্রসারিত ধূ-ধূ বালুকারাশির মধ্যে গৈরিক জল ধারায় ভেসে আসছে ফুল ও গাঁদা ফুলের মালা। সারা পৌষ মাস ধরে টুসু পরব হয়েছে তারই ভাসানের ফুল।

পৌষ পার্বণের শেষ লগ্ন। ঘাটে ঘাটে মকর স্নানের ভিড়। বালিকা ও কিশোরীদের টুসু ভাসানের গান, ফেরী ঘাটে নৌকা পারাপার, কূলে কূলে পৌষালী উৎসব, পিকনিকের জমাটি আনন্দ কোলাহল।

তারই মধ্যে পাথর চাতালে বসে ঢেউ গুণছে এক সরল কোমল তরুণ। গোঁফে রেশ দিয়েছে। চোখ দুটি আয়ত। ঘন কৃষ্ণ ভ্রূ এবং অতল গভীর চোখের তারায় রোমান্টিক ভাবালুতা। নাকটা খাড়া। দাঁতগুলো অবিন্যস্ত। মাথার উপর ঝাঁকড়া চুল। ঈষৎ কোঁকড়ানো, অযত্নে লালিত। ছোট কপাল। মুখের মধ্যে কি যেন আকর্ষণ আছে।

উজ্জ্বল শ্যামল গায়ের রঙ। দোহারা শরীর। চওড়া পাঞ্জা। লম্বা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। বুকের ছাতি ছত্রিশ ইঞ্চি। পরনে হাফপ্যাণ্ট। ছোট ছোট চেক দেওয়া কেলিকো ছিটের ফুল শার্ট প্যাণ্টের ভিতরে গুঁজে পরেছে সেজন্য দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছে ওকে। বসে আছে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে। মনটাও সতেজ।

এই জাতকের নাম অনন্ত গোপাল শর্মা। পিতা ৺কৃষ্ণগোপাল শর্মা। সাকিন বনবিষ্টুপুর। জিলা বর্ধমান।

গরিবের ছেলে। বাবা ছিলেন আদর্শবাদী শিক্ষক। মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন গান্ধীজীর আদর্শ। সংগ্রাম করেছেন অন্যায় ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন সামান্য জমিজমা, পুকুর, বাগান। তাই দিয়ে কায়ক্লেশে সংসার চালাতেন। তিনি গত হবার পর তাঁর মা জাহ্নবীদেবী বহুকষ্টে সেই সংসারের হাল ধরে রেখেছেন।

অনন্ত, নীতি, প্রশান্ত ও প্রীতি—চারটি ছেলেমেয়ে। প্রত্যেকেই আপন আপন ক্লাসে ফার্স্ট হয়। অনন্ত বি. এস. সি.-তে ডিসটিংশান পেয়েছে। আরো পড়ার ইচ্ছে থাকলেও সাধ্যে কুলোয়নি।

তার পিসেমশাই বালিপাথর কলিয়ারীর মাইনিং সরদার তারই উদ্যোগে দামোদর কোল কোম্পানীতে মাইনিং ট্রেনির জন্য দরখাস্ত করেছিল। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেছে। আজ বেলা তিনটের সময় কোম্পানীর টেকনিক্যাল স্কুলে মৌখিক পরীক্ষা হবে।

সেজন্য কোনো টেনশান ছিল না। ওসব আধুনিককালের ব্যাপার। ঠিক বেলা দুটোর সময় দামোদর থেকে উঠে ও ডিসেরগড়ের দিকে রওনা হলো। মেন গেট পেরিয়ে অনেকটা মোরাম রাস্তা। তার দু'পাশে সবুজ ঘাসের লন। রাস্তার ধারে কুড়ি ফুট অন্তর গোল করে ছাঁটা ঝাউ গাছের সারি। ডালিয়া, জিনিয়া, মেরী গোল্ড, ক্রিসানথিমাম এবং বিভিন্ন সিজন ফ্লাওয়ারের রঙে ও রূপে ভরপুর হয়ে উঠেছে বাগানটি।

মোজাইক করা গোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনন্ত অপেক্ষা করতে লাগল তার জীবন ও জীবিকার কঠোর ভবিষ্যতের মুখে। বেশ একটা উদ্বেগ উত্তেজনার আশা ও নিরাশার দোলা। তারই মধ্যে সদ্য পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দু'একটা হাল্কা কথায় মনের ভার কাটাবার প্রয়াস। কেউ কেউ নার্ভাস। অনন্ত বে-ফিকির।

প্রথমজন বেরিয়ে এল। জন কয়েক ছেঁকে ধরল ওকে।

—না—না। তেমন কিছু নয়। বলতে বলতে ও কেটে বেরিয়ে গেল।

বারোর পর তেরো। এইবার অনন্তর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। কান দুটো গরম। চোখ দুটো ডাগর দেখাচ্ছে। টানা ভুরু কুঁচকে গেছে। চোখ ভুরু এবং নাক এই তিনটি প্রত্যঙ্গে ওর মনের ভাব ফুটে ওঠে।

পরীক্ষকেরা হয়তো তা লক্ষ্য করেছিলেন। একজন বসতে বললেন। উনি মিঃ কর। স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। মিঃ ভার্মা, পারসোন্যাল অফিসার এবং একজন গোরা সাহেব। ডেপুটি চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার। ওঁর কথা বোঝাই দায়। অবশ্য মিঃ কর দেশী ইংরেজিতে বলে দিচ্ছিলেন।

একে তো জন্মগত সাহেব ভীতি তারপর সবই ইংরেজি। একজন গ্রাম্য তরুণের পক্ষে সহজভাবে ইংরেজি ভাষায় উত্তর দেওয়া সোজা নয়। তবে সে বলেছিল।

ওর বায়োডাটার ফরম গোরা সাহেবের কাছে ছিল। নাম, পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করার পর উনি বললেন—তুমি ম্যাট্রিক ও ইন্টার মিডিয়েটে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছো। বি. এস সি.-তেও ডিসটিংশন পেয়েছো। ব্রিলিয়্যান্ট একাডেমিক ক্যারিয়ার। তাহলে তুমি আরো পড়লে না কেন?

অনন্ত উত্তরটা শুরু করলো—আনফরচুনেটলী আই য়্যাম—বলে। তারপর অকালে পিতৃহীন হওয়া ও পরিবারের আর্থিক অনটনের কথা সরলভাবে বিবৃত করল। বলতে বলতে তার মুখে বেদনার ছাপ পড়ল। সাহেবটি সহানুভূতি দেখালেন ও প্রশ্ন করলেন—আমাদের কোম্পানী যদি তোমাকে মাইনিং ট্রেনিং-এর সুযোগ দেয় তবে ফার্স্ট ক্লাশ পাবে তো?

অনন্ত আত্মবিশ্বাসের কণ্ঠে বলল—ইয়েস স্যার।

আরেকজন জিজ্ঞাসা করলেন—ক্যান ইউ ওয়ার্ক অ্যাজ ম্যানুয়েল লেবার?

—ইয়েস স্যার।

গভীর আত্মপ্রত্যয়ে ডান হাতের পাঞ্জাটা টেবিলের উপর চিৎ করে ফেলে দিল। শরীরটাতেও ঝাঁকুনি লাগল। সাহেবরা তা লক্ষ্য করলেন।

বললেন—ও কে। তুমি যাও।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

যেতে যেতে দেখল গোরা সাহেবটি ওর নামটাকে লাল কালির দাগে বেষ্টন করলেন। তার দিনদশ পর শেরগড় হাসপাতালে মেডিকেল একজামিনেশনের ডাক পড়ল। শক্ত সমর্থ শরীর। ওতে সে ফেল করবে না।

চার

অনন্তর চাকরি হয়ে গেল। দিনে একটাকা স্টাইপেণ্ডে ফার্স্ট ইয়ার মাইনিং ট্রেনি। চার বছরের কোর্স। প্রতি বছর ছ'আনা করে স্টাইপেণ্ড বাড়বে। চার বছর পর মারো ছক্কা। সেকেণ্ড ক্লাস পাশ করতে পারলে মাসিক পঞ্চান্ন টাকা বেতনের ট্রেনি থেকে সাড়ে তিনশো টাকার ছোট সাহেব।

তার সঙ্গে বিবিধ অ্যালাউন্স। বাংলো, চাপরাশী, মেথর।

না পাশ করলেও বানে ভেসে যাবে না। কোম্পানী তাকে মাইনিং কোর্সের যেমন পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে তেমনি চাকরি দেবে। কাজেই সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ। সাধ্য ও সাধনা থাকলেই হলো।

সেই স্বপ্ন বুকে নিয়ে শ্যামল ছায়াঘেরা প্রশান্ত পল্লী জীবন ছেড়ে কয়লা কুঠির কালো যবনিকার দিকে পা বাড়াল অনন্ত। এমন কত মানুষের বহতা স্রোত কয়লা কুঠিতে আছড়ে পড়ছে ১৭৭৪ সাল থেকে। ইউরোপ থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনমানুষ, কুলি কাবারী, সাহেব-সুবো অবলীলায় ছুটে এসেছে বাংলা বিহারের রাঢ় ভূমিতে ধরিত্রীর শিলান্তর বিদীর্ণ করে আধুনিক সভ্যতার জীবনী শক্তি কয়লা আহরণ করতে?

কত মানুষ কত ভাবেই না এসেছে। শিকড় গেড়েছে। ডালপালা বিস্তার করেছে। কেউ থিতু হয়েছে, কেউ হয়নি। কত তাদের জীবন যন্ত্রণা। জীবন

ও।জীবিকার তাগিদে কত সংগ্রাম। কয়লা কুঠির কালো যবনিকায় কেউ হারিয়েছে রূপ, কেউ রূপো। কেউ কেউ দু'হাত ভরে লুটে নিয়েছে রূপ, রূপো, হাসিনা দৌলৎ। সে এক রব। মধুচক্রকে বেষ্টন করে মৌমাছির মতো।

সেটা ফেব্রুয়ারি মাস। রোদটা চিন্ চিন্ করে গায়ে লাগছে। হাসুনিয়া মোড়ে অনন্ত বাস থেকে নামল শতরঞ্চি বাঁধা ছোট্ট বেডিং ও গোলাপ ফুল আঁকা টিনের স্যুটকেশ হাতে।

কপালে ঘাম। দু'এক গোছা চুল পড়ছে চোখে। হাত দিয়ে তা সরিয়ে এদিক সেদিক তাকাল। পান গুমটিতে খবর নিল দামুলিয়া কলিয়ারীর অফিস কোন দিকে তা জানবার জন্য।

অচেনা অজানা জায়গা। পিচ রোডটা নিয়ামতপুর থেকে চলে গেছে শের-গড়ের দিকে। ঐ পথে বাস চলে। একটা রেল পথ পিচ রাস্তাটা আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করে কলিয়ারীর দিকে গেছে। ওটাই দামুলিয়া কলিয়ারীর সাইডিং লাইন। কয়লা বোঝাই মালগাড়ি চলাচল করে।

একটি মোরাম বিছানো পথ সেখান থেকে বেরিয়ে পুবে বাঁক নিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর দু'ভাগে ভাগ হয়েছে। যেটি ডাইনে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে গেছে সেটিই দামুলিয়া কলিয়ারীর পথ।

অনন্ত হেঁটে যাচ্ছে। ডান হাতে ঝোলানো স্যুটকেশ। বাঁ কাঁধে বেডিং। একে একে পার হয়ে যাচ্ছে এজেন্ট সাহেবের বিরাট বাংলো, বাবু কোয়ার্টারের সারি। একটি ফুটবল মাঠ তারপর ফাঁকা। উঁচু কম্পাউণ্ড ঘেরা গোরখপুরী শ্রমিকদের ক্যাম্প, দোতলা হাসপাতাল কাম পিটহেড পথ, ছোট ছোট বাংলোর সারি, বাঁ দিকে ক্রেচ বিল্ডিং, অগ্রদূত মেস, বাবু কোয়ার্টারের সারি, পাশে বাংলো।

কলিয়ারী অফিসের সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখের তারা ঘুরোলেই চারটি চালক, হেডগীয়ার, ইঞ্জিন, চিমনি সব দেখা যায়।

বেশ বড়সড় অফিস। অনেক লোকজন। জানালায় জানালায় কয়লা কুলিরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেতন দেওয়া হচ্ছে।

একজন খাকি শার্ট প্যাণ্ট পরা লোককে জিজ্ঞাসা করল, ম্যানেজার সাহেবের অফিস কোনটা ?

লোকটা ওকে সবচেয়ে শেষের ঘরটা দেখিয়ে দিল। অনন্ত ওর বেডিং স্যুটকেশটা বারান্দায় নামিয়ে রেখে সাহেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াল। দারোয়ান ওকে আমল দিল না। অনন্ত দাঁড়িয়েই রইল। এতলোক ঐ অফিসে ঢুকছে বেরুচ্ছে কাউকেই সে আটকাচ্ছে না অথচ ওকেই আটকে দিল। আচ্ছা তো ?

একজন লম্বা চওড়া দারুণ স্মার্ট অফিসার অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পরনে হাফপ্যাণ্ট, খাকি হাফ শার্ট। পায়ে খাদের জুতো। ঝকঝকে পরিষ্কার

গায়ের রঙ। পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো। ছোট ছোট চুল। পায়ের গোছে কালো কালো লোম গোল গোল পাক খেয়ে আছে।

অনন্ত ওকেই সেলাম দিয়ে জানালো—গুড মর্নিং স্যার।

—গুড মর্নিং। তুমি কে?

—মাইনিং ট্রেনি স্যার। নূতন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি। তাই জয়েন করতে এসেছি। ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো।

উনি মিঃ চৌধুরী। দামুলিয়ার ডেপুটি ম্যানেজার ফার্স্ট ক্লাস পাশ করেছেন বছর দুই আগে। ম্যানেজারের পরেই ওঁর স্থান। তিনিই দয়াপরবশ হয়ে ম্যানেজারের কাছে পৌঁছে দিলেন।

অনন্ত ওঁকে নমস্কার করল। উনি পেনসিলটা নাড়লেন।

শুধু নামটা ও কতদূর লেখাপড়া করেছে এইটুকু জিজ্ঞাসা করেই বললেন, ডি. সি সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দাও।

দামুলিয়া কলিয়ারীতে চাকরি করতে হলে যে দুটি মহাজন ব্যক্তির অনুকম্পা অবশ্য প্রার্থনীয় তাঁদের একজন ডি. সি. সাহেব। অর্থাৎ দেবব্রত চক্রবর্তী। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার।

দ্বিতীয় জন হলেন ডি. ডি. সাহেব। পুরো নাম ধর্মদাস তালুকদার। ট্রেনিরা ঠাট্টা করে বলে ডি. ডি. টি.। মাইনিং সরদারী সার্টিফিকেট সম্বল করে ব্রিটিশ কোম্পানির ছোট সাহেব। আঙুল ফুলে কলাগাছ আর কাকে বলে? একটি ষাঁড়ের দৌলতে তার এত রমরমা।

প্রথম জনের অনুজ্ঞায় অনন্ত অগ্রদূত মেসে একটি সিট পেল অফিসের কেরানি অনিলবাবুর রুমে। ঘণ্টাখানেক পর আরো একজন এসে পড়ল। তার নাম কমলেন্দু বিশ্বাস। একটু মোটাসোটা সুখী চেহারা। বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে আই. এস. সি. পাশ করেছে।

অনন্ত ডানপিটে। কমলেন্দু শান্ত সুবোধ। অনন্ত গরিবের ছেলে। কমলেন্দু-বড়লোকের ছেলে। কিন্তু মাত্র এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে দুজনের ভাব ভালবাসা জমে উঠেছে।

অনন্তর বিছানা ছিল মায়ের হাতে তৈরি একটি নকশি কাঁথা, একটি সুজনী, সতরঞ্জি, চাদর, বালিশ। অমলেন্দুর ছিল তোষক, কম্বল, চাদর, বালিশ।

অনিলবাবু বারোটার সময় মেসে এলেন। বড়ই অপ্রসন্ন। একে কালো তাই থমথমে। বললেন—দুটো বিছানা করলে আমার খাটটা কি মাথায় রাখব? এইটুকু তো ঘর। আপনারা একটা বিছানা করুন।

অগত্যাই। ওরা নতুন এসেছে। হাল হকিকত কি জানে?

দুটি বিছানা তুলে সবগুলি পর পর সাজিয়ে একটি বিছনা করল। পাশাপাশি দুটি বালিশ রেখে অনন্ত বলল—বাঃ। খাসা ফুলশয্যা হে!

কমলেন্দু বলল—ঈশ্বর করেন যেন এই বিছানার উপর আপনার ফুলশয্যা হয়।

—ওঃ হো! একটা বড় অ্যাবসার্ড ড্রিম।

অনিলবাবুর খাটটির মাথা শিতানে দেওয়ালে টাঙানো পুরানো ক্যালেণ্ডারে গান্ধীজীর ছবি। নিচে লেখা—আমার জীবনই আমার বাণী।

সেই মূল্যবান বাণী-মূর্তির পদতলে সটান লম্বমান অনিলবাবুর কালো ভুঁড়ির দিকে চোখ ঠেরে অনন্ত বলল—আহা কি পবিত্র!

অনিলবাবু ওর দিকে কট কট করে তাকিয়ে বললেন—বেশি ইয়ার্কি মারবেন না।

মেসের বারান্দায় তখন জোর গুলজার। ট্রেনিরা এসে গেছে। প্রায় দশ বারোজন। তারা হল্লা জুড়ে দিয়েছে।

'টি' শেপের বারান্দার সামনে ব্যাডমিণ্টন কোর্ট। দুটি খুঁটি পুঁতে হাই পাওয়ার বাল্ব লাগানোর সরঞ্জাম। নেটটা টাঙানোই আছে। সেখানে মোড়ার উপর বসে কেউ তেল মাখছে, কেউ খালি গায়ে কসরৎ করছে। সেইসঙ্গে চলছে গুলতানি। হাজারো কিসিমের কিসস্যা কহানী। জিভে জড়তা নেই। অবলীলায় বলে যাচ্ছে আদিরসে চোবানো সংলাপ।

একটি বাথরুম। দু-তিনজন এক একবারে ঢুকে পড়ছে। দরজাও খোলা। অথচ নগ্নস্নান। কেউ বা স্নান করে গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে অনায়াসে বারান্দা দিয়ে পার হচ্ছে নগ্ন অবস্থাতেই।

অলিখিত নিয়মে স্নানের সময়ে নারীদের প্রবেশ নিষেধ। যদি কেউ এসে পড়ে তবে সেই লজ্জায় পড়বে। ওদের কোনো বিকার নেই। সব সিদ্ধপুরুষ। কমলেন্দু ভেবাচেকা খেয়ে গিয়েছিল। অনন্ত অতটা নয়। বরং ভালোই লাগছিল। বেশ তো আদি জননীর কোলে আদিম সন্তান।

বাঃ দৃশ্যটি উপভোগ্য!

একটি নগ্ন যুবক অনন্তর গাল টিপে বলল—এই খোকা। তোর নাম কি?

—অনন্ত শর্মা।

আরেকজন কমলেন্দুর গালে চুমু খেয়ে বলল—এ শালা রসের বিনোদিনী!

ওর মুখটা লাল হয়ে গেল রাগে ও লজ্জায়।

ওদেরকে নিয়ে হাসি-মসকরা চলতেই লাগল। নানা অশ্লীল ভঙ্গীতে তাতিয়ে তুলল। কেউ কেউ দু-এক থাপ্পড় মারও বসাল।

অনন্ত বলল—আপনারা আমাদের সিনিয়র। তাই দাদা। না হলে গায়ের জোর কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম। খোকা খুকু কিছু নয় দেখতে পাবেন খেলার মাঠে। আসবেন আমার সঙ্গে মোকাবিলা করতে।

—সাবাশ! একটি ছোকরা হাততালি দিল। ওর নাম সুবীর সেন। কলকাতার ছেলে। আজই এসেছে এবং ওদের পাল্লায় পড়েছে। ওর দিকে

হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল। একজন লম্বা ছিপছিপে কালো রঙের ছোকরা হাত বাড়িয়ে বলল—আমি স্টিফেন হেমব্রাম। ফোর্থ ইয়ার মেকানিক্যাল ট্রেনি। ফুটবল টিমের ক্যাপটেন। সুবীর ও অনন্ত দুজনেই ওকে বাউ করে বলল—আশা করি খেলতে পাবো।

সেদিন সন্ধ্যায় ওদের পরিচয় হল স্থমিত চ্যাটার্জীর সঙ্গে। ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ করে চাকরি করছেন। মেসের সবারই লোক্যাল গার্জেন।

তিনি সস্নেহে ওর পিঠ চাপড়ে বললেন—লড়ে যা অনন্ত। তোর মধ্যে স্পিরিট আছে।

—দাদা ওরা আমাদেরকে ভীষণ অপমান করেছে।

—কিছু মনে করিসনে। দিন কয়েক পর গলায় গলায় বন্ধুত্ব হবে। তখন আবার একজন আরেকজনকে ছেড়ে থাকতে পারবিনে।

পাঁচ

অগ্রদূত মেসের একটা পুরানো ঐতিহ্য আছে। এখান থেকে প্রতি বছর একটি দুটি ট্রেনি সেকেণ্ড ক্লাস পাশ করে ছোট সাহেব হয়। পাশ-করা ছাত্রদের উদাহরণ সামনে রেখে পড়াশোনা করে। তাদের নোট, খাতা, ড্রয়িং, স্কেচ, বইপত্র পায়। কারভিক থেকে প্রকাশিত ইউনিভার্সাল মাইনিং স্কুল বইটার তখনকার বাজারে একশো নব্বই টাকা দাম। দৈনিক এক টাকা হাজরি পাওয়া ছাত্রদের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। যাদের বাড়ির অবস্থা ভালো তারা পারে। তাছাড়াও ডাঃ পেনম্যান, ডাঃ হুইটেকার, মিঃ ক্লার্ক, মিঃ ফ্যানেটকার প্রমুখের বই কিনতে হয়। সায়েন্স অ্যাণ্ড আর্টস অফ মাইনিং নামে পাক্ষিক পত্রিকা বের হতো সেটা তো নিতেই হয়। আমাদের দেশের ভূতত্ত্ব বিলেতের সঙ্গে মেলে না। আইন-কানুন বিলেতের ধাঁচে তৈরি হলেও বিলেতের মতো নয়। কাজেই সংগ্রহ একটা মস্ত ব্যাপার।

অগ্রদূত মেসের ছাত্রদের পারস্পরিক সহযোগিতার বাতাবরণ সেদিক দিয়ে খুবই অনুকূল ছিল। পরের পর ছাত্ররা মাল মশলা পেয়ে যেত।

আর তাদের কেন্দ্র চরিত্র ছিলেন স্থমিত চ্যাটার্জী। ছাত্রদেরকে ভাইয়ের মতো ভালো বাসতেন। ট্রেনিং পিরিয়ডের চার বছর পার হয়ে গেছে। সেকেণ্ড ক্লাস পরীক্ষায় বার দুই ফেল করেছেন। বর্তমানে ভেন্টিলেশন অফিসারের কাজ করেন। অর্থাৎ খাদে বায়ু চলাচলের যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। তখন এই পোস্টের জন্য ম্যানেজারী পাশ করতে হতো না।

একেবারে উত্তরের ঘরটি এক নম্বর। মহীতোষ সেন ও শিবেন ভট্টাচার্য। দুজনেই ফোর্থ ইয়ার ট্রেনি। এবছর সেকেণ্ড ক্লাস দেবে।

দু'নম্বরে নবেন্দু ঘোষ, সাধন পাল—থার্ড ইয়ার ট্রেনি। তিন নম্বরে সুব্রত রুদ্র, অপূর্ব সেনগুপ্ত। চার নম্বরে মহেন্দ্র সিং, সুরেশ প্রসাদ ঝা। পাঁচ নম্বরে অসীম ব্যানার্জী সেকেণ্ড ইয়ার ছাত্র। কলিয়ারীর বড়বাবু রামহরির জামাই, শ্বশুর ঘরে থাকে না। ওর বউ কাশীমাতা বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাস টেনে পড়ে। দুজনে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেম করে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মারফৎ চিঠির আদান প্রদান হয়। দুজনেই দুজনের ফটো বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখে।

ওর রুমমেট স্টিফেন হেমব্রাম। শেরগড় হাসপাতালে মিস টেরেজা ঘুঘু নামে একটা ব্ল্যাক মডেলের নার্স আছে। ওরা দুজনেই আদিবাসী খ্রীস্টান। পরস্পরের সম্পর্ক আছে এবং চুটিয়ে প্রেম করছে।

সেজন্য অগ্রদূত মেসের এই ঘরটিকে বলে প্রেম নিবাস। পাঁচ নম্বর তো। তাই অস্থির পঞ্চমের তাড়নায় সর্বদাই অশান্ত। কোনো ছুটির দিনে যদি ঘুঘু বেড়াতে আসে তবে অসীম ঘর ছেড়ে দেয়। হেমব্রাম বন্ধুকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বলে তোর বাসন্তী কেন আসে না রে? ওকে নিয়ে আয়। বিয়ে করা বউ। অত কিসের লজ্জা ভয়?

অসীম মনে জোর পায়। কিন্তু ওর শ্বশুর শাশুড়ী দুটোই টেঁঠিয়া। কিছুতেই কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

ছ' নম্বরে সুমিত চ্যাটার্জী ও সুনীল নন্দী। দুই মেরুর দুই বাসিন্দা। সুমিতবাবুর জীবনেও একটি প্রেম ফুটি ফুটি করছে। সে বিলবাবু মজুমদারের মেয়ে স্বপ্নার অনারারী টিচার। ও এবছর স্কুল ফাইন্যাল দেবে। বেশ চালাক চতুর মেয়ে। নাচে প্রাইজ পেয়েছে।

সাত নম্বরে অনিলবাবু, অনন্ত, কমলেন্দু।

আট নম্বরে গুণময় বারুদ কুলি, ওর দাদা হরিহর এবং সুবীর।

নয় নম্বরে দীপক দাস, সত্যেন মোহান্ত। দশ নম্বরে ফটিক দা। ক্যান্টিনের ম্যানেজার। ছাত্রদের বড় ভালবাসার দাদা। বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়ে আছে। ছা-পোষা ধরনের মানুষ। জওহরলাল নেহরুকে দু'বার সামনা সামনি দেখেছে। দারুণ ভক্তি করে ওঁকে। ডিসকভারী অফ ইণ্ডিয়া বইটি ওর বাকসোতে আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। কথা বলার সময় তার থেকে রেফারেন্স তুলে দেয়।

এই মেসের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তার বারামাস্যা, আনন্দ উৎসব উদ্বেগ উত্তেজনা এবং সুখ দুঃখের সঙ্গে যে একবার ভিজে গেছে সে আর মায়া কাটাতে পারে না। এমন কয়েকজন ছোট সাহেব আছে যারা পাশ করে অন্যত্র বদলি হওয়ার পরও ছুটির দিনে আড্ডা মারতে আসে। যতদিন না বিয়ে থা হয় ততদিন এ রোগ যাবে না। কারো বা সেই প্রেমটিও এখানে কোনো কোয়ার্টারে প্রতীক্ষায় আছে।

আলাপ পরিচয়ের প্রাথমিক—অধ্যায়টা পার হয়ে অনন্ত নিজেকে খাপ খাইয়ে

নিয়েছে। সকলের সঙ্গে হেসে খেলে বেশ আছে। মেসের ব্যবস্থাটিও ভালো। মাসের শুরুতে স্টাইপেণ্ড পেয়েই কুড়ি টাকা জমা দিতে হয়। তাতে দুপুরে ও রাত্রে ভাত, একটা তরকারি, ডাল, ভাজা এবং আমিষ। মাছ, মাংস অথবা ডিম। সকালে জলখাবার দুটো পরোটা, আলু ভাজা এবং ঝোলা গুড়।

ঠাকুর, চাকর ও ঝি। মেস মেম্বারদের মধ্যে মাসে একজন করে ম্যানেজার হতো। সে-ই সারা মাসের হিসেব নিকেশ রাখত ও মাস ফুরোলেই মিল চার্জ হিসেব করে যা দেনা পাওনা তার তালিকা টাঙিয়ে দিত। কারো অতিথি এলে তাও খাওয়ার চার্জ ঐ দরে। মাসের শেষে একদিন ফিস্ট। লুচি, মাংস ও পায়েস।

স্নানের সময়ে নগ্ন বিভঙ্গ এবং খাবার সময় অশ্রান্ত কোলাহল। দিনে বেলা একটা থেকে দুটো, রাত্রে নটা থেকে দশটা। যারা ডিউটি থাকার জন্য সময়ে হাজির হতে পারত না, ঠাকুরমশাই তাদের রুমে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখতেন।

গজল্লাটা বড়ই মুখরোচক। হরেক কিসিমের আলোচনা। নারীর যৌবন, মিথুনের পুলক, প্যার কি নগমা, ফুটবল, ক্রিকেট, রাজনীতি, সমাজনীতি, অঙ্ক, ইংরেজি, লেজিসলেচর, মাইনিং টেকনোলজি এবং মজদুরি মাইফেল। মেসের দেওয়াল পত্রিকা।

নানারকমের চুটকি, ভাষ্য, আলোচনা, চিঠি, বক্তৃতা, ব্যঙ্গচিত্র, ইত্যাদি মোটা মোটা অক্ষরে হাতে লেখা। ছদ্মনামী লেখক গোষ্ঠী, পানসুপারী, পানমৌরি, চুন জর্দা, মজদুর, কাকভুশণ্ডী ইত্যাদি। এরা নিশ্চয়ই এই মেসেরই। কিন্তু কার কি নাম এটা জানবে কী করে? সিনিয়ারদিকে জিজ্ঞাসা করলে মিটি মিটি হাসে। কেউ বলে—দেখো না-তুমিও যদি কবি হতে পারো।

অনন্তর প্রথম প্রবেশটা আর পাঁচজন ট্রেনির মতো হয়নি। আগে যারা এসেছে তারা সবাই অল্প বিস্তর র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছে। কিন্তু অনন্ত বিয়ের রাতে বিড়াল মেরে হিরো হয়ে গেছে।

ঐ যে মোকাবিলা করবেন খেলার মাঠে—ঐ কথাতে স্টিফেন যেচে আলাপ করেছে। সুবীর ও কমলেন্দু ওর পরম বন্ধু হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় সুমিতবাবু ওকে তারিফ করলেন।

দিনকয়েকের মধ্যে ঘটল আরেকটি ঘটনা। নবেন্দু ঘোষের জামাইবাবুর নাম জটিল পাত্র। তিনি হাফ সাহেবের পোস্ট নিয়ে এসেছেন এবং যতদিন না ওর কোয়ার্টার রেডি হচ্ছে ততদিন মেসেই থাকবেন। মুখে বড় বড় বুলি ঝাড়েন। ধোপ দুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবী পরে খেতে বসেন জামাইবাবুর মতোই।

খাবার সময় তো হাজার আলোচনা হয়। সেদিন ফুটবল খেলোয়াড়দের আলোচনা হচ্ছিল এবং অর্বাচীন অনন্ত প্রশ্ন করে বসল—রাম বাহাদুর কি জাত?

কিন্তু তার পরেই মনে মনে জিভ কাটল। এ যে বড় বেফাঁস কথা হয়ে

গেছে। এবং জটিলবাবুও তা লুফে নিয়ে উত্তর দিলেন—বালখিল্য প্রশ্ন। তোমার জানা উচিত সব বাহাত্বর নেপালী।

অনন্ত বাক্যে তুখোড়। হেরে যেতে যেতে ও জবাব দিল—তবে কি রায় বাহাত্বরও নেপালী ?

—হিয়ার। হিয়ার।

সবাই হো—হো—করে হেসে উঠলো।

এটা তো তুপুরের ব্যাপার। সন্ধ্যায় আরেকটা ঘটনা ঘটল। পংক্তিভোজনে সামিল হয়ে খেতে বসেছে সবাই। এলুমিনিয়ামের বাটিতে মুন থাকতো। এটা কমন ইউটেনসিল। বাঁ হাতে করে এ ওর দিকে ঠেলে দিত। সাধন বসেছিল চার পাঁচজনের পরে। ওর ডালের বাটিটা থালা বাটির সারি থেকে একটু উপর দিকে ছিল। এ ওর দিকে মুনের বাটি দেওয়াটা রেওয়াজ ছিল।

অনন্ত ক্যারাম বোর্ডের ঘুঁটির মতো মুনের বাটিটা ঠেলে দিল। ঠকাস করে ধাক্কা মারল সামনের ডালের বাটিকে। ডাল ছিটকে পড়ল জটিলবাবুর ধুতি পাঞ্জাবীতে। কিম্ভুতকিমাকার অবস্থা। অনন্ত ভীষণ অপ্রস্তুত।

—আহারে চু-চু-চু।

এটা তুঃখের হাসি এবং কৌতুকের ব্যাপার। হাসিতে ফেটে পড়বার জন্য সবারই পেট কুল কুল করছে। হাসাও যায় না। সে এক বিষম ঠ্যালা!

পরদিন সকালে মেসের দেওয়াল পত্রিকায় কার্টুন চিত্র। রায় বাহাত্বরের মতো ড্রেস মেক আপ করা একটি বৃদ্ধ ফুটবলে শট মারছেন আর তার মাথায় ডালের বাটি উপুড় হয়ে পড়ছে। রঙচঙে ছবি। নীচে ক্যাপসন রায় বাহাত্বর ডাল খায়। ফুটবল খেলে।

অনন্ত এই দেওয়াল পত্রিকাটির প্রতি ভীষণ আকর্ষণ বোধ করত। প্রায় তিন ফুট লম্বা তু'ফুট চওড়া কাঠের বোর্ড দেওয়ালে ঝুলত। লেখাগুলি গোল পিন দিয়ে সাঁটা হতো। আবার নতুন লেখা আসত পুরানো লেখা চাপা পড়ত। ভালো লেখা এবং ছবি বেশ কিছুদিন ধরে থাকত। একদিন সে একটা কবিতা লিখে টাঙিয়ে দিল। কবির নাম—কয়লা কুলি।

কবিতার নাম—'মালকাটা'

চৈ চম্পা হাজারিবাগের জঙ্গল ফুঁড়ে
সিধু কানু চাঁদ ভৈরবের কপাল ভেঙে
আদিবাসী মায়ের জরায়ু ছিঁড়ে
কে তুমি বেরিয়ে এলে মালকাটা ?
গাঁইতি হাতে ঘাম চিক্ চিক্ আতুল গায়ে
নিকষ কালো পাললিক শিলাস্তরের আ-চোট ভূমিতে
চোট বসাবার আগে তোমার কি মনে পড়ে না

আদিবাসী মায়ের কালো মুখটার কথা ?
মনে পড়ে না—
গোরা সাহেবেরা একদিন তোমার মায়ের
আ-চোট ভূমিতে
চোট বসিয়েছিল—১৮৫৫ সালে।
সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়।
তখনো তুমি যুবক ছিলে এখনো যুবক
দাঁড়িয়ে আছো স্থিরচিত্রের মতো
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে
কালো কয়লার প্রেক্ষাপটে।

ছয়

সেই একটা যুগ। নারীদেহ ভোগ্য পণ্য। তামাম কোলফিল্ডে অমন কত শোভারাণী বিউটি কুইন হয়েছিল। নারীত্ব, সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে সাদা কুকুরের রঙিন মাইফেল জমিয়ে তুলত। তাদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা ছিল না। প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না।

তাই বিউটিরও ভিতরে প্রেম ছিল না। তার শরীরটারই যখন দাম তখন সেটাকেই সে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত। নানা প্রসাধনে সুগন্ধী ও সুচিক্কণ করে তুলত। কখনো নিরাভরণা হয়ে দাঁড়াতো ড্রেসিং টেবিলের সামনে হাই পাওয়ার বাল্বের আলোতে।

ডি. ডি. সাহেব তাকিয়ে দেখতেন। এই শরীর। পুঞ্জীভূত যৌবন এবং তার জ্বালা। নিজেও জ্বলছে অন্যকেও জ্বালাচ্ছে। এমন-অপূর্ব সৌন্দর্য প্রাণহীন। প্রাণের জন্মও দিতে পারে না। বিউটি নামের একটা মেয়ের বিউটিই আছে। মন নেই। সে শিল্পীর গড়া প্রতিমা।

খুলে দেয় হুইস্কীর বোতল। দুজনেই পান করে। দুজনেই মাতাল হয়। ডি. ডি. সাহেব চান একটু প্রেম, ভালবাসা,-উষ্ণতা।

একদিন তিনি ফেটে পড়লেন—তুমি জানো না বিউটি তোমাকে আমি কত ভালবাসি। কিন্তু তোমার মন নেই। তুমি একটি শিল্পীর গড়া প্রতিমা।

—তাই বুঝি ?

সুন্দর ভঙ্গীতে জানালো ও। বলল—ভালবাসা তো একতরফা হয় না। তুমি যদি ভালবাসো তাহলে আমিও বাসি।

—এই কি তার নমুনা ?

গ্লাসের তলানি পর্যন্ত শেষ করে আবার ঢালতে ঢালতে বলল—কেমন নমুনা

চাও ? যখন খুশী যেমন খুশী তুমি আমাকে এনজয় করছো। আমি কখনো প্রতিবাদ করেছি ?

—কেন করোনি ? তাহলে তো বুঝতাম তোমার মন আছে। রাগ অনুরাগ আছে।

—কেন ডি. ডি. ওসব তিক্ত প্রসঙ্গ টেনে আনছো ? আজ যদি তোমার সি. এম. ই. ফোন করে বলেন ভুত বাংলোর পার্টিতে বিউটিকে পাঠিয়ে দেবেন। তখন আমি কাকে রাগ দেখাবো ? পিছনে ক্ষ্যাপা কুকুর লেলিয়ে দিয়ে ভালবাসার কথা বোল না।

ডি. ডি.-র মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বারমান সাহেব বিউটিকে হস্তান্তর করে দিয়েছিলেন বলেই যে তার কোবালা সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল তা নয়। গুদামজাত দ্রব্যের যেমন তালিকা থাকে বড় বড় রসিকদের কাছেও তেমনি বিউটিদের তালিকা থাকে। প্রয়োজন হলেই তাঁরা রিকুইজিশন করেন গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে। অথবা টেলিফোনে।

উনি একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়লেন। একটু পর বিউটিও তার পাশে শুলো। দুজনের চোখেই ঘুম নেই।

রাত বয়ে গেল কালের নিয়মে। ভোরের হিমেল বাতাসে অজস্র শিশির বিন্দু টুপ-টাপ খসে পড়ল গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায়। সকালের সোনারোদে ঝিলমিল করে উঠল শিশির ধোওয়া প্রকৃতি।

জেগে উঠল শিল্পনগরী, কুলিধাওড়া, বাবু কোয়ার্টার। কে কত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে রাত কাবার করে দিল তার হিসেব কে রাখে ?

অনিবার্য নিয়মে বয়লার হাউসে গন-গনে আগুনের তাপে জল বাষ্পীভূত হলো। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠল। হস হস শব্দে ইঞ্জিন চালু হলো। বন্ বন্ করে হেড গীয়ারে পুলি চাকা ঘুরল। সারা কলিয়ারী ভরে গেল যান্ত্রিক শব্দে।

ডি. ডি. সাহেব দাঁড়ালেন পিট টপে পরনে খাকি হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট, মাথায় হেলমেট, পায়ে বুট জুতো, হাঁটু পর্যন্ত খাকি মোজার ভিতর গোঁজা একটি পেনসিল। না পাশ দেশী সাহেব। আদি এবং অকৃত্রিম মাইনিংম্যান। স্থিরচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে আছেন উনবিংশ শতাব্দী থেকে। বশংবদ ভৃত্য। সুদক্ষ অফিসার। পরম বিশ্বাসী দাস।

শিল্প সভ্যতার পটভূমিতে একান্ত প্রয়োজনীয় চরিত্র।

ফুটবল মরশুমে অগ্রদূত মেস জম-জমাট। প্রায়ই ওদের ফুটবল টিম হিপ হিপ হুররে করতে করতে মেসে আসে। গুলজার ধরিয়ে দেয়। তাদের মুখে বিজয়ীর হাসি। স্টিফেন হেমব্রাম কাপ্টেন। এ বছরের নয়া আমদানি সুবীর বোস, অনন্ত শর্মা। দুজনেই দুর্ধর্ষ প্লেয়ার। ইণ্টার কোম্পানী টুর্ণামেণ্টে একটার পর একটা খেলা যে জিতে যাচ্ছে তা এই দুটি খেলোয়াড়ের জন্য।

কিন্তু সেমি ফাইন্যালে শিমুলিয়ার সঙ্গে খেলায় অনন্ত হাঁটুতে চোট খেয়ে গেল। খেলায় জিতল। আর তার ওপর পড়ে গেল সবারই চোখ। ওর চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ডাক্তারবাবু বললেন সাতদিন রেস্ট। কলিয়ারীতে ছুটি করিয়ে দিলেন। ফুটবলে পা দেওয়া বারণ। ফাইন্যাল খেলার দিন যেন হান্‌ড্রেড পারসেণ্ট ফিটনেস নিয়ে মাঠে নামতে পারে। কত লোকের কত উপদেশ। এমন কি ডি. সি. সাহেবও ওর খবর নিতে মেসে আসেন।

অনন্তর এতটা পছন্দ নয়। চোট এমন কিছু নয়। ফুটবল খেলোয়াড়দের হামেশাই এমন চোট লাগে। তাতে কি আছে ?

অখণ্ড অবসর। কোনো কাজ নেই। কোনো কাজে মনও নেই। বর্ষার আকাশে মেঘ ডম্বুর বাজছে। দামোদরে দু'বেলা বান উথাল-পাথাল করছে। কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে অনন্ত বেরিয়ে পড়ল দামোদরের দিকে। হলেজ ঘর, বয়লার হাউস, স্যাণ্ড লাইন পার হয়ে উঁচু পাড়ের ওপর খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে। একদিকে ধানক্ষেত। অন্যদিকে দামোদরের দুরন্ত জলধারা। জল-তরঙ্গের অদ্ভুত শব্দ। মেঘলা আকাশে সূর্যের ফিনকি দিয়ে পড়া লাল রশ্মি। পরপারে শ্যামল বনভূমি। তটভূমির ওপর ঘনসবুজ ঘাস। ঠাঁই ঠাঁই দু'একটি পলাশ ও শিমুল গাছ।

হঠাৎ ওর চোখ আটকে গেল এক আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যে।

একটি গাই আপন মনে ঘাসে মুখ ডুবিয়ে চরছে। ঈষৎ শ্যামল গায়ের রঙ। মসৃণ গা চিক্ চিক্ করছে। কপালে সাদা চাঁদ। আর তার কাছেই একটি বালিকা বধূ বাছুরটির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছে। কখনো বা তাকাচ্ছে পঞ্চকোট পাহাড়ের দিকে।

পরনে হলুদ রঙের শাড়ি। চুলগুলো পিছনে সাপটে বাঁধা। সিঁথিতে লম্বা করে সিঁদুর। কপালে টিপ। দু'হাতে কাঁচের চুড়ি। পায়ে মল।

অনন্তর মনে হল এই কি কৃষ্ণকলি ?

কিন্তু না। এ কৃষ্ণকলি নয়! চাঁপার কলি! কি সুন্দর গায়ের রঙ! লাবণ্যে উদ্ভাসিত কচি মুখ। চোখ দুটি যেন তুলি দিয়ে আঁকা। কোন শিল্পী তৈরি করেছে এমন সৌন্দর্যময়ী বালিকা ? না, ঠিক বালিকা নয়। কৈশোরের কলি ফুটেছে শরীরে।

দৃশ্যটির রূপে, লাবণ্যে, ঐশ্বর্যে অনন্ত এত মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি তখন বাছুরটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রীবা ভঙ্গী করে। ওর একটা হাত কোমরে। দু'চোখে অপার বিস্ময়। অনন্ত জিজ্ঞাসা করল—তোমার নাম কি খুকি ?

—গৌরী!

—হ্যা! গৌরীই বটে! তা তোমার মহাদেবটি কোথায়?

—কি করে জানবো?

—সেকি? তোমার তো বিয়ে হয়েছে।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার কি অত মনে আছে? কখন সেই চার পাঁচ বছর বয়সের কথা। মুংলী—আয়!

ছুটতে ছুটতে গাইটার কাছে চলে গেল। ওর পায়ের মল বাজলো ঝুম ঝুম করে। গাইটা মাথা তুলল। ওর গলায় ঘণ্টা বাজল ঠুন্ ঠুন্ শব্দে! বাছুরটাও কাছে এল। ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবার।

অনন্ত দৃষ্টি ফেরাতে পারছিল না। নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছিল। একটা মেয়েকে এমন করে দেখলে সে কি মনে করবে? অথচ উদার প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে কি অপূর্ব এই দৃশ্য ও শব্দ।

হঠাৎ মেয়েটি বলে উঠল—আপনি তো অনন্তা দা। আমি আপনাকে চিনি।

অবাক হয়ে গেল ও। বলল—আমাকে চেনো?

—হ্যাঁ!

—কি করে চিনলে?

—আপনার মেসের দুয়ার দিয়ে রোজ স্কুল যাই যে। আমরা সবাই চিনি আপনাকে। আপনি কবিতা লেখেন—ফুটবল খেলেন।

অনন্ত হাসল। বলল—বাঃ, তুমি তো অনেক খবর রাখো অথচ আমি তোমাকে চিনতাম না।

—কি করে চিনবেন? কুড়ি বাইশটি মেয়ের মধ্যে আলাদা করে কাউকে চেনা যায়?

—এবার চিনতে পারবো—কোন ক্লাসে পড়?

—ক্লাস সিক্স। যাই?

গাইবাছুর তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল মল ঝুম্ ঝুম্ করে।

কাদের মেয়ে কার বউ কিছুই তো জানা হলো না। অথচ ভাল লাগে ঐশ্বর্যময় প্রকৃতির বুকে সৌন্দর্যের এই মূর্তিটিকে।

অপার মুগ্ধতা নিয়ে ফিরে এল মেসে।

ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতির মতো কালীমাতা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা স্কুলে যেত মেসের সামনে দিয়ে। কত রকমারি সাজপোশাকে, কারো ফ্রক, কারো সালোয়ার কামিজ, কারো শাড়ি। নানা ধাঁচে চুল বাঁধত। কারো বা বেণী দুলত। কারো খালি পা, কারো পায়ে চটি। নানা ধরনের, নানা জাতির। সিঁদুর পরা মেয়েও কম ছিল না।

গুচ্ছ গুচ্ছভাবে কলতানে পথঘাট মুখরিত করে যখন যেত তখন অনন্ত

তাকিয়ে থাকত সেই কিশোরী বধূটিকে দেখবার জন্য। শুধু সম্ভব হতো না দিন পালি ডিউটি থাকলে।

দৃশ্যটা বড় ভাল লাগত ওর। একদিন কবিতা লিখে মেসের দেওয়াল পত্রিকায় টাঙিয়ে দিল।

তাতে কেউ একজন টিপ্পনী কাটল—রূপ মুগ্ধ কবি।

কবিতাটা ঠিকমতো উৎরায়নি। তাই সে নিজেই ওটা ছিঁড়ে দিল। অনিল-বাবু বললেন—ছ্যাঃ!

শেরগড়ের মাঠে ফাইন্যাল খেলা। ডি. সি. সাহেব সেদিন একটা ট্রাক ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ওদের যাবার আসবার জন্য। ওরা যখন ড্রেস করে মাঠে নামার জন্য তৈরি তখন দামুলিয়ার এজেণ্ট, ম্যানেজার, মিঃ চৌধুরী, ডি. ডি., ডি. সি. সব এসে হাজির হলেন সেখানে। এজেণ্ট সাহেব খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করে পরিচিতা হলেন। হেমব্রামকে তো আগে থেকেই চিনতেন। ডি. সি. সাহেব বিশেষ করে চিনিয়ে দিলেন সুবীর ও অনন্তকে। এজেণ্ট সাহেব পিঠ থাপড়ে সাবাস দিলেন। বড় বড় কথায় উৎসাহ যোগালেন।

খেলার বাঁশি বাজল। শেরগড়ের দুর্দান্ত ফরওয়ার্ড লাইন তুখোড় ঘোড়-সওয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু অনন্ত সেদিন দুর্বার। পর পর তিনটে আক্রমণ তিনবারই দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ে গেল অনন্ত। ওর দু'পাশে দুজন কেষ্টো বাউরী ও বাবু মুচি। অনন্তর লড়াকু হিম্মৎ দেখে তারাও দুর্বার হয়ে উঠল। মিনিট দশেকের মধ্যে দেখা গেল দামুলিয়া চেপে ধরেছে শেরগড়কে। হেমব্রামেরও রুদ্র মূর্তি। বিশ মিনিটের সময় পেয়ে গেল গোল।

দুরন্ত বেগে বল নিয়ে যাচ্ছিল হেমব্রাম। তাকে তাড়া করে যাচ্ছিল তিনজন। হঠাৎ সে ব্যাক পাস করে সরে গেল। সুধীর টুক করে ঠেলে দিল অলোক দেকে। সে শট নিল সরাসরি গোলে। যেন একটা ছবি।

তারপর শেরগড় যত মরীয়া হয়ে ওঠে অনন্ত তত শক্ত হয়ে যায়। সে এক বাফার। কার সাধ্য তাকে টপকে যায়? শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। বহুদিন পর দামুলিয়া শিল্ড পেল। অভিনন্দনের পর অভিনন্দনে ভেসে গেল ওরা। বড় বড় সাহেবরা এসে করমর্দন করলেন। কি বিরাট হিরো!

ট্রাক, প্রসেসান, ব্যাণ্ডপার্টির বাজনা, সাহেবদের গাড়ি সব মিছিল করে কলিয়ারী ফিরল। জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। এতবড় জয় অনন্তর জীবনে এই প্রথম। ক্যাপ্টেন হেমব্রাম বিহ্বল হয়ে পড়েছে। ওকে এনকারেজ করার জন্য মিস ঘুঘু এসে পড়েছে মেসে।

অগ্রদূত মেসের সামনে সবুজ ঘাস বিছানো লনটা মানুষের পায়ে পায়ে কাদা হয়ে গেল। সুমিতবাবুও শিল্ড হাতে নাচতে লাগলেন। ডাক্তারবাবু অনন্ত

ও সুবীরের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—সোনার ছেলে! এমনি করে তোরা এ বছর ফার্স্ট এড কম্পিটিশনের শিল্ডটা এনে দিস।

সেই বিরাট জয়োল্লাসের তলায় চাপা পড়ে গেল সেদিন অস্ত সূর্যের রক্তিম রশ্মিতে নারী ও প্রকৃতির যে রূপকল্প অনন্তর অন্তরে স্থিরচিত্রের মতো ধরা পড়েছিল।

অবশ্য এইভাবেই হৃদয়ের পরতে পরতে ছবির পর ছবি ও সাজিয়ে রাখছে। কিসের জন্য—কে জানে। বড় ভাবালু ছেলেটা।

সাত

দেশে কয়লার চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি চালু হলে এই চাহিদার পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। রেলওয়ে একটা বড় কনজিউমার। তাদের সম্প্রসারণ চলছে। উৎকৃষ্ট মানের কয়লা যাচ্ছে লোহা, ইস্পাত, এলুমিনিয়াম ও ধাতুর কারখানায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০-২১ সাল থেকে ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত যে তীব্র মন্দার বাজার ছিল তাতে কয়লা শিল্প ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বহু কলিয়ারী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে নিম্নমানের কয়লা যে স্তরে। বহু কোম্পানী লাটে উঠেছিল। বহু কোম্পানী হস্তান্তরিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে মাত্র কয়েকটি দেশী শিল্পপতির কয়লার বাজারে ব্যবসা ছিল ও কলিয়ারি ছিল। সিংহভাগ ছিল ব্রিটিশ কোম্পানীর মালিকানাধীন! সেসব কোম্পানীতে দেশী কোম্পানীগুলির শেয়ার ঢুকতে শুরু করে তখন থেকেই।

বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত মন্দা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতা ব্রিটিশ কোম্পানীগুলিকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। তাঁরা ব্যবসা গুটোচ্ছিলেন। একবার বিলেতের ব্যাঙ্কে যে টাকা পৌঁছে গিয়েছিল মন্দার বাজারে সে টাকা তুলে নতুন বিনিয়োগ অনেক কোম্পানীই বন্ধ করে দিয়েছিল।

এদিকে নতুন নতুন কয়লার স্তরও আবিষ্কৃত হচ্ছিল। তাতে দেশী কোম্পানী-গুলি ১৯৩০-৩২ সালের পর বাজার তেজী হয়ে উঠলে কয়লা খনির প্রসারে মনোযোগী হয়ে উঠল।

এইভাবেই দেশী কোম্পানীর মালিকানা এবং শেয়ার দুইই বেড়ে যাচ্ছিল। তবুও কয়লা শিল্পের উপর আধিপত্য ছিল ব্রিটিশ কোম্পানীদের।

বার্ড এণ্ড হিলজারস, এন্ড্রিউ ইয়ুল, ম্যাকনীল ব্যারী, টারনার মরিসন প্রমুখ ম্যানেজিং এজেন্টরা ডিসেরগড়, সাঁকতোড়িয়া, হাটনল, পণিহাটী, কোয়থী রানা প্রভৃতি নামী দামী স্তরগুলির পাট্টা ভোগ করছিলেন। ডিসেরগড় বাঁকশিমূলিয়া ও জামুরিয়া অঞ্চলে তাঁদের একচেটিয়া কারবার ছিল।

ভারতে দামোদর কোল কোম্পানীর পত্তন হয়েছিল ১৮৫৫ সালে। এই বছরটি নানা কারণেই ভারতের ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম গণ আন্দোলন সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল এই বছরেই।

দামুণ্ডা, শেরগড়, জাঁটুড়ি, ভজুড়ি অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিঘার কোল-প্রপার্টি বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে নয়শো নিরানব্বই বছরের লীজ বন্দোবস্ত নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। তখনো কয়লা চালান যেত দামোদরের ফেরীঘাট দিয়ে নৌকা করে। হুগলীর মহীসভা ঘাটে। সেখান থেকে উলুবেড়িয়া ক্যানেল দিয়ে কলকাতা।

১৮৬০ সালে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেল চালু হলো। রেলওয়ের ক্রমশ প্রসার ও বিস্তার পরিবহনের ক্ষেত্রে নিয়ে এল এক বিরাট বিপ্লব। নৌকার পরিবর্তে রেলে কয়লা পরিবহন শুরু হলো।

শুরু হলো দামোদর কোল কোম্পানীর বাড়বাড়ন্ত। বিশ্বযুদ্ধের পরে যদিবা ধাক্কা খেল কিন্তু তার আগে ছিল বাম্পার মার্কেট। ১৯০৮ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত কয়লার দুর্ভিক্ষ লেগে গিয়েছিল। ভালোমন্দ সবরকম কয়লাস্তরে একটির পর একটি নতুন কলিয়ারী চলছিল। সে এক বাজার। কয়লার ধুলোও চড়া দরে বিক্রি হচ্ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মন্দার বাজার কাটিয়ে উঠে দামোদর কোল কোম্পানী নতুন করে বিনিয়োগ শুরু করে দেয়। ১৯৩০-৪০ সাল পর্যন্ত চলেছিল দামুলিয়ার এক দু'নম্বর চানক। তারপর তিন ও চার নম্বর চানক সিংকিং হয়। সে দুটি চানকে এখন পুরোদস্তুর উৎপাদন চলছে। পাঁচ নম্বর চানক সিংকিং হয়েছিল ১৯৪৫-৪৭ সালে। তাতেও পুরো উৎপাদন চলছে।

বন্ধ হয়ে গেছে এক ও দু'নম্বর চানক। তবে চানক দুটি আছে। ভিতরে কয়েকটা সুড়ঙ্গ পথ ও চানকের চারিদিকের স্তম্ভগুলি অটুট আছে। হেডগীয়ার পাল্লা দুটি দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ইঞ্জিন ও বয়লার তুলে নেওয়া হয়েছে। একটা ক্রেন ফিট করা আছে। সেই ক্রেনের রসায় বালতি বেঁধে মানুষ ওঠানামা করতে পারে অনেক কষ্টে।

পুরানো অফিসঘর ও গুমটিঘরগুলি এখন চাপরাশীদের খাটাল। তারা দিব্যি সেসব বে-দখল করে বসে আছে। তারই পাশে পুরানো আমলের গোল গোল ছাদের একসারি কোয়ার্টার দখল করে আছে জনকয়েক সর্দারজী। কাজ করে টিনডেল ও স্যাণ্ডস্টোয়িংয়ের ফিটারের। তেজু সিং, ফিজু সিং, দরবারা সিং এই রকম সব নাম। ওদেরই একটা ছেলের নাম গুরুনাম সিং। উঠতি অ্যাথলিট। হেমব্রাম কলিয়ারী অঞ্চলের দ্রুততম দৌড়বীর। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছে। অফুরন্ত দম।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই বার্ষিক স্পোর্টস এর প্রস্তুতি শুরু

হয়ে গেছে। অনন্তরও ডাক পড়েছে। প্র্যাকটিশ করতে গিয়ে এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ থেকে বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠেছে। এখন গুরনামও সন্ধ্যাকালে মেসে আসে আড্ডা মারতে।

অগ্রদূত মেসের সরস্বতী পুজোয় নায়িকা, হবু নায়িকা, দূর ভবিষ্যতের নায়িকা এইসব কিশোরী ও বালিকার দল মা মামীদের শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরে ফুর ফুর করে বেড়াচ্ছে। যেন প্রজাপতির ঝাঁক।

বীণা হস্তে মাটির সরস্বতী তার আগের দিন এসে গেছেন। সঙ্গে প্রমাণ সাইজের একটি শ্বেত শুভ্র রাজহংসী। জলজ্যান্ত হলে কত না ডিম দিত।

ইহ বাহ্য! ট্রেনি বাবাজীরা তো সিং ভেঙে বাছুর সেজে যৌবন কালে বালক ছাত্রের ভূমিকায় নেমে পড়েছে। বৌদিদির শাড়ি, দাদাদের ধুতি, দোকানের লাল নীল কাগজ ইত্যাদির লাগসই খাঁচা বানিয়ে মা সরস্বতীর একখানা চিকন আস্তানা করে ফেলেছে। এদিক ওদিক থেকে দেখে নিজেরাই তারিফ করছে—বহুত আচ্ছা! ফাস্ট ক্লাস ডেকোরেশন।

অনন্ত সদাই উদ্যোগী। সেজন্য প্রসাদ বিতরণের ভার ওর ওপরই পড়ল। চিঁড়ে গুড়ে চটচটে হয়ে থাকো সারাদিন। লোকজন তো আসছেই। বেচারীর খাওয়ারও অবসর নেই। শুচি, কল্যাণী, বাসন্তীর দল ওকে পেয়ে বসেছে। হাসিঠাট্টার সঙ্গে প্রসাদ বিতরণ সেজন্যই বুঝি ক্লান্তকর হচ্ছে না।

সন্ধ্যাকালে বিচিত্রানুষ্ঠান।

কলিয়ারীতেই জনকয়েক শিল্পী আছে। যেমন স্বপ্না স্কুল থেকে প্রাইজ পেয়েছে। অসীমের বন্ধু রজত ভালো গান করে। কবিতা আবৃত্তিটা তো কমন ব্যাপার। রবি ঠাকুর বাঙালী বাচ্চাদের মগজে ঢুকে বসে আছেন। অনন্ত দেবে কমিক নক্শা। একজন আনাড়ী দেহাতী আদমী কলকাতা শহরে গিয়ে কিরকম ভেবাচেকা খেয়ে গিয়েছিল তারই আদ্যশ্রাদ্ধ। ইতিপূর্বে মেসের আড্ডাখানায় দু'একবার মকশো করে নিয়েছে।

আর বার্ণপুর থেকে জনকয়েক ভাড়াটিয়া শিল্পী আসবেন।

ব্যবস্থাটি বেশ ভালো। ট্রেনিরা স্টাফদের কোয়ার্টারে গিয়ে দাদা বৌদি ও ছানা পোনাদিকে নিমন্ত্রণ করে এসেছে। আরো কি না এসে পারে?

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মহিলাদের ব্যাপারটা দেখছেন।

তখন অলিতে গলিতে ডেকোরেটারস কোম্পানী ছিল না। চেয়ার টেবিলের রেওয়াজ নয়। সাহেবদের জন্য অফিস থেকে খান কয়েক চেয়ার আনা হতো। বাদবাকী বিশুদ্ধ জমির ওপর খাদের ব্লাটিশ ক্লথ বা চট।

সন্ধ্যা থেকেই লোকজনের যাতায়াত চলছে। মেয়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরছে।

শুচি, কল্যাণীর দলে চার পাঁচটি মেয়ে ফুর ফুর করে বেড়াচ্ছিল। অনন্তকে ভেংচিও কাটছিল। ওদের মধ্যে বেশ একটা স্বচ্ছন্দ আলাপচারিতা গড়ে উঠেছিল।

অনন্ত এখন গ্রীনরুম নিয়ে ব্যস্ত। হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা এবং বাঁয়ার বিড়ে, তবলার হাতুড়ি ঠিক ঠাক রেখে যাচ্ছে। তখন সেই ঝাঁকটি গ্রীনরুমেই ঢুকে পড়ল।

এতগুলি মেয়ের মধ্যে অনন্তর দৃষ্টি বিশেষ করে পড়ল একটি বালিকা বধূর দিকে। পরনে লাল শাড়ি, পায়ে রূপোর মল, গলায় রূপোর হার, দু' হাতে কাঁচের চুড়ি, সিঁথিতে আঁকা লম্বা সিঁদুর। কপালে টিপ। ঘোমটা টেনে ঢেকে রেখেছে মাথার খোঁপা। নাকের নোলক দুলছে লুক্ লুক্ করে।

অভিভূত বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে অনন্ত সুর করে বলল—

কাদের কুলের বউ গো তুমি—কাদের কুলের বউ—

বলতে বলতে ওর চিবুক ধরে নাড়া দিলো। শুচিরা সব খিলখিল করে হেসে উঠল। সেই মেয়েটি লজ্জায় মরে যায় আর কি।

ধ্যেৎ! মুখ ঝামটা দিয়ে সরে গেল। হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগল। রাগে এবং লজ্জায় হয়তো বা চলেই যেত, শুচি ছুটে গিয়ে ওকে ধরল।

অনন্তও ততক্ষণে ওর কাছে পৌঁছে গেছে।

বলল, কি হলো খুকি? রাগ করছো কেন?

—খুকি নই। আমার নাম গৌরী। আপনি তো চেনেন আমাকে। তবে এমন তামাশা করছেন কেন?

গৌরীর নাকের পাটা দুলছিল। চোখ দুটো ছল্ ছল্ করছিল।

অনন্তর তখনো তামাশার নেশা যায়নি। বলল—আহা! আমি তো ভেবেছিলাম তোমাকে এই ড্রেসে মঞ্চে নামিয়ে দেবো। একটা বধূ ড্যান্স দেবে।

—পারবেন আপনি সঙ্গত করতে? আসরে নামবেন তাহলে। আমি নাচতেও জানি—গান করতেও জানি।

—ওরে বাপরে! এ যে সাক্ষাৎ অপ্সরা।

—বটেই তো! আপনার মতো শুধু মুখেই ফুটানি নাকি?

মেয়েগুলি খিলখিল করে উঠল—দিয়েছে গৌরী, অনন্তদার মুখে ঝামা ঘসে দিয়েছে।

গৌরীকে তাতিয়ে দিয়ে অনন্ত বেশ মজা পাচ্ছিল। ওর ঘাড় বাঁকানো রাগের ভঙ্গি, চোখ ডাগর করা চাউনি এবং ঘোমটা খুলে পড়া পুঁতির মালা দিয়ে সাজানো খোঁপা সবই কেমন অভিনব মাত্রা নিয়ে মনে চমক দিচ্ছিল। সেই সময়ে মেয়েগুলির খলবলানিতে বড় বিরক্ত হলো।

বলল—তোরা চুপ কর তো!

সুবীর এসে ওর ঘাড় ধরল। বলল—শ্যালা! কচি মেয়েগুলির সঙ্গে নষ্টামি হচ্ছে। আয় এদিকে।

বিচিত্রানুষ্ঠান হলো। যেমনটি হবার, তেমনি ছেলেভুলানো ছড়া কাটার

মতো। অবশেষে সুমিতবাবু ঘোষণা করলেন—এবার অনিল সরকার তাঁর গৌড়ীয় ঘরানার বদ খেয়াল পরিবেশন করবেন।

মণ্ডপে হৈ হৈ উঠল। ছেলেছোকরাদের ফাজলামি শুরু হবে। তাই সব একে একে চলে গেলেন। আসর ফাঁকা। ট্রেনিরা জিনিসপত্র গুটোতে ব্যস্ত। হঠাৎ অনন্তর নজর পড়ল তিন চারটি কুলি ধাওড়ার মেয়ের সঙ্গে গৈরী একদিকে দাঁড়িয়ে আছে। শুচি কল্যাণীরা চলে গেছে।

অনন্ত বলল—কি হলো গৈরী ? এখনো দাঁড়িয়ে আছ ? বাসায় যাও।

—যাবো তো! দাদারা আমাদিকে নিয়ে যাবে বলেছে। এখনো তো এল না।

—ওঃ, তাই বুঝি আটকে পড়েছো। তা আমি তোমাদিকে এগিয়ে দিলে যেতে পারবে তো ?

—হ্যাঁ—পারবো। ফাটকবাজার পর্যন্ত পৌঁছে দিন।

—আচ্ছা—একটু দাঁড়াও! সুবীরকে বলে আসি।

পথে যেতে যেতে গৈরী বলল—আপনাকে কি সব যা তা বললাম। কত না রাগ করেছেন অনন্ত দা ?

—আরে না না। রাগ করবো কেন ?

—হ্যাঁ! করেছেন। তারপর আমার সঙ্গে কথাই বললেন না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। খালি খালি কান্না পাচ্ছিল।

—আচ্ছা পাগল তো! রাগ করলে এই রাত্রে তোমাদিকে পৌঁছাতে আসতাম ?

—আপনি খুব ভালো!

দেখতে কিশোরী হলে কি হবে ? মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে ভিতরেও পাক ধরেছে। না হলে সুমিত চ্যাটার্জীর অত ব্যস্ততার মধ্যেও কেন সে কাছে এসে দাঁড়াবে ? প্রাণের টান আছে বলেই তো। সম্পর্কটি গুরু শিষ্যার। সুমিতবাবু ওকে ক্লাস সেভেন থেকে পড়াচ্ছেন। কোনো বেতন নেন না। বয়ঃসন্ধিকালে সেই অবৈতনিক শিক্ষককে হৃদয়টি দিয়ে ফেলল। নিরুচ্চার প্রেম। কেউ কারো কাছে মুখ ফুটে বলতে পারে না। এ তো বড় বিষম সঙ্কট।

সুমিতবাবু বললেন—স্বপ্না। তুমি এখনো যাওনি ?

—না। একা যাবো কি করে ?

—তোমাদের পাড়ার এত ছেলেমেয়ে এসেছিল, তাদের সঙ্গে যেতে পারতে।

—না। আপনি চলুন।

—আচ্ছা একটু দাঁড়াও।

জিনিসপত্র গুটানোর কাজকর্ম চুকিয়ে ওকে নিয়ে যাচ্ছিল। ডি. ডি. সাহেবের বাংলোর কাছে বললেন—আমার ইচ্ছা ছিল না যে তুমি অনুষ্ঠানে আসো।

অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। কি করে মেক-আপ দেবে? অনেক পড়তে হবে।

—ধ্যেৎ! সব সময়ে পড়াশোনার কথা শুনতে ভালো লাগে না।

—সেকি? তোমার সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা।

—হোক্ গে।

—পড়বে না?

—না।

—কেন?

—ভালো লাগে না।

—নাচতে ভালো লাগে?

—না।

—আড্ডা মারতে ভালো লাগে?

—না।

—তবে তোমার কি ভালো লাগে?

তোমাকে।

একটি শব্দ যেন সমুদ্র মন্থনের সুধাভাণ্ড। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণরস। পাহাড়ী ঝর্ণার অশ্রান্ত কলধ্বনি। বিপুলা পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি। অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার বাণীরূপ।

সুমিতবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তখন, সে আঁচল দিয়ে পুরো মুখটিই ঢেকে নিয়েছে।

ওর পিঠে হাত রাখলেন। বললেন—অত লজ্জা কি? মুখটা খোলো।

স্বপ্না তখন কাঁপছিল। বলল—কি বলে ফেললাম আপনাকে? আমাকে ক্ষমা করুন সুমিতদা।

সুমিতবাবু ওর মুখ থেকে আঁচলটা টেনে সরিয়ে অবনত চিবুক তুলে ধরে বললেন—যে কথা আমার বলা উচিত ছিল তা তুমি বলে দিলে। তোমার যেমন আমাকে ভালো লাগে আমারও তো তেমনি তোমাকে ভালো লাগে। নিজেরই অজান্তে কখন যে এই ভালোলাগা ভালোবাসা হয়ে গেছে তা বুঝতে পারিনি। আজ তুমি আমাকে জাগিয়ে দিলে স্বপ্না।

স্বপ্না তখন একটু স্বাভাবিক হয়েছে। সুমিতবাবু ওর একটা হাত নিজের হাতে চেপে ধরেছেন। সে হাত কাঁপছে।

স্বপ্না বলল—পরীক্ষা দিয়েই চাকরীতে ঢুকতে হবে। তা না হলে বাবার সংসার চলবে না। ভাই বোনেরা মানুষ হবে না। কি জানি আমার ভালোবাসা কোনো দিন সার্থক হবে কি না?

আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব স্বপ্না। যতদিন না তুমি তৈরি হচ্ছ ততদিন অপেক্ষা করব।

—তুমি কত ভালো।

রাস্তার উপরেই নিচু হয়ে ওকে প্রণাম করল।

অনন্ত তখন ফাটকবাজারে গৈরীকে পৌছে দিয়ে ফিরে আসছে। দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলতে লাগল। কারণ ওঁরা ওকে দেখতে পেলে লজ্জা পেতে পারেন।

তারপর একদিন অনিলবাবু কোয়ার্টার পেয়ে মেস থেকে চলে গেলেন। এতগুলো দিন যে চার দেওয়ালের মধ্যে তিনটি মানুষ বাস করত তাদের মধ্যে একটি চরিত্র সদা সর্বদাই ছিল অনুজ্জ্বল, আত্মমগ্ন। না, চক্রান্তকারী ছিলেন না, সদাশয় ভদ্রলোক।

যাবার সময়েও বেডিং ও স্থটকেশটি একটি লোকের মাথায় চড়িয়ে টুক টুক করে বেরিয়ে পড়ছিলেন। অনন্ত বলল—দাদা। এতদিন এক সঙ্গে বাস করলাম। যাবার সময় আমাদের দোষক্রটি ক্ষমা করে যান। উনি ওর দিকে তাকালেন। বললেন—নারে ভাই। তোমাদের দু'জনকে আমি ভাইয়ের মতো ভালোবাসি। দোষক্রটি দেখি না।

অনন্তর বুকটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল।

আট

রবিবারের সকাল। অগ্রদূত মেস প্রায় ফাঁকা। শনিবার থেকেই বাড়ি যাবার হিড়িক। অনন্তর দুই রুমমেট চলে যাবার পর সে একা। ওদিকে স্থমিতবাবুও একা।

বাইরে এসে মেসের ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ ক'জন মেম্বার?

—পাঁচ ছ' জন হবে।

—ব্যাস। লাগাও মাংসের ঝোল, আলু-পোস্ত।

স্থমিতবাবুর গলা পেয়ে অনন্ত বাইরে এসে বলল—রয়্যাল কম্বিনেশন। এখন একবার গরম মুড়ি ঝাল পকুড়ি হয়ে যাক।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হোক।

স্থমিতবাবুর মনটা বেশ খুশি খুশি। ঠাকুরমশাইকে সব যোগাড়পত্র করতে দিয়ে অনন্তর সঙ্গে গল্প করতে বসলেন। ওদের দু'জনের বয়সের ব্যবধানটা প্রায় সাত-আট বছরের। কিন্তু বেশ একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অনেকটা গুরু-শিষ্যের মতো। তবে শিষ্যটি এঁচড়ে পাকা। তাই ভাবী গুরুপত্নী নিয়েও হাসি-ঠাট্টা করে।

একদিন স্বপ্না কি একটা কাজে মেসে আসছিল। অনন্তরা বেশ কয়েকজন ছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল—সরে যাও, সরে যাও। নায়িকা এখন অভিসারিকা।

সেই শুনে স্বপ্না তো ওকে এই মারে কি সেই মারে। এমন ঢিল ছুঁড়েছিল যে কপালে লাগলেই রক্তপাত। তারপর জানাজানি।

মুড়ি পকুড়ি থালায় নিয়ে চিবুতে চিবুতে সুমিতবাবু বললেন—যাবি অনন্ত—আমার সঙ্গে ?

—কোথায় দাদা ?

—ডিসেরগড় হাটে আজ দেবেন সেনের মিটিং আছে।

অনন্ত একপায়ে খাড়া। তৎক্ষণাৎ রাজী।

খেয়েদেয়ে সুমিতবাবুর সাইকেলের ক্যারিয়ারে চড়ে বসল।

হ্যা শেরগড় হল, ডিসেরগড়। তার দক্ষিণে দামোদর নদ। ওপারে জিলা মানভূমের রুক্ষ দিগন্তে তালবীথির সারি। দামোদরের ধারে-ধারে বয়লার চিমনি আর হেডগীয়ার পাল্লা খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ মেললেই দেখা যায় শিল্প বিপ্লবের ছবি—গল্ গল্ করে ধোঁয়া উড়ছে বয়লার চিমনি দিয়ে। বন্ বন্ করে ঘুরছে হেড গীয়ারের পুলিচাকা।

ডিসেরগড়ে হাট বসে প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার। দারুণ জম্-জমাট হাট। রবিবারে কয়লাকুঠির কুলি-কামিন বাবু-ভাইয়াদের ছুটির দিন। সারা সপ্তাহের সওদা বেসাতি, আনাজপাতি কেনাবেচার দিন। মাদারীওলা ডুগডুগী বাজায়। চুড়িউলি ঝম্কা গিরায়।

তারই পাশে সামিয়ানা খাটিয়ে মঞ্চ তৈরি হয়েছে। দেবেন সেনের মিটিং হবে। কি যেন নিয়ে এসেছেন উনি। হাতের মোয়া-পানের বাটা-মহুয়ার রস—কে জানে কি ?

কুলি-কামিনদের কানাকানি। লোক জড় হচ্ছে কাতারে কাতারে। মিছিল আসছে একটি দুটি করে। শেরগড়, সালুঙ্কি, শালবনী, দামুলিয়া, দারম, আণ্ডার চক, হাটডি, পটডি, পানমোহরা, সাতঘরিয়া এমন কত কয়লাকুঠির কত কুলি-কামিন।

হাড়ি, ধাড়ি, মাহাতো, কুর্মী, জুনিয়া, পাশমন, দুশাদ, মশহর, সিদ, বিদ, যাদব, গোয়ালা, ধোবী, ক্যাওট, সিং, রায়, দুবে, চৌবে, পাণ্ডে, মিছির, সৎনামী, সূরযবংশী, হরিবন্শ, হরিজন, সাঁওতাল, বাউড়ী, মুচি, মেথর, চণ্ডাল—এমন কত জাত, কত নাম, কত মানুষ।

আরো এসেছে সুমিত চ্যাটার্জী, হরিহর গান্ধী, সুধীর রুদ্র, প্রমথ মণ্ডল, জগদীশ রায়, নগেন মল্লিক প্রভৃতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির নেতা। শম্ভু বাউরী, কালো বাউরী, রতন ধীবর, রামপ্রসাদ, চরিতর, কিষণ, চামরু, ঝামরুর মতো খাড়া ডিউটিবালা আদমী।

এবং অনন্ত। সব ঘাটেই যে জল খায়। দুনিয়াদারীর হরেক তামাশা দেখতে যার অদম্য কৌতূহল।

দেবেন সেন এলেন বক্তৃতা দিতে। মাঝারী গড়নের মানুষটি। গায়ের রঙ তামাটে। যত নামডাক শোনা যায়, দেখে কিন্তু তা মনে হয় না।

বৈশাখের গরমে প্রাণ আইঢাই করছিল। উনি খুব ঘেমে গিয়েছিলেন। কপাল দিয়ে টস্ টস্ করে ঘাম পড়ছিল। গায়ের জামাটা ভিজে সপ্ সপ্ করছিল।

উনি বলতে শুরু করলেন—ভাইসব!

দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কত অশ্রু, কত রক্তের বান ডেকে গেছে। আমরা জেল খেটেছি। পুলিশের অত্যাচার ও নির্যাতনে হাড় মাংস সিদ্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু পরিবর্তনটা কি হলো? দেশের শ্রমিক কৃষক তো সেই তিমিরেই। আট-দশ ঘণ্টা খাদে খেটে পনেরো আনা মজুরী। কোনো কোনো কলিয়ারীতে মালকাটারা আজ খাদে নেমে কাল ওঠে। সেই ব্যারাকলউ সাহেবের আমলে যেমনভাবে চলত তেমনি চলছে। শ্রমিকদের জান মানের কোনো দাম নেই। অ্যাক্সিডেণ্ট হয়, লোক মরে, ক্ষতিপূরণ খুঁজতে গেলে মালিক ম্যানেজাররা বলে—কই হাজিরা খাতায় তো ওর নাম নেই।

এই যে হাজিরা খাতা—এর ব্যাপারটা কী?

সরকারি আইন আছে যে প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট হাজিরা খাতায় হাজিরা লিখিয়ে কাজ করতে যাবে। সেই হাজিরা মোতাবেক সে বেতন পাবে। বেতনের অনুপাতে টাকায় এক আনা হারে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কাটা হবে শ্রমিকের তরফ থেকে আর এক আনা দেবে কোম্পানী। জমা দু' আনা। এই টাকা তার হিসেবে বছরের পর বছর সুদ সহ জমা হবে। মারা গেলে তার পরিবার, বেঁচে থাকলে চাকরী যাবার পর সে পাবে ভবিষ্যনিধি হিসেবে।

আর আছে বোনাস। একটা কোয়ার্টারে অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে মার্চ, মার্চ থেকে জুন এইভাবে বছরে চারটি কোয়ার্টার। প্রতি কোয়ার্টারে ৬৬টি দিন হাজিরা থাকলেই সে বোনাস পাবে প্রতি মাসে বেসিক বেতনের এক-তৃতীয়াংশ।

কিন্তু যদি হাজিরা খাতায় নাম না থাকে তাহলে ঐসব পাওনা গণ্ডা মারা যাচ্ছে। এমন কি সে যে একটা কলিয়ারীর কর্মী সেই স্বীকৃতিটুকুও পাচ্ছে না। পাওনা যোওনা পরের কথা।

সব কলিয়ারীতে দুটি করে খাতা। কম পক্ষে পঞ্চাশটা কলিয়ারী আমি জানি যেখানে পাঁচশো জন কর্মী কাজ করে আর হাজিরা হয় পঞ্চাশজনের। বাকী সব দু'নম্বরী খাতায় হাজিরা। চোথা কাগজে পেমেণ্ট।

আইন মোতাবেক কাজের সময়-সীমা হলো আট ঘণ্টা। শিশু শ্রমিক নিষিদ্ধ। মহিলাদের খাদের ভিতরে কাজ নিষিদ্ধ। কিন্তু কার্যকালে হচ্ছেটা কী? একটা

পরিবারের বউ ছেলেমেয়ে সবাই মিলে কাজ করতে যাচ্ছে। মেয়েরাও খাদে নামছে। খাদের অন্ধকারে তাদের সতীত্ব নারীত্ব লুন্ঠিত হচ্ছে। শিশুরা অত্যধিক শ্রম ও অপুষ্টিতে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে।

গৃহ সমস্যা? কুলি-ধাওড়াগুলিতে মানুষ না গরু-শূয়োর বাস করে তাই বোঝা দায়। আলো নেই, বাতাস নেই, তিল ধারণের স্থান নেই। গু, গোবর মেখে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়। নর্দমার জলে হাবুডুবু খায়। স্যানিটেশন বলে যে একটা কথা আছে তা বুঝি কেউ জানে না।

এক একটি ছোট-খাটো সাহেব বাংলোতে ত্রিশ চল্লিশটি বিজলী বাতি জ্বলে। চার-পাঁচটি ফ্যান ঘোরে, দশ-বারোটি ঘর, বাগান মালি, মেথর, চাপরাশী কত কী? অথচ কুলি-ধাওড়ায় বাতির তেল পাওয়া দায়। ব্রিটিশ আমল থেকে যে কথাটা চালু আছে—কলিয়ারীতে ওয়াটার, কোয়ার্টার, অয়েল, ফুয়েল ফ্রি—তা আজ প্রহসন।

মাথা ঠুকে মরে গেলেও কেউ ছুটি পায় না। পেলেও তার দরুন পয়সা পায় না। সরদাররা দেশ থেকে কুলি-কামিন নিয়ে আসে। তাদের আগাম দাদন দেয়। আর তাতেই বন্ধক পড়ে থাকে কুলি-কামিনের জীবন। ঋণ তাদের মাথার বোঝা জন্মজন্মান্তর ধরে। যতই কাজ করুক হিসেবের কারচুপিতে বন্ধকী কোবালার ফারখৎ নেই।

ঠিক এইভাবে কয়লাকুঠির শ্রমিকদের প্রতি শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের কথা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে বললেন প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে। রাণীগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্রের কত কয়লাকুঠির নাম করলেন যেখানে কসাইখানা চলছে। কুলিদেরকে জবাই করা হয়। মেয়েদের সতীত্ব নাশ করা হয়। মালিকরা খুলে রাখে মদের ভাঁটি, কসবিখানা। সেখানে বিক্রয় করা হয় চোলাই মদ এবং নারীমাংস। পোষ্য পায় ঝরিয়ার মাস্তান, ডাণ্ডাবাজ, গুণ্ডা।

নিজের আয়নায় নিজেকে আর কতটুকু দেখা যায়? তাই কুলি-কামিনরা নিজেদের দুর্দশার কথাটা ঠিক বুঝত না। ভাবত এই বুঝি বিধিলিপি। দেবেন সেন তাদের সামনে পর পর ছবি সাজিয়ে আর্ট গ্যালারী তৈরি করে দিলেন। নিজের নিজের ছবি চিনে নিতে কোনো অসুবিধা নেই।

তাহলে উপায়?

উপায়—সংগ্রাম। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। সব শ্রমিক এক হও।

হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—সব শ্রমিক এক হও।

মিটিং শেষ হবার পর দশ পনের মিনিটের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল। মঞ্চে একটি হাজাকবাতি জ্বলছিল। তার আলোতে বিশিষ্ট কর্মীরা কর্মসূচী রচনা করছিলেন। নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল! সুমিতবাবু ও অনন্তও সেখানে ছিল।

সুমিতবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন—দেবেনদা, এই ছেলেটির নাম অনন্ত শর্মা। আমাদের কয়লাকুঠির কবি।

অনন্ত ওঁকে জোড়হাত করে নমস্কার করল। উনি স্মিত হেসে বললেন—বাঃ। কয়লাকুঠির মতো রুক্ষ শুষ্ক দেশে একজন কবি পাওয়া ভাগ্যের কথা। কি কি কবিতা লিখেছ?

—না স্যার। তেমন কিছু নয়। দু'একটা কবিতা লিটল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে।

—বেশ বেশ। তোমার চোখ দুটিতে স্বপ্ন টল টল করছে। কবি হওয়া তোমাকেই সাজে। লেখো—কবিতা লেখো—শ্রমিকদের ঘামের কবিতা, রক্তের কবিতা, সংগ্রামের কবিতা। এ যুগের চারণ কবি হও।

কয়লা কুলির ইতিহাস লেখো।

মিটিং থেকে ফিরে এসে ঠিক এই কথাগুলিই সে তার ডায়েরীতে লিখে ফেলল। একেবারে বড় বড় হরফে। যেন কোনো সত্যদ্রষ্টা ঋষির মন্ত্রগুপ্তি।

ওর স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখর। অনায়াসে লিখে ফেলল পুরো বক্তৃতার বয়ান। ছোট-বড় ঘটনা ও সংলাপ। যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হলো তাঁদের সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা।

নয়

কেটে গেল আরো একটা বছর। ছয়মাস খুঁটা মিস্ত্রীর সঙ্গে ও ছয়মাস বারুদ কুলিতে অত্যাবশ্যকীয় ট্রেনিংটি শেষ হলো। এরই মধ্যে ফুটবল মরশুমে দেদার ম্যাচ খেলল, ট্রফি জিতল, স্পোর্টসে প্রাইজ পেল এবং থার্ড ইয়ারের শুরুতে বিজয় মঞ্চে দাঁড়াল ফার্স্ট এড কম্পিটিশনে চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রাইজ নিতে।

মেসের দেওয়াল পত্রিকায় বেশ কয়েকটি জোরালো কবিতা লিখল কয়লাকুলির স্বেদ, অশ্রু ও সংগ্রাম নিয়ে। কলকাতায় একটা ম্যাগাজিনে দুটো কবিতা বেরিয়েছে। স্থানীয় পত্র-পত্রিকাতেও বেরুচ্ছে। ক্রমশই অনন্ত শর্মা একটা নাম হয়ে উঠছে।

ইহ বাহ্য! ওদের জীবনের সব চার্ম বরবাদ হতে বসেছে খাদের অন্ধকারে। ১লা জানুয়ারি থেকেই ডিউটি পড়েছে লোডারের। অনন্ত ও কমলেন্দু দু'জনে একটি জোড়। পড়েছে ডি. ডি. সাহেবের পাল্লায়। ওঁর কাছে কাজে ফাঁকি নেই। লোকটার সবদিকে শ্যেন দৃষ্টি। যখন লাইন মিস্ত্রির সঙ্গে কাজ করত তখন কুলিদের সঙ্গে কাঁধে রেল চড়িয়ে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে চলাটাও বাকি ছিল না। খুঁটা কুলি ও বারুদ কুলির কাজের সময় তো একটা করে বরাদ্দ কুলি কম করে ওদেরকে খাটিয়ে নিয়েছিলেন।

কোম্পানির ট্রেনিং স্কীমটাই এইরকম। হাতে কলমে ট্রেনিং নিতে হবে।

প্রতিটি কাজেই শিক্ষা, দক্ষতা ও অভ্যাসের প্রয়োজন। চোখ মেলে তাকালেই ঘন অন্ধকারে রহস্যময়ী প্রকৃতির বুক চিরে সুড়ঙ্গ কেটে এগিয়ে যাবার ক্রিয়া কৌশল।

ঘড় ঘড় শব্দে কোল কাটিং মেশিন চলে। নিরেট কয়লার স্তরে খাঁজা তৈরি হয়। ড্রিল দিয়ে হোল করে তাতে বারুদ ঠাসানি হয়। বিজলী ডিটোনেটার দিয়ে আওয়াজ হয়। তারে তার যোগ করে শট ফায়ারার এক্সপ্লোডারের চাবি ঘুরালেই গুড়ুম। হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়ে কয়লার চাঙড়। ধুলো ও ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। নাইট্রাস ফিউমসের কটু গন্ধ। জল ছিটাও, বাতাস দাও, ঝাড়াই কর। ইত্যাকার প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে কয়লা লোডারের দল বেলচা দিয়ে ঝোড়া ভরতে আয়তনে ঢুকে পড়ে।

অনন্ত ও কমলেন্দু এখন সেই কাজ করছে। প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কয়লা ভর্তি ঝোড়া কাঁধে নিয়ে খাদের চড়াই ভাঙতে গ্যালন গ্যালন ঘাম ঝরে। বুকটা হাঁস ফাঁস করে। অনন্ত যদি বা পারে কিন্তু কমলেন্দু একদম নয়। সে বড়-লোকের ছেলে। ঝুড়িটা কাঁধে চড়িয়ে দিলে কঁক্ কঁক্ করে।

মহা ফাঁপর। কবিতা টবিতা মাথায় উঠেছে। খাদ থেকে উঠে ঝিলের মড়ার মতো মেসের ঘরে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। কখনো বা চোখ ফেটে জল বেরিয়ে যায়। এই থেকে উদ্ধার পাবার কি যে উপায় তাই নিয়ে দু'জনে সুদীর্ঘ পরামর্শ করে। কিন্তু আশার আলো পায় না।

ডি. ডি. সাহেব সেদিন মুডে ছিলেন। বিউটির হাত ধরে বললেন—

—একটা কথা বলব?

—ভনিতা ছাড়ো তো!

—বলছিলাম বাড়িটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

—তা আমি কি করব?

—একটা ছেলে যদি হতো।

—ভ্রষ্টা মেয়ের পুতের সোহাগ ভালো নয়।

—তোমার কি সাধ আহ্লাদ নেই?

—আমার আবার সাধ আহ্লাদ! কুমোর ঘরে মাটি মেখে, ধান ভেনে জীবন কাটতো—এখন তো সুখের ভাত খাচ্ছি।

কাটাকাটা কথা। ডি. ডি.-র শুনতে ভালো লাগল না। একসেট ধোবায় কাচা কড়া মাঞ্জা দেওয়া হাফ প্যান্ট হাফ শার্ট পরে জুতোর ফিতে লাগাতে শুরু করলেন।

বিউটি বলল—এখুনি উঠে পড়লে যে।

হ্যাঁ। কাজ আছে।

—জানি জানি। আমার কথা শুনে গা টা চিড়বিড় করে উঠলো তো!

—ঠেস দিয়ে কথা বোল না। আমি কিছু অন্যায় আবদার করিনি ?

—এমন কিছু ন্যায়ও করনি। আজ আমার দেহে রূপ যৌবন আছে তাড়িয়ে দিলে তোমার চেয়েও বড় ক্যাপ্তান পাবো। ছেলে পুলে হলে কে পুঁছবে ?

—আমাকে তুমি এত অবিশ্বাস কর ? তোমার জন্য জাত সমাজ সব ত্যাগ করেছি তবু ফণা তুলেই আছো ? সুযোগ পেলেই ছোবল মারো।

—বিষ তো ওগ্‌রায় না। তাহলে অনেক কাণ্ড হয়ে যেত। তোমরা আমার ওপর যত বিষ ঢেলেছো তা যদি ওগরাতে পারতাম তবে বিষের বান ডেকে যেত। এতগুলো বছর একসঙ্গে কাটতো না।

—একটাই তো আমার আফসোস। এতগুলো বছর একসঙ্গে থেকেও তোমার মনের নাগাল পেলাম না।

—তার কি দরকার ? শরীরটা তো পাচ্ছ। যখন খুশি যেমন খুশি।

—অত তর্কের সময় নেই আমার।

টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

শ্যালা মেয়্যার জাত ! এঁটোপাতার মতো উড়ে বেড়াচ্ছিলি বুকে ঠাঁই দিয়ে রাখলাম তাই ফণা তুলছিস। তোর অত কিসের দেমাক ?

এটা খুবই সত্যি যে বিউটি ওকে মনের ভিতরে ঠাঁই দিতে পারেনি। ওর মুখের উপরেই চরিত্রহীন, জুলুমবাজ, স্বার্থপর এই সব বলে ধিক্কার দেয়। তার জন্য কলহ কচ্‌কচি কম হয় না। তবু তাদের সহাবস্থান আছে। একই চুম্বকের দুটি মেরু একই সঙ্গে অবলীলায় অবস্থান করছে। কালচক্রের আবর্তনে ঘটে যাচ্ছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের খেলা।

বড় নিঃসঙ্গ জীবন। এত ফাঁকা লাগে যে মাঝে মাঝে কান্নায় বুক ফেটে যায়। কোলে কাঁখে একটাও যদি থাকত তবে কি এতটা শূন্যতা থাকত ? লজ্জা ঘেন্না যাইহোক নিজেরই রক্ত মাংস দিয়ে গড়া। ডি. ডি. সাহেব তো কত করেই চাইছে। কিন্তু তার যে অনেক বাধা।

এতোয়ারীর ধাওড়ায় অনন্ত বেশ জমিয়ে বসেছে। ষাট-সত্তরজন লোডারের বাস। চারখানা লম্বা চওড়া ঘর। খোলার ছাউনি। মেঝেতে সারি সারি দড়ির খাট। ইয়া ইয়া ল্যাহাঙ্গা জোয়ান। জরু গরু বাল বাচ্চা দেশে। একক জীবনযাত্রা।

খাওয়া দাওয়া সরদারের জিম্মা। সময় হলেই থালা পেতে বসে পড়ে। রাঁধুনি হাতায় করে ডাল ঢেলে দেয়। গণ্ডা গণ্ডা রুটি। হপ্তা হাজিরা সরদার অফিস থেকে তুলে আনে। মেসের খরচ, কমিশন, সুদ, আসল কেটে কুটে বাদবাকী ওর কাছেই জমা থাকে। মনিঅর্ডার করে দেশের ঠিকানায় পাঠায় তাতেই তাদের বাচ্চা বিবির খরচ চলে।

মাসে ষাট-সত্তরজনের মনিঅর্ডার ফর্ম্‌ লিখতে হয়। সেই জন্যই অনন্তর এত খাতির। ওকে ধাওড়ায় ডেকে এনেছে ঠিকানা মোতাবেক ফর্মগুলি ভর্তি করতে। না হলে প্রতিটি ফর্মে এক পয়সা কি লাগবে। তারও লোক আছে। অনন্ত পয়সা কড়ির ব্যাপারটা জানতো না। সরল বিশ্বাসে ফর্ম্‌ ভর্তি করে দিলো।

ওর সমবয়সী একটি ছোকরা বলল—এ বাবু! হামারা এক খৎ লিখ্‌ দিহু।

—কিস্‌কা খৎ?

—চিট্‌ঠি! মোর মেহেরারুকা!

—আরে শ্বালা! তোর বউকে আমি চিঠি লিখব কেন?

—হামরো নাম দিহ।

—প্রেমপত্র?

—হাঁ মুহাব্বৎকা চিট্‌ঠি।

—ঠিক আছে। দেবো লিখে। খামটাম দিও।

ছোকরাটি পকেট থেকে দু'আনা পয়সা বের করে বলল—ইয়ে লেও। অনন্ত পয়সা ফেরত দিতেই ও হাঁ হাঁ করে উঠল নহি নহি। দু'পয়সা তোর লিয়ে।

—আরে বোকা! তুই আমার দোস্ত। তোর কাছে পয়সা নেবো কিরে?

—ঠিক বা। সরদারকে পাশ তোর পইসা মিল গইল?

— কিসের পয়সা?

—ফরম পুরা করনেকা।

—তার জন্য পয়সা পাওয়া যায় নাকি?

—হাঁ! তু তো আচ্ছা বুড়বক।

—হাঁরে ভাই। আমি বুড়বকই বটে। তবে এইরকম বুড়বকই যেন থাকি। তোদের যখন দরকার আমাকে বলবি—চিঠি লেখা বা মনিঅর্ডার ফর্ম্‌ লেখার কাজ বিনা পয়সায় করে দেবো।

—আজীব বাৎ!

ছোকরাটির নাম রামধনি। প্রায় একবছর কাজ করছে। গত বছর দ্বিরাগমনে বউকে ঘরে এনেছে। মাত্র দশটা দিন বউয়ের সঙ্গে শুয়েছে। সেই স্মৃতিটা বুকে দগ্‌ দগ্‌ করছে। যতদিন যাচ্ছে ততো চাগিয়ে উঠছে। ছুটির জন্য মাথা ঠুকছে। কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছে না। হাতে টাকাও নেই যে পালিয়ে যাবে। সরদার ওকে চার আনা পয়সা দেয় এক সপ্তাহের হাত খরচ বাবদ। বাদবাকী টাকা ওর বাপকে মনিঅর্ডার করে পাঠায়। সেও সামান্য। সুদ সহ দেনার কিস্তি মেটাতেই চলে যায়। সরদারের কাছে টাকা ধার নিয়ে দ্বিরাগমনে বউ এনেছে। টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত ছুটি নেই, সেই কড়ারে পরদেশে কাজ করতে এসেছে।

অনন্ত হিন্দী ভাষাটা সামান্যই জানত। সংস্কৃত পড়েছিল বলে দেবনাগরী

হরফটা লিখতে জানত ; সেইটুকু বিদ্যে সম্বল করে—প্রিয়তমা সম্বোধন করে দিল একখানা প্রেমপত্র লিখে। তাতে কিছু খাদের ভয়ভাবনা শ্রম ও স্বেদের কথা, কিছু যৌন রহস্য রোমাঞ্চ-কামনা-বাসনা, টাকা শোধ হয়ে গেলে দেশে ফিরে মিলন মাঙ্গল্যের স্বপ্ন সোহাগ ইত্যাদি নিয়ে পাতা তিনেক চিঠি। লেখা শেষ করে পড়তে পড়তে অনন্তর নিজেরই মনে হচ্ছিল কোন পরদেশে নোলক পরা একটি কিশোরী নীল রঙের শাড়িতে মুখ ঢেকে তারই প্রতীক্ষায় বসে আছে। টসটসে লাবণ্য ভরা মুখে অপার কৌতুক।

খাদের ভিতর মুণ্ডাবাতির আলোতে চিঠিটি পড়ে রামধনিকে শোনাল। শুনতে শুনতে ও অভিভূত রোমাঞ্চিত। জড়িয়ে ধরে বলল—বাবু! তু ক্যা লিখ দিয়া। ঈ তো মোর দিলকী বাৎ!

অনন্ত ভাবল যে বিরহী নায়কটি তার পাশে বসে আছে—নিবিড় অন্ধকারে বুকের ভিতর জ্বালিয়ে রেখেছে অনির্বাণ দীপশিখা তার হয়ে চিঠিটা যাকে লিখল—সে পড়তে জানে তো?

কথাটা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থেমে গেল। যদি না জানে তাহলে সেই ভুলটা ভেঙে দেবার বেদনাটা না জানি কত মর্মান্তিক হয়ে উঠবে?

সরদারী প্রথার শাসন ও শোষণের নির্মম চিত্রটি সেই ওর কাছে প্রথম তুলে ধরেছিল। এক একজন সরদার দেশ গাঁ থেকে লোক এনে কলিয়ারীতে ভর্তি করে। মানুষের বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখ, উৎসব-সামাজিকতা থাকেই। তারই সুযোগ নিয়ে সে পয়সাকড়ি ধার-দেনা দেয়। কড়ার একটাই কলিয়ারীতে খাটতে যাবে। সুদ-আসলের টাকা শোধ হলেই চলে আসবে। পরে ইচ্ছা হলে আবার যাবে।

প্রক্রিয়াটি আপাত সরল। কিন্তু ভিতরে জিলিপির প্যাঁচ। সুদে আসলে টাকা শোধ তো জীবনে কখনো হবার নয়। সরদাররা সে হিসেব শেখেনি। তারপর সে কোম্পানির খয়ের খাঁ। কিছু ত্যাঁদড়ামি করলেই ডাণ্ডা পেটাই। কমিশন দু'তরফা। কোম্পানি তো পার টন রেজিংয়ে এক আনা দেয়ই। লেবারের কাছেও নেয়। খাবার দাবার রেশন তার উপরেও এক কাট। এই-ভাবে ছাঁটতে ছাঁটতে শ্রমিকের পাওনা কানাকড়ি।

অনন্ত সব জেনে গিয়েছিল। শোষণের প্রক্রিয়াটি এমন চিকন পিছল যে কার সাধ্যি ধরে? এই নিয়ে ও সুমিতবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছিল। উনি বলেছিলেন—আরো তথ্য সংগ্রহ কর। হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হবে।

এই সময় রামধনি ওকে বলল—বাবু মোর হিসাব তেনি কর দিহ।

এতোয়ারী যখন শুনল—রামধনির হিসেব করতে হবে তখন ভীষণ রেগে গেল। তারপর গাঁই গুঁই করতে করতে একদিন অনন্তের কাছে বসতেই হলো।

সুদ, তস্য সুদ, রেশনের দাম, দোকানের ধার ইত্যাদি কতরকম ফিরিস্তি করার পরও দেখা গেল রামধনির প্রায় চল্লিশ টাকা পাওনা হচ্ছে।

বলল—টাকাটা দিয়ে ওকে ছুটি দাও।

—বাবু ছুটি তো ডি. ডি. সাহেবের সহি না হলে হবে না।

—ঠিক আছে। আমি ছুটি করিয়ে দেবো। তুমি টাকা পেমেণ্ট দাও।

ডি. ডি. সাহেবের কাছে রামধনির ছুটির দরখাস্ত ও সহি করিয়ে দিলো। চাপে পড়ে এতোয়ারীও টাকা দিতে বাধ্য হলো।

রামধনির চোখেমুখে সে কি আনন্দ! অনন্তর হাত ধরে ভালোবাসা জানাতে গিয়ে কেঁদেই ফেলল।

অনন্ত ভাবল—যাক। একটা বিরহীর মনে তো কিছু আনন্দ দিতে পারলাম। লোডারদের সঙ্গে কাজ করে এইটাই নীট লাভ।

কিন্তু অনন্ত বুঝতে পারেনি তার ভাগ্যচক্রের গতি কেমন ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন করছে। অমন কত রামধনি তার কাছে এসে কত অভিযোগ করছে। সাধ্যমতো সেও চেষ্টা করছে যতটুকু সম্ভব সুসার করার। শ্রমিক শোষণের যন্ত্রণা তার বুকেও বাজছে।

দশ

সরস্বতী পুজোর আর তিনটে দিন বাকী। সুমিতবাবু পুজো কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী। আর অনন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সেক্রেটারী। কিন্তু কার্যত সুবীর ও অনন্তই সব। কারণ সুমিতবাবুর নামটুকু ব্যবহার করা ছাড়া আর বিশেষ কোনো কাজকর্ম তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। তিনি ইউনিয়ন নিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছেন। কাজেই তাঁর বকলমে কাজ করতে হয় অনন্তকেই। অবশ্য সুবীর আছে ওর বন্ধু, উপদেষ্টা এবং কাজের দোসর।

ফোর্থ ইয়ারের ট্রেনিদেরকে টেক্কা দিয়ে এই যে ওরা দুই বন্ধুতে যাবতীয় প্ল্যান, প্রোগ্রাম ও আয়োজনের ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেজন্য প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার একটা স্রোত বয়েই যাচ্ছে। সেসবকে ওরা তোয়াক্কা করে না। দু'জনেই সমান বেপরোয়া। কলিয়ারীর সাহেব, বাবু ও শ্রমিকদের মধ্যে ওদের একটা স্থান নির্ধারিত হয়ে গেছে। বিশেষ করে এবারকার প্রোগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর কিছু অংশকে সামিল করার জন্য ওদের নামটা খুব পরিচিত হয়ে উঠেছে। শ্রমিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখছে। তাছাড়া অনন্ত তো ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িয়েই পড়েছে। খুব গোপনে ও এখন সুমিতবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

সেদিন সন্ধ্যায় মেসের বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বসে পড়েছে সব অনুষ্ঠানসূচী ফাইনাল করার জন্য। এসেওছে অনেক। ভাদু ও ঝুমুরদলের আধিকারী, শম্ভু

বাউরী, শবনী, বেলাদাসী। ভাংড়ার জন্য গুরুনাম ও তার জনাকয়েক পাঞ্জাবী বন্ধু। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে রঞ্জন, রবীন, আলোক, সুধন্য, কল্যাণী, ভারতী, শুচি, ও প্রেমা কাউর এবং গৈরী। তাদের নেত্রী স্বপ্না। মেসের গায়ক শিল্পী রজত তো আছেই। ফোর্থ ইয়ারের অসীম ও সাধন পাল। সুমিতবাবু এলেন একটু দেরি করেই।

তারপর—

অনুষ্ঠানের দিন হৈ হৈ ব্যাপার। লোক আসছে পিল পিল করে। সবাই অবাক। এটা কি হলো? অন্যান্য বছর এক দেড়শো হলে ওরা মনে করত কি দারুণ সাফল্য! কিন্তু একি ব্যাপার?

কিছু চেয়ার, বেঞ্চি, তক্তা ব্যবস্থা করেছিল! তাতে সাহেব, মেমসাহেব ও স্টাফদের ফ্যামিলি বসবার জায়গা করল বটে কিন্তু অনেকেই বসতে পেল না। ওদিকে মেস কম্পাউণ্ডের একশো ফুট বাই একশো ফুট জায়গাতে তিল ধারণের স্থান নেই।

হিমসিম খেতে খেতে স্বেচ্ছাসেবকরা এসে বলল—সুমিতদা! একি হলো? আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না। এত লোক কোথা থেকে এল? কোথায় বসতে দেবো।

সুমিতবাবু হাসতে হাসতে বললেন—তোদেরকে ব্যস্ত হতে হবে না। ওরা মাটিতেই বসে পড়বে।

তাই হলো। দর্শকদের কোনো বিক্ষোভ নেই। ওরা খোলা আকাশের নীচে মাটিতেই বসে পড়ল। কম্পাউণ্ড ওয়ালের উপরে বসে পড়ল যত ছেলেছোকরা।

অনন্ত সুমিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করল—দাদা! আমিও তো অবাক! এত লোক কোথা থেকে এল?

—ওরে এরা তোর অনুষ্ঠান দেখতে আসার দর্শক নয়। সব আপন আপন দলের পৃষ্ঠপোষক। দেখতে পাচ্ছিস না—লুনিয়া ধাওড়া উজার করে যত মেয়ে পুরুষ এসেছে ওদের নিজের মেয়ে নাচবে বলে। জমুনিয়া বাউরী পাড়ার লোকরাও সেই জন্য এসেছে। পাঞ্জাবীরা এসেছে তাদের অনুষ্ঠান দেখতে। এটা টোট্যাল ইনভলভ্‌মেণ্টের ফল। সবাই নিজের নিজের শিল্পীদেরকে উৎসাহ দিতে এসেছে। কসমোপলিটান সমাজের কসমোপলিটান প্রোগ্রাম কিনা! যা তুই, গ্রীনরুমে যা। শুরু করতে দেরি করিস না।

অনন্ত ওর নিজের ঘরটাই ছেড়ে দিয়েছিল গ্রীনরুম করতে। শিল্পী সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্য সুবীরের ঘরটাও নিতে হয়েছে। অনন্তর ঘরে ভাদু, ঝুমুর আর রাম সীতার পার্টি। সেখানে ঢুকতেই মধুগন্ধে নাকটা কুঁচকে গেল। বাউরী মেয়েগুলো খোঁপা বাঁধছে, ড্রেস করছে। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

গৌরীর বাপ গুলু ও শম্ভু এক কোণায় বসে গাঁজা টানছে। গৌরী ও তার বান্ধবী ফাল্গুনী গদ গদ ভাবে লুটিয়ে পড়ছে। গৌরীর গায়ে রূপোর গয়না। মাথায় ফুল দিয়ে বাঁধা খোঁপা। শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পড়ছে। চোখ দুটি ঘোলাটে।

অনন্তকে দেখে চপল ভঙ্গিতে বলল—দেখে নিন অনন্তদা, আমরা দু'জন, আমার বাপুজী, মামু আর গোবিন চাচা। দেখবেন কেমন নাচ নাচি।

অনন্ত অবাক। এ কোন গৌরী? এ যে বেহেড মাতোয়ালী। কথা না বলে বাইরে এল। সুমিতবাবুকে গিয়ে বলল—দাদা! আজ বোধহয় বেইজ্জতের সীমা থাকবে না। মেয়ে পুরুষ সব মদে চুর হয়ে এসেছে। এরা আসরে গিয়ে কি করবে দাদা?

সুমিতবাবু ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলল—ভাবিসনে। ওরা মদ না খেলে আসরে দাঁড়াতেই পারবে না। যা তুই প্রোগ্রাম শুরু করিয়ে দে।

স্বপ্নাদের 'কাটি ধান' প্রোগ্রামের শিল্পীরা তৈরি হয়েই ছিল। স্বপ্নাও নাচের পোশাকে তৈরি। রজতও তৈরি। আসরে হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা, বাঁশি, বেহালা, মন্দিরা ইত্যাদি এসে গেছে।

সুবীর ঘোষণা করল—আমরা অগ্রদূত মেসের পক্ষ থেকে দর্শকদেরকে স্বাগত জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করছি। প্রথমেই একটা ক্লাসিক ড্যান্স করছেন স্বপ্নাদেবী।

অনুষ্ঠান চলছে। অনন্তর মন পড়ে আছে বেহেড মাতোয়ালীদের দিকেই। কি যে করবে ওরা? সুমিতবাবুর অতটা ভরসা রাখবার যে কি কারণ তা ওর মাথায় ঢুকছে না।

আবার ওদের গ্রীনরুমে ঢুকল। ততক্ষণে ঝুমুর দলের সাজগোজ হয়ে গেছে। এক জায়গায় গায়ে গা দিয়ে বসে আরামসে বিড়ি ফুঁকছে। ঘরটা ভরে গেছে কড়া নিকোটিন ও মহুয়ার মধুগন্ধে। অনন্তর এসব অভ্যাস নেই। নাকটা বিদ্রোহ করে উঠছে।

গৌরীর দিকে তাকাল। বোধহয় কোনো চুম্বক বসানো আছে ওর মুখে যা অনন্তর চোখ দুটোকে অবলীলায় টেনে আনে।

ফাগুনী গৌরীর চেয়ে বয়সে বছর খানেকের বড়ই হবে। রঙটা উজ্জ্বল শ্যামল। প্রায় পরিণত যুবতী। বুক পাছার ডৌল এসে গেছে। বিয়ে তো হয়েইছে স্বামী সোহাগের আস্বাদনও পেয়ে গেছে। সেজন্য ওর মধ্যে তেমন অহেতুকি চাপল্য নেই। খুব যত্ন করে গৌরীর কপালে ফোঁটা দিচ্ছে। অনন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। ফোঁটা দেওয়া শেষ হবার পর ওকে বেশ বিয়ের কনের মতো দেখাচ্ছিল।

অনন্ত বলল—বাঃ বেশ হয়েছে। এটা কি সাজলি রে গৌরী?

গৈরী বলল—সীতা !

স্বভাব দোষে অনন্ত রসিকতা করে বলল—তাহলে রাম সাজবে কে ?

ভাবালু চোখ নাচিয়ে গৈরী বলল—তুমি সাজবে।

অনন্তর নাভিমূল ছ্যাৎ করে উঠল। বাউরী মেয়েগুলো হি হি করে হাসলে তখন। শম্ভু খিক্ খিক্ করছে। ফাগুনী কেমন একটা ভঙ্গি করে অনন্তর দিকে ছুঁড়ে মারল দৃষ্টিবাণ। গৈরীর চোখে উজ্জ্বল প্রত্যাশা।

অনন্ত ভাবল—না। এদের সঙ্গে কথা বলা যাবে না।

সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

স্বপ্নার নাচ, রজতের গান, 'কাটি ধান' হবার পর সুবীর ঘোষণা করল—এবার শুরু হচ্ছে আমাদের বিশেষ নিবেদন—গুরুনাম সিং ও সম্প্রদায়ের ভাংড়া নাচ।

আঃ বোলে বোলে বোলে !

সরদারজীরা ঘোষণা শুনেই উল্লাসধ্বনি করে উঠল। নাচ জমে গেল ঝম্ ঝম্ করে। দর্শকরা হাততালি দিয়ে দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগল।

মুখচোরা গুরুনাম গান ধরেছে—

ক্যা ম্যায় ঝুট বোলিয়ঁ…

জহর গোলিয়ঁ…

কোই না…

বোলে—বোলে—বোলে—

প্রেমা চোখ ডাগর করে সেদিকে তাকিয়েছিল। অনন্ত ওর পিঠে হাত দিয়ে বলল—কিরে প্রেমা ? গুরুনামকে কেমন দেখছিস ?

—উঃ। অনন্তদা—তোমার পেটে এত বুদ্ধি !

—কেন ? জখম হয়ে গেলি নাকি ?

—যাও ! আমার সঙ্গে কথা বোল না।

অনন্ত হাসল। ওর পিঠে কয়েকটা আদরের থাপ্পড় দিয়ে চলে গেল।

এগারো

ত্রেতাযুগের রামসীতা বিংশ শতাব্দীর দর্শকদেরকে কতটুকু আকৃষ্ট করতে পারবে এ বিষয়ে কার না সংশয় ছিল। তার পরে এইসব বেহেড মাতাল আসরে দাঁড়িয়ে হাবা বলতে বাবা বলবে নাকি সেই ভয়ে অনন্ত কাঁটা হয়ে ছিল। একবার ভেবেছিল সেজেগুজে গ্রীনরুমে বসে থাক, ওদের প্রোগ্রাম বাতিল করে দেবে। কিন্তু বড় সাধ করে এসেছে। তাও একা নয় ধাওড়া উজাড় করা দর্শক নিয়ে। তবু ও দ্বিধা দ্বন্দ্বেই রয়ে গেল।

সুবীর ঘোষণা করে দিল ওদের প্রোগ্রাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য ! গুলু আসরে দাঁড়িয়ে ঢোলকে বোল তুলতেই অনন্তর সব ধারণা ওলট-পালট হয়ে গেল। সীতা ও তার সহেলীর সাজে গৌরী এবং ফাগুনী আসরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ছাড়া কি করতে পারে ? ফুটফুটে সুন্দর একটি মুখ দেখে দর্শকদের কিছুটা সুখানুভূতি।

গোবিন যখন গান ধরল তখন সব অবাক। এমন কিছু মিউজিক নেই। গুলুর ঢোল, শম্ভুর বাঁশি, চরিতরের মন্দিরা। গোবিন গেয়ে যাচ্ছে তুলসীদাসজীর দোঁহা।

অনন্ত একটা বেঞ্চির উপর বসে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

সুমিতবাবু বললেন—কি রে অনন্ত তাজ্জব বনে গেলি ?

—হ্যাঁ দাদা ! এ তো দেখছি যাদু করে দিয়েছে।

—আরে তুই জানিস না, গোবিন ওদের গানের মাস্টার। তুলসীদাসজীর রামায়ণ পুরোটা গান করে শুনিয়ে দিতে পারে। অথচ মাথায় ঝোড়া বয়ে ওয়াগন লোড করে। এসব ভাবা যায় না রে।

তখন রাত দুটো। ঝুমুর চলছে ঝম্ ঝম্ করে। আসর গম্ গম্ করছে। সাহেব সুবোদের দু'চারজন এবং কিছু বর্ষীয়ান বাবু ও তাঁদের ঘরণী ছাড়া বাকী সব জমে গেছে চিটা গুড়ে মাছির মতো।

এখানেও গুলু বাজনদার। শম্ভু বাঁশিওলা। গোবিনও আছে গায়ক গায়িকাদের সঙ্গে। ভাবপ্রীতার ঝুমুর হচ্ছে—

উজর কাজর আঁখি পানে রাঙল ঠোঁর গে।
দাঁড়োয়া পর গিরে লম্বা কেশ।

ঠিক যেন প্রাণের ভিতরে ঠমক দিচ্ছে তেমনি সুর, তেমনি তাল।

অনন্তর চোখ ঘুরছে সব দিকে। ঢোলকের তালে তালে দর্শক ঘুমে ঢুলছে এমন দৃশ্যও চোখে পড়ল। এক জায়গায় এসে ওর দৃষ্টিটা আটকে গেল। বাউণ্ডারী দেওয়ালের কাছে একটা বেঞ্চের একপাশে বসে আছে প্রেমা। তার পাশেই গুরুনাম সিং। শুধু তাই নয় প্রেমা ঘুমে ঢুলে পড়ছে গুরুনাম পরম যত্নে ওর টাল সামলাচ্ছে।

বড় ভালো লাগল ওর। এই কয়েকদিনের মধ্যে ওরা কত কাছাকাছি এসে গেছে। এবার ওদের বাপদেরকে অনায়াসে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। মনে মনে হাসল। একটা সিগারেট ধরাল।

সুবীর ও কমলেন্দু কাছাকাছি কোথাও ছিল। ওরা ওর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে নিয়ে ধরাল। শীতটা জাঁকিয়ে উঠেছে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সুবীর বলল—তাহলে প্রোগ্রাম সাকসেসফুল ?

—হ্যাঁ ! এত পরিশ্রম সার্থক হলো। বাব্বাঃ সন্ধ্যাকালে যখন মদের গন্ধে গ্রীনরুম ভরে গেল তখন আমার হয়ে গেছল।

—মাইরি ! আমারও।

তিন বন্ধুতে পরম তৃপ্তিতে সিগারেট টানতে টানতে ঝুমুর গানের সুর এনজয় করছিল। অনন্ত বলল—কিন্তু আর কতক্ষণ চলবে ?

—চলুক না হোল নাইট।

—বাপরে ! তোরা বোস আমি গ্রীনরুমটা দেখে আসি।

—ওখানে আর কি আছে ?

—জিনিসপত্র তো আছে। শ্যালা চোর ছ্যাচ্ছোড়ের অভাব নেই।

—যা তবে।

অনন্ত গ্রীনরুমে ঢুকেই থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চারিদিকে কাপড়-চোপড়, সাজের দ্রব্য, রং তুলি, বাক্সো ছত্রখান হযে পড়ে আছে। আর তার মাঝে গৈরী শুয়ে আছে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে। শরীরটা ভেঙেচুরে এদিক ওদিক। খোঁপা খুলে চুলের রাশি এলিয়ে। বুকের একটা দিকে গুচ্ছেক কাপড় জমে আছে। আরেকটা দিক শুধু ব্লাউজ ঢাকা। যৌবনের কলি ফুটেছে। মুখটা ঝক্‌ঝক্ করছে। কপালে কানে চন্দনের ফোঁটা লেপে পুঁছে গেছে। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নাকের পাটা দুলছে, নোলক দুলছে এবং মুরগির ডিমের মতো বুকের কুসুম স্পন্দিত হচ্ছে।

আর ভীষণ জোরালোভাবে চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে একটি অনাবৃত পা। শায়া শাড়ি উঠে গেছে হাঁটুর উপর পর্যন্ত। চিকণ উরুর প্রান্তদেশ। আঃ। ভয়ঙ্কর সুন্দর।

বেশ কিছুক্ষণ আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গৈরী ঘুমে ন্যাতা। সে ওর অস্তিত্বই টের পায়নি।

একটু পর অনন্তর চোখ থেকে পরম বিস্ময়ের ধাঁধা কেটে গেল। বিবেকটা জেগে উঠে ওকে শাসাল—ছিঃ ছিঃ অনন্ত ! পরের বউয়ের কলি ফোটা যৌবন দেখে তুমি জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছ।

ভাবল বেরিয়ে যাবে। কিন্তু না। পা দুটো কিসে যেন আটকে গেছে। ও আস্তে করে গৈরীর কাছে এল। খুব যত্ন করে শায়া শাড়ির প্রান্তটা টেনে পা-টা ঢাকা দিয়ে দিলো। তবু গৈরীর ঘুম ভাঙল না। কেমন একটু গোঁ গোঁ শব্দ করে পাশ ফিরে শুল। মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ল। অনন্ত ওর গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকল—গৈরী ! এই গৈরী !

—উঁ !

—ওঠ।

—কেন উঠবো ?

—ওঠ বলছি। বেশ রুক্ষস্বরে বলল ও।

গৈরী কষ্ট করে চোখের পাতা খুলবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

অনন্ত ওকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে বলল—এত ঘুম কিসের তোর ? ওঠ বলছি—ওঠ।

গৌরী চোখ মেলে বিড় বিড় করে কি বলল। তারপর আবার লুটিয়ে পড়ল। মাথাটা মেঝের উপর টকাস করে ঠোকা খেল।

অনন্ত বলল—ওঃ। কোনো শোর ঘোর নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে এল। ওর চোখে মুখে ছিটা দিয়ে বলল—গৌরী ! এত বেহুঁশ হয়ে ঘুমোস না। ওঠ।

—অনন্ত দা !

—হ্যাঁ !

জলের ছিটা পেয়ে চোখের ভারটা কেটে গেছে। ওর দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে বলল—আমার যে ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

—ঘরে গিয়ে ঘুমাবি।

—বাপুজী কোথায় ?

—বাজনা বাজাচ্ছে।

—উঃ বাব্বাঃ। একটা মোচড় খেয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

অনন্ত ওকে ধরে বলল—দাঁড়াতে পারবি ?

—হ্যাঁ। আমি বাইরে যাবো।

—আয়। আমার হাতে ভর দিয়ে দাঁড়া। তোকে নিয়ে যাচ্ছি।

—ছিঃ। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে কী ? লজ্জা করে না বুঝি !

চলতে গিয়ে টাল খেয়ে গেল। অনন্ত ওকে ধরে না ফেললে পড়ে যেত। গৌরী এবারে নিজেই ওর হাতটা শক্ত করে ধরল। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় কয়েক পা চলার পর পা দুটো একটু শক্ত হলো।

অনন্ত বুঝতে পেরেছিল ও কোথায় যেতে চায়। তাই বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে টেনে লাগিয়ে দিলো।

বেশ দেরিতে গৌরী বেরুল। মাথার খোঁপাটা পুরো খুলে দিয়েছে। নানারকমের খোঁপার কাঁটাগুলো ওর হাতে। মাথায় জল নিয়েছে। হাত পা ধুয়েছে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে স্বচ্ছন্দভাবেই বারান্দার উপর চলছে। অনন্তর কাছে এসে মুখটা নামাল।

মনে হচ্ছে কিডনী খালি হয়ে যাওয়ার পর চোখে মুখে মাথায় জল নেওয়ার দরুন নেশাটা ছুটে গেছে। খোয়ারি ভাঙার অবসাদে শরীর ক্লান্ত।

অনন্ত বলল—হ্যাঁরে গৌরী ! এমন করে কি মদ খেতে আছে ? নাকি এমনি একা একা বেহুঁশ হয়ে ঘুমোতে আছে ? যদি কোনো বাজে লোকের নজরে পড়তিস তবে তো সে তোর ক্ষতি করে দিতে পারত।

দরজা ধরে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। মুখ তুলে তাকাল গভীর কালো চোখ দুটি তখন ছলছল করছে। ঠোঁট দুটোও কাঁপছে। কি একটা বলতে গিয়ে পারল না। ঢোঁক গিলে আবার মুখ নীচু করল।

অনন্ত বলল—এবার চলতে পারবি তো?

—হ্যাঁ।

—তবে যা। এই দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে বাঁ দিকে চলে যা। ওখানেই তোদের লোকজন আছে। তাদের কাছে বোস গে।

—হ্যাঁ! কিন্তু—

—কিন্তু কি রে?

—আমি কি করে তোমার কাছে মুখ দেখাব?

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অনন্ত বলল—আর কাঁদিস নে গৈরী। এই ভাঙা রাতে অনেক নাটক হয়ে গেছে। কেউ দেখতে পেলে নিন্দে বদনামের শেষ থাকত না। যা—

গৈরী চলে গেল। অনন্ত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বিমূঢ় হয়ে।

বারো

ব্যাস। পরব ফুরিয়ে গেল। তিন দিন ছুটি নিয়েছিল পুজো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য। তাও শেষ। এবার চল মন খাদে খাটতে। রাত বারোটায় পালি। কমলেন্দু বাড়ি গেছে। এখনো ওর হোম সিকনেস কাটেনি। একদিনের জন্য বাড়ি না গেলে মনটা বড় উস্‌খুস্‌ করে। কে জানে সেখানে তার জন্য কোনো নরম কোমল কুমারীর হৃদয় প্রতীক্ষা করে আছে কিনা? বড্ড চাপা ছেলে। যাক একদিন ঘুরে আসুক। কাল সকালেই তো এসে যাবে।

এখনো ওরা একই পালিতে কাজ করে। এতোয়ারী সরদারের দলের সঙ্গে অনন্ত যে গাড়ি ভর্তি করে তা দু'জনের নামেই লেখা হয়। এইভাবেই সে বন্ধুকৃত্য করে। শরীরের ঘাম ও অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে।

কমলেন্দু বড় অপরাধবোধ করে। অনন্ত ওকে দাবড়ে চুপ করিয়ে দেয়। সুবীর বলে তোর কিসের অত সঙ্কোচ রে। ডি. ডি. সাহেবের পায়ে তেল লাগানোর চেয়ে তো এটা ভালো ব্যবস্থা। এই ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ হলে তুই একটা জম্পেস ফিস্ট দিবি।

—ইয়া!

অনন্ত খুব খুশি।

সেদিন রাত্রে বাতিঘরেই এতোয়ারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। মুখে খৈনী নিয়ে বলল—বাবুজী! আপনি কেনো এতো তক্‌লিফ কোরছেন? আপনাকে গাড়ি ভরতে হবে না। আমার লোকজনের দেখভাল করিয়ে দেন। মুনশীবাবু, মাইনিং

াবুকে বলিয়ে দেন আমার দলকে থোড়া জলদি জলদি গাড়ি আউর কোয়লা যাগাড় করিয়ে দিবে।

অনন্ত বলল—আচ্ছা, আচ্ছা! সে ব্যবস্থা আমি করব।

কিন্তু কে জানতো সেই রাত্রেই তাকে গ্যাস পয়জনে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। এক রাত্রেই হিরো বনে যাবে। কত লোক তাকে দেখতে এল। কত উদ্বেগ, কত ব্যাকুলতা।

মা এলেন। মাথায় হাত রাখলেন। কি স্বস্তি! বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে উড়ে গেল। তারপর এল গৈরী। তার সারা মনে ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে ছিল। কেন ওকে এত ভালো লাগে? কেন ওর চোখের তারা দুটি এখনো তার মনে ঝিলিক দিচ্ছে? কেন বাজছে হিপীড় দিপীড় মাদল? বুক পাছা তো তৈরি হয়ে গেছে। বিয়ালা পুরুষের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ি চলে যা। আমার বুকে চাবুক মারছিস কেন? আমি তোর কে যে অত দরদ দেখাতে এসেছিলি। এঃ। সুয়াগ কত!

কিন্তু ওর মুখটি বড় মিষ্টি। প্রতিমার মতো গড়ন। ধ্রুপদী সৌন্দর্য! নাকি বন্য সৌন্দর্য? শিশির ভেজা নকল কিশলয়ে ছলকে পড়া রোদের মতো অপার লাবণ্য তার সর্বাঙ্গে। সেই ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে গেছে ও।

ভোরের আলো ঠিকরে পড়ছে জানালার কাঁচে। এক কাপ চা হাতে নিয়ে বৌটি ওর মাথার চুলগুলো খামচে ধরে টেনে ওঠাল।

মিষ্টি হেসে বলল—ভোরবেলায় কি স্বপ্ন দেখছিলে ভাইটি?

অনন্ত ধড়ফড় করে উঠে বলল—ও দিদি! এত বেলা হয়ে গেছে!

—হ্যাঁ। চা খাও।

এরই মধ্যে স্নান সারা হয়ে গেছে ওর। মুখটি বড়ই প্রসন্ন ও পবিত্র দেখাচ্ছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে ভাবল—কেন লোকে ওর নামে এত কুৎসা রটনা করে?

বলল—দিদি! আমাদের জন্য আপনার কত কষ্ট হচ্ছে।

—এটা সাহেব সুবোদের ডায়লগ। যারা স্তাবকতা করে। তুমি দরদ দেখাতে এসো না। আমি তোমার দিদি এবং তোমার জন্য কোনো কষ্টই আমাকে পীড়া দিতে পারবে না।

অনন্ত মুগ্ধ বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল—গত জন্মে সত্যিই তুমি আমার দিদি ছিলে।

—গত জন্মে নয় এ জন্মেই। তুমি ছোট ছিলে তাই আমাকে মনে করতে পারছ না। তোমার মা, পিসীমা দু'জনেই আমাকে চেনেন। তোমার বাবা যখন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ করছিলেন তখন আমি তাঁর কাছে হাতে-খড়ি নিয়েছিলাম। তিনি আমার শিক্ষাগুরু।

—তুমি কি শোভাদি?

—হ্যাঁ অনন্ত।

—এখানে কি করে এলে?

—সে অনেক কথা। তুমি ছোট ভাই। তোমার কাছে বলতে পারব না।

এঁটো কাপ-ডিশটা হাতে নিয়ে চলে গেল।

আর একটা দিন। তারপরই ওরা ছুটি পেয়ে গেল। সম্মুখে বিস্তৃত কর্মভূমি। বিরাট মানব-জমিন অনাবাদী পড়ে আছে। রামপ্রসাদ কৃষিকাজ করতে বলেছেন। সে চাষ-আবাদ অধ্যাত্ম জগতের কথা। অনন্তের চাষ-আবাদ তাদেরকে সচেতন করে তোলা। অজ্ঞান ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষকে আলোর পথে নিয়ে আসা। সেই প্রচেষ্টাতে কেটে গেল আরো একটি বছর। ওরা ফোর্থ ইয়ারে উঠল।

গৈরীর বাপ গুলু লুনিয়া ছেদিলালের জামাই। ওর মা ডিপোর হাজিরা কামিন। দু'জনের জোড়া লেগেছিল সেই বিশের দশকে। তখন হেনীর বয়স তিন বছর। গুলুর আট বছর। গৈরী ওদের প্রথম সন্তান। তারপরের দুটি ছেলে সুরেশপ্রসাদ ও মহেশপ্রসাদ। আবার দুটি মেয়ে চম্পা ও চামেলী।

প্রথম যৌবনে হেনীও সুন্দরী ছিল। কয়লা ডিপোর কয়লা কালি, রোদ জল ও শীতে এখন গায়ের রঙ ঝামা। খসখসে চামড়া, মুখে মেচেতা, হাতে পায়ে হাজাফাটা। মেজাজ তিরিক্ষি। সন্ধ্যে হলেই মদে মাতাল।

ওর দুই ভাই চরিতর ও কিষণ এখন দেড়শো কুলি-কামিনের সরদার। পালে পালে ছানাপোনা। কে অত গুণেগাঁথে। চরিতরের বড় ছেলে দুটি লায়েক হয়েছে। বিয়ে তো বাল্যকালেই হয়েছে। বৌদের ঘর বসত হয়েছে। বড় ছেলে জগদীশের বউয়ের নাম বৈশাখী। ঢলঢলে লম্বা। উজ্জ্বল শ্যামল গায়ের রঙ। মোটা ঠোঁট। মাথায় একরাশ কালো চুল। চোখদুটি পটল চেরা। একটি ছেলে হয়েছে। গা ভর্তি গয়না। এতবড় সরদারের বড় বউ বলে দেমাক আছে।

মেজো ছেলে হরেরামের বউয়ের নাম কুন্তী। নিকষ কালো গায়ের রঙ। গড়নটি মা কালীর মতো। মুখের ছাঁদটি যেন ছাঁচে ঢালা। এখনো ছেলেপুলে হয়নি। বয়সটা গৈরীর সমানই।

কিষণের বড়ছেলের নাম রামজী লাল। বিয়ে হয়েছে। বৌয়ের দ্বিরাগমন হয়নি। এ বছর হবে।

গৈরীরও দ্বিরাগমন হবে এ বছর। ওর শ্বশুরের সঙ্গে গুলুর এই নিয়ে কথাবার্তা চলছে। কিন্তু উভয়পক্ষেরই টাকাকড়ির টানাটানির জন্য দিন স্থির হয়নি। চেষ্টা চলছে বোশেখ মাসের এক শুভদিনে সে কন্যা বিদায় করবে।

এই বিয়ে এবং দ্বিরাগমন নিয়ে ওদের সমাজে বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনা। লেনাদেনা, ভোজ নিয়ে খরচ-খরচাও প্রচুর। তিন-চারদিন ধরে কুটুম-বাটুম, মদ-মাংস, নাচ-গানের লাগাতার মাইফেল।

আর কলিয়ারীর মধ্যে ছেদিলালের গোষ্ঠীই সর্ববৃহৎ এবং প্রাচীন।

সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন কয়লাকুঠিতে দারুণ শ্রমিকের অভাব তখন সে এসেছিল ব্যারাকলউ সাহেবের পানমোহরা কলিয়ারীতে। আরো দশজন কুলির মতো সেও একটা কুলি।

তার চোখের সামনেই ঘটেছিল দেউলটির বিস্ফোরণ। সে কি আতঙ্কের দিন। যুদ্ধ শেষ হবার পর ছাঁটাই আর ছাঁটাই। সেই হিড়িকেও সে টিঁকে গিয়েছিল। মন্দার বাজারেও হেজে যায়নি।

ক্রমে ক্রমে নিজের আত্মীয় পরিজন নিয়ে যেমন গোষ্ঠী বাড়ছিল তেমনি ছানাপোনাও পয়দা হচ্ছিল। বিশের দশকের শেষদিকে একবার ঠাঁই বদল। পানমোহরা কোল কোম্পানি ছেড়ে শেরগড় কোল কোম্পানিতে এসে পঞ্চাশজন কুলিকামিনের ওয়াগন লোডিংয়ের সরদার।

ছেলেদের আমলে সেই পঞ্চাশজন বেড়ে হয়েছে দেড়শো জন।

গুলুরা স্বামী-স্ত্রী সেই গোষ্ঠীভুক্ত হয়েও কাজ করে দিন হাজিরার। এমন আরো বিশ-বাইশ জন আছে। কেউ টালোয়ান, কেউ জেনারেল মজদুর। তাদেরকে ঐ দেড়শো জনের হিসেবে ধরা হয় না।

ওদের গানের মাস্টার গোবিনও ছেদিলালের ছেলে। কিন্তু প্রথম জীবনে গান-বাজনা সাধন-ভজনের দিকে এমন ঝোঁক পড়েছিল যে বিষয়-আশয়, সরদারি, কমিশন আর উপার্জন কোনোদিকেই তার মন ছিল না। এমন কি ওর বিয়ালা বউকে দ্বিরাগমনে আনেওনি। সে মেয়ের অন্যছেলের সঙ্গে স্যাঙ্গা হয়েছে।

বাপ মরে যাবার পর বেশ আতান্তরে পড়ে গিয়েছিল। তখন চরিতর ও কিষণ ওর মাথায় ঝোড়া আর বুকের উপর একটি সবলা যুবতী প্রায় একই সঙ্গে চড়িয়ে দিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দায়িত্ব পালন করেছিল। এখনো সে ঐ বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। অবশ্য তার বউও চাকরি করে এবং সন্তান প্রসব করে। ফাগুনী তার বড় মেয়ে।

এত সত্ত্বেও গোবিন কিন্তু নিরাসক্ত। হারমোনিয়ামটি নিয়ে একবার বসলে সে সব ভুলে যায়। গুলু ওর সম্পর্কে ভগ্নীপতি। তারও রীত চরিত্র ওর মতো অতটা বাউণ্ডুলে না হলেও ঢোলকটি কাছে পেলে বোলের তুফান তুলে দেয়।

সেজন্য চরিতরের চবুতরা সন্ধ্যা হলেই জমজমাট। তুলসীদাসজীর রামায়ণ গান নিত্যকার ব্যাপার। রামধুনের সুরে বিরহ মিলনের নিত্যসঙ্গীত।

মজার কথা যে মেয়েটি দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ গোবিনের নামে সিঁথিতে সিঁদুর পরেও তার ঘর-সংসার থেকে বঞ্চিতা সেই নতুন সংসার পেতে যে ছেলেটি প্রসব করেছিল সে-ই গৈরীর স্বামী। সেও দশ বছর থেকে সিঁদুর পরছে।

ওর শ্বশুরের নাম মনিলাল। বরের নাম রবিলাল। ওরা সব ম্যাকনীল

কোম্পানির কলিয়ারীতে খাদে লোডারের কাজ করে। দামুলিয়াতে আরো যে একটা ওয়াগন লোডিংয়ের দল আছে তাদেরই নিকট আত্মীয়। বিয়েটা হয়েও ছিল ওদেরই যোগাযোগে।

গৌরীর বন্ধুবান্ধবরা জানত যে আগামী বৈশাখে ওর দ্বিরাগমন হবে সেজন্য বর বর করে ক্ষেপাতো।

শুচি বলত বিরহিনী রাধা।

কখনো অন্যমনস্ক দেখলে ঠোক্কর দিত কার ধ্যান করছিস লো? বরের?

বর সম্পর্কে ভাবতে তো ভালো লাগে। কেমন একটা স্বপ্নের আবেশ। বুকের ভিতর দ্রিমি দ্রিমি শব্দ। অনাঘ্রাত সুখের পিপাসা। কার্তিক মাসে পনেরো পেরিয়ে ষোলোতে পা দিলো। এই তো জোয়ারের সময়। সে সব চাওয়া পাওয়ার বাসনা কার বা না থাকে?

কিন্তু ও যে কিছুতেই বরের মুখটা মনে করতে পারে না। যখন তখন এমন একটা মুখ সারা অন্তর জুড়ে ফুটে উঠে যে তার ভাবনাতেই বিভোর হয়ে যায়। কাঁচামাটিতে দাগ কেটে মূর্তি গড়ার মতো হৃদয়ের কোমল পরতে সেই মূর্তির ছাঁচ গড়ে উঠেছে।

ইতিমধ্যে স্কুলের রেজাল্ট আউট হয়েছে। ও পাশ করে ক্লাস নাইনে উঠেছে। আর দুটো বছর। যদি দ্বিরাগমন না হয়, যদি শ্বশুর বাড়ি যেতে না হয় তাহলেই সে ম্যাট্রিক পাশ করে যাবে। ঐ তো বাসন্তীদির বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে শ্বশুর বাড়ি গেছে। তেমনি কি তারও হতে পারে না?

বাপের কাছে আবদার করে বাপুজী! আমাকে ম্যাট্রিক পাশ করতে দে! তারপরে শ্বশুর ঘর পাঠাবি।

গুলু মেয়েটিকে বড়ই ভালোবাসে। ওর কোনো আবদার অবহেলায় ঠেলে ফেলে না। কিন্তু এযে বড় কঠিন আবদার। তাই ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, কি করবি বিটি? শ্বশুর ঘর তো যেতেই হবেক। উয়ারা বড় জিদ করছে।

—তবে এত লেখাপড়া শিখালি ক্যেনে? শেষটাই যদি না হবেক ত।

—প্রভুজী যদি কপালে লেখে ত হবেক।

—আর হবেক? একটি ভাং মুখ্যুর সঙ্গে বিয়া দিলি—উ কি বুঝবেক লেখাপড়ার মর্ম?

—বিয়ার সময় তো সেকথা বুঝি নাই বিটি।

তা বুঝবার কথাও নয়। দুনিয়া মেয়ের বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়া ব্যতিক্রম। ওরই কি লেখাপড়া হতো?

ভাগ্যিস তখন হোয়াইট সাহেব ম্যানেজার ছিলেন। বহু কর্মের হোতা। আজ যেখানে ফার্স্ট এড কম্পিটিশনের মহড়া চলছে সেই ডিসপেনসারী, অগ্রদূত

মেস সার্থক অর্থেই কলিয়ারীর সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রদূত তা উনিই তৈরি করিয়েছিলেন।

ভদ্রলোকের রুচিজ্ঞান ছিল। শ্রমিকদের প্রতি দরদও ছিল। বছর চারেক এই কলিয়ারীতে ম্যানেজার থাকাকালীন বিশ হাজার টন মাসিক প্রোডাকসনকে বাড়িয়ে চল্লিশ হাজার টন করেছিলেন। পাঁচ ও ছ' নম্বর চানক খোদাই করিয়েছিলেন। পঞ্চাশটি বাবু কোয়ার্টার, শ'পাঁচেক কুলি ধাওড়া, চারটি ছোট সাহেবদের বাংলো, একটি বড় বাংলো, ক্রেচ, ক্যান্টিন ও একটি প্রাইমারী স্কুল তিনিই করিয়েছিলেন।

এই সবের মধ্যেই তিনি বেঁচে আছেন। লোকে বলে হোয়াইট সাহেবের স্ট্যাচু তৈরি করে অফিসের সামনে রাখা দরকার।

তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠার মাস ছয়েক পর দেখলেন সাকুল্যে বারোটি ছাত্র। . অথচ দুটি মাস্টারকে কোম্পানী পুষ্যি দিচ্ছে।

রেগেমেগে বাবু, চাপরাশী, মাস্টার নিয়ে ধাওড়া পরিক্রমায় বেরুলেন। পাঁচ বছরের ঊর্ধে ছেলেমেয়ে যে তাঁর নজরে পড়ল তাকেই পাকড়াও করে স্কুলে নিয়ে এলেন। তাদের মা বাপকে কড়া হুকুম দিলেন।

গৌরী তখন খালি গায়ে ফ্যানাড়ি পরে কড়ি খেলছিল। ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে দেখে সাহেব ওকে টপ করে ধরে ফেললেন। বেনীবাঁধা উড়ু উড়ু চুলের মধ্যে সিঁথির সিঁদুর দেখে বললেন, মাই গড! ম্যারেড বেবী। তা হোক। স্কুলে ভর্তি করে দাও।

সেই দিন গৌরীর হাতে খড়ি হলো। ছেলেমেয়েরা সাহেবের ভয়ে যেমন ঝাকের কইয়ের মতো এসেছিল তেমনি একটি দুটি করে খসেও পড়ল। আবার নূতন এল। কিন্তু গৌরী রয়েই গেল।

ও প্রাইমারী পরীক্ষায় পাশ করল। আর কাউকে বলতে হলো না। গুলু তার মেয়েকে হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে শেরগড়ের কালীমাতা বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলো।

সেই মেয়ে এখন ভর ভরন্ত যুবতী। মনের উপর এমন কিছু ছাপ পড়েছে যে ভাং মুখ্যু স্বামীকে গ্রহণ করতে পারছে না। ওর রহন সহন, দরশ পরশ যে সমাজের সঙ্গে তাতে মনোজগতে প্রতি নিয়তই ঘটে যাচ্ছে পরিবর্তন। সীতা সেজে আসরে নাচলে কি হবে? এই হচ্ছে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া।

ওদের ধাওড়াটিকে লোকে বলে নামো ধাওড়া। কলিয়ারীর পশ্চিমে। দামোদর থেকে হাজার খানেক ফুট উত্তরে। মাঝে চষা মাঠ ও একটা পুকুর। দামোদরে বড় বান ডাকলে উঠোনে জল ছপ ছপ করে।

যেমন নোংরা তেমনি ঘিঞ্জি। জল, কল, পায়খানা, জল নিকাশের নালা কিছু নেই। শুধু চাপ বাঁধা খোলার ছাউনি করা ইটের ঘর। পনেরো বিশ বছর

আগে কোম্পানী সারি সারি খোলার ঘর বানিয়ে দিয়েছিল। তারপর কুলি কামিনরা নিজের গরজেই তার গায়ে কুঁড়ে ঘর বসিয়েছে।

সময় বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। তাদের যৌবনের তাড়না আছে। জৈবিক প্রয়োজন আছে। প্রজন্ম ও প্রসবের জন্য চার দেওয়ালের আড়ালের প্রয়োজন আছে। সেসব উপেক্ষা করা চলে না।

কত আত্মীয়স্বজন চাকরির লোভে এসে বাসা বাঁধছে। গরু, মোষ, হাঁস, ছাগল, শুয়োর, মুরগি এসব পশুপক্ষী তো আছেই। নিত্যদিন উনুন জ্বলে। তার গাদা গাদা ছাই। গু, গোবর, কুটোকাটা, আবর্জনা। কোনো কিছুরই সাফ সুতরো করার ব্যবস্থা নেই। বাতাস চলে না। আলো ঢোকে না। সূর্য ডুবলেই অন্ধকার।

আর যেখানে যত অন্ধকার সেখানে তত পাপ; ঐ ঘিঞ্জিঘরের মধ্যেই মদ চোলাই হয়। জুয়োর আড্ডা বসে, মেয়েমানুষের শরীর নিয়ে ব্যবসা চলে, অবৈধ শিশুর লাশ আস্তাকুঁড়ে পচে। পা ফেলতে গা ঘিন্‌ঘিন করে। বাস করা তো দূরের কথা। যারা থাকে তারা মানুষ না জন্তু-জানোয়ার কে জানে?

গৌরী সেই ধাওড়ার মেয়ে!

তবে শ্বাস নেবার মতো বাতাস পায়। কারণ গুলু অনেকদিনের পুরনো কর্মী এবং সরদারের জামাই বলে কোম্পানীর তৈরি দুটি খোলার ঘর পেয়েছে। তাদের ঘর দক্ষিণদুয়ারী এবং সামনেটা ফাঁকা। উঠোন পার হলেই ধানমাঠ। কুটুস কাঁটার বেড়া দেওয়া একফালি উঠোন আছে বলেই প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারে।

অন্যের তো সে সুযোগও নেই। দক্ষিণদুয়ারী ঘরের যে সারি তার বাকীটা দখল করে রেখেছে চরিতর, কিষণ, গোবিন, জগদীশ প্রভৃতি সরদারের গুষ্টিরাই।

উত্তরে পর পর কোয়ার্টারের সারি এবং ঐ বেমক্কা কুঁড়ের কুঁড়োজালি। তারই মাঝে একটি চবুতরা। নামো ধাওড়ার হৃদ্‌পিণ্ড। একটি বটের চারা। তার চারপাশে গোল করে সিমেণ্ট বাঁধানো বেদি। চারিদিকে ত্রিশ-চল্লিশ ফুটের মতো ফাঁকা জমি। তাকে ঘিরে আছে ধাওড়ার ঘরগুলি। ইটের গাঁথুনী, খোলার চাল; মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, গরুর গোয়াল, শুয়োর খুপড়ী কত কী যে বানিয়েছে ওরা।

ঘরে তো বাস করতে পারে না। বাইরেই পড়ে থাকে। চবুতরায় এসে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। এখানেই তাদের গঞ্জিকা সেবন হয়। ঢোল করতাল বাজিয়ে হোলী, চৈতা, কাজরী ও রামায়ণ গান করে। ঝগড়ার সালিশ, হপ্তার পেমেণ্ট, কুটুম্ব আপ্যায়ন, বিয়ে-সাদী, ভোজ, ক্রিয়া কর্ম, ইউনিয়নের মিটিং কি না হয় সেখানে? হরদম গমগম করে।

তেরো

নূতন বছরে নূতন পুরানো মিলিয়ে সিনিয়র, জুনিয়র, মাইনর ও গার্লস টিম তৈরি করেছেন ডাক্তারবাবু। অনন্ত ও সুবীর সিনিয়র টিমে প্রমোশন পেয়েছে। মেয়েদের টিম তৈরি হয়েছে শুচি, কল্যাণী, ভারতী ও গৈরীকে নিয়ে।

গৈরীর নাম শুনেই অনন্তর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সুমিতবাবু ঠাট্টা করে বললেন, এতদিনে ডাক্তার একটা টিম তৈরি করেছে। মেয়েগুলো গায়ে গতরে কি রকম চেকনাই আছে বল দিকি। বেশ একটা ফ্যাশন প্যারেড হবে।

'চলো গৈরী! হেঙ্গেল হেঙ্গেল করে চলছিস যে!'

হা হা শব্দে হেসে উঠল অনন্ত। সেই সঙ্গে সুবীর ও অন্যান্য টিম মেম্বাররা।

শুচির মুখটা রাগে গন্ গন্ করছে। সে টিমের ক্যাপ্টেন। টিম নিয়ে প্যারেড প্র্যাকটিশ করছিল। দেখনশোভা যেমনই হোক প্যারেড হচ্ছিল না।

অনন্তর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুচি বলল—অনন্তদা! ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

চটুল ভঙ্গিতে অনন্ত বলল—কি ভালো হবে না শুনি?

—আপনার ঠাট্টা ইয়ার্কি!

—আমি একাই দায়ী?

—হ্যাঁ তো! আপনিই তো শুরু করলেন।

—বেশ। যা করবার করে ফ্যাল্।

—করবই তো। ডাক্তারদাকে বলে দেব।

—যা বলগে। প্যারেড করতে পারিসনে পায়ে পা মেলাতে পারিসনে, স্ট্রেচার নিয়ে হাঁটতে পারিসনে—আবার রাগ কত। বিষ নেই তা কুলোপানা চক্কর।

ধমক খেয়ে শুচির মুখটা চুপসে গেল। দুটো ঢোক গিলে বলল—আমরা পারব না কেন? এই দেহাতী মেয়েটার যে পা বশ হচ্ছে না।

—ওকে শ্বশুর বাড়ি যেতে বলে দে।

—ধ্যেৎ। আপনার সব কিছুতেই ঠাট্টা।

—ঠিক বলেছি। তেল চুকচুকে খোঁপায় ফুল গুঁজে রঙদার শাড়ি পরে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া চলে। প্যারেড হয় না। এমন মেয়েকে টিমে নিয়েছিস কেন?

শুচি ঝেঁঝে উঠল—টিম কি আমি তৈরি করেছি

—ডাক্তারদা করেছেন। উনিই বুঝবেন। সবাই চুপচাপ। পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে ঘাসের উপর বসে পড়ছে।

তখন এলেন ডাক্তারবাবু। পরনে সাদা হাফশার্ট ও সাদা ফুল প্যান্ট। গলায় স্টেথিসকোপ। হয়তো ওদের কথা শুনতে পেয়েছেন। সবারই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—কি হয়েছে তোমাদের?

কেউ জবাব দিলো না।

গৈরী হাঁটু মুড়ে বসে ফার্স্ট এইড বইটায় মুখ গুঁজে দিয়েছে। শুচি ওর দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু বললেন—তোদেরই কিছু হয়েছে?

শুচি বলল—কই না তো!

—আমার কাছে লুকোচ্ছিস? গৈরীর মুখটা তুলে আমাকে দেখা তো।

শুচি যত ওর মুখটা তুলতে চায় তত ও মুখ গুঁজে দেয়।

ডাক্তারবাবু ধমক দিলেন—এই! কি হচ্ছে? মুখটা তোল বলছি।

গৈরী মুখ তুলল। একটি সজল কোমল মুখ! ঠোঁট দুটি কাঁপছে। চোখের পাতা ভেজা। কপালের সিঁদুর লেবড়ে গেছে। সিঁথিটা টক্ টক্ করছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা মুছল।

ডাক্তারবাবু বললেন—কি হয়েছে রে তোর?

গৈরী আবার মুখ নীচু করে গুম হয়ে গেল।

উনি বললেন—চুপ করে আছিস কেন?

—আমার হবে না ডাক্তার দাদা।

—কেন হবে না?

—তাই তো বলছে। হাসছে—টিটকিরি দিচ্ছে।

—কে হাসছে?

—সবাই! আমি যেন ফ্যালনা। ফার্স্ট এড না হলো তো কি হয়েছে?

ডাক্তারবাবু হুঙ্কার ছাড়লেন—এই তোমরা কে টিটকিরি দিচ্ছো? নিজের মুখে আমার কাছে স্বীকার কর।

অনন্ত বলল—টিটকিরি নয় দাদা। ওদের প্যারেড হচ্ছিল না। শুচি বলল—চলো গৈরী। হেঙ্গেল হেঙ্গেল করে চলছিস যে! তাই শুনে হেসে ফেললাম। কারণ শুচির মুখে গেঁয়ো শব্দ শুনতে মজা লেগেছিল।

—হ্যাঁ! আপনি বলেননি ওকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দে।

গৈরী তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করল। তখন ওর চোখে জল নেই।

—সে তো একদিন যেতেই হবে।

—যখন যাবো, তখন যাবো—এখন কি তার?

ওর রাগ দেখে অনন্তর মনে হলো সত্যি তো ওর এত উষ্মার কারণ ছিল না। মেয়েগুলোকে একটু বেশি বকাঝকা করে ফেলেছে।

তবু একটু তামাশার সুরে বলল—আচ্ছা, আচ্ছা, ঘাট হয়েছে।

ডাক্তারবাবু বললেন—শুধরে নাও।

—কি করে শোধরাবো?

—গৌরীকে তৈরি করে দাও। এখনো যথেষ্ট সময় আছে। ওদেরকে শেখাও।

—সিঁথিতে সাইনবোর্ড মার্কা মেয়ে অন্য কারো শিক্ষা নেবে মনে করেছেন?

গৌরী আবার ফুঁসে উঠল—তবে কি সাইনবোর্ডটা মুছে দিয়ে আসব বলছেন? কোনো বিবাহিতা মেয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে দেবে এটা তখন ওরা কল্পনা করতে পারত না। শুচি ধমক দিল—কি যা-তা বলছিস গৌরী?

কল্যাণী বলল—সিঁথির সিঁদুর মুছবি কিরে? রাগে তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই দেখছি।

—কি করে থাকবে? অনন্তদা আমার পিছনে লেগেই আছে। তোমরা ভদ্রলোকের মেয়ে তো—তাই কিছু বলতে পারে না। আমি গরিব, ছোটলোক, লেবারের ঘরের মেয়ে তাই পেয়ে বসেছে। লেখাপড়া শিখতে আসাই আমার পাপ হয়ে গেছে। তোমাদের পিছনে কুকুরের মতো ল্যাং ল্যাং করে ঘুরে বেড়ানোই পাপ হয়ে গেছে।

রাগে, দুঃখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

সুবীর বলল—অনন্ত তুই একটা থার্ডক্লাস। ঠাট্টা-ইয়ার্কির সীমা আছে। তা নয় এমন সেন্টিমেণ্টে আঘাত দিয়ে কথা বলছিস যে বেচারী কেঁদে ফেলল।

—কোন সেন্টিমেণ্টে আঘাত দিলাম বল?

ডাক্তারবাবু বললেন—সাইনবোর্ড মার্কা বলে। হ্যাঁরে চার-পাঁচ বছর বয়সে ওদের বিয়ে হয়। তখন থেকে সিঁদুর পরে স্বামীর কল্যাণ কামনায়। তুই তাকে পোস্টার বানিয়ে দিলি! এটা ওর অন্তরে আঘাত দেবে না।

—আমি খুবই দুঃখিত দাদা। এতটা তলিয়ে ভাবিনি।

অনন্ত সত্যিই মরমে মরে যাচ্ছিল। গৌরীর দিকে তাকিয়ে জোড়হাত করে বলল—আমাকে তুই ক্ষমা কর গৌরী!

গৌরীর মাথাটা নীচু হয়েছিল। অনন্তর কথায় আবার সোজা হয়ে গেল।

বলল—এই আরেক পাপ। তুমি বামুনের ছেলে হয়ে আমাকে জোড়হাত করছ কেন। বলতে বলতে উঠে এসে অনন্তর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

এসব আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দায়। মনের উপর জটিল সংস্কারের জাল যে তা ছিন্ন করাও দুঃসাধ্য! গৌরীর ভাষাও শুদ্ধ নয়। যাকে আপনি বলে তাকেই তুমি।

কিন্তু ডাক্তারবাবু তার পুরো সুযোগ নিয়ে নিলেন। বললেন—বাস বাস, আর কথা নয়। মেয়েদের টিমের দায়িত্ব অনন্তের। প্যারেড টু প্রাইজ!

অনন্ত বলল—তাই হবে দাদা। তবে গুরুতর। আর এদের সেন্টিমেণ্টগুলোও ঠিক বুঝি না।

শুচি বলল—হঁ্যা। আপনার মাথা।

—তোরা সব সেন্টিমেন্টের ঝুড়ি।

—আর আপনি মুক্তপুরুষ। রাগ বিরাগ কিছু নেই।

কল্যাণী ওকে চিম্‌টি কেটে বলল—আঃ। চুপ কর না। সেই থেকে শুরু করেছিস তো চলছেই।

অনন্ত বলল—যাক তোমারই একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে মনে হচ্ছে। চল—প্যারেড করব। টিম—গেট রেডি।

চারটি মেয়ে ঝটপট উঠে দাঁড়াল।

অনন্ত এবার খুব সিরিয়াস। প্রত্যেককে নিজের পায়ের সঙ্গে মিলিয়ে লেফট রাইট করাল। গৌরীর কালঘাম ছুটিয়ে দিলো। শীতের বিকেলেও গলা ও কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। মুখটা ভীষণ গম্ভীর। নাকের পাটা দুলছে এবং গাল দুটোয় সিঁদুরে রঙের ছোপ ধরেছে। ঘন ঘন হাঁফাচ্ছে।

অনন্ত বলল—ঠিক আছে। একটু জিরিয়ে নে—তারপর আবার—হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঘাসের উপর আলু-থালু হয়ে বসে পড়ল।

ফাঁক পেয়ে শুচি ও কল্যাণী রাস্তার ফিরিওলার কাছে বাদাম কিনতে গেল। একটু পর ভারতীও ওদের পিছু নিল।

গৌরী একা। শ্বাসটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। অনন্ত ফার্স্ট এড বইয়ে স্ট্রেচার ড্রিলের একটা ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। গৌরী সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। অনন্ত চোখ তুলতেই ফিক করে হাসল।

১৯৪৭ সাল।

প্রতিদিনের মতো ১৫ই আগস্টের উষালগ্নে সূর্য উঠেছিল নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা নিয়ে। স্বাধীনতার ডঙ্কা বেজেছিল ভারতের দিকে দিগন্তে। পত পত করে উড়েছিল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। কি সে জয় জয়কার ধ্বনি। যেন নবচেতনার প্লাবন।

গুণী রায় ও মথন দাসের মতো হাড় কঞ্জুষ লোকও গ্রামের দুর্গাথানে বঁদে বিলি করে দিয়েছিলেন। সাত সকালে সব ছেলেদিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে স্নান করতে পাঠিয়েছিলেন।

অনন্ত সেই দিনটিকে খুব ভালোভাবে মনে করে রেখেছে।

মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে দেখে গ্রামের দাদা ও কাকারা দাঁড়িয়ে। তাঁরাই তাড়া দিলেন—যা-যা চান করে আয়।

মাকে জিজ্ঞাসা করল—কেন মা? এত সকালে চান করব কেন? কি পুজো হবে?

যেন পুজো-পাশা ছাড়া সকালে স্নান করতে নেই।

ওর মা বললেন দেশমাতৃকার পুজো হবে। আজ স্বাধীনতা দিবস। দেশে ব্রিটিশ রাজ থাকবে না। ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের দেশ হবে।

আর দেশে রাজা থাকবে না? কি আশ্চর্য কথা? রামায়ণ, মহাভারত ও ইতিহাসে কত রাজা মহারাজার কাহিনী পড়েছে। ইংরেজদিকেও রাজা মনে করেছে। সেসব উল্টে দিলো।

কে?

গণতন্ত্র!

গণতন্ত্র লোকটা কেমন? তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে।

মনের মধ্যে সেই যে একটা বিতর্কের সূত্রপাত হয়ে গেল আজও তার মীমাংসা হয়নি। যত বয়স বেড়েছে ততো তার মাত্রা বদলেছে। মানে বদলেছে। মূলোচ্ছেদ হয়নি। গণতন্ত্রকে কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয়। যেন একটা আইডিয়া। তার কোনো আকার নেই।

সেই থেকে অনন্ত খুঁজে বেড়ায় ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপ। ইতিহাস, সময়, সমাজ ও তার বিবর্তন। কয়লা, পাথর, জলবালি ও ফসিল। মহাকালের ঘোড়ার ক্ষুরে মানুষ মানুষীর স্পন্দিত হৃদয়ের বার্তা। লোভ, লালসা, হিংসা ও রিরংসার কালো যবনিকায় দু'একটি সাদা আলোর ফুটকি। ভূত্বক, ভূতত্ত্ব, নদ নদী, পাহাড়ের আশীর্বাদ ও অভিশাপ।

•

দামোদর অনার্য নদ!

কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে নৈসর্গিক বিপর্যয়ের প্রচণ্ড তাড়নায় পৃথিবীর ত্বক, মাংস, অস্থি, মজ্জা তোলপাড় করে জন্ম নিয়েছিল সে।

তখন থেকেই সে বয়ে যাচ্ছে ছোটনাগপুরের মালভূমি অতিক্রম করে, অসংখ্য ডুংরিকে পাশ কাটিয়ে, বোকারো, করনপুরা, ঝরিয়া পার হয়ে শেরগড় পরগনার মধ্য দিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে।

দুরন্ত দুর্বার জলস্রোত। দুকূল প্লাবী বন্যার তাণ্ডব। পঞ্চকোট পাহাড়ের সীমানায় বরাকর নদ তার বুকে আছাড় খেয়ে পড়েছে। দুই নদের দুরন্ত বন্যায় হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা, ছন্নছাড়া।

তবুও অনার্য সে সাঁওতালের কাছে পরম পবিত্র। এর জলে তারা অস্থি বিসর্জন দেয়। মৃতদেহ দাহ করে।

প্রতি বছর বর্ষা আসে। আকাশে মেঘ দুন্দুভি বাজে। দামোদর উপত্যকার জনমানুষের হৃৎপিণ্ডে ঘন ঘন হাতুড়ী পড়ে। অনার্য আক্রোশে গর্জন করে দামোদর। কার সাধ্য তার সামনে দাঁড়ায়?

অথচ তারই বুকে থরে থরে সঞ্চিত হয়ে আছে নিকষ কালো পাললিক শিলার কয়লাস্তর। অপ্রমেয় তাপশক্তির আধার। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার জীবনীশক্তি! লক্ষ কোটি টন আঁধার মানিক।

তোমারই জল, তোমারই বালি, তোমারই কয়লা নিয়ে ব্রিটিশ রাজের শিল্প বিপ্লব। আজ তার অমোঘ প্রয়োজন।

কয়লা ছাড়া মানুষের জীবন?

ভাবাই যায় না।

এই কথাগুলো, এই ভৌগোলিক তত্ত্ব ও সভ্যতার বিকাশ নিয়ে অনন্ত খুব ভাবে। তার মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগে। প্রকৃতি কত বিচিত্ররূপিনী! কত তার রূপ রস গন্ধ। গাছের পাতা, ফুলের সুগন্ধ, ফলের রস সব কিছুকে অতিক্রম করে যার জীবন ধারণের অমোঘ প্রয়োজন।

চৌদ্দ

হাতের তালুতে রক্তপাতের জন্য ব্যাণ্ডেজ বাঁধার তালিম দিচ্ছে অনন্ত।

গৈরী হাতটা বাড়িয়ে দিলো। সুডৌল সুগৌর। খুব চিকন লোম।

অনন্ত ওর হাতটা টেনে নিজের বাঁ হাতের উপর রাখল। তুলো দিয়ে হাত মুছে দেবার মহড়া দিলো। একটা ব্যাণ্ডেজ পাকিয়ে গোল করে ওর মুঠিতে ধরিয়ে আঙুল মুড়ে মুঠিটা বন্ধ করে দিলো।

আর একটা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে মুঠিটা বেশ যত্ন করেই বাঁধছিল। তখনই সে অনুভব করল ওর হাতটা কাঁপছে।

কব্জি থেকে প্রায় কনুই অব্দি বারোটি বিভিন্ন ডিজাইনের কাঁচের চুড়ি। ঠিন ঠিন করে বাজছে। কব্জিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জায়গা করতে ওর চুরিগুলো উপর দিকে ঠেলতে ঠেলতে বলল—বাব্বাঃ! এতগুলো চুড়ি!

শুচি মন্তব্য করল—ওর বরকে মাসে দশ টাকার চুরি কিনতে হবে।

—আঃ!

গৈরীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দটা হতেও পারে শুচির কথার উত্তর কিংবা নিজেদেরও অজ্ঞাত শীৎকার। ওরা কেউই সে ধ্বনির সঙ্গে পরিচিত নয়।

অনন্ত দেখল ওর খুব নরম ও চিকন লোমগুলো সরু সরু পদ্মকাটার মতো হয়ে গেছে। হাতটা থর থর করে কাঁপছে এবং ঠোঁটদুটো ফাঁক করে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ওর সারা গায়ে তড়িৎ শিহরণের ঢেউ খেলে গেল।

একেই কি রোমাঞ্চ বলে?

সুমিতবাবু কি একেই বলেছিলেন শরীরের প্রতিক্রিয়া?

এক মুহূর্তের বিমূঢ়তা।

তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজটা শেষ করে দিয়ে উঠে পড়ল। বলল—তোরা নিজেরা প্রাকটিশ কর। আমি এক রাউণ্ড স্ট্রেচার ড্রিল করে আসি।

গৌরী তখনো তেমনিভাবে বসে। শুচি ওকে ধাক্কা মেরে বলল—এই গৌরী। হাতটা আমার দিকে বাড়া। ব্যাণ্ডেজটা ভাল করে দেখেনি।

মোরাম রাস্তার উপরে পায়ের শব্দ করে ওরা হাঁটছে। আগে অনন্ত পিছনে গৌরী। তখন বেশ অন্ধকার নেমেছে। সদর রাস্তায় আলো আছে। কুলি ধাওড়ার পথ অন্ধকার। এখানে সেখানে ডাঁই করা ছাইগাদা। সারি সারি ঝাঁঝরি উনুন জলছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় পথ ঘাট ছেয়ে গেছে।

রেল লাইন পার হয়েই ফাটকবাজার। দু'সারি পান গুমটি। চা পকুড়ির দোকান। চালাঘরে তরিতরকারি, চাল মাছের পসরা। দুটো বড় বড় মুদির দোকান। ছোট বড় খানকয়েক লটকন ও কাপড়ের দোকান।

সন্ধ্যাকালটা বেশ জমজমাট হয়ে থাকে। হ্যাজাক বাতি জ্বলে।

ওরা যখন ফাটক পার হচ্ছিল অনন্ত তখন গৌরীর চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে। জনাকয়েক ফচকে ছোঁড়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করল—গুলুয়ার বিটি ডাকদার হবেক।

পর পর কয়েকটা সিটি পড়ল।

তাই শুনে অনন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল এবং ওর চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে গেল।

গৌরী ওর কাছে এসে বলল—চলুন চলুন। ওরা রোজ এমনি করে।

—তাছাড়া আর কি মুরোদ আছে?

বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আবার অন্ধকার। আবার ঘিঞ্জি।

অনন্ত ওদের চবুতরায় এসেছিল। সেই রাস্তাটিতেই যাচ্ছিল।

গৌরী বলল—ওদিকে না। এদিকে।

অনন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার গৌরী আগে চলছে। একটা খুব সঙ্কীর্ণ রাস্তা পার হবার সময় অনন্ত বলল—বাব্বাঃ যমদুয়ার।

—হ্যাঁ।

—এবার তুই একা যেতে পারবি নে?

—তা পারব না কেন? এগুলো তো আমাদের জাতকুটুমের ঘর। এখানে আমার কোনো ভয় নেই।

—তাহলে যা।

গৌরী হেসে বলল—আসুন না দাদা। দেখে যান কেমনভাবে থাকি। যখন ম্যানেজার হবেন তখন আপনার কুলি-কামিনদিকে এই নরক থেকে উদ্ধার করবেন।

—সে কি আমার সাধ্যরে। চল—দেখেই আসি।

কারও উঠোন দিয়ে, কোনো ছাইগাদার পাশ দিয়ে, নর্দমা ডিঙিয়ে কোনো-রকমে একটি খোলার ঘরের উঠোনে এসে পৌঁছাল।

আট ফুট বাই দশ ফুট সাইজের দুটি খোলার ঘর। তারই বারান্দার একপাশে

রান্না হচ্ছে। অন্যদিকে খড়ের চালায় গাই-বাছুর আছে। একটি শুয়োর খুপড়ী এবং মুরগির খোঁয়াড়। সামনে কুটুস কাঁটার ঝোপ-জঙ্গল।

ওর মা রুটি সেঁকছে। গুলু ডিউটী গেছে। বাচ্চাগুলো কাঁথা ঢাকা দিয়ে—উনুনসালে বসে আছে। একটি ঘরের ভিতর হ্যারিকেন বাতি জ্বলছে। ওর ভাই দুটি বই খাতা নিয়ে বসেছিল। গৈরীর সাড়া পেয়েই পড়তে শুরু করে দিলো।

অনন্ত উঠোনেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর মা তাকে দেখে ঘোমটাটা বুক পর্যন্ত টেনে নিল।

গৈরী বলল—আসুন দাদা—ভিতরে আসুন।

অসীম কৌতুহলে অনন্ত ভিতরে ঢুকে পড়ল। খাট তক্তা কিছু নেই। ঝুড়ি ঝাপটা হাঁড়ি কুঁড়িতে দেওয়ালের ধারগুলো জ্যাম। একটি তার টাঙানো আছে ঘরের এ পাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত। তাতে টাঙানো আছে ছেলেমেয়েদের জামা, প্যাণ্ট, গামছা, ফ্যানাড়ী, শাড়ি, ব্লাউজ। কোনায় কোনায় মাকড়সার জাল ও ঝুলকালি চাল পর্যন্ত ছেয়ে দিয়েছে। চারিদিকে ময়লা।

তারই মধ্যে একটি জায়গা পরিষ্কার। সেখানে দেওয়ালে টাঙানো মা সরস্বতীর ফটো। শিব দুর্গার ছবিওলা পুরানো ক্যালেণ্ডার। কাঠের বাক্সে বই, খাতা, শ্লেট, পেন্সিল ডাঁই করা।

গৈরী সেই বাক্সটি খালি করে ওকে বসতে দিলো।

সেদিনও সন্ধ্যাকালে ডাক্তারবাবু ক্লাস করতে করতে রাত করে দিলেন। শেষদিনের ব্যাপার। জনে জনে পরীক্ষা করে নিতেই বেলা ডুবে গেল।

গৈরীর সেই পুরানো সমস্যা। একবার ভাবল—একাই চলে যাবে।

কিন্তু কিরকম ভয় ভয় ভাবটা মনের ভিতর গুর গুর করে উঠল। কিছুক্ষণ একাই রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হন্ হন্ করে মেসে ঢুকে অনন্ত'র দরজায় ধাক্কা মারল।

অনন্ত দরজা খুলে অবাক। বলল—আরে তুই! বাসায় যাসনি?

কেমন অভিমানের সুরে বলল—একা কি করে যাব? ভয় করে না বুঝি?

—তাতো বটে! কথাটা মনেই ছিল না।

—আমার জন্য একটু ভাববে তবে তো মনে থাকবে।

কমলেন্দু টিপ্পনী কাটল—তোমার জন্য ভাববার সময় কোথা ওর?

—তাই বটে!

অনন্ত বলল—বোস গৈরী। চা খেয়েনি তবেই তোকে পৌঁছে দেব।

গৈরী দাঁড়িয়েই রইল। অনন্ত আবার বলল—বোস।

গৈরী মেঝেতেই বসতে যাচ্ছিল। অনন্ত বলল—আরে ওখানে কেন?

—তবে কি?

—এখানে বোস। বিছানার একটা দিক দেখিয়ে দিলো।

—ও বাব্বাঃ! তোমার বিছানায় বসব আমি?

—কেন? কি দোষ আছে?

—তুমি ব্রাহ্মণ!

—তাতে কি আছে?

—আমি ছোট জাতের মেয়ে অনন্ত দা।

অনন্ত মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ওর চোখে চোখ রেখে বলল—হে ভগবান! এতদিনে তুই এই শিখলি। আমার বামনাই দেখলি!

মেসের ঠাকুর কেটলিতে চা ও হাতে দুটি কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। অনন্ত আরো একটা কাপ আনিয়ে তিন কাপ চা তিনজনে নিল।

কমলেন্দু বলল—গৈরী! তোমার জাতপাত নিয়ে এত সংস্কার কেন?

—তা হবে না?

অনন্ত বলল—না। আমাদের কাছে ব্রাহ্মণ, শুদ্র সবই সমান।

কমলেন্দু বলল—অনন্তর বাবা বাউরী বাগদীদের মড়া পোড়াতেন, তাদের রোগীর সেবা করতেন, তাদের ঘরে ভাত খেতেন।

—সেজন্য একবার ছ' বছর যাবৎ জাতে পতিত ছিলেন।

গৈরী প্রশ্ন করল—জাতে উঠলেন কি করে?

—গ্রামে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তিনি আমাদের বাড়িতে তিনদিন ছিলেন। বাবার হাতেই খেতেন। তিনি গ্রামের মাতব্বরদের ধর্মে গোঁড়ামি, জাতপাত নিয়ে খুব ভর্ৎসনা করেছিলেন। তারপর থেকে সব ঠিক হয়ে গেল।

—এখন কী করেন? জাত মানেন।

—না।

—জাত মানেন না?

গৈরী কি রকম আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল—কিন্তু আমি যে মানি।

—কে তোকে বারণ করেছে? কিন্তু আমাদের কাছে ওসব আদিখ্যেতা করিস না। আমরা পছন্দ করি না। নিজেই যদি নিজেকে ছোটলোক বলে ঘেন্না করিস তবে তো কোনো কালেই ভদ্রলোক হতে পারবি না।

—আর বকবেন না তো। দিন কাপটা দিন।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এঁটো কাপগুলো নিয়ে বারান্দার একপাশে রেখে এল। সকালে ঝি এসে ধুয়ে নেবে।

রাস্তায় নেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনন্ত ঠাট্টার স্বরে বলল—চা-টা খাওয়ার পর ধোঁয়ার তেষ্টা পায়। তুই একটা বিড়ি ধরিয়ে ফ্যাল গৈরী। কেউ দেখবে না।

গৈরী হাসতে হাসতে বলল—তুমি বলেছিলে না—আর ঠাট্টা করবে না।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম।

—কিন্তু আমি ভুলিনি। বিশ্বাস কর সেদিন থেকে একটাও বিড়ি খাইনি। পকেট খালি।

ওর ফতুয়ার মতো ব্লাউজের পকেটটি উলটে দিলো।

অনন্ত অবাক। একদিন ওর পকেটে বিড়ি দেখে বকেছিল বটে তাই বলে—বিস্মিত কণ্ঠে বলল—এক কথায় বিড়ির নেশা ছেড়ে দিলি ?

—বিড়ি তো বিড়ি। তোমার কথায় মরতেও পারি।

ছায়া ছায়া পথ। বাঁদিকে ডি. সি. ও ডি. ডি. সাহেবের জোড়া বাংলো। পরপর দুটি শিমুল গাছের চারা। মোরাম বিছানো গেরুয়া পথের জাফরি কাটা আলো।

অনন্তর ভিতরটা কেমন দুলছে। গৈরীর কাঁধে হাত দিয়ে বলল—হ্যাঁ রে গৈরী!

—উঁ!

—আমার একটা মুখের কথা তোর কাছে এত দামী হলো কি করে ?

জানি না।

মুখটা নীচু করে চলছে। অনন্ত ওর কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিল। চলতে চলতে এগিয়ে গেল। নিঃশব্দ পদযাত্রা। কিন্তু মন মুখর। কত কথার জাল বুনে যাচ্ছে দু'জনেই।

ক্রমে ক্রমে ফাটকবাজার পার হয়ে গেল। ফচকে ছোঁড়াদের হাসি-টিটকিরী এবং সিটি শেষ হলো। অন্ধকার পথ অনন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল।

গৈরী বলল—দাঁড়ালে যে।

তোদের পাড়ায় তো এসে গেলাম। এবার তুই চলে যা।

—আচ্ছা! গৈরী দাঁড়িয়েই রইল।

অনন্ত বলল—আর একটা দিন। কালকে কম্পিটিশন হয়ে গেলে আর কি তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে ?

—কেন হবে না ? একবার গৈরী বলে ডেকেই দেখো।

—আচ্ছা গৈরী—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি—কিছু মনে করিস নে।

—বল।

—তোর স্বামীকে তুই ভালোবাসিস ?

গৈরী বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—ওর কথা আমি ঠিক মনে করতে পারি নে। ভালোবাসার কথা ভাবলেই তোমার মুখটা মস্ত ডাগর হয়ে মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। এ যে আমার কি অলীক কল্পনা—ভাবলেও লজ্জায় মরে যাই।

অনন্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কানে বাজল ঝুম ঝুম শব্দ। ক্রমশ তা মিলিয়ে গেল।

ওর মনে হলো এক জোড়া পা মল ঝুম ঝুম করে তার হৃৎপিণ্ড মাড়িয়ে চলে গেলো। তাকে সে ধরতে পারল না।

পনেরো

পরদিন সকাল থেকেই সাজ সাজ রব। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে সব একসঙ্গে বেরুলো। শীতের বাতাস বইছে হু-হু করে। ওদের মনেই হচ্ছে না শীত আছে।

ডিসপেনসারীতে গিয়ে দেখল মেয়েরা আগেই নেমে গেছে। কি সব সাজের বাহার। শুচি ও ভারতী হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে। কল্যাণীর পরনে শালোয়ার কামিজ। পায়ে শুঁর তোলা চটি। পিঠে বেণী ঝুলছে। মুখে প্রসাধন।

সব থেকে মজার পোশাক গৈরীর। পশ্চিমী ঢঙে পরা নীল শাড়ি। ফতুয়ার মতো পকেটওলা ব্লাউজ। দু'হাতে কনুই পর্যন্ত কাঁচের চুড়ি। গলায় মালা। চোখ দুটিতে কান পর্যন্ত কাজল। কপালে ডাগর করে সিঁদুর টিপ। সিঁথিতে লম্বা করে গোলা সিঁদুর। খোঁপা বেঁধেছে পরিপাটী করে। চলতে ফিরতে রুনুঝুনু মিউজিক দিচ্ছে।

ডাক্তারবাবু বললেন—একি রে গৈরী, বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছিস নাকি?

সবাই হেসে উঠল। গৈরী লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ছেলেরা মজা পেয়ে গেলো। অনন্ত সুর করে গান ধরল—চুঁড়িয়া বাজে গৈরী ঠুমক ঠুমক···

—অনন্তদা! তুমিও!

গৈরীর চোখ থেকে ঠিকরে পড়ল এমন এক দ্যুতির ঝলক যে অনন্ত চুপ মেরে গেল। সুবীর ঠাট্টা করল—এক ধমকিতে তোকে ঠাণ্ডা করে দিল রে।

—কি করবি বল? নারী যে প্রবলা।

যৌবনের ধর্ম! বোধ ও অবোধের লীলা চঞ্চল ঢেউ। মনের মধ্যে যখনই জোয়ার তখনই ভাঁটা।

ডাক্তারবাবু ওদেরকে নিয়ে যাবার জন্য অ্যাম্বুলেন্সকে ব্যবস্থা করেছিলেন। তারই ভিতর ঠাসাঠাসি করে উঠে পড়ল। যাত্রী ছাড়াও মালপত্র নেহাত কম ছিল না। ওদের টিফিনের জন্য লেবু, কলা, আপেল, পাঁউরুটি, বিস্কুট, ডিমসেদ্ধ, ষোলোজনের নতুন ইউনিফর্ম। ষোলো জোড়া নতুন জুতো মোজা।

গাড়ি স্টার্ট দিলো। হাসিখুশীতে মশগুল হয়ে ওরা চলল।

বেলা নটা নাগাদ শেরগড়ের হাসপাতালে পৌঁছে গেল। বেশ বড়সড় হাসপাতাল। সামনের বাগানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানেই সামিয়ানা টাঙিয়ে চেয়ার টেবিল পাতা হয়েছে। বাউণ্ডারী দেওয়ালের ধার বরাবর ব্রাটিশ

ক্লথের ঢাকা দেওয়া প্যাণ্ডেল। পনেরো ষোলো ফুট লম্বা চওড়া জায়গা দিয়ে ব্রাটিশ ক্লথেরই পার্টিশন। সামনেটা ফাঁকা। এগুলো সব প্রতিযোগীদের থাকবার জায়গা। প্রত্যেক ঘরে এক হাঁড়ি করে জল। মেঝেতে ব্রাটিশ ক্লথ পাতা।

ডাক্তারবাবু বললেন—তোমরা দুটো ঘর দখল নে নাও। একটা মেয়েদের জন্য। একটা তোমাদের জন্য।

বেশ একটা অস্থির উত্তেজনার মুহূর্ত।

সামনের মাঠে স্ট্রেচার ড্রিল হচ্ছে। সামিয়ানার নীচে বিচারকরা আছেন। টেবিলের উপর ছড়ানো আছে স্ট্রেচার, ব্যাণ্ডেজ, স্লিপ্ট, ব্ল্যানকেট, আইস ব্যাগ, হট ওয়াটার বটল ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম। পাশেই হাসপাতালের উঁচু খাটের বিছানা।

ওদের টিমের নম্বর ছিল পাঁচ। মাইকে টিম নম্বর ফাইভ ডাকা মাত্র সুবীর কমাণ্ড দিল—টিম গেট রেডি। অ্যাটেনশন।

চার নওজোয়ান এক লাইনে দাঁড়াল অ্যাটেনশন ভঙ্গীতে। টানটান পেশী। শক্ত মুখ। ধ্বক ধ্বক করছে। চোখে প্রতিজ্ঞা।

ফরোয়ার্ড মার্চ! একই তালে জুতোর শব্দ তুলে এগিয়ে গেল।

হল্ট! বিচারকের সামনে দাঁড়াল।

টার্ন টু দ্যা রাইট। রাইট টার্ন! সবাই ডানদিকে ঘুরল।

স্যালুট দ্য অফিসারস। স্যালুট!

চারটি হাত একই সঙ্গে স্যালুটের ভঙ্গিতে ফ্রিজড। যেন মিলিটারীর মহড়া। সবারই চোখ সেদিকে। বিচারকদেরকে ম্যাজিকের মতো ধরে নিল। সুবীরের গলা যেমন ভঙ্গীও তেমন। স্পষ্ট উচ্চারণ।

পলক মাত্র সময়। একজন বিচারক বললেন—একটা খাদের সুরঙ্গ পথে পাথর চাপা পড়ে একজন আহত হয়েছে। তাকে ফার্স্ট এড দিয়ে নিয়ে এসো। পথে আসতে একটি নালা ও একটি ভাঙা দেওয়াল আছে। তা অতিক্রম করে আসতে হবে! দশ মিনিট সময়। হ্যারী আপ!

অনন্তর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। হাতও চলে খুব দ্রুত। এটা একটা রঙ্গমঞ্চ। কিভাবে অতি দ্রুত নিপুণ ও নির্ভুলভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে সেই শিক্ষারই মহড়া। এও এক থিয়েটার।

ওরা তা জানে। টেবিলের ওপর ছড়ানো সাজ-সরঞ্জাম দ্রুত হাতে তুলে নিল দু'জন। অনন্ত তার রিকুইজিশন স্লিপ ঐখানেই লিখে দিলো। এখন সময়ের দাম খুব। পলকে রহে যুগ চারি।

—টিম ডবল মার্চ!

ওরা বেরিয়ে গেল। কোথাও ফাউল নেই। স্টেপিং-এ ভুল নেই।

সেখানে পৌঁছে দেখল একটা সাজানো পেশেণ্টের হাঁটুর উপর আড়াআড়ি-ভাবে একটা কাঠ রাখা আছে। তাতে লেখা—পাথর। দু'জনে সেটা ধরে সরিয়ে প্লিণ্ট দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফেলল।

স্ট্রেচারে তুলে বয়ে নিয়ে আসছে। প্রথমে নালা। সেটা কেতাদুরস্তভাবে পার হলো। তারপর দুটি খুঁটির ওপর গোলপোস্টের মতো দেওয়াল। পেশেণ্টকে নীচে নামাল। দু'জনে স্ট্রেচারের হ্যাণ্ডেল ধরে বুক পর্যন্ত তুলল। দু'জন টপ করে ভিতরে ঢুকে হাত উপরে করে স্ট্রেচার ধরল। তৎক্ষণাৎ অন্য দু'জনে হাত বদল করে নিল।

গোটা অপারেশনটা এত দ্রুত, এত পরিচ্ছন্ন এবং এমন নিখুঁত সময় ও স্মার্টনেসের সঙ্গে হলো যে তখন তাদেরকে ছবির মতো দেখাচ্ছিল।

চারিদিক থেকে চট চট হাততালি পড়ল।

ওদের সাজঘরে অন্যান্য টিমের মেম্বাররা আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। মেয়েরা লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে ও হাততালি দিচ্ছে।

শুচি বলল—উঃ কি স্মার্ট!

—সুবীরদার কমাণ্ড!

ওরা হাততালি শুনল। কিন্তু মনোযোগ বিঘ্নিত হলো না। পেশেণ্টকে এনে তার জন্য নির্দিষ্ট বেডে শুইয়ে দিলো। সময় লাগল নয় মিনিট দশ সেকেণ্ড।

একজন বিচারক বললেন—ওয়েল ডান!

ফিরে এল সাজঘরে। রীতিমতো হল্লা পড়ে গেছে তখন। কেউ কেউ জড়িয়ে ধরল! শুচি ওদেরকে একটা করে কমলালেবু দিলো।

সুবীর বলল—ধন্যবাদ! তোরা ফিরে এলে আমরাও কমলালেবু দেবো।

মেয়েদের ডাক পড়ল বেলা দুটোয়। তখন ওদের মুখ শুকিয়ে আমসী। সকাল বেলাকার ঝকঝকে উজ্জ্বল সাদা পরীর দলটি ভয়-ভাবনা ক্ষিদে তেষ্টায় মলিন। পা কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। হাঁটুতে হাঁটু লাগছে। দাঁতে দাঁত।

অনন্ত ছুটে এল হাঁ হাঁ করে—আরে আরে। করিস কি? এত নার্ভাস হলে চলে নাকি! চল্ চল্ এগিয়ে চল।

ওরা করুণ চোখে ওর দিকে তাকাল।

অনন্ত প্রায় ধমকের সুরে বলল—ঘাবড়াস না। জরুর ফার্স্ট হবি। ফার্স্ট! ফরোয়ার্ড মার্চ।

ওরা কমাণ্ড নিয়েই বেরিয়ে গেল। বিচারকের কাছে যখন পৌঁছাল তখন ধাত ফিরে পেয়েছে। ওদের প্রশ্ন সহজ ছিল। বেশ করল।

ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সুবীর একটি করে কমলালেবু ধরিয়ে দিলো।

তারপর মৌখিক পরীক্ষা। প্রত্যেকের পঁচিশ নম্বর করে। আবার বুক দুরু-দুরু ভাব। কি হয়—কি হয়!

উদ্বেগ অস্থিরতা ও উত্তেজনার পর প্রায় সন্ধ্যার মুখে রেজাল্ট আউট হলো। ডাঃ মণি ব্যানার্জীর জয় জয়াকার। সিনিয়ার, মাইনার ও গার্ল টিম ফার্স্ট। জুনিয়ার টিম সেকেণ্ড।

হাসিতে হাসিতে ছয়লাপ। ডাক্তারবাবু বললেন—মেয়েরা স্ট্রেচার ড্রিলে ফার্স্ট হয়েছে।

সুবীর বলল—অনন্ত ভালো কারিগর।

—গৈরী একাই মৌখিকে বাইশ নম্বর পেয়েছে।

—অনন্ত ওর কানে কানে মন্ত্র দিয়েছে।

গৈরী চোখ পাকিয়ে সুবীরের দিকে তাকাল।

ডাক্তারবাবু বললেন—তোরা আমার মুখ রেখেছিস। কাল আমার বাংলোতে তোদের নেমন্তন্ন, লুচি পায়েস খাওয়াবো।

অনন্ত বলল—আর মাংসের ঝোল।

—উঃ। আবার একটা খরচ বাড়িয়ে দিলি। ঠিক আছে—তাই হবে।

—থ্রি চিয়ারস্ ফর ডাক্তার দা।

—হিফ্ হিফ্ হুররে!

আলো ঝলমল মঞ্চ। টেবিলের উপর ফুলদানি। তাজা গোলাপের মোড়ক। সারি সারি পুরস্কার সামগ্রী। শিল্ড, কাপ, মেডেল।

টাই পরা সাহেবরা চেয়ারে বসে আছেন। সামনে বেঞ্চির উপর প্রতিযোগিরা। প্রথম সারিতেই মেয়েরা। ইউনিফর্ম ছেড়ে আবার সেই রঙবাহার শাড়ি পরেছে। মুছে গেছে মুখের মলিনতা। প্রসাধন বলতে পাউডার।

বক্তৃতা হওয়ার পর পুরস্কার বিতরণ। একজন বিলিতী মেমসাহেব প্রাইজ দিচ্ছেন। বয়সে বুড়ী সাজ-পোশাকে ছুঁড়ি। প্রাইজ দিয়ে সবারই সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করছেন।

গৈরীকে প্রাইজ দিয়ে বললেন—আঃ! ম্যারেড গার্ল!

পাশ থেকে একজন সাহেব বললেন—ইয়েস ম্যাডাম! সি ইজ কামিং ফ্রম এ ওয়ার্কিং ক্লাস।

মেমসাহেব ঘাড় নাড়লেন। গৈরী এসব কথাবার্তার বিন্দু বিসর্গও বুঝল না। আসলে ওর চোখ, কান কিছুই যেন কাজ করছে না। প্রাইজের কেরোসিন-স্টোভটি বগলদাবা করে চলে এল।

অনন্ত ওর দিকেই তাকিয়েছিল। বিপন্ন কিন্তু উদ্ভাসিত মুখের ভঙ্গী দেখে সুবীরের দিকে তাকাল।

সুবীর বলল—আহা! বেচারী নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

সে কি একটা কথা? যে জীবনে কখনো প্রাইজ পায়নি তার কাছে এ যে অভাবনীয়। এত আনন্দ ও সহ্য করতে পারছে না। কতক্ষণে ও মা, বাবা,

ভাই বোন ও আত্মীয় স্বজনদিগকে দেখাবে সেই ভাবনাতেই আকুল। আর ব্যাকুল অনন্তর জন্য। মনে হচ্ছে ওকে ধরে চুমু খায়।

অনন্ত ও সুবীর চ্যাম্পিয়নশিপের শিল্ডটা হাতে নিয়ে আছে। ঠিক পিছনে আছেন ডাক্তারবাবু। একজন ফটোগ্রাফার ফটো তুলে নিলেন।

এই শিল্ড থাকবে ম্যানেজারের অফিসে। প্রাইজগুলি সব আপন আপন।

হৈ হৈ করতে করতে এ্যাম্বুলেন্সে চড়ে কালিয়ারী এসে পড়ল। কি আনন্দ! ছেলেমেয়ে সব একসঙ্গে নাচতে লাগল।

পরদিন ডাক্তারবাবুর বাংলো সাত-সন্ধ্যেতেই সরগরম। কিসে গুলজার। যেন হাট বসেছে। ওঁর চেলা-চামুণ্ডারা চিৎকার এবং হাসিতেই আসর জমিয়ে দিয়েছে। তবু তো এখনো নাচ-গান শুরু হয়নি।

ডাক্তারবাবুর পাশের বাংলোটি মিস্টার নিকলসের। কলিয়ারীর ঠিকাদার। জাতে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। বয়সে প্রবীণ। ওর বাংলোতে দুটি মেয়ে থাকে। বয়সে যুবতী। মেড-ইন-ইণ্ডিয়া বডি। বাৎ করে ফরেনের। ধুসর রঙের চুল। নীল রঙের চোখের মণি। লোকে বলে খাস বিলাইতি সাহেবের পয়দা। ওরাই নাকি মিঃ নিকলসের ক্যাপিটাল অ্যাসেট। না হলে এখন ভগ্নদশা। ইউরোপীয়ান সাহেবরা যখন ম্যানেজার এজেন্ট ছিলেন তখন ওঁর রমরমা ছিল। দেশী ম্যানেজারদের পাল্লায় পড়ে চার আনা পয়সার হিসাব-নিকাশের ছকে পড়ে গেছেন! অমন যে বিউটিফুল হিরোইন পুষেছেন তাদেরও বাজারদর নেমে গেছে। আজকাল রইস কাপ্তান কই?

এদের হৈ হুল্লোড় শুনে ওরাও গ্রামোফোন রেকর্ডে বিলিতী মিউজিক বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। কখনো বা উঁকি মেরে দেখছে—বাউণ্ডারী দেওয়ালের ওপার থেকে।

তাই দেখে ছেলে-ছোক্‌রাদের উৎসাহ শতগুণে বেড়ে যাচ্ছে। ওরা তো দূর থেকে দেখেই চোখের সুখে মগ্ন হয়। গায়ে হাত দেবার মুরোদ নেই।

লুচি ভাজার গন্ধ ভাসছে। মাংস কেটে মশলাপাতি মেখে উনুনে চড়াবার প্রস্তুতি চলছে। অনন্ত খাটাল থেকে এক বালতি দুধ নিয়ে পৌছাল।

ডাক্তার বৌদি গাছকোমর বেঁধে রান্নার আসর তদারক করছেন। হাঁক-ডাক হুকুম চলছে অবিরত। ঈষৎ পৃথুলা এবং অলসমন্থর শ্রোণীগতির প্রাবল্যে দুলছে। কোমরে দু' থাক মাংস। ঢাকা দেওয়ার অবকাশ নেই। দেবররা লক্ষ্মণ তুল্য।

শম্ভু বাউরী একটি ঢোলক নিয়েই হাজির। রঙ চড়িয়েই এসেছে। সঙ্গে তার দেহরক্ষী। কৃত্তিবাস বাউরী। খাদের টলোয়ান। মাইনার্স টিমের মেম্বার।

জুড়ে দিলো ভাদুগান—

ভাদুর মনে রঙ লেগেছে
শান্তিপুরা শাড়ি পরেছে
আলগা খোঁপায় গাঁদা ফুল
কৃষ্ণ কোমল চাঁচর চুল।
দীঘল চোখে—
দীঘল চোখে কাজল পরেছে
উজল কাজল রঙ ফিরেছে।
শান্তিপুরা—
শান্তিপুরা শাড়ি পরেছে
ভাদুর মনে রঙ লেগেছে।
তেটে-খেটে ধুম, তেটে-খেটে ধুম—
চাডুম, চাডুম।

এক পদ গাইতে না গাইতেই আসর জমে গেল।

রাত দশটা। মাথার উপর চাঁদ উঠেছে। মোরাম রাস্তাটি গেরুয়া নদীর মতো দেখাচ্ছে। দু' পাশে গাছ-গাছালির ছায়া। কেমন অদ্ভুত লাগছে তার মধ্যে হেঁটে যেতে।

শীতের বাতাস বইছে হু হু করে। হাড় পাঁজর কাঁপছে। গৌরী শাড়ির আঁচলটা টেনে গায়ের উপর সাপটে নিল। বেচারীর গায়ে একটা উড়ুনীও নেই। সোয়েটার তো নয়ই।

অনন্ত ওর গায়ে হাত দিলো। বরফের মতো ঠাণ্ডা। হি হি করে কাঁপছে। ঠোঁট দুটো থর থর করছে। দাঁতে দাঁত লাগছে ঠক্ ঠক্ করে। অনন্ত কষ্ট পেল। বলল—গৌরী! তোর খুব শীত করছে নারে?

—খুব!

—আমার গায়ের চাদরটা নিবি?

—তুমি কি গায়ে দেবে?

—আমার গায়ে একটা হাফ সোয়েটার আছে।

—তাহলে দাও।

তুষের চাদর। অনন্তর গায়ের গরম ওম্ জড়ানো। গৌরী পরম আগ্রহে সেটা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিল। এদিক ওদিক ঝুলে পড়েছিল অনন্ত তা ভালো করে সেঁটে দিলো। শীতের উষ্ণতা এবং প্রেমিকের স্পর্শ দুই-ই পেল।

অনন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল। বলল—বাব্বাঃ। বাঁচলাম। ঠাণ্ডায় মরে যাচ্ছিলাম।

অনন্ত বলল—তোর গায়ের চাদর নেই?

—না।

—তোকে যদি একটা নতুন চাদর কিনে দিই তাহলে তুই নিবি ?

—না।

—কেন ? আমার কি তোকে কিছু উপহার দেবার অধিকার নেই ?

—নিশ্চয় আছে। কিন্তু নতুন চাদর তুমি কিনে নিও। এই চাদরটা আমি তোমাকে ফেরৎ দেব না।

—বাঃ রে! এ তো জুলুম!

—হ্যাঁ। জুলুম। খুলে নিতে পারবে ?

—তাই কি বলছি ? কিন্তু উপহার দিতে হলে তো নতুনই দিতে হয়। পুরনো ময়লা চাদর কেন ?

—কেন ? শুনবে—এতে তোমার গায়ের গন্ধ লেগে আছে।

অনন্ত হেসে বলল—বাঃ রে গৌরী। বেশ রোমান্টিক ডায়লগ দিলি তো!

—রোমান্টিক ডায়লগ কি অনন্তদা ?

—তোর মাথা।

—বল না ?

—ওটা ভালোবাসার কথা।

—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁ। তোর বরকে বলবি ?

—বরকে কি বলব অনন্তদা ? সে কি ইংরেজি জানে ? আকাট মুখ্যু—কয়লা কুলি।

অনন্ত মুখে চুক চুক শব্দ করে বলল—আহারে! কি আফসোস!

—আফসোস না ছাই। আমি ওর ঘর করতে যাবই না।

—সে কি ? অনন্ত চমকে উঠল।

—হ্যাঁ তো! দেখতেই পাবে।

কথা বলতে বলতে রেল ফাটক পার হয়ে গেল। বাজারটা তখন নিঃঝুম। সব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। কুকুরগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল। ওদেরকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। শীতের বাতাসে উড়ে যাচ্ছে এঁটো পাতা। কাগজের ঠোঙা।

রাস্তার সেই মোড়াটিতে এসে দাঁড়াল যেখান থেকে ঘন বসতি ধাওড়ার অলি গলি, উঠোন বাদাড় পার হয়ে যেতে হয়। সেখানটা কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার।

গৌরী ওর বুকের কাছাকাছি সেঁটে দাঁড়িয়ে বলল—এবার একাই আমি যেতে পারব।

—ভয় করবে না ?

—না। আর কিসের ভয় ?

—আচ্ছা! তাহলে আমি ফিরে যাচ্ছি।

অনন্ত ফিরতে গিয়েও ওর কাঁধে হাত রাখল। চিবুকটা তুলে ধরল। গৈরী দু'হাতে চেপে ধরল সেই হাতটা।

কেমন বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে বলল—কি?

চিরন্তনী নারীর সত্তা নিংড়ানো শব্দ—কি?

তার অর্থ বোঝার মতো অভিজ্ঞতা অনন্তের নেই। গৈরীর তো নয়ই। তথাপি স্বতঃউৎসারিত ভাবোদ্দীপক শব্দ অনন্তর অন্তর প্রবলবেগে নাড়িয়ে দিলো। কি এক জ্বালা ফেটে পড়ছে শরীরে—মনে!

গৈরী বলল—অনন্তদা! আর তো আমাদের দেখা হবে না।

ওর গলাটা ভাঙা। কণ্ঠস্বরে বাষ্প জড়িত তাপ। অনন্ত জবাব দিতে পারল না। গৈরী বলল—কত সহজ আনন্দে দিনগুলি কাটল। যা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি তাই তুমি আমাদের হাতে তুলে দিলে। না হলে মুনিয়ার মেয়ে কোনো-দিন প্রাইজ জিতে আনবে তা কি ভাবা যায়?

—আর কিছু পাসনি?

—হ্যাঁ। পেয়েছি তোমার ভালোবাসা। কত ঠাট্টা করতে আমাকে। আমি রাগ করতাম। তখন তো তোমাকে চিনতাম না। যখন চিনলাম তখন বুক জুড়ে শুধু তুমি—আর তুমি। তোমার একটা ফটো দেবে। বুকে বেঁধে রাখব। রোজ সকালে উঠে দেখব।

অনন্তর ভিতরে বিরাট কিছু একটা হচ্ছিল। তোলপাড় করা ব্যাপার। ঠিক বুঝতে পারছিল না এটা কিসের অস্থিরতা। কেন এই তাড়না।

—কথা বলছ না কেন অনন্তদা?

ওর হাতটা দু'হাতে করে বুকে চেপে ধরছে। নরম স্তনদুটিতে গভীর চাপ পড়েছে।

অনন্ত বলল—তোর সিঁথির সিঁদুরটা যেন এক রক্তনালা।! যদি ওটা না থাকত—যদি তোর বিয়ে না হতো—তাহলে—

—তাহলে? তাহলে কি বল? কি ভীষণ ব্যাকুলতা!

—স্বপ্ন দেখতাম।

—কিসের?

—বলব না।

—উঃ! কথাটা খোলসা কর অনন্তদা।

বলতে বলতে ওর হাতটা জোড়ে কামড়ে ধরল।

—আঃ! করিস কি? ছাড়—ছাড়। জোর করেই টেনে নিল হাতটা।

—এঃ মা! ছিঃ ছিঃ! তোমার হাতটা নোংরা করে দিলাম।

বলতে বলতে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে দিলো। অনন্ত ওর কাঁধদুটো চেপে ধরল। বলল—কি করে ডিঙোব ঐ রক্তনালা।

তুমি না পুরুষ!

প্রকৃতি ডাক দিয়েছে। পুরুষের সাধ্য কি তাকে উপেক্ষা করে? অনন্তর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। দোলায়মান দ্বিধা জাগ্রত পৌরুষের কাছে পরাভূত হলো। সরে গেল আজন্ম সংস্কারের গাঢ় কুহেলিকা। প্রবলভাবে চেপে ধরল প্রকৃতিকে!

ক্ষণিকের বিমূঢ়তা। চিবুক তুলে গৈরী বলল—কি?

অস্ফুট শব্দ। শব্দের তরঙ্গে অশ্রুত রিমিঝিমি। চিবুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গৈরী। টলটলে চোখের তারায় নিবিড় প্রত্যাশা।

—একটি চুমু দে!

—আঃ—

একটি চুম্বন। বিশাল চৌম্বক শক্তির একটি ঢেউ। দাবদাহী যন্ত্রণার একটি স্ফুলিঙ্গ। অনন্ত রহস্যময় প্রকৃতির বুকে খসে পড়া ফুলের একটি পাপড়ি। দেশ, কাল, জাতি, সমাজ ও সংস্কারের একটি ব্যতিক্রম। নিরয়ন কালচক্রে একটি স্থির মুহূর্ত!

অনন্ত সেখান থেকে চলে গেল ভূতে পাওয়া মানুষের মতো। গৈরী তখন চিরন্তনী নায়িকা। কিশোরীর পূর্ণ কৈশোর যৌবনের তরঙ্গ বিক্ষেপে চঞ্চল। মানস লোকের গহীন অন্ধকারে ঝলকিত দামিনীর উদ্ভাস। অন্তরটা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেল। বাকী রইল কত রাতের স্বপ্ন। কত রজনীগন্ধার সুবাস। মর্মের তিয়াস! অনার্য আকাঙ্ক্ষা!

সতেরো

১৯৫৫ সাল। দামোদর কোল কোম্পানির শতবর্ষ পূর্তি। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান, সভা সমিতির প্রস্তুতি চলছে। অন্যদিকে চলছে শোষণের অবাধ রাজত্ব। এ একটা বিরাট জাল। সারা কয়লাক্ষেত্রব্যাপী বিছানো। রুই, কাৎলা, হাঙর, কুমীর আশায় ওঁৎ পেতে থাকে। চুনোপুঁটিরা ঘুরতে ঘুরতে তাদের মুখে এসে পড়ে। তারাও গপ করে গিলে ফেলে।

সব কলিয়ারীতেই আছেন মালিক, ম্যানেজার, গোমস্তা, ঠিকাদার, সরদার, ক্যাশিয়ার, হাজিরাবাবু, গুদামবাবু। তাদের মাথার ওপর এজেন্ট। ম্যানেজার হতে হলে ম্যানেজারী পাশ করতে হয়। কিন্তু এজেন্ট হবার জন্য তার দরকার নেই। মালিকের আস্থাভাজন চাপরাশী কিংবা খাজাঞ্চীবাবুও এজেন্ট হতে পারতেন। এমন দৃষ্টান্ত ছিল ভুরি ভুরি।

কিন্তু দামোদর কোল কোম্পানি বিলিতী সংস্থা। সেই যখন গরুরগাড়ির

জমানা ছিল, ঘোড়া ছিল দ্রুতগামী বাহন তখন সেই ঘোড়ার যুগে যাদের পত্তন ও বিস্তার শিল্প-বিপ্লবের নামে একশো বছর ধরে ভারতীয় কয়লা ক্ষেত্রের মুনাফাভোগ, তাদের মালিক বলতে কোনো ব্যক্তিকে বোঝাত না। ছিল বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্স। ভারতবর্ষে এক বা দু'জন রেসিডেন্সিয়াল ডাইরেক্টার থাকতেন বাদবাকী সব বিলেতে অথবা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে।

সেখান থেকেই কোম্পানি পরিচালনার নীতি নির্ধারিত হতো। শক্ত সমর্থ বাঁধন থাকত সর্বত্র। এজেন্ট, ম্যানেজার, গোমস্তা, সরদার ও চাপরাশী দিয়ে স্রেফ ডাণ্ডাবাজীর উপর নির্ভরশীল যে প্রশাসন দামোদর কোল কোম্পানী তা থেকে কিছুটা ভিন্ন। যদিও সেই সবই আছে। শুধু একটি লেবার সাহেব নিয়োজিত হয়েছেন ইনটেলেকচুয়াল চামচাগিরির জন্য। আইনত যার নিয়োগ শ্রম কল্যাণের জন্য। প্রথাগত কারণে তিনিই শোষকের পুরোহিত।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই শাসন ও শোষণের ব্যাপারগুলি বুদ্ধি করে চালিয়ে নিতে হয়। একটা সফিস্টিকেটেড ম্যানার্স চাই তো!

পঞ্চাশের মন্বন্তরে এবং পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের কারণে খাদ্যদ্রব্য বাজার থেকে উধাও হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা এবং মুনাফা শিকারী ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীরা তা গুদামজাত করে ফেলেছিলেন। যুদ্ধের জন্য জ্বালানীর প্রয়োজন মেটাতেই হবে। খনি শ্রমিকরা যদি না খেয়ে মরে হেজে যায় তাহলে কয়লা তুলবে কে? এই জ্ঞানটা সব মালিকের টনটনে ছিল। তাই রেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।

তাতে দেওয়া হতো চাল, ডাল, গম, কেরোসিন তেল, সাবান ইত্যাদি। যাকে বলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

কিছুদিন সাবান বস্তুটা বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তাই দেওয়া হতো সাজিমাটি। ঘাম, তেল, কয়লা, বালি মাখা শরীর সাজিমাটি দিয়ে ধুতে হতো। গাগুলি খর খর করত। চামড়া ফেটে যেত। মেয়েরা মাথা ঘসত লাল রঙের চিট মাটি দিয়ে।

দিন বদলে গেছে। মন্বন্তর ফুরিয়ে গেছে। বাজারে চাল ডাল পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু রেশন প্রথা বন্ধ হয়নি। তাহলে যে ডি. ডি., ডি. সি., মজুতদারের শিরে সংক্রান্তি। অবিরল স্রোতাধারায় পুষ্ট ঝর্ণা। তার ভাগ সবাই পায়। এজেন্ট থেকে রেশনবাবু পর্যন্ত।

সব কোম্পানীতে রেশন সাপ্লায়ের ঠিকাদার থাকত। বাজারদর মোতাবেক দাম পান তিনি। সরবরাহ করেন বাজারের অবিক্রীত মাল, তার সঙ্গে পাইল হয় যুদ্ধের সময়ের গুদামজাত মাল। মিশ্রণের অঙ্কটা ভালোই বোঝেন।

শ্রমিকরা সেই মাল নিতে বাধ্য থাকে। ফলত কুলি ধাওড়ায় যখন ভাত রান্না হয় তখন এক বিটকেল দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে যায়। ওদের পাকস্থলী

কি দিয়ে তৈরি তা ভগবান জানেন। কিন্তু কি আশ্চর্য তার জন্য বিক্ষোভ হয় না। শ্রমিকরা হয়তো মনে করে এর চেয়ে ভালো মাল পয়দা হয় না।

পবন এখন রেশনবাবু। একদা লেবার সাহেব হতে গিয়ে ল্যাজে গোবরে হয়ে এসে রেশনের দৌলতে জিন্দেগীর রোশনাই পাল্টে নিয়েছেন। তাঁর উপরওলা ডি. সি. সাহেব।

ওহো! কি অপূর্ব মনিকাঞ্চন সংযোগ।

সুমিতবাবু এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক দিন থেকে ভাবছিলেন। কিন্তু আন্দোলন যে করবেন তার মতো জনমত চাই তো! এই নিয়ে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। তাঁরাও আন্দোলনের পক্ষপাতী? কিন্তু কিভাবে?

এই সূত্রেই একদিন তিনি রেশনবাবুকে বললেন—আপনারা রেশনে যা দিচ্ছেন তা কি গরু ছাগলেও খেতে পারে?

উনি বিনয় দেখিয়ে হাত কচলে বললেন—কি বলবো ভাই? যেমন সাপ্লাই আসছে তেমনি দিচ্ছি। আমার তো জমিদারী নেই যে চাষের চাল এনে দেবো।

—থামুন। জমিদারী থাকলে আর চাকরী করতে আসতেন না। জমিদারী বানাবার জন্যই এসেছেন।

—বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছেন।

হ্যাঁ। আমার কথা এই রকমই। মনে রাখবেন কুলি কামিনরাও মানুষ। ভালো মাল না দিলে ফল বুঝবেন। বারমান সাহেবের জমানা ফুরিয়ে গেছে।

ওর শক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে পবন লেজ গুটিয়ে পালালেন।

বিকেলেই ডি. সি. সাহেবের অফিসে সুমিতবাবুর ডাক পড়ল। অনন্ত তখনই খাদ থেকে উঠে এসেছে। নাওয়া খাওয়া হয়নি। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। কয়লা কালিতে মুখটা বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে।

সুমিতবাবু বললেন চল অনন্ত! আজ ডি. সি.-র সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। অনন্ত তৎক্ষণাৎ ওর সঙ্গ নিল।

ডি. সি. গম্ভীর মুখে বসে আছেন। ` মতবাবুকে বসতেও বললেন না। উনিও বসলেন না। মনে মনে উষ্ণ হয়ে উঠলেন। বললেন, কি ব্যাপার দেবুদা! হঠাৎ তলব কেন?

—তুমি খুব বাড়াবাড়ি করছ সুমিত।

—কিসে দেখলেন?

—আজ পবনকে শাসিয়েছো?

—শাসাইনি ঠিক। তবে রেশনের মালটা সাপ্লাই যাতে ভালো হয় সে কথা বলেছি।

—দ্যাখো এটা তোমার বিজনেস নয়।

—বিজনেস নয়। প্রয়োজন। মানুষের প্রয়োজন।

অনন্ত বলল—ঐ চালের ভাত কি কেউ খেতে পারে ? জঘন্য অখাদ্য !

—এসব ব্যাপারে তুমি কেন নাক গলাচ্ছো অনন্ত ?

—আপনিই বা কেন উল্টো গাইছেন ?

—তুমি বুঝবে না। এটা আমার ডিউটি।

—খারাপ মাল সাপ্লাই দেওয়া ?

উনি উষ্ণ হয়ে উঠলেন। যদিও স্ত্রীর নিষেধ আছে অনন্তর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে তবু ওর অহংকার আক্রান্ত হওয়ায় বেতাল হয়ে গেলেন।

বললেন—সুমিত ! এই ছেলেগুলির মাথা খেয়ে বসে আছো।

সুমিতবাবু বললেন—ছেলেটার মাথা আপনার আমার চেয়েও সাফ। দিন কয়েক পরে আপনারই না মাথা খেয়ে বসে।

—তাই দেখছি। পেকে ঝুনো হয়ে গেছে। এদিকে মুখ টিপলে দুধ বেরুবে। গায়ে আঁতুরের গন্ধ যায়নি।

তেমনি কৌতুক কটাক্ষে এক পলক তাকিয়ে সুমিতবাবু বললেন—আপনারই তো স্বজাতি কুটুম্ব। দেখুন না মেয়ের পাত্র হিসেবে বেছে নিতে পারেন কিনা ? ছেলে ভালো। মানাবেও বেশ। এবং হয়তো আপনার মেয়েটিও এ প্রস্তাব লুফে নেবে।

উনি গর্জন করে উঠলেন—সুমিত ! তুমি কি আমাকে অপমান করতে কোমর বেঁধে এসেছো ?

—ঠিক উল্টো ! আপনিই আমাকে অপমান করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু দেবুদা, বাজারের যত রিজেক্ট মাল নিয়ে যে শ্রমিকদিকে দিচ্ছেন এ খবর হয়তো আপনার চীফ মাইনিং ইনজিনিয়ারও জানেন না।

—তবে যাও। তাঁর কাছেই দরবার কর গে।

—সেটা আপনি না বললেও করবো।

—অলরাইট ! তবে জেনে রেখো আমার স্টাফদিকে যদি শাসাও তাহলে আমাদেরও শাসাবার উপায় আছে।

সুমিতবাবু তিক্ত কণ্ঠে বললেন—তা আবার নেই ? বিশাল ঠাঙাড়ে বাহিনী পুষে রেখেছেন। একশো বছর ধরে শ্রমিকদের বুকে স্টিম রোলার চালাচ্ছেন—এসব কি জানি না ?

—তবে আবার কি ? মনে রাখলেই মঙ্গল। যাও—ফালতু তর্ক করো না।

সুমিতবাবু ও অনন্ত চলে আসছিল। উনি আবার অনন্তকে ডেকে বললেন—দেখো অনন্ত, তুমি একটা ব্রাইট স্টুডেন্ট। তোমার সম্ভাবনা আছে। সুমিতের সঙ্গে ঘুরে কেন তা নষ্ট করছ। ওর সঙ্গে গাঁটছড়াটা কাটাও। সুমিতবাবু জনান্তিকে বললেন—তারপর গাঁটছড়াটা ওর মেয়ের সঙ্গে বেঁধো।

ডি. সি. সাহেব তা শুনতে পেলেন কিনা কে জানে কিন্তু অনন্তর খুব খারাপ

লাগল। বলল—ঐ একটা কথা বলে ওকে কেন খোঁটা দিচ্ছেন দাদা? এটা ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়ে যাচ্ছে নাকি?

—তা ঠিক। তবে এটাই ওর মনোবাসনা। তুমি ইচ্ছা করলে অনায়াসে এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারো। তাতে দামোদর কোল কোম্পানীতে তোমার চাকরি-বাকরিতে আয় উন্নতির নূতন দিগন্ত খুলে যাবে। আফটার অল এই ঘুঘু সাহেবগুলির কোম্পানীর উপর তলায় খুব কদর।

অনন্ত জবাব দিলো না। মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে মেসে ফিরল। স্নান করে ভাত খেতে বসে গেল। কখন সেই সকাল সাড়ে সাতটায় চারটি পরোটা, তরকারি ও গুড় দিয়ে জল খাবার খেয়ে খাদে গিয়েছিল।

সেটা ১৯৪৭ সাল। সোদপুরের বটতলায় বসে জনাকয়েক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা খনি শ্রমিকদের জন্য আন্দোলনের একটা কর্মসূচী গ্রহণ করছিলেন। বেতন, ভাতা, বোনাস, ভবিষ্যনিধি, বার্ষিক সবেতন ছুটি, চাকরির স্থায়িত্ব, চিকিৎসা, জল সরবরাহ, শিক্ষা, কাজের সময়সীমা, কয়লাটবের সমতা ইত্যাদি সতেরো দফা দাবিপত্র পেশ হয়েছিল। সরকারী হস্তক্ষেপের দরুন তা নিযে প্রথম বোর্ড অফ কন্‌সিলিয়েশন বা আপস মীমাংসা পর্যন্ত। তাতে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সরকারী আমলা, কোল কোম্পানীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।

ফয়সালা একটা হয়েছিল। কাট-ছাঁট, দর মোলাই করে নীতিগতভাবে ট্রেড ইউনিয়নের দাবি-দাওয়া কিছুটা পূরণ করা হয়েছিল। তার দরুন একজন মালকাটা গাঁইতি দিয়ে কয়লা কেটে ছত্রিশ ঘনফুট কয়লা টব গাড়িতে বোঝাই করার মজুরি দাঁড়াল—মূল বেতন আট আনা। পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধিজনিত চার আনা। ভাতা একশো পঞ্চাশ শতাংশ এক টাকা দু'আনা এবং খাদ্য সঙ্কটের দরুন চালু রেশন বাবদ ছয় আনা। সাকুল্যে দু' টাকা চার আনা। তাতে ভবিষ্যনিধি কাটা যেত সওয়া শতাংশ হিসেবে নয় পয়সা।

দিন হাজরীর শ্রমিকদের মূল বেতন দৈনিক আট আনা। ভাতা—বারো আনা। রেশন বাবদ ছয় আনা। সাকুল্যে এক টাকা দশ আনা। মহিলা শ্রমিকদের তার চেয়েও কম।

স্মিতবাবু ফাইল খুলে হিসেব-নিকেশ করতে করতে বললেন—আমরা রেশন তো নাও নিতে পারি। কোম্পানী তার দরুণ ছয় আনা পয়সা দিয়ে দিক। বাজার থেকে মাল কিনব। দাম দু' পয়সা বেশী লাগবে কিন্তু মাল ভালো পাবো। পচাধসা জোয়ার বাজরা চাল গম খেয়ে যে পেটের অসুখে ভুগে ভুগে লোকগুলি ফুরিয়ে যাচ্ছে তা থেকে বাঁচবে।

—বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

—আমরাই বাঁধবো।

—শুনলেই তো সাহেবরা সব খাপ্পা হয়ে যাবে। তখন শুরু হবে শ্রমিক নির্যাতন।

অনন্তর আশঙ্কা অমূলক নয়। তা সুমিতবাবু জানেন।

বললেন—তা তো হবেই। তার মোকাবিলাও আমাদিকে করতে হবে। ব্রিটিশরা নির্যাতন কম করেনি। তা দিয়ে তো গণ-আন্দোলন রোধ করতে পারেনি। তেমনি গণআন্দোলন যখন শুরু হবে তখন কোথায় হারিয়ে যাবে ডি. ডি., ডি. সি., বারমান, পডিস, গুপ্তা, ভাবা, তেওয়ারী, পাণ্ডে, সিং, লালা।

অতন্ত বলল—তাই যেন হয় দাদা।

আঠারো

অনন্তর এখন গৈরী ছাড়া দেবী নেই। ডায়েরি লেখার শুরুতেই সে গৈরী বন্দনা সেরে নিল। পারলে-উলফৎ, জিন্দেগী, মুহব্বৎ, ঘুঙ্ঘট, ছুনরী, পায়েল, পয়োধর ইত্যাদি শব্দ ঘেঁটে একটা গজল লিখে ফেলত। কিন্তু এত এলেম নেই।

তারপর লিখল এই সময়টাই কয়লা শিল্পের এক ক্রান্তিকাল, স্বাধীনতার পর ভারত গঠনের প্রয়াস শিল্প বিপ্লবের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি সজাগ হয়ে উঠেছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট বড় মাঝারি নানা শিল্পোদ্যোগ শুরু হয়েছিল সরকারী ও বেসরকারী পরিচালনায়।

ভারতের রূর এলাকা বলে খ্যাত আসানসোলকে ঘিরে আমলাদহির সাঁওতাল পাড়া উঠিয়ে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্থান কেবলস, কল্যাণেশ্বরীর উপরে বরাকর নদে মাইথন ড্যাম, দুর্গাপুর ফরিদপুরের জঙ্গলে ব্লাস্ট ফার্নেস, কোক-ওভেন, বার্নপুরের এক্সটেনসন এসব তো হচ্ছিলই সেই সঙ্গে চালু হচ্ছিল নতুন নতুন কয়লা কুঠি।

১৯২৬ সালে যে ইন্ডাস্ট্রিয়েল ডিসপিউট অ্যাক্ট পাশ হয়েছিল তার হাওয়া এতোদিনে এসে পড়ল কয়লা শিল্পে, মাঝে রয়ে গেছে আঠাশটি বছর। তীব্র মন্দা ও সুতীব্র স্বাধীনতা সংগ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ এবং স্বাধীনতা এতসব বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কয়লাখনির কয়েক লক্ষ শ্রমিকের অন্ধকূপে জীবন যাপন নিয়ে ভাববার অবসর কারো ছিল না।

দেবেন সেন এসেছেন সেই ভাবনা নিয়ে। প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্মী। কয়লা কুঠিতে শ্রমিকদিকে সংঘবদ্ধ করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আপ্রাণ চেষ্টায় লেগে আছেন। কিন্তু কুলিকামিনরা এমন ধাতু দিয়ে তৈরি যে একটা প্লাটফর্মে, একটা পতাকার নীচে দাঁড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না।

বড় সাহেব তো অনেক দূরের মানুষ। ডি. ডি., ডি. সি. কটকট করে তাকালে কাপড়ে পেচ্ছাব করে ফেলে। ধাওড়ায় একটা চাপরাশী এলে বাচ্চা থেকে বুড়ো

পর্যন্ত সবারই বুক ধরফড় করে। ভিতরে আগুন বলে কিছু নেই। মনের ব্যাটারী কখনো চার্জ হয় না। বেবাক ড্যাম্প হয়ে গেছে। সেলগুলো বিলকুল ড্যামেজ।

একে কি করে জাগাবে? কি করে বোঝাবে এক টাকা দু' আনা মজুরি আর ছ'আনার পচাধসা রেশনে সংসার চলে না। ভাত চাই, কাপড় চাই, মাথা গুঁজবার ঠাঁই, শিক্ষার সুযোগ।

চাওয়া পাওয়ার এই বোধটাই ওদের নেই। কতটুকু পেলে একটা শ্রমিকের চলতে পারে তাই তারা বোঝে না।

আসলে ওরা জীবন ধারণ করে ভীষণ ভয়ের জগতে। আরা, বালিয়া, ছাপরা দেওরিয়া, রায়পুর, বিলাসপুর, মুঙ্গের, মধুপুর, ভাগলপুর, বেনারসের দূর দূর গ্রামাঞ্চল থেকে যারা কয়লাকুঠির শ্রমিক রাজপুত, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভূমিহার-জমিদার জোতদার মহাজন ও ব্যবসাদারের কুক্ষিগত তাদের জমি, জিরেত, হাল, ফাল, বলদ, মোষ। ওরা শুধু শ্রমিক জোয়ার, বাজরা, পচাগম খেয়ে গায়ের ঘাম রক্ত ঢেলে দেয়। মেয়েদের যৌবন সুদের দায়ে বন্ধক থাকে।

তাই ইউনিয়ন করতে গিয়ে যদি চাকরী চলে যায় তবে ঐ সব চশমখোর খুন পিয়াসীদের পাল্লায় গিয়ে পড়তে হবে। যদিও খুন পিয়াসীরা কলিয়ারী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে অনেক আগেই।

তারা সব বাবু চাপরাশীর চাকরী করে। সুদ ও দুধের ব্যবসা করে। মালিকের হুকুমে শ্রমিকের ঘাড়ে ডাণ্ডা মারে। তবু তার মধ্যেও যৎসামান্যই হোক মজুরি তো পায়। দেশ গাঁয়ে যে তারও উপায় নেই।

কাজেই আন্দোলন যদি করতে হয় তবে সবারই আগে ভয়কে জয় করতে হবে। এক জুজুর ভয়ে যে বেসামাল অবস্থা তার পরিবর্তন চাই।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেল একজোড়া কবুতর কবুতরী তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। বারান্দায় বেরিয়েই দেখতে পেল রামধনি দাঁড়িয়ে আর শাড়ি পড়া একটি মেয়ে থামে ঠেস দিয়ে বসে। তার পাশে একটি গোলাপ ফুল আঁকা টিনের স্যুটকেশ এবং চটে বাঁধা একটি পুঁটুলি। হয়তো বা বেডিং।

রামধনি ওকে সেলাম করল—সেলাম বাবুজি!

—কি হে? দেশ থেকে ফিরলে বুঝি?

হাঁ বাবুজী? আপনা জরুকো লে আওলবাঢ়ে। আঙুল বাড়িয়ে লালশাড়ি ঢাকা মেয়েটিকে দেখিয়ে দিলো। অনন্ত সেদিকে তাকাতেই মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখতে পেল একটি নাক ও নোলক। বাকীটা ঘোমটায় ঢাকা।

অনন্তর তদবির সুপারিশে রামধনি এখন বছরে একবার করে ছুটি পায়। তাতে যে তৃষ্ণা মেটেনি সে তো বউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা দেখেই বুঝতে পেরেছে।

বলল, ঠিকেই কিয়া।

—আর বাবুজী হামকো থোড়া মদৎ করিয়ে।

—ক্যা মদৎ—বলো ?

এই রামধনিকে দিয়েই ও লোডারদের ব্যূহভেদ করেছে। না হলে জবরদস্ত সরদার এতোয়ারীর দলে ঢুকে অত তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করা এবং বেশ কিছু সংখ্যক লোডারকে ইউনিয়নের মেম্বার করা সহজ ব্যাপার ছিল না। এখনো রামধনি অন্যান্য দলের লোডারদের মধ্যে খুব গোপনে প্রচার চালাচ্ছে। তাকে মদৎ দেওয়া অনন্তের নৈতিক দায়িত্ব।

রামধনির চাহিদা সামান্যই। বউকে রাখবার জন্য একটা চার দেওয়ালের আড়াল ও মাথার উপর একটি ছাউনী।

অনন্ত বলল ছুটি যাবার আগে যদি একথা বলতে তবে এতদিনে কিছু করতাম। হঠাৎ যে বউ নিয়ে এলে তা এখুনি কোথায় থাকতে দেবো ? ও বলল—নেহী বাবুজী। জলদি বাজীকো কুছ নেহী। দু' দশ রোজ কোই দোস্ত, রিস্তেদারকো পাশ গুজর লেব।

—তবে ঠিক আছে। আমি ডি. ডি. সাহেবকে বলছি যেয়ে।

ওর বউ উঠে এসে দূর থেকে গড় হয়ে প্রণাম করল। তারপরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। আগে আগে রামধনি। ওর কাঁধে স্যুটকেশ। হাতে চটের পুঁটুলি।

কলিয়ারী গিয়ে অনন্ত প্রথমেই রামধনির জন্য দরবার করল। উনি বললেন —এই মালগুলিকে কোথা থেকে জোটাও অনন্ত ?

কটির ব্যবস্থা করবে ?

—এইটার তো করে দিন।

অনন্তর কথা উনি ঠেলতে পারেন না। তাই গুদামে টিপ করে করে দিলেন এককাহণ খড়, দু'কেজি রকুই দড়ি, এক কেজি পেরেক দশটি রোলা কাঠ আর ছয়টি কাঁচা বাঁশ। খাদ থেকে একটা মিস্ত্রীও ব্যবস্থা করে দিলেন।

রামধনি তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মাটির দেওয়াল দিয়ে ঐসব পালপত্র চড়িয়ে নিজের একটা ছোট ঘর বানিয়ে নিল। ব্যস স্বপ্ন সার্থক। ছোটাসা ঘর হোগী বাদলো কো ছাউনী।

ওর বউ বাসমতী নূতন করে বাসর শয্যা পাতল। এতদিনে তাদের শোবার জন্য একটা ঘর হলো। না হলে কি দেশে কি কলিয়ারীতে স্বামী স্ত্রী যে একটা রাত এক বিছানায় শোবে তার জো ছিল না।

ভাব ভালবাসার প্রাকৃতিক প্রয়োজনটুকু মেটাবারও ঠাঁই ছিল না। অন্ধকার ছাড়া আড়াল ছিল না। ছাঁচতলে, বাদারতলে মিলন হতো। তাও সদাই শঙ্কা পাছে কেউ দেখে ফেলে।

তারা অনন্তকে প্রণাম করবে না তো কাকে করবে ?

এদিকে গৈরী তখন বিরহিনী। এক চুম্বনের ঠ্যালায় দশ দশার বিকার।

লেখাপড়া দায় হয়েছে। গুলু যে কত কষ্টের টাকা দিয়ে ওর জন্য নতুন বই কিনে দিয়েছে তার পাতায় পাতায় অনন্তেরই ছবি দেখে ও। খাতাতে প্রেমপত্র লেখে—শ্রীচরণ কমলেষু সম্বোধন করে। কিন্তু কোনো চিঠিই দিতে সাহস হয় না। খাতার পাতাতেই থেকে যায়।· যদি কখনো সুযোগ পায় তবে খাতা শুদ্ধ অনন্তকে দিয়ে বলবে—তুমি বড় নিষ্ঠুর। এইগুলো পড়ে দেখবে আমি তোমার জন্য কেমন করে মরে যাচ্ছি।

কি ভাগ্যিস এসব দেখবার লোক নেই ওদের বাড়িতে। কেউ তো আর লেখাপড়া জানে না। বাংলা তো নয়ই।

বিরহে হা হুতাশ করার সুযোগও অনেক। বাপে তিনপালিতে ঘুরে ঘুরে ডিউটি করে। ঘরের চেয়ে চবুতরাতেই থাকে বেশী। ওর মায়ের বরাবর দিনপালি।

সেজন্য রান্না বান্নার ব্যাপারটিও সরল। ভোরে উঠে ভাত চড়িয়ে ঘাটে যায়। ফিরে এসে ডাল তরকারি রাঁধে। তারপর ঘরগুষ্টি খেতে বসে যায়। সকাল আটটার মধ্যেই একটা পাট চুকল। হাঁড়িতে রইল কিছু ভাত তরকারী। ছেলেমেয়েদের ক্ষিদে লাগলে নিজেই নিয়ে খাবে।

বাপ মা তো ডিউটি বেরিয়ে গেল। বেলা দশটা নাগাদ ছোটদেরকে খাইয়ে দাইয়ে সেও বই বগলে স্কুল চলে যেত।

গুলু ও গোবিন শালা ভগ্নীপতি। দুজনেই সঙ্গীত শিল্পী। কাজেই ভাব-রাগটা বরাবরই জম্পেশ?

এখন ফাল্গুন মাস। সামনে ফাগুয়া। তাই ওরা দুজনে এক রবিবারের দুপুরে ডিসেরগড় হাটে এসেছে সওদা বেসাতি করতে। আসতে আসতেই গলা খস খস করছিল। তাই এক প্রাইভেট ভাটিখানায় ঢুকে পড়েছে। এসব সুলুক সন্ধান ওদের ঠিক জানা আছে।

মাল-ফাল নিয়ে মুড়ি-কলাই ভাজা দিয়ে বেশ আয়েস করে খাচ্ছিল। নেশাটাও জমে উঠেছে। তখন এল মনিলাল। সঙ্গে তার বউও আছে। ওরাই গৌরীর শ্বশুর-শাশুড়ি।

গুলুকে দেখেই মনিলালের কুটুম্ব পীরিত জেগে উঠল। গোবিনের একদা পরিত্যক্তা বউটি তার সামনেই হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল মদের বাটিটি নিয়ে। এক নারী তিন পুরুষ। সম্পর্কটা হাসি-ঠাট্টার। অতঃপর আসর জমে উঠল। বিয়াই-বিয়ানের সঙ্গ পেয়ে গুলুও খুব খুশী। খরচ-খরচার হিসেব কে করে? ঝনাৎ ঝনাৎ পয়সা ফেলছে আর মদ কিনছে।

মনিলালের বউ বলল—বিয়াই! কতদিন আর বিটিটিকে ঘরে পুরে রাখবি? ঈ-বারে গাওনা করাঞে দে।

গুলু চোখ পিট পিট করে বলল—গাওনার তো খরচ আছে।

—সে তো আছেই।

—তারপর আমার বিটি পড়ালিখা শিখছে।

—সে শিখুক ক্যেনে ?

—আর দু-বছর পরে ম্যাট্রিং পাশ করবেক।

—ওঃ বাব্বা। তাকে আবার বেটাটি আওয়ারা হঞে যাবেক।

—তা ক্যেনে হবেক ?

—হবেক নাই ক্যেনে ? জুয়ান বয়েস। তুর বিটিটিও তো ছুটু নাই। উও তো ডাগর হঞেছে। বেশি দিন ঘরে পুষে রাখলে রীত-প্রীত বদলে যাবেক।

—অমন কথা বলিস না। আমার চাঁদের পারা বিটি। মস্ত বুঝিলদার।

বিয়াই বিয়ান পালা করে কথা বলছে। গুলু একা। তাই গোবিন যোগান দেবার জন্য বলল—দুটা বছর পড়তে দে। ম্যাট্রিং পাশটি করুক। একটি নাম থাকবেক লুনিয়া ঘরের বিটি পাশ করেছে।

মনিলালের বউ ঝেঁঝে উঠল—অমন কথা বলিস না। দু বছর আমি ঘরের বউকে বাপের ঘরে থাকতে দিব নাই।

গুলু বলল—তাই বলে তুরা নিঞে যেঞে আমার বিটিকে ডিপুতে কামিনের কাজ করাবি নাকি ? সেটি হবেক নাই।

—আগে পাঠাঞেই গ্যাখ—আমরা কি করি ?

—ঘরে যেঞে বুঝাবুঝি করতে হবেক তো।

—সে করগা। কিন্তুক বলে দিছি এই বোশাখ মাসে গাওনা করতে হবেক।

গুলুর নেশা কেটে গেল। এই তো ফাল্গুন। বোশেখ মাসকে দেরি কোথায় ? এরই মধ্যে অত টাকাকড়ি পাবে কোথায় ? পয়লা প্রথম মেয়ে দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি যাবে। তাকে কাপড়, চোপড়, গয়নাগাঁটি দিতে হবে। তারপর কুটুমদিকে ভোজ।

বলল—থাম। টাকাকড়ি যোগাড় হোক !

—তার লেগে বসে থাকব নাকি ? আঘন মাসে যে খবর পাঠাঞেছিলাম তখন যোগাড় করলি নাই ক্যেনে ?

মনিলালের চেয়ে ওর বউয়েরই জিভের ঝাল বেশি। গোবিন একটা সমঝোতা করার জন্য বলল—টাকা তো বললেই আসবেক নাই। আরও দু'চার মাস সবুর কর ক্যেনে ?

—তুর কথাতে ? কুনু দাম আছে তুর কথার ? মনে করে গ্যাখ ঈ-মাসে লয় উ-মাসে করে দু-বছর ঝুলাঞে আমার বাপকে বিদায় করে দিঞেছিলি। আমার জীবনে বিয়ালা পুরুষের ঘরকন্নাও হলো নাই, গাওনাও হলো নাই। সেই যখন ল্যাঙ্গা করতেই হলো আগেই জবাব দিতিস তবে দু'বছর আগে আমার ঘরকন্না হতো।

কতকাল আগেকার কথা নিয়ে এমন ঠোক্কর দিলো যে গোবিনের আর রা বেরুল না। তুষের আগুন আর কাকে বলে ?

মনিলাল বলল—সে যা হবার হঞেছে। বল বিয়াই তুর কি মতলব ? বৈশাখ মাসে গাওনা হবেক ?

—তা কি করে হবেক ?

ওর বিয়ানের নেশাটা বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই চুড়ি বাজিয়ে ঝনঝন করে বলল—তা ক্যেনে হবেক ? বিটিকে লেখাপড়া শিখাছিস। বড়লোক নাগর ধরবেক। পয়সা কামাবেক। গাওনা করাতে যাবি ক্যেনে ?

গুলুর ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল ! গর্জন করে উঠল—খবরদার ঈসব কথা বলিস না। সীতার পারা বিটি আমার। তার নামে যদি বদনাম দিস তবে খেঁকালে মুখ ভেঙে দিব। শ্যালা বেজন্মা ম্যেয়া এই জন্যে তুর বিয়ালা পুরুষের ঘর হয় নাই।

ও উঠে পড়েছিল। মনিলাল হাত ধরে বসাল। নিজের বউকেই ধমকি দিলো—শালী তুঁই বাৎ করতে জানিস না। ঐ বিটি ছোলাটি এসে আমার ঘরের বহু হবেক। তার নামে বদনাম।

মাতালের ঝগড়া লাগু হয়ে গেল। তারপর বেধড়ক খিস্তি খেউড় ! অবশেষে গোবিনের মধ্যস্থতাতেই আপাতত মিটল।

কথা হলো বৈশাখ মাসে মনিলাল একবার গুলুর ঘরে আসবে গাওনার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে।

তারপরে মনিলাল ওর বউকে ধরে ধরে নিয়ে গেল। ওর চলবারও সাধ্য নেই।

গুলুর পকেট ফাঁকা হয়ে গেছে। সওদাবেসাতি মাথায় উঠল। মুখ আঁধারী সন্ধ্যায় খালি হাতে ঘরে ফিরল।

তাই দেখে হেনী একেবারে রণরঙ্গিণী। এই মারে কি সেই মারে। ঝাঁটা হাতেই লম্ফঝম্প।

যতই হোক গোবিন ওর বড় ভাই। তাই সে যখন বলল—গৈরীর শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে মদ দোকানে দেখা হলো। কুটুমের খাতির রাখতে হবেক তো। উয়ারা কত দূর থেকে আসছে। তাথেই গুলুর পয়সাকড়ি খরচ হঞে গেল।

—খুব হঞেছে। খাবি ঈ-বারে উনানের ছাই। তীব্রকণ্ঠে গরল উগরে দিয়ে চলে গেল।

খাবার সময় করেও দিলো তাই। গুলু ছিল চবুতরায়। তাকে ডাকলই না। ছেলে মেয়েগুলিকে ভাত বেড়ে দিয়ে নিজেও এক থাল নিয়ে বসে পড়ল।

গৈরী বলল—ঈ বাবা। বাপুকে যে দিলি নাই।

—উয়ার খাবার কি দরকার ? দমে মদ খেঞে এসেছে।

—ধন্যি মা তুই ! কি করে খেতে রুচছে ?

—আঃ বাপ স্থয়াগী ! বুক টাটাছে। অত যদি দরদ তবে খাওয়াগা।

—খাওয়াবই তো।

হন হন করে চলে গেল। হেনীর তাতে বিকার নেই। কোঁৎ কোঁৎ করে ভাত গিলতে লাগল।

চবুতরায় তখন রবিবারের মাইফেল। ফাগুয়ার গান চলছে। ছেলেমেয়ে-বৌঝিরাও জুটে গেছে। বসবার জায়গা নেই। গায়ে গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে। ওকে দেখে ফাল্গুনী কাছে ডাকল। বৈশাখী ও কুন্তী সরাসরি করে বসবার জায়গা করে দিলো।

বসতে বসতে গৈরী বলল—বাপুকে ডাকতে এসেছিলম খাবার লেগে।

—থাম তো। সারা রাত বাকী খেলেই হবেক।

গৈরীর মনটা উসখুস করছিল। তারপর সেও গানে স্থর মিলিয়ে দিলো। চলছে তো চলছেই ! আসর ভাঙতে রাত বারোটা।

গৈরী ওর বাপের হাত ধরে ঘরে এল। তখন বেবাক অন্ধকার! লম্ফ জেলে রান্না ঘরে ঢুকল। অবশিষ্ট ভাত তরকারি ছুটি থালায় বেড়ে নিয়ে এল।

গুলু বলল—ঈ-কি বিটি ? তুঁই খাস নাই।

—না বাপু। মা বড় রেগে গেইছে।

ভাতের গ্রাস মুখে তুলে গুলু বলল—উ রাগলে কি হবেক ? তুর শাশুড়ী আবার আরো। বলছে বৈশাখ মাসেই গাওনা করতে হবেক।

গৈরীর ভিতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। আর্তকণ্ঠে বলল—এই বাবা !

—হঁ। বললল অখন টাকাকড়ি নাই তো সাতঝুড়ি কথা শুনালেক।

—শুনাক গা। উরাদিকে বলে দিবি—আমি শ্বশুর ঘর করব নাই।

—অমন কথা বলতে নাই বিটি।

—হুঁ। ভাং মুখ্যুর ঘর করব ন'কি ?

—কি করবি ? বিয়ার সময় জানি নাই।

—ক্যেনে আমার শাশুড়ীর ত স্যাঙ্গার সংসার। আমি ম্যাট্রিক পাশ করে লিই। তারপরে লেখাপড়া জানা কারুর সাঁথ স্যাঙ্গা দিবি। বিয়ালা পুরুষের ঘর নাই বা করলম। উয়াদিকে জবাব দিঞে দেগা।

—না বিটি। অমন কথা মনে আনিস না। আজ দশ বছর যার নামে সিঁতুর পরছিস তা ক্যেনে পুঁছবি ? তুর কপালে মুখ্যু বর লেখা আছে তো কি করবি ?

—কপালের লেখা আমি উল্টাঞে দিব। তুকে আবার বলছি অমন শ্বশুর ঘরকে আমি যাব নাই।

রাগে রাগে উঠে পড়ল ! মধ্যবিত্ত ঘরের নেকু মেয়ে নয় ও। বাপকে এত ভালোবাসে যে তার কাছে মনের কথা লুকোবারও প্রয়োজন বোধ করে না। একদা বাল্যকালে যেমন জামা কাপড়, খেলনার জন্য আবদার করত আজ তেমনিভাবেই বিয়ে ভাঙার আবদার করে।

উনিশ

অনন্তর পিসীমায়ের নাম অন্নপূর্ণা। সর্বদাই প্রসন্নময়ী। বয়সটা অনন্তর চেয়ে ছ'সাত বছর বেশী, পরস্পরের স্নেহ ভক্তির সম্পর্কটিও নির্মল। আবার হাসি ঠাট্টা খুনসুটিও করে। ডি. সি. সাহেবের নিমন্ত্রণে তিনি এসেছিলেন কল্যাণীকে দেখতে।

কুটুম্বিতা সেরে ওরা হগুনিয়া মোড়ে বাস ধরতে যাচ্ছেন। পিসেমশাইয়ের লম্বা পা। আগে আগে চলছেন। পিসীমা আস্তে আস্তে। অনন্ত তার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল পিসীমা ?

—কিরে ?

—তোমরা এ ব্যাপারটা নিয়ে এগিয়ো না।

—কেন রে ? অমন সুন্দরী মেয়ে।

—তাতেই তো আরো বেশী ভয়।

—কেন ? স্বভাব চরিত্রের দোষ আছে নাকি ?

—না পিসীমা। পরের মেয়ের দোষ দেবো কেন ? মেয়েটি সত্যিই ভালো।

—তাহলে অমত করছিস কেন ?

—আমাকে পাশ টাশ করতে দেবে তো ? নীতুর বিয়ে হবে তবে তো ?

—সেসব কথাও হয়েছে। একটা কথাবার্তা ঠিক করে রাখা। মেয়েটিও ম্যাট্রিক পাশ করুক। তুইও ম্যানেজারী পাশ কর। নীতুর বিয়ে হোক তারপর হবে। দেনা পাওনার কার্পণ্য করবে না। শুধু একটা পাকা কথা চাইছেন।

অনন্ত কাঁদো স্বরে বলল—হেই পিসীমা তোমার পায়ে পড়ি, কোনো কথা দিয়ে বেসো না।

অন্নপূর্ণা দেবী দাঁড়িয়ে পড়লেন। অনন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন কেন এত অমত করছিস অনন্ত ?

অনন্ত একটু থেমে সময় নিয়ে বলল—তোমরা যে ভাবছো অনন্ত পাশ করে ম্যানেজার হবে তা এখন হচ্ছে না পিসীমা। আমার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিও না।

—সে কি রে ? তাহলে কি করবি তুই ?

—কাউকে যদি না বলো তাহলে বলবো।

—বল। কাউকে বলবো না।

—কলিয়ারীর শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা আমি সহ্য করতে পারছি না। সেজন্য

শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছি। সামনে বিরাট সংগ্রাম। আমি যে হারিয়ে যাবো না ফুরিয়ে যাবো তার নিশ্চয়তা নেই। এ সময়ে কেন একটা ফুলের মতো মেয়ের মনে ধোঁকা দেবো বলো? আমি কারো স্বপ্ন ভঙ্গের কারণ হতে চাই না পিসীমা।

অন্নপূর্ণা দেবী আশ্চর্য হলেন না। চলতে চলতে বললেন—যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা। দাদা তখনকার দিনের ইংরেজিতে ফার্স্টক্লাস অনার্স। ইচ্ছা করলে ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারতেন। তা না হয়ে একটা এঁদো পাড়াগাঁয়ে মাস্টারী করে, আদর্শের জন্য সংগ্রাম করতে করতে অকালে চলে গেলেন। তুই তো সেই বাপের বেটা। আন্দোলন, সংগ্রাম তোর রক্তে। তোকে কি করে ফেরাবো?

—কাউকে বলবে না তো।

—আমি না বললেও কি কথা চাপা থাকবে? ছাই চাপা আগুন একদিন দাবানলের মতই জ্বলে উঠবে।

—তাই আশীর্বাদ কর পিসীমা।

—বেশ। করলাম।

হোলীর মাতামাতিতে কটা দিন কাটল। তারপর ডিসেরগড়ে পীরের মেলা। পীর সাহেবের সমাধিতে চাদর পরাবার জন্য বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা। এক সপ্তাহের উপর মেলা চলে।

ট্রেনিরা সব সন্ধ্যাকালটা মেলাতেই কাটিয়ে দেয়। আমোদস্ফূর্তির নানা উপকরণ। জম জমাট ব্যাপার।

ততদিনে পুরানো বছরটাও খসে গেছে। বৈশাখের গরম পড়েছে। অগ্রদূত মেসের মেম্বারদের শোবার খাটিয়া সন্ধ্যাকালে বারান্দায় পাতা হচ্ছে।

সেই সময় একদিন অনন্ত ফিরল প্রায় রাত দশটায়। সুমিতবাবু তখন বারান্দায় ওর খাটের পাশে একটি ফাঁকা বারুদ বাকসের ওপর ফাইল পত্র নিয়ে বসে আছেন।

অনন্ত আসতেই ডাকলেন, এদিকে আয় অনন্ত!

—কি দাদা?

উনি খাটের একপাশে সরে গিয়ে ওকে বসতে দিলেন। ফাইল খুলে একটা চিঠি দেখিয়ে বললেন—পড়়। খুব গোপনীয়। রেসিডেনশিয়াল ডাইরেকটারের চিঠির কপি।

কোম্পানীর ডাইরেকটারদের এক একটি সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের কাছে মরণ সমান। এক তো ভারত স্বাধীন হবার পর বিলিতী কোম্পানীরা তাঁদের আখের ভেবে নিয়েছিলেন। বিপুল সংখ্যক শ্রমিকদের মেহনতে যে শিল্প চলে তার জুলুমের রাজ কায়েম রাখা সম্ভব হবে না। আর তা না হলে মুনাফার কড়ি সমুদ্র ডিঙিয়ে বিলাতে ব্যাঙ্কগুলিকে স্ফীত করে তুলবে না।

শেয়ার বাজারে বেচাকেনার হার বেড়ে যাচ্ছিল। কাচ্ছী, মাড়োয়ারী, সিন্ধি মালিকরা সেসব শেয়ার কিনছিলেন। তার আঁচ দামোদর কোল কোম্পানীতেও এসে পড়েছিল এবং ন্যূনতম যতগুলি শেয়ার হাতে থাকলে পরিচালনা ক্ষমতা নিজের হাতে থাকে তাই রেখে বাদবাকী শেয়ার বাজারে ছেড়ে দিচ্ছিলেন।

আবার শ্রমিক ঐক্য, ট্রেড ইউনিয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেতন, ভাতা বোনাস, ছুটি ও বাসস্থানের দাবি যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠছিল তাতে মানুষের বদলে মেসিন চালাবার কৌশলটাই বেশী করে আরোপ করছিলেন। কারণ মেসিন প্রতিবাদ করতে জানে না।

এবার চোট পড়তে যাচ্ছে ওয়াগন লোডারদের উপর। চার-পাঁচটি সরদারের প্রায় পাঁচশোজন কুলিকামিন। তার মধ্যে একা চরিতরের দেড়শো।

বোর্ড অফ ডাইরেকটার্সের চিঠিতে শুধু দামোদর কোল কোম্পানীতেই তিন হাজর শ্রমিক ছাঁটাই করতে হবে। তার জন্য বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবনের উপর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দামুলিয়া কলিয়ারীতে স্ক্রিনিং প্ল্যাণ্ট তৈরি হচ্ছে। বড় বড় গারডার পুঁতে বাঙ্কার তৈরি হবে। চালনা বসবে। কনভেয়ার বেল্ট দিয়ে কয়লা এসে পড়বে চালনার উপর। ঘটাং ঘট শব্দে চাসনা চলবে। সোজাসুজি ওয়াগনে লোড হবে। তাহলে লোডার কুলিকামিনের দরকার কি?

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে ওদের বাকী রইল না।

অনন্ত বলল—তাহলে দাদা—এর উপায়?

—সেই তো ভাবছি।

—ওরা অতদিনের পুরানো লেবার। এক কথাতেই ছাঁটাই।

—এখনো হয়নি তবে হবে। কোম্পানী যদি মেশিন বসাতে চায় তবে আমরা বাধা দিতে পারি না।

—কিন্তু ছাঁটাইও তো করতে পারে না। কন্‌সিলিয়েশনে চাকরীর স্থায়িত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে।

—কোম্পানী তা নাও মানতে পারে। কন্‌সিলিয়েশন কোনো আইন নয়। আপস মীমাংসা।

—তাহলে আমাদিকে আন্দোলনে নামতে হবে।

—হ্যাঁ। আমি একবার দেবেনদার সঙ্গে আলোচনা করে নিই। তারপরে সরদারদিকে ডাকবো। তারা যদি আন্দোলনে রাজী হয় তবেই নামবো।

কিন্তু যাদের নিয়ে এত ভাবনা চিন্তা তারা নির্বিকার। সারা দিন-রাত সাইডিংয়ের কয়লা ডিপোতে পড়ে থাকে। সেখানেই তাদের আহার নিদ্রা এবং মৈথুনও। জোয়ার এলে ধাওড়া পর্যন্ত যাবার ধৈর্য বা ক্লেশ স্বীকারের সময় থাকে না। লগ্ন তো বয়ে যেতে দেওয়া চলে না।

সাইডিংয়ে সারি সারি ওয়াগন। খোলা ঢাকা দু' রকমই। সেগুলো ধাওড়ার চেয়ে কিসে খারাপ? তার ভিতরেই বাসর শয্যা। নীচে দানা দানা কয়লা। বড় বড় রিভেট। গামছা পেতে শোওয়া। পিঠে বড় লাগে। হাঁটুর ছাল চামড়া উঠে যায়। তাতেই স্বর্গসুখ। পরক্ষণেই মাথায় ঝোড়া নিয়ে দর্ দর্ করে হেঁটে যায়।

গৌরী সেই সমাজের মেয়ে। ওর মা বাপ হাজরির কাজ করে এই যা। ঠিকাদারের ওয়াগন লোডর হলে ওরাও তাই করত। স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে কাজের পরিবর্তনের জন্য।

গৌরীর শ্বশুর এসেছে ওর ভাই বাঁকেলালকে নিয়ে। সে নাকি বহুৎ চলতা পুরজা আদমী। সাহেবদের সঙ্গে দহরম মহরম। বোলচাল জানে।

কুটুমের খাতির রাখতে একটা শুয়োর কেটে মাংস রান্না হচ্ছে। চাট চলেছে। ধেনোমদে কুটুমের কাছে দর কমে যাবে তাই বোতলের মদ এসেছে। সব খানেওলা আদমী। চোঁ চোঁ টেনে নিচ্ছে। কাচ্চা বাচ্চা মেয়ে পুরুষদেরও ঢুক ঢুক করে চলছে। তাদের মধ্যে অটল সংগ্রামে স্থির হয়ে আছে গৌরী। সে মদ ছোঁবে না। চামড়া পোড়ার গন্ধটা বড্ড বিটকাল্। নাক সিঁটকে গলা পর্যন্ত টেনে গল্ গল্ করে ঘামছে।

আহা! বেচারী!

গুলু ও তার শালা সম্বন্ধী বন্ধুই চবুতরায় বসেছে। জোর দরমোলাই চলছে। গুলু বলল—আমার জোয়ান বিটি ছিলা। যেঞেই ঘরবশত হবেক। ডিপুতে খাটতে দিব নাই। সে কথা করার করতে হবেক। আমার বিটি লেখাপড়া জানে। খরচ খরচার জন্যে একশো টাকা দিতে হবেক।

কিন্তু একশো টাকা অনেক টাকা। ওদের কাছে পাহাড়ের সমান। ভাত, মদ, কাপড়, কানি, ছাওয়াতি, পোয়াতি, অসুখ বিসুখ, সুদ আসল ধার উঠার শোধবোধ নিয়ে খরচের ঠ্যালায় জেরবার। একলপ্তে পায় কোথা?

বাঁকেলাল বলল—এইটি কথা হলো বিয়াই?

—হুঁ।

—কিন্তুক বিটি তুকে পাঠাতেই হবেক।

গুলু নেশার ঘোরে চোখ পিট্‌পিট করে বলল—বিটিটিকে ঘরে রেখে কি আমি চাটব? তুদের বউ তুরা নিঞে যা। কিন্তুক আমার পাওনা মিটাঞে দে।

—তা ক্যেনে দিব। বিয়ার সময় তো ঊ-কথা হয় নাই।

—তবে তুই বিয়া দিঞেই নিঞে গেলি নাই ক্যেনে? আমি কিছুই লিতম নাই। কিন্তুক এতদ্দিন খাওয়ালম, পরালম, ডাগর করলম তার খরচ হিসাব কর।

বাঁকেলাল রাগে রাগে বলল—এইটি উল্টা কথা বলছিস বিয়াই। কুন্ বাপে

না নিজের বিটিকে খোরাকী দিঞে পালপোষ করে? বিটি ডাগর হলেই তো গাওনা হয়। ছুটুতে নিঞে যাব বললেই তুঁই পাঠাতিস?

—উয়াকে লেখাপড়া শিখাতে তো আমার খরচ হঞেছে।

—যা শিখাঞেছিস তা তুর বিটির পেটেই থাকবেক।

—শ্বশুর ঘর করতে যেঞে তো বিটির পেটে ছেলাও থাকবেক। সেটি তুরা লিবি নহি?

এমন সব আর্গুমেন্ট যে শুনলেই লোকের মাথা বিগড়ে যাবে। কারো বিশ্বাসই হবে না। অথচ এই তাদের সংলাপ। বিচিত্র এবং বিসদৃশ ভোকাবুলারী।

সন্ধ্যাটা বোলচালেই কেটে গেল। মদ খেতে খেতে বেহুঁশ। তবু ফয়শালা হলো না। পরদিন সকালে ফিরে যাবার তাড়া। ঠেটি ধুতির ওপর সবুজ রঙের ফতুয়াটি চড়িয়ে মনিলাল বলল—অনেক কথাই তো বললি বিয়াই। টাকা না হলে বিটি দিবি নাই সেইটিই বুঝলাম। কিন্তুক আমার ব্যাটার বহুকে একবার দেখতে দিবি তো?

—হঁ-হঁ। তা ক্যেনে দিব নাই? এগে—গৈরী! আয়গে—তোর শ্বশুরাকে পরণাম কর।

ঐ নোংরা, থ্যাংরা লোকগুলোকে প্রণাম করবার কথাতেই গৈরীর সর্বাঙ্গ রী রী করে উঠল। কিন্তু করবে কি? ওর মা যে হাত ধরে টানছে। অস্ফুট চাপাকণ্ঠে বলল—উয়াদিকে বলে দে মাঈ—আমি শ্বশুর ঘর যাব নাই।

ওর মা ধমকে উঠল—চুপ কর ধুমসী। শ্বশুর বটে—পরণাম করগা।

ওকে টেনেই নিয়ে এল। সারামুখ কাপড়ে ঢেকে টিপ টিপ করে প্রণাম করল।

ওর শ্বশুর ওর হাতে একটি রূপোর টাকা দিয়ে বলল—মুখটা খোলগে মাঈয়ি।

গৈরী ঘোমটাটা আরো টেনে নিল। ওর মা ঝঙ্কার দিলো—আঃ! লাজ সরমে মরে যেছে। উয়াদেরই তো ঘরকন্না করতে হবেক গে। খুল—মুখ খুল।

ও নিজেই ঘোমটাটা টেনে খুলে দিলো। গৈরী মুহূর্তের জন্য হতচকিত। তারপরই ঘোমটায় মুখ ঢেকে দ্রুত পায়ে চলে গেল।

কিন্তু!

পদ্ম পলাশের বিকশিত সৌন্দর্যের একটি ঝলক। ভীত চকিত দুটি চোখের তারার বিদ্যুৎ প্রভা। নিতম্ব ঈষৎ ভারী। চলার ছন্দে যাদুকরী মায়া। পায়ের গোছে মল। পাতা দুটি চিকন। আঙুলে চুটকি। হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি। ঝুম ঝুম শব্দে মল বাজল। রিনি ঝিনি চুড়ি।

মনিলাল থ। বাঁকেলালের চোখ ট্যারা।

খানিক পর মনিলাল বলল—ঠিক আছে। শ'টাকায় দিব।

বাঁকেলাল বলল—এ-হে-হে দাদা তুঁই টাকা কবুল করে দিলি?

—হুঁ। ঈ-মক্ষিচোষ বিয়াই বিনা পয়সায় বিটি দিবেক নাই।

—তাই বলে এত টাকা। কুথায় পাবি?

খেতি-জমি বিচে দিব।

—ছুটি পাবি—দেশে যাবি—খরিদ্দার দেখবি—জমি বিচবি—টাকা আনবি। তাকে তো বৈশাখ মাস শেষ হঞে যাবেক।

—না হয় জষ্ট্যি মাসে হবেক। না হয় আষাঢ় শাওনে। কিন্তুক এই বহুকে আমি জরুর ঘরে নিঞে যাব।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনিলাল যাবার জন্য পা বাড়াল। গুলু ওর কাছে ল্যাজ নাড়তে শুরু করে দিলো—কিছু মনে করিস না বিয়াই। টাকা আমি নিজের জন্যে খুঁজি নাই। আমি তো বাপ বটি। সাধ তো আছে। টাকা নাই বলেই তুর কাছে খুঁজছি। তুঁই বিশ্বাস লে—ঐ টাকাটি সব আমি বিটিকে জেবর গড়াঞে দিব। চাঁদের পারা বিটি আমার জেবর না পরালে মানাবেক ক্যেনে? তুই রাগিস না। টাকা তুর ঘরকেই যাবেক। সাধটি পুরা হতে দে।

—ওরে বিয়াই! আমার জমি জায়গা তুর বিটিতেই পাবেক। তো তুদের কাছে যদি মাটার যেঞে জেবরের দাম বেশী হয় তো তাই লিবি। মনের সুখে সাধ মিটাবি।

চলতে চলতে আবার বলল—দেশ থেকে এসেই টাকা পাঠাঞে দিব। গাওনার দিন ঠিক করে দিস। আমার বেটা এসে নিঞে যাবেক। বিটি জামাই পাঠাঞে দিবি। ফের যদি বাহানা করিস তবে তুর বাপের নাম ভুলাঞে দিব। আমি রাগি না তো রাগি না। রাগলে চণ্ডাল।

কুড়ি

দামোদরের কিনারে গ্রীষ্মের সন্ধ্যা বড়ই মনোরম। স্নিগ্ধ শীতল বাতাস। দামোদরের কলোচ্ছ্বাস। ঝক ঝকে বালুকা রাশি। পঞ্চকোট পাহাড়ের সুনীল প্রেক্ষাপট। পরপারে মানভুম জেলার তালবীথি। দিগন্ত ছোঁয়া আকাশের গায়ে চুমকি জ্বালা নক্ষত্র।

নদীর গর্ভে বালি তোলার জন্য লোহার তৈরি বাঙ্কার। দু'পাশে উঁচু মাটির বাঁধ। সবুজ চাপড়া ঘাস হয়েছে তাতে। বাঁধের ক্ষয় রোধের জন্য রীতিমত চাষ করা হয়েছে। একজন মালী থাকে তার হেফাজতের জন্য। সে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতো কয়েকটা বেলিফুলের ঝাড় লাগিয়েছে। ফুল ও কুঁড়িতে ভরে আছে। ভারী সুন্দর সুগন্ধ। আর আছে সাজানো বাগান। সেখানে ঢুকতে পায় না কেউ। অনন্ত সেখানে ডিউটি পেয়ে খুব খুশী। প্রথম সপ্তাহে দিন

পালি। দ্বিতীয় সপ্তাহে চারবাজা পালি। অর্থাৎ বিকেল চারটে থেকে রাত বারোটা।

পালির শুরুতে বেশ কিছু কাজ থাকে। লোকজনের বিলি ব্যবস্থা, নৌকার পাম্প হলেজ ও বাঙ্কার চালু করা। দিন পালিতে কোনো বিশেষ কাজ যদি অসমাপ্ত থাকে তবে তা শেষ করা। ঘণ্টা দুয়েক সময় কিভাবে কেটে যায় বুঝতে পারে না।

তারপর খবরদারী। যদি কোনো ব্রেকডাউন হয় তবে তার মেরামত। সেজন্য মুন্সী, মিস্ত্রী সবই আছে। কাজের এমন সিস্টেম যে ফাঁকি দেবার জো নেই। কোথাও একজন ফাঁকি দিলে অন্য জায়গায় টান পড়বে।

কাজেই যেসব ট্রেনির ডিউটি থাকে তারা যথেষ্ট সময় পেয়ে যায়। বসে থাকে, বই পড়ে, কেউ কেউ মেসেও চলে আসে।

দিনপালিতে মাথার উপর খররৌদ্র। বসবার জায়গা নেই। বাঙ্কারের ছায়াটুকু সম্বল। কোম্পানী একটা চালাঘর বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা দেবেন না। তাহলে ডিউটিওলারা ঐ এক টুকরো ছায়ার লোভে সেখানে গিয়ে জুটবে।

কিন্তু চারবাজা বা রাতপালিতে প্রকৃতি নিজেই মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে দেয়। রাত নামে। অসংখ্য তারকা জ্বলে। চাঁদ ওঠে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় দামোদরের আশ্চর্য সব দৃশ্য ফুটে ওঠে। দেখবার চোখ থাকলে অপার্থিব আনন্দে মন ভরে যায়।

সেদিন সোমবার। অনন্ত বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চকোট পাহাড়ের কোলে অস্তসূর্যের রক্তরাগ রঞ্জিত আকাশের বুকে বর্ণালীর ঢেউ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছে।

বাঁধের নীচ দিয়ে রাস্তা। ধাওড়ার মেয়েরা দামোদরে বালি খুঁড়ে জল বের করে কলসিতে ভরে নিয়ে যায়। সকাল সন্ধ্যা মেয়েদের মিছিল চলে দলে দলে। তারা হাসে, কথা বলে, গান করে। কোনো জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই। সহজ ও স্বচ্ছন্দ চলার ছন্দে রূপ ও যৌবনের নানা যাদুকরীভঙ্গীর চিত্র বিচিত্র বিন্যাস।

কত রকম সাজ পোশাক পরে আসে। রঙ বেরঙের শাড়ি ব্লাউজ। গলায় রূপোর টাকার গাঁথুনী করা হার। পায়ে মল। কোমরে ঘুড়ের কোমর বন্ধ। নানা ফুলের মালা। কানে ঝুমকা। বাহুতে তাগা। চোখে সুর্মা। সিঁথিতে সিঁদুর। কপালে টিপ। কৃষ্ণ খোঁপায় রূপোর ফুল, প্রজাপতি। হাতভর্তি চুড়ি।

সবুজ ঘাসের আস্তরণে বসে নারী ও প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হবার মতই দৃশ্যাবলী। আকাশের বর্ণ বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তারও নানা মেজাজের খোলতাই।

হঠাৎ অনন্তর দৃষ্টি আটকে গেল দামোদরের গর্ভে বালিতে চলা শুঁড়ি পথে। পাঁচ-ছটি প্রায় এক বয়সের মেয়ে হাসতে হাসতে আসছে। তাদের মাথায় এলুমিনিয়ামের চার পাঁচটি করে হাঁড়ি। মোটা সোটা বিড়ের ওপর প্রথমে ঘড়াটি তারপর তার থেকে ছোট এইভাবে সাজানো। হাত দুটি খালি। দুলিয়ে দুলিয়ে চলছে।

সারির প্রথমেই গৈরী।

বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। তার প্রথম প্রেম মাথায় জল ভরা কলসি নিয়ে নদীপথে হেঁটে যাচ্ছে। কি সুচারু তার চলার ছন্দ।

বেশ লম্বা দেখাচ্ছে। গায়ের রঙটা আরো উজ্জ্বল হয়েছে। মুখটি প্রতিমার মতো। তার পিছনে ওর সহেলী। বুক জোড়া ফাগুনের আগুন। প্রায় ঝলক দিয়ে বলল, এলো গৈরী! ত্থাখ কে বটে?

গৈরী চোখ তুলে তাকিয়েই চমকে উঠল। মাথার হাঁড়িগুলি টাল খেয়ে পড়েই যেত। হাত দুটো তুলে সামাল দিলো। সামনে পা দিলো।

অনন্তর কত কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ওরা চলে গেল। নূতন যৌবনের মিছিল কি সুন্দর দেখাচ্ছে। গৈরী সবার সেরা।

সন্ধ্যা নামল। আকাশের নক্ষত্র সভা চাঁদের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হলো। তিথিটা বোধ হয় শুক্লাদশমী। তাই বুঝি চাঁদের এত দপ্‌দপানি। অনন্তর লগ্ন চক্রে চন্দ্রের বলবান প্রভাব।

ল্যাম্প পোস্টের নীচে বসে পকেট থেকে একটা বই বের করল এই তার স্বভাব। খাদে গেলেও পকেটে বই, কাগজ কলম নিয়ে যায়। অবসর পেলেই বসে পড়ে। সময় সময় রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, অর্জুন-উর্বশী, হেডগীয়ার পাল্লা, বয়লার চিমনি সব একই মাত্রা নিয়ে তার কাছে হাজির হয়।

কিন্তু পোকার বড় উপদ্রব। কালো, সবুজ, খয়রা কত রং-বেরং, জামার মধ্যে ঢুকে গিজ গিজ করছে। মাথার চুলে গুড়সুড়ি দিচ্ছে। ধ্যেৎ! ভীষণ বিরক্তিতে সেখান থেকে সরে গেল। বেশ কিছুটা দূরে ফিকে অন্ধকারে বসে ওর হাতের হ্যাণ্ড ল্যাম্পটা জেলে দিলো। ওটা খাদের বাতি। এবার পড়াটা বেশ হচ্ছে।

মুনশীবাবু বাঙ্কারের কাছাকাছি এক জায়গায় চট পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে। টালোয়ানরা ক্রমাগত খালি টবের লুস লোল হাবিস করছে। এখন কোনো কাজ নেই। পালি শেষ হবার আগেই বইটা শেষ করে ফেলবে।

বেশ কিছুক্ষণ পর যখন ও বইয়ের পাতায় পুরোপুরি মগ্ন তখন হঠাৎ কে যেন পিছন দিক থেকে হাত বাড়িয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিলো। মৃদু সুবাস ও মধুর রিনি ঝিনি শব্দে চমকে উঠল।—

—কে?

একটি কোমল হাত টপ করে ওর মুখের উপর চাপা পড়ল এবং অতি পরিচিত কণ্ঠের ধ্বনি শুনল—আঃ। চেঁচাচ্ছো কেন ?

একটা চাপা হাসি। পিঠের উপর পেলব কোমল স্পর্শ। অনন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে ঘাড় ফেরাল এবং একটা হাত দিয়ে তার গলাটা বেষ্টন করে বলল খুব দুষ্টু হয়েছিস তাই না ?

—বটেই তো! চাপা হাসি অপরূপ দ্যুতিতে ঝলকে উঠল।

—তোর তো খুব সাহস ?

—না হলে কি আসতে পারতাম ?

—কেউ যদি দেখে ফেলে ?

—তোমার নামে নিন্দে হবে ?

—আমি পুরুষ মানুষ। নিন্দেতে কি এসে যায় ? কিন্তু তোর যে সাড়ে সর্বনাশ। আরো কি বিয়ালা পুরুষে ঘরে নেবে।

—নাই বা নিল। আমার প্রেমিক পুরুষটির ভালোবাসা তো থাকবে।

—এঃ। কথায় পেরে ওঠা দায়।

চিবুক ধরে আদর করল। বলল—এই রাস্তার ধারে বসে থাকা কি ঠিক হচ্ছে ? কত লোক যাওয়া আসা করে।

—চল। নদীতে নেমে যাই। ওখানে—ঐ দূরে বালিয়াড়িতে বসে গল্প করি গে। কতদিন মন খুলে কথা বলিনি।

—তাই চল।

পরস্পরের হাত ধরে অনায়াসে নেবে গেল অনার্য দামোদরের গর্ভে। ধু ধু বালুকারাশি। তার বুকে হেঁটে যাচ্ছে বিমূঢ় নায়ক-নায়িকা।

বড় বড় বালির টিপির মধ্যখানে দুজনে বসে পড়ল। সেখান থেকে দামোদরের জলরেখা সামনেই, চিক্ চিক্ ঝিক্ ঝিক্ করছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁপন লাগছে। নদীর বালিতেও চুমকি জ্বলছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাইকার টুকরো চাঁদের আলোতে ঝিক্ মিক্ করছে।

অনন্ত বলল—তোকে এখন বেশ ডাগর ডোগর দেখাচ্ছে গৈরী।

গৈরী ঠোঁট টিপে বলল—যৌবনটা ভরাট হয়েছে তো।

—আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

—তোমার চোখে রঙ লেগেছে তো।

—তোর চোখে লাগেনি ?

—না হলে এলাম কেন ?

—তা বটে! অনন্ত হাসল। দাঁতের পর দাঁতের সারি ঝিকিয়ে উঠল। বলল—পাকাবুড়ির মতো কথা বলছিস।

—মেয়ে তো! বারো বছর বয়সেই পেকে যায়।

—আচ্ছা। তুই বাড়ি যাবি কি করে ?

—হেঁটে হেঁটে।

—তা বলছি না। বাড়িতে যখন জিজ্ঞাসা করবে এত রাত্রে কোথায় ছিলি তখন কি বলবি।

—সে ভাবনা আমার নেই। ভাই বোন দিকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি ? মা নেশায় বেহুঁশ। বাবা ডিউটি গেছে! ফিরতে রাত বারোটা পার হয়ে যাবে। ততক্ষণ অনায়াসে তোমার কাছে থাকতে পারি।

কিন্তু আমার যে ডিউটি আছে।

—জানি জানি। খুব কাজের লোক তুমি।

অভিমান তরল কণ্ঠের আহত উত্তর। অনন্ত ওর কপাল থেকে কয়েকটি চুল সরিয়ে দিলো পরম যত্নে। কি দুর্নিবার আকর্ষণ ঐ মুখে। কিন্তু ভীষণ নিষেধাজ্ঞা ওর সিঁথিতে। কপাল থেকে মাথার তালু পর্যন্ত যেন এক জমাট রক্তের নালা। তার উপরে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, এই লাল সাইন বোর্ডটাই ভিতরে প্রবেশ নিষেধ বলে আমাকে শাসায়। কি করে তোর কাছে পৌঁছাবো গৈরী ?

—ভালোবাসার সেতু দিয়ে।

—এটা ভুল হচ্ছে গৈরী যতই হোক তুই বিবাহিতা। একদিন তোর স্বামী এসে অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেই।

—তার আগে তুমি দখল করে নাও।

—গৈরী !

—ওদিকে তাকাচ্ছ কেন ? আমার বাপ মায়ে কখন যে আমার অজান্তে কাকে দিয়ে একটা দাগ মেরে দিয়েছে সেটাই তো আমার মনের খবর নয়। আমি তোমার। তুমি দখলদারী কায়েম কর। আচোট ভূমিতে চোট বসাও। তবেই তোমার জানমানের টান পড়বে।

অনন্ত ভয় পেয়ে গেল। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল—না না। তা হয় না। ভুল একবার হয়ে গেছে। ঐ পর্যন্তই থাক। আর নয়।

—কি নয় ? গৈরী ওর কাছ থেকে সরে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

—এই লুকোচুরি ! পরের বউয়ের সঙ্গে প্রেমের খেলা।

গৈরী শান্ত, স্থির এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলল—আমি কুমারী শরীরে, মনে। ঘুরে ফিরে পরের বউ পরের বউ কোর না।

—বড় বেশী এগিয়ে গেছিস গৈরী।

—তুমি আস্কারা দিয়েছো বলেই। না হলে সেই সরস্বতী পূজার রাত্রে যেদিন তুমি অনায়াসে আমার সতীত্ব নষ্ট করে দিতে পারতে কিন্তু তা না করে যেভাবে মান রাখলে তাতে আমি তোমাকে দেবতার মতো ভক্তি শুরু করলাম।

সেখানেই যদি থেমে যেতে তাহলে পুজোই পেয়ে যেতে। প্রেম আদায় করার জন্য চুমু খেলে কেন।

এই তিরস্কার অনন্তর প্রাপ্য ছিল। মাথা নীচু করে শুনল। আস্তে আস্তে তাকাল—ভুল একটা হয়েছে। তবুও ফিরবার সময় আছে। না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—ভীতু! ডরপুক। এই তোমার ভালোবাসা? পরিষ্কার করেই বল—আমি তোকে ভালোবাসি না।

অনন্ত ঘাবড়ে গেল। বলল—কেন এত রাগ করছিস গৈরী?

—রাগ? কিসের জন্য? যার মনে ভালোবাসা নেই তাকে রাগ দেখিয়ে কি হবে? আমি ছোট জাতের মেয়ে। মদ খাই বিড়ি খাই আমাকে কি তুমি ভালোবাসতে পারো? তুমি ভালোবাসবে শুচিকে, কল্যাণীকে তারা ভদ্রলোকের মেয়ে।

গৈরীর এই চেহারা অনন্ত আগে দেখেনি। ওর মনে হলো তার প্রথম প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। তাকে ফেরাতেই হবে।

বলল—আঃ। কি বাজে বকছিস? জাতের রেয়াত আমি করি না। আমার ভাবনা তোর সিঁথির সিঁদুরটার জন্য। না হলে তুই আমার সারা অন্তর জুড়ে আছিস। আজ যদি ডায়রীর খাতাটা কাছে থাকতো তবে দেখাতাম কত কথা লিখেছি শুধু তোকে নিয়ে। কত ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছি তোকে পাবার জন্য।

—সত্যি?

—হ্যাঁ!

—আমিও তোমাকে অনেক চিঠি লিখেছি। কিন্তু একটাও পাঠাতে পারিনি। সব খাতাতেই আছে। কাল তোমাকে দেবো।

বিবশ বিহ্বল গৈরী ওর বুকের উপর মুখ ঘষতে লাগল। তখন ওর শিরা উপশিরার রক্তস্রোত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। অস্থির পঞ্চমে অশান্ত রাগিনী বেজে চলেছে অন্তরের কানায় কানায়। অনার্য আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল।

অশান্ত উত্তেজনায় ভেঙে যাচ্ছে অনন্ত। পুরুষ যাকে কামনা করে, হৃদয়ের শোণিত প্রবাহে যার নাম রঞ্জিত হয় সেই নারী তার বুকের ওপর। অক্ষত, অনাঘ্রাত, নিটোল।

মাথার উপর তারা ভরা আকাশ। চন্দ্রমা বিরাজ করছে রাজ-রাজেশ্বরের মতো। ঠোঁটের সামনে দুটি ঠোঁট। আবেগে কম্পিত। চোখের তারায় গহিন গাঙের আহ্বান।

নৌকা ভাসাও মাঝি। আর দেরি হলে জোয়ার কেটে যাবে। ভাটার টানে চড়ায় আটকে যাবে। সময় বড় বলবান। এই মুহূর্তটি পার হয়ে গেলে পৃথিবী দুরন্ত গতিতে চাঁদকে পিছনে ফেলে চলে যাবে।

চোখের সামনে একজোড়া পদ্ম কোরক। চড় চড় করে বেড়ে যাচ্ছে গৈরীর শরীরের উত্তাপ। নিস্তব্ধ বালুকাবেলায় ঘন শ্বাস ও বিলম্বিত শিৎকারের চাপা ধ্বনিতরঙ্গ অনন্তর অন্তর বাহির ভূমিকম্পের তাড়নায় কম্পিত করে তুলেছে। দামোদর গর্জন করছে। কুল ভাঙা বন্যার তাণ্ডবে ভেঙে যাচ্ছে চামড়ার ছাউনি দেওয়া হাড়ের ঘর খানি।

ভয়ে, বিস্ময়ে ও অসহ্য জ্বালার উত্তাপে ঘটে গেল বিস্ফোরণ। তীব্রতম মুহূর্তে শোচনীয় ব্যর্থতায় এলিয়ে পড়ল অনন্ত। বালির উপর মুখ থুবড়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ পর বলল—আমরা একদম আনাড়ী।

গৈরীও বুকে মুখ গুঁজে দিলো।

কবির কাম শুধু যন্ত্রণাই দেয় না। সৃষ্টিও করে। সাড়া জাগে প্রাণের। মুকুলিকা প্রস্ফুটিত হয়। মধুকর গুঞ্জন করে। ব্যর্থতাই শেষ কথা নয়। তার পরই আসে সাফল্য।

রুমক্ ঝুমক ঝুম্ রুমক্ ঝুম্।

সারা সত্তাজুড়ে তালবাদ্যের মধুর ঝঙ্কার। কল্লোলিত দামোদর ঢেউ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আকাশ জোড়া নক্ষত্রের মেলা। সুনির্মল পূর্ণচন্দ্র। বালুকাবেলায় ঝরে পড়ছে বিন্দু বিন্দু চন্দনের মতো স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্না ধারা।

পরপারে শ্যামল দিগন্ত। নিবিড় নীল ট্রাপিজিয়ামের মতো পঞ্চকোট পাহাড়। পশ্চাৎপটে আকাশ ছোঁয়া চিমনি থেকে ঝলক ঝলক অগ্নিশিখা। কালো ধোঁয়া নীল আকাশের বুকে এঁকে যাচ্ছে শিল্প বিপ্লবের ছবি।

প্রেম তার অপার মহিমা নিয়ে সব যন্ত্রণা মুছে দিয়েছে নায়ক নায়িকার মন থেকে। যেন কত যুগ যুগান্ত পার হয়ে, ব্যথা বেদনার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তারা পৌঁছে গেছে স্বপ্নের রাজ্যে। সেখানে আকাশের নক্ষত্র সভায় পরীরা নাচে। তাদের সুঠাম দেহ, উদ্ভিন্ন যৌবন, ফুলের কাঁকন পরা হাতের মুদ্রা, খোঁপায় সাজানো ফুলের মুকুট কত না বিভঙ্গ তোলে রাগ অনুরাগের সুখানুভূতি। মুখরিত তালবাদ্যে দ্রুতলয়ে চলে হৃৎপিণ্ড।

আনন্দে, আশ্লেষে, মিথুনের পুলকে আবেশ জড়ানো চোখ দুটি মেলে অনন্তের দিকে তাকিয়ে আছে গৈরী। ঢেউ ভাঙা জলে চাঁদের ঝিকিমিকি। অনন্ত শুয়ে আছে বালুকাবেলার সুখশয্যায়। সুপ্তি মগ্ন। জেগে আছে চাঁদ। জেগে আছে গৈরী।

অনার্য দামোদরের বুকে অনার্য কন্যার অশান্ত প্রণয় ক্ষুধা পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ভরে গেছে। অনন্তর বুকে কান পেতে শুনছে হৃৎপিণ্ডের ছন্দোবদ্ধ স্পন্দন। বিমুক্ত কবরী। সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে রাশিকৃত কালোচুলের বোঝা। ঢেকে দিয়েছে নগ্ন নীবিবন্ধের লজ্জা! লাবণ্যময় জানু অক্লেশে বেষ্টন করে আছে অনন্তর কটিদেশ। এবার সেও ঘুমিয়ে পড়বে। চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে।

প্রায় ভোর রাত্রে মেসে ফিরে অনন্ত তার ডায়েরীতে লিখে রাখল—কবে এমন নিবিড় মিলনের সুখে পার হয়ে যাবে তারা জাগা রাত।

হে দামোদর! তুমি অনার্য। তাই তোমার বুকের পরিসর অত বিরাট। গভীরতা এমন অতলস্পর্শী। তোমার শিরা উপশিরা অস্ত্রোপচার করে শুধু তাপশক্তিরই উৎপাদন হয় না। আমার জন্য নিটোল প্রেমের পসরাও সাজিয়ে রেখেছো।

তাই তোমাকে লাখো সেলাম।

একুশ

ঘুম ভাঙল সুমিতবাবুর ডাকে। তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

উনি বললেন, কাল কত রাত্রে ফিরেছিলি অনন্ত? আমি তোর জন্য বারোটা পর্যন্ত জেগেছিলাম।

অনন্ত বেশ অপরাধ বোধ করল। কিছু না বলে বাথরুমে চলে গেলো। ও ফিরে আসার পর সুমিতবাবু বললেন—তৈরি হয়ে নে। বেরুতে হবে।

—এখুনি?

—হ্যাঁ। কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। আমাদিকে অবিলম্বে রেশন বন্ধ আন্দোলন চালু করতে হবে।

তখনকার রাজনীতিতে নেতারা ডাক দিয়েছেন বললেই যে জনগণ তৈরি হয়ে যাবে তা ছিল না। সর্বব্যপ্ত ভয়ের রাজত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে কেউ চায় না।

তবে স্ক্রিনিং প্ল্যাণ্ট বসাবার কাজ যখন থেকে সুরু হয়েছে তখন থেকে দুশাদ, পাশমন সাঁওতাল, বাউরী ওয়াগন লোডাররা বুঝতে পেরেছে যে তাদের ছাঁটাই আসন্ন। এমন কি সরদাররাও ভয় পেয়ে গেছে। আগে চরিতরের দলটাই ইউনিয়নে যোগ দেবার জন্য রাজী হয়েছিল এখন ফুলবনির সাঁওতাল দল, শকুন্তলার বাউরী দল, রামদেওয়ের পাশমন দল রাজী হয়ে গেছে।

এই কাজটির সব কৃতিত্ব অনন্তের। সেই ঘরে ঘরে গিয়ে সবকে বুঝিয়েছে, কানে মন্ত্র পড়েছে। ওদের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে।

একটা দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওদেরই বিভিন্ন দলের সঙ্গে মিটিং করতে করেতে গেল। পরের দিন গেল সরদারজীদের ধাওড়ায়। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গুরুনাম ইতিমধ্যে তেজ সিং, ফৈজু সিং, দববারা সিং প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিকে ডেকে এনেছে। ওরা কেউ ফিটার মিস্ত্রী, কেউ টিনভেল, জমাদার। প্রেমার বাবা মহীন্দার সিং মাইনিং সরদার।

আলোচনা হচ্ছে। নীতিগতভাবে ইউনিয়নের প্রস্তাব সমর্থন করতে রাজী হয়েছে। কিন্তু সামনে যাবার সাহস নেই। তাই তারা দ্বিধাগ্রস্ত। সুমিতবাবু ও অনন্ত ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বলে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

গুরুনাম অনন্তকে ডেকে বাইরে নিয়ে এসে বলল—আরে ইয়ার তু তো বে-রহম আদমী হো।

কিঁউ?

—আও।

ওকে টেনে নিয়ে এল নিজের ঘরে। প্রেমা ওকে কিল দেখিয়ে বলল—

—বড় লীডার হয়ে গেছো তাই না? আমি যে এখানে আছি সেকথা খেয়াল নেই।

গুরুনামের ঘরটি কুলি ধাওড়ার মতই। টালির চাল ইটের দেওয়াল। আটফুট সাইজ। একপাশে কাঠের তক্তাপোষের ওপর বিছানা। দরজার সোজাতেই দেওয়ালে সাঁটা গুরুনানকের ফটো। একদিকে ছোট একটি আলনা। তাতে শাড়ি, ব্লাউজ, সালোয়ার, কামিজ, ফুলপ্যাণ্ট হাফপ্যাণ্ট ইত্যাদি। তাকের উপর সাজানো গুরুনামের নানা প্রাইজ, মেডেল, কাপ, শিল্ড।

বিছানার একপাশে ওদের তিনমাসের বাচ্চা। অনন্ত ঘরে ঢুকে শ্বাস নিল। পবিত্র ধূপের গন্ধ। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। বাচ্চাটির গাল টিপে আদর করল

বলল—তাহলে সুখের সংসার পেতেছিস? লাকি কপাল। চিয়ার উ!

—আগে বোস তো! তারপর কথা বলবি। তক্তাপোষের ওপরই বসল। প্রেমা বাইরে গেল। বেশ ভরাট দেখাচ্ছে ওকে। আগে লম্বা পাতলা ছিল। নাকটা বিসদৃশভাবে সামনে বেড়ে থাকতো। এখন সুখ ও সোহাগের আনন্দে গালগুলো ভরাট হয়েছে বলে অতটা বেমানান দেখায় না। তবে একটি নূতন মাত্রা যোগ হয়েছে। যেন গোঁফের রেশ দিচ্ছে।

গুরুনাম বলল—ইয়ার তু মেরা নয়া জিন্দেগী বানা দিয়া। ম্যায় দিওয়ানা থা। তু প্রেমা মিলা দিয়া।

প্রেমা ঢুকল হাতে একটা ডিশ নিয়ে। লাজুক হেসে বলল—তুমি এসেছো শুনে একটু পায়েস করেছি। খাও।

অনন্ত বলল, এটা তুই কি করেছিস প্রেমা?

—বাঃ রে! তোমাকে মিষ্টি মুখ করাবো না তো কাকে করাবো?

—খুব হয়েছে। কিন্তু আমি একা কি করে খাবো? সুমিতদা আছেন। প্রেমা গুরুনামের দিকে তাকাল। ও বলল—ঠিক হ্যায়। আভি বুলাকে লাতা। প্রেমা আরো একটা ডিশে পায়েস, মিষ্টি এনে রাখল।

বলল, কতদিন পরে এলে দাদা? সেই বাচ্চাটার ছ'দিনে একবার এসেছিলে। তখন তোমার সঙ্গে কথা বলতেই পারিনি।

ওড়না দিয়ে মুখ মুছল।

অনন্ত বলল—তোদেরকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

—তোমার মনে আছে তো আমি বলেছিলাম তোমার বিয়ের ঘটকালি করবো। তা তোমার যে কি পছন্দ তাই বলছো না। তারপরে শুনলাম কল্যাণীর বাপের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছ।

সুমিতবাবু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন—তোমরা কি চাও অনন্ত গরিবের বন্ধু না হয়ে বড়লোকের জামাই হোক ?

না দাদা ! তা চাইব কেন ?

অনন্তর পাশে বসতে বসতে চোখ নাচিয়ে বললেন—তবে ?

ওর দিকে ডিশ এগিয়ে দিয়ে প্রেমা বলল—খান দাদা।

—হ্যা। তোমাদের পাড়ায় এসে খেয়েই যাচ্ছি। একবার তোমার বাপের খাতিরে, একবার তোমার শ্বশুরের খাতিরে আর এবার তোমার খাতিরে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না।

—কি কাজ ?

—শ্রমিক ঐক্য। ইউনিয়নের টিকিট কাটতে বড়ই নারাজ।

প্রেমা গুরুনামের দিকে একবার তাকাল। বলল—ঐরকম দরবার ডেকে কিচ্ছু হবে না। ওদের জন্য চাই হুকুম। বিনা হুকুমে চলতে জানে না।

—কিন্তু হুকুমটা দেবে কে ?

—আপনি ভাববেন না। ও পাড়ায় আমার বাবা, এ পাড়ায় আমার শ্বশুর। দু'পাড়ার দুজন মাতব্বর। ওদেরকে রাজী করাবার ভার আমার।

অনন্ত বলল—আঃ। বাঁচালি যাহোক।

সুমিতবাবু বললেন—তোমাকে আমি এইটুকু থেকে বড় হতে দেখলাম। এরই মধ্যে কত বুঝে ফেলেছো। যাক ভারটা তোমার উপরেই রইল।

পরদিন সন্ধ্যায় মিটিং হলো নগেন মণ্ডলের ঘরে। সে পাম্প খালাসী। বেশ কিছু হাজরীবালা শ্রমিককে জুটিয়েছিল। তার পরদিন হরিহর গান্ধীর পাড়ায়। ও টিম্বার মিস্ত্রী।

রাজকিশোর সিং পিট মুনশী, তিলক সিং মাইনিং সরকার, রাবণ মাঝি পাথর কাটা প্রমুখ কয়েকজন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওদের কাছে এল এবং সংগঠনের কাজে লেগে পড়ল। ওরা অবশ্য আগেও ছিল।

তারপর টালোয়ানদের সঙ্গে কথাবার্তা। ওরা নানা জাতের মিশাল। কিন্তু ইউনিয়নের কাজে বেশ অগ্রণী ভূমিকা নিল। বরং বলা যেতে পারে একটা শক্তপোক্ত শ্রমিক ফোরাম তৈরি করে নিল।

কিন্তু সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী হচ্ছে লোডার। প্রায় এক হাজার। তাদের তিন চারশো জন গোরখপুরী শ্রমিক। ওদের সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা। কোনো ফাঁক দিয়েই ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের ঢুকবার জো নেই।

বাকি সব আরা, বালিয়া, ছাপরা, মতিহারী, দেওরিয়া, তুমকা, মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি জায়গার রাম, হরিজন, চামার, ধোবী, ক্যারট, বিন, বিদ, ধাঙড়, কুর্মী, মাহাতো।

সবারই আচার ব্যবহার, সংস্কার, পাল পার্বণ, উৎসব, আনন্দের আলাদা রকমফের। এক একটি সরদারের খবরদারীতে শ' পঞ্চাশ আদমী। সেই তাদের শাসন শোষণের জাঁতাকল। শ্রমিকরা সেটা বুঝেও বুঝে না। লোডার ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকদের ওপর সরদারী প্রথা এত প্রকট নয়। বস্তুত ঠিকাদারের শ্রমিকদের ওপর সরদারী রাজ কায়েম রাখা যতটা সুবিধাজনক ততটা অন্য শ্রেণীর ওপর হয় না।

এক এক সরদারের দশ বিশটা চোখ। পঞ্চাশটা কান। কোথাও কিছু গোলমাল বুঝলে গোমস্তাবাবুর কাছে চুগলি করে। উনি তার ব্যবস্থা করেন। না পারলে ডি. সি. সাহেব তো আছেনই।

এইরকম চেইন সিস্টেমে বাঁধা। অনন্ত ভাবতেই থাকে কি করে ওদের মধ্যে ঢুকবে?

সেদিনটা ছিল শনিবার। সকাল থেকেই অনন্তর বুক উথাল পাথাল করছিল। এই বারটি ওর জীবনে বোধহয় একটা আলাদা মাত্রা নিয়ে স্থায়ী হয়ে যাবে।

মনে পড়ল গৈরী ওর একটা ফটো চেয়েছিল। কিন্তু তেমন ভালো ফটো তো নেই। মাইনিং সরদারী পরীক্ষা দেবার জন্য পাশপোর্ট সাইজ ফটো আছে। তাই একটা দেবার জন্য আলাদা করে খামে ভরে রাখল।

কিন্তু গৈরীর ফটো? সেটা সে পায় কোথা?

হ্যাঁ। আছে। ফার্স্ট এইড কম্পিটিশনের দিন সব টিমেরই ইউনিফরম পরা ফটো তোলা হয়েছিল। চারটি মেয়ের একসঙ্গে একটা গ্রুপ ফটো আছে।

তাতে মন ভরবে কেন? ওর আলাদা ফটো চাই। বুকের ভিতর লকেট করে রাখবো।

কুলিকামিন নিয়ে ভাবতে ভাবতে মাথাটা জ্যাম ধরে গিয়েছিল। গৈরীর ভাবনা যেমনি এল অমনি কেমন আনন্দবোধ করল।

না। গৈরীকে আজ চাই-ই চাই!

রামধনির রাত পালি ডিউটি। নতুন ঘর সংসার নিয়ে সে এখন বেশ সুখী। বাসমতী ভাত রাঁধে, চুল বাঁধে, সোহাগে আদরে ভরে রাখে স্বামীর মন। যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। বাসমতীর রূপের বাহার না থাক যৌবনের ঠমক আছে।

সন্ধ্যাবেলায় বসে বসে রুটি বেলছিল। রামধনি সেঁকছিল।

হঠাৎ ঢুকে পড়ল অনন্ত।

ওরা দুজনেই অবাক। বাসমতী ঘোমটায় মুখ ঢাকল। রামধনি অবাক-চোখে তাকিয়ে বলল—আরে বাবু আপ ?

—হাঁ। থোড়া বাৎ হ্যায়।

ওকে বুঝিয়ে বলল আসন্ন আন্দোলনের কথা তারপর দেখা করতে চাইল সেইসব বন্ধুদের সঙ্গে, যারা রাজী হয়েছিল।

রামধনি ওকে ঘরে বসিয়ে রেখে বন্ধুদের ডাকতে গেল।

টিমটিম করে হ্যারিকেন বাতি জ্বলছে। ঘরের বাইরে উনুন জ্বলছে। বাসমতী উনুনের আশে পাশে ঘোরাঘুরি করছে। প্রেমা যত সহজে ওর সঙ্গে কথা বলতে আসে ও তা পারে না। ঘোমটার আড়ালে কুলকুল করে ঘামে।

ঘরে আসবাবপত্র কিছু নেই। এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল পর্যন্ত পেরেক গেঁথে তার টাঙানো! তারই উপর লুঙ্গি গামছা লেঙ্গট শাড়ি ব্লাউজ। এক কোণায় একটি কাঠের বারুদ বাক্সো তার উপর সেই ফুলতোলা স্যুটকেশটি। অন্য কোণায় মাটি, এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি, ডেচকি, রান্নার সরঞ্জাম। আর একটি দড়ির ঝোলা খাট, অনন্তর খাতিরে খাদ থেকে আনা ব্রাটিশ ক্লথের উপর একটি শাড়ি বিছিয়ে দিয়েছে।

তার উপরে বসতেই খুরা বাবু মচ মচ করে উঠল। কি করে শোয় ওরা ? আপন মনে একটু হাসে ও। ভালোই হয়। শরীরের ওজনেই পরস্পর গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে।

খাটের উপর বিছানো শাড়ি কুঁচকে গেল। ঘর ভর্তি ঘামের গন্ধ। বসতে পারল না। গরমে ঘাম জবজবে হয়ে গেছে সে নিজেও। উঠে পড়ল। বাইরে এসে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

বহু কষ্টে দশ-বারোটি লোক যোগাড় করে নিয়ে এল। তাও কত ভয়ে ভয়ে। তাদেরকেই পাখী পড়া করে বোঝাতে লাগাল ও। সেই একই কথা—শ্রমিক ঐক্য, সংগঠন, আন্দোলন, সংগ্রাম ইত্যাদি। হাজারবার বলা হয়ে গেছে বলে ওরও সেসব মুখস্থ হয়ে গেছে।

বিশেষ কোনো সাড়া নেই। তবে একজন বলল—বাবুজী ? আমরা ইউনিয়নের কথা জানি। আপনারা কি করতে চান তাও জানি। মনে মনে আপনাদের সাহসের তারিফ করি। সমর্থন করি। কিন্তু কি করবো ? সরদাররা জানতে পারলে আমাদের জান খতরা করে দেবে। বউ-বিটির ইজ্জত লুট করে দেবে। দেশে যে ক্ষেতি-বাড়ি আছে তা বে-দখল করে বাপ-মাকে ভিখমাঙ্গার দশা বানিয়ে দেবে। এর যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন তবে আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকবো।

অনন্ত বলল—সরদার একজন তোমরা একশোজন, হাজারজন, লাখোজন।

সবাই যদি এককাট্টা হও তাহলে কোন সরদারের হিম্মৎ হবে তোমাদের উপর অত্যাচার করে ?

—হবে বাবুজী। সরদার একজন নয়। তাদের মাথার উপর গোমস্তাবাবু। ডি. সি. সাহেব, ম্যানেজার সাহেব, খুদ কোম্পানী। তাদের চাপরাশীর হাজার লাঠি। বন্দুক। আমরা কি করে মোকাবিলা করব ?

—মোকাবিলা আমরা করবো। তোমরা শুধু সঙ্গে থাকবে।

এইভাবে রাত দশটা পর্যন্ত আলোচনা চলল। আর অনন্তের সময় নেই। গৈরী হয়তো একাই বসে আছে। সোমবারে আসার কথা দিয়ে উঠে পড়ল।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। সবেমাত্র চাঁদ উঠেছে। তখনো লালিমা কাটেনি। গা ছমছমে অন্ধকার। পিছনে পাড়ের ওপর গাছগাছালির ছায়া। শিয়াল ডাকছে হুক্কা-হুয়া। শিমুল ডালে শকুনির ছানা কাঁদছে। খানিক দূরে শ্মশানভূমি।

তারই মধ্যে চুপচাপ বসে আছে গৈরী। বুক তোলপাড় করা অস্থিরতা। কান পেতে আছে পরিচিত পায়ের শব্দটির জন্য।

এক সময় সেই শব্দ কাছে এল। খুব কাছে। তার চোখ, কান, ত্বক, মাসের অতি সন্নিকটে। তখন সে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিল।

অনন্ত কৈফিয়তের সুরে বলল—দেরি হয়ে গেল রামধনির ধাওড়ায়। লোডারদের নিয়ে মিটিং করলাম।

তবু গৈরী সাড়া দিলো না। অনন্ত হাঁটু গেড়ে কাছে বসল। মুখে হাত দিতে গেল ও জোর করে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

অনন্ত বুঝল—গৈরীর মান হয়েছে। মনে মনে হাসল।

একটি ফুলের মালা নিয়ে এসেছিল ওকে দেবার জন্য। আর একটি আংটি।

বলল—বেশ। তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না। আমিও এটা দিয়ে চলে যাই। মালাটি পরিয়ে দিলো।

গৈরী গলে জল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল—মালা!

হ্যাঁ তো। আরো একটা জিনিস আছে। ডানহাতটা দে।

ও হাত বাড়িয়ে দিলো। অনন্ত ওর অনামিকায় আংটি পরিয়ে দিলো। এই তার জীবনে প্রথম সোনার গয়না। তাতে নাম লেখা অনন্ত। সেটা এখন পড়তে পারল না। তারপরে দিলো ওর ফটোটি।

গৈরী অভিভূত হয়ে ওর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকাল। তারপর গড় হয়ে প্রণাম করল।—অনন্ত বলল—এ কিরে ?

—তুমি আমার স্বামী। তুমিই আমার গুরু।

বাইশ

ফাটকবাজারে প্রকাশ্য জনসভা। মঞ্চ হয়েছে। মাইক এসেছে, নেতারাও উপস্থিত। চার পাঁচশো কুলিকামিন জড় হয়েছে মিটিং দেখতে। শ্লোগান চলছে। ব্যস্ততা বাড়ছে?

ততদিনে বর্ষাও নেমে গেছে। আষাঢ়ের আকাশে ছায়া ছায়া মেঘ। পর পর কয়েকদিন বৃষ্টিও হয়েছে। মাটি ভিজে। তারই উপর বসে পড়েছে সবাই। অনন্ত আর গোপনে থাকতে চায় না। সেইদিন প্রথম সে আত্মপ্রকাশ করল। অবশ্য অধিকাংশ কুলিকামিন জানতো। কিন্তু প্রকাশ্য জনসভায় মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে মাইকে ভাষণ দেওয়া সেই প্রথম।

উরু থেকে হাঁটু পর্যন্ত থর থর করে কাঁপছে। প্রথম দিকে গলাটাও তারপর সব ঠিক। মামুলি কিছু কথা বলার পরই চড়াস্বরে বলতে লাগল—ভাই সব। আমি বহুলোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যা বুঝেছি তা হলো আমাদের শ্রমিকরা ভয়ের রাজত্বে বাস করছে। কিন্তু তাদের কিসের ভয়? সাহেবরা কি জুজু বটে? নাকি গোমস্তা চাপরাশীদেরই লাঠি আছে? সরদাররা কি লাটের বাঁট। তোমরা সব এক হও সব যাদুর মোকাবিলা করবো।

চারিদিক থেকে হাততালি পড়ল।

ওদের যদি একটা লাঠি বের হয় আমাদের একশোটা হবে। ওদের যদি একশো হয় আমাদের হাজারটা হবে। আমরা একা নই। তামাম হিন্দুস্তানের কয়লা কুলি আমাদের সঙ্গে। মালিক ম্যানেজার, গোমস্তা চাপরাশীর কালো হাত ভেঙে দেবো।

আবার হাততালি।

আমরা চাই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। কিন্তু মালিকের দালালরা যদি অশান্তি সৃষ্টি করে তবে তাদেরকে হালাল করতে পেছপা হব না।

আবার হাততালি।

শ্রমিকের কল্যাণের জন্যই শ্রমিক সংগঠন। যার নাম ট্রেড ইউনিয়ন। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এর সঙ্গে বেইমানি করবো না। সমস্ত শ্রমিকের জন্য আমাদের দুয়ার খোলা আছে কিন্তু কেউ যদি চালাকি করে তবে তার জবাবও দিতে জানি।

আরো বলে রাখছি অবিলম্বে রেশন আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছি। সব শ্রমিক তাতে যোগ দিন। কেউ রেশন তুলতে যাবেন না। যদি কেউ যায় তবে জানবো সে বেইমান। কোম্পানীর দালাল। তার কি ব্যবস্থা নিতে হয় জানি। সরদার,গোমস্তা, চাপরাশীদিকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি—লাঠি আমাদেরও আছে। তা চালাতেও জানি।

হাততালির পর হাততালি।

তার কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে আরো উচ্চগ্রামে উঠতে লাগল। বক্তব্য তীব্র থেকে

তীব্রতর। শাসানির পর শাসানি। আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতার শেষে সে যখন সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কথা শেষ করল তখন কুলিকামিনদের মনে নেতার আসনটি পাকা হয়ে গেছে।

হ্যাঁ। এই রকম মানুষই চাই। এমনি হিম্মৎবলা, এমনি বোলনেবালা। যে নেতারা এতদিন থেকে অনন্তকে দেখে এসেছে শান্ত, স্থির, বক্তব্য দৃঢ় কিন্তু ভাষায় সংযত; চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ এবং পাওনা যোওনার লাভক্ষতির উপর যত্নবান তারা অবাক হয়ে গেছে। সে যে এমনভাবে জ্বলে উঠবে মালিকের কালো হাত ভেঙে দেবার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে তা কেউ ভাবতেই পারেননি। কিরকম আবিষ্ট হয়ে শুনছিল। ওর বলা শেষ হলে অন্যান্য বক্তারাও ঐ একই সুর ধরে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিলো।

ফলত শ্রমিকদের মধ্যে একটা টগবগে ভাব জেগে উঠল। যারা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছিল তারা মনঃস্থির করল তাদের মনে ভয় এবং প্রতিহিংসা দুইই জেগে উঠল।

মেসের দিকে ফিরবার সময় সুমিতবাবু বললেন—তোর বক্তব্য শ্রমিকরা খুব নিয়েছে। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগছে তুই এত গরম হলি কি করে?

—দাদা! কম পক্ষে দু'হাজার জনের সঙ্গে গোপনে কথা বলেছি তাতে দেখেছি সবাই একরকম ভয়ের শিকার। ক্লৈব্য ত্যাগ করে উঠবারও ইচ্ছা নেই। সেইজন্যই আমি মনে মনে তৈরি হয়েছিলাম একটা গরম হাওয়া বইয়ে দেবার জন্য। ভয়কে জয় করতে হলে পাল্টা ভয়ের সৃষ্টি করাই ভালো। তাতে শ্রমিকদের মানসিক ক্ষমতা বাড়বে। আমি কি ভুল করেছি?

—না। ঠিকই করেছিস। বরং হিরো বনে গেছিস।

পরদিন কলিয়ারীর সামনে একটা নূতন দৃশ্য। বেশ বড় সড় শ্রমিকের মিছিল। পুরোভাগে সুমিত চ্যাটার্জী, অনন্ত শর্মা, হরিহর গান্ধী, তিলক সিং, যমুনা যাদব, মগহু হুনিয়া, রাবণ মাঝি, কালো বাউরী, শম্ভু বাউরী, শকুন্তলা বাউরিনী, ফুলমনি প্রমুখ।

বড় সাহেব অফিসেই ছিলেন। ভ্রূ কুঁচকে সামনের দিকে তাকালেন। পুরো চাতালটা লোকে লোকে ভরে গেছে। সবাই এই কলিয়ারীর শ্রমিক। তারা যে একসঙ্গে জমায়েত হয়ে ম্যানেজারের অফিসে আসতে পারে এই ধারণাটাই ওঁর ছিল না।

ভিতরে ভিতরে শ্রমিকদিকে একতাবদ্ধ করার, আন্দোলনে সামিল হবার বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ করার, চলতি রেশন ব্যবস্থা তুলে দেবার জন্য যে কাজ চলছে এবং গতকাল বিকেলে ফাটকবাজারে খুব গরম গরম লেকচার বাজী হয়েছে, অনন্ত নামে একটা কোর্থ ইয়ারের ট্রেনি কোম্পানীকে শাসানি দিয়ে বক্তৃতা করেছে এসব সংবাদ ওঁর কাছে আছে। নেই শুধু এই মিছিল ও সমাবেশের খবর।

ভিতরে ভিতরে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। এরকম অবস্থার মোকাবিলা তো করতে হয়নি কখনো। ব্রিটিশ আমল থেকে ম্যানেজারী করে আসছেন। দাপট ও শাসনের ব্যাপারগুলোই জানা আছে।

কলিংবেল টিপে বড়বাবু রামহরিকে ডেকে নির্দেশ দিলেন ডি. সি., ডি. ডি., হেড চাপরাশী, গোমস্তাবাবু, ও ইনচারজবাবুকে ডাকো।

ফোন করলেন, এজেন্ট, সি এম. ঈ, পারসোন্যাল অফিসার ও চীপ সিকিউরিটি অফিসারকে। তাঁদের পরামর্শ জানতে।

বাইরে শ্লোগান চলছে। মিটিং হচ্ছে। উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দেওয়া হচ্ছে রেশন বন্ধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। সবই কানে আসছে। কি অসহ্য ব্যাপার। কি স্পর্ধা।

দেখতে দেখতে দু'তরফেই ভিড় জমে গেল। গাড়ির পর গাড়ি এল সাহেব সুবো নিয়ে। দু পক্ষের পুরো টেনশান।

সুমিতবাবু এলেন জনকয়েক সহকর্মী নিয়ে। ম্যানেজারের অফিসে ঢুকবার মুখে দারোয়ান তাদের পথ আটকে দিলো।

উনি বললেন—আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

ম্যানেজার বললেন—আগে জনতা হটাও। তারপর আলোচনা।

—জনতা তো বাইরে আছে।

—তাহলেও এটা জুলুমবাজীর চাপ সৃষ্টি করেছে।

—বেশ তাহলে যে যেখানে আছেন থাকুন।

ফিরে গিয়ে শ্রমিকদিকে বললেন কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না তাহলেও হটব না। এখানেই বসে পড়।

ব্যাপারটা বেশিক্ষণ চলল না। দু'ভ্যান পুলিশ এসে বেপরোয়া লাঠি চালিয়ে শ্রমিকদিকে ছত্রভঙ্গ করে দিলো। সুমিত চ্যাটার্জী সহ শতকজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

যাবার সময় ওরা শ্লোগান দিতে দিতে চলল শ্রমিক ঐক্য-জিন্দাবাদ। রেশন আন্দোলন—সফল কর।

মালিক ম্যানেজারের কালো-হাত ভেঙে দাও ভেঙে দাও। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ হৈ হল্লা, গোলমাল, চিৎকার, ও আর্তনাদ চলল। তারপর সব ঠাণ্ডা। ভারী বুট পরা চাপরাশীর দল অফিসের সামনে মার্চ করতে লাগল। এই মহড়া সারা দিনরাত চলবে। একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করতে হবে তো।

—আজই শ্রমিক ঐক্যের শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডকরণ করে দিচ্ছি। ম্যানেজারের সদম্ভ ঘোষণা।

বয়লার ফার্নেস দাউ দাউ করে জ্বলছে, চিমনী দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, বন্ বন্ করে পুলিচাকা ঘুরছে।

পুলিশের লাল পাগড়ি, বেঁটে লাঠির ত্রাস দু'হাজার ফুট নীচের পাতাল পুরীতেও ছড়িয়ে গেছে। মানুষ আর কথা বলছে না। মেসিন চলছে। ঘর ঘর কর কর শাঁ শাঁ ঘটাং ঘট—

ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ভিন্ন শব্দ। আবহ সঙ্গীতের মতো বাজছে।

কুলিধাওড়গুলো একদম ফাঁকা! ছেলেমেয়েরা ঘরে ঢুকে গেছে। কে কোথায় ভয়ে পালিয়েছে। রেল ফটকের বাজারে ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে। কারো পা বাড়াবার জো নেই। চাপরাশীদের পায়ে নাগরা জুতো মচ মচ শব্দে স্বাধীন ভারতের শ্রমিক ঐক্যকে খতম করে দিতে হরদম টহল দিচ্ছে।

গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল খুলেছে। সামনে ষান্মাসিক পরীক্ষা। কিন্তু গৈরীর পড়তে মন নেই। থাকবার কথাও নয়। যে অবস্থায় ও পড়েছে অন্য মেয়ে হলে স্কুল যেতেই পারতো না। শক্ত ধাতের মেয়ে বলেই পারছে। বাইরে থেকে দেখে বোঝবারও জো নেই। না হলে ভিতরে ভীষণ টানাপোড়েন প্রচণ্ড অস্থিরতা।

ওর শ্বশুর ওর বাপকে একশো টাকা দিয়ে দিয়েছে, স্যাকরার দোকানে রূপোর গহনা তৈরি হচ্ছে—বিছে হার, বাজু বন্ধ, ঝুমকা, হাতের চুড়ি, কঙ্কন, দ্বিরাগমনের দিন ধার্য হয়েছে পাঁচই শ্রাবণ। তার আর সময় কোথা ?

এদিকে রাত্রে ঘুম হয় না। সকালে উঠতে কষ্ট হয়। ঘন ঘন হাই তোলে শরীরটা যেন দশমন ভারী। এমনটা আগে ছিল না। গা জ্বর জ্বর বমি ভাব দুদিন স্কুল যেতে পারেনি।

কে বা ওর খবর নেয় ? হেনী তো সকালে কলিয়ারী যায়। বিকেলে ফেরে। সন্ধ্যা হলেই মদে মাতাল। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে প্রজনন। ছেলে মেয়েদের খবর কে রাখে ?

সেটা গৈরীর পক্ষে শাপে বর। পার হয়ে গেল একটা বিষম সময়। এবারও বুঝতে পেরেছে। ধরা পড়েছে নিজের কাছেই। নারীদেহের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে রজঃস্রাবও একটি। মিলনের সুখ পেতে না পেতেই অসময়ে ঘটে গেল ঋতু পরিবর্তন। তারপর জীবনের সেই স্মরণীয় শনিবারের রাতে পৌঁছে গেল প্রাণের বার্তা।

কিন্তু যার জন্য এত সেই জানে না। তাকে জানাবে কি করে ?

শনিবারের পর শনিবার পার হয়ে গেছে শ্রেফ রাত জেগে। কত আশা করে বসে থেকেছে তবু খবর আসেনি। শনিবারের রাত অভিসারের রাত হতে পায়নি কত যুগ যুগান্তর থেকে।

তবে কি অনন্ত তাকে ফেলে দেবে ? তার গর্ভে সন্তানের জন্ম দিয়ে সরে পড়বে ?

না না। অসম্ভব। তার ভালোবাসা অতলস্পর্শী। সমুদ্রের মতো গভীর।

কাঠের বাক্সোর ভিতর কাপড় চোপড় দিয়ে ঢাকা সযত্নে রাখা শুকনো ফুলের মালাটি বের করে গলায় পরে, শুঁকে আবার রেখে দেয়। আংটি বের করে আঙুলে পরে। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে অনন্ত নামটি। ফটোটি চেপে ধরে ঠোঁটে। দু'চোখ বেয়ে দর দর ধারায় জল গড়ায়। ভিতরটা ডুকরে ডুকরে কাঁদে।

হায়। কি মরনে মরলাম!

এই যখন তার মনের অবস্থা তখন খবর এল পুলিশের লাঠি চালনার। তারপর একটির পর একটি দুঃসংবাদ—সুমিতবাবু ধরা পড়েছেন। তার সঙ্গে গোবিন মামু, হরিহর গান্ধী। অনন্ত ফেরার। পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ভীষণ মুষড়ে পড়ল ও।

তবু সে পরের দিন স্কুল গেল। কারণ ঘরের বাইরে না গেলে খবর পাবে কি করে? কিন্তু কোথায় বা খবর নেবে? অনন্তই বা খবর দেয় না কেন? না দিক। নিজেই যাবো খোঁজ করতে? কিসের লজ্জা? সব লাজ শরম তো তাকেই দিয়েছি? লোকে কি বলবে? বলুক।

কমলেন্দু শনিবার বাড়ি গিয়েছিল। সোমবার ফিরতে পারেনি। মঙ্গলবার মেসে ফিরে ছন্ন ছাড়া ভাব দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল। সুবীর ও অনন্ত দুজনকেই পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ট্রেনিদের অনেকেই মেস ছেড়ে চলে গেছে। এত পুলিশের হিড়িক, কে থাকবে? মেস ফাঁকা।

ও পৌঁছবামাত্র একবার পুলিশ, একবার চাপরাশীর কাছে জবাব দিহি করতে হলো। পিওন এসে ডেকে নিয়ে গেল ডি. সি. সাহেবের কাছে। উনি রীতিমতো ধমকি দিলেন—অনন্তের নামে বডি ওয়ারেন্ট আছে। ও মেসে আসবেই। তখন নিশ্চয়ই খবর দিও। না হলে তোমার দশাও খারাপ।

কমলেন্দু ওকে কিছু বলল না। ডিউটিও গেল না। অনন্তের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু পুলিশ যাকে খুঁজে বের করতে পারছে না তাকে ওকি খুঁজে বের করতে পারবে? দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে যখন মাথাটা কামড়ে খাচ্ছে পেটে খিদে কল কল করছে তখন ওর সেই বোধটা এল।

মেসে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে বই খুলল। কিছুতেই মন বসল না। আই ঢাই করে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। হঠাৎ দরজায় মৃদু ঠক্ ঠক্ শব্দ। খুলেই থ।

—আরে গৌরী! তুমি?

ম্লান হেসে গৌরী বলল—হ্যাঁ দাদা।

—কি হয়েছে তোমার? মুখটা এমন শুকনো কেন?

—কিছু না স্কুল থেকে ফিরছি তো।

মেয়েদের সঙ্গে কথায় আচরণে কমলেন্দুর একটা জড়তা আছে। সে ওকে ঘরে এসে বসতে বলতেও পারছে না। গৈরীও বসল না।

জিজ্ঞাসা করল—আপনার বন্ধুর খবর পেলেন ?

—না। সকাল থেকে অনেক ঘোরাঘুরি করলাম।

—পুলিশে ধরা পড়েনি তো ?

—কি জানি ?

—আচ্ছা চলি—তাহলে।

—ওকে কিছু বলতে হবে ? মানে যদি খবর পাই।

গৈরী একটু হেসে বলল কি আর বলবেন ? আমি খবর নিতে এসেছিলাম। এইটুকুই বলে দেবেন। আবার একবার আসবো না হয় তো।

ও চলে গেল। ক্লান্ত ও অবসন্ন ভঙ্গীতে।

কমলেন্দুর মনে খটকা লাগল। অনেক লোকই তো অনন্তর খোঁজ নিতে আসছে কিন্তু এত ব্যগ্রতা তো কারো মুখে দেখেনি। কি রকম যেন উদাস উদাস ভাব। ওর উপরে এত টান কেন ?

আঃ। বেচারী অনন্ত! গরীবের ছেলে। বিধবা মায়ের জ্যৈষ্ঠ পুত্র। সংসারে তার কত দায় দায়িত্ব। একটা গোটা পরিবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে আজ এমন ঝামেলায় পড়ল যে বডি ওয়ারেণ্ট!

রাত ঝম্ ঝম্ করছে। কলিয়ারীর যান্ত্রিক শব্দতরঙ্গ আবহমণ্ডলকে ছেয়ে রেখেছে। সারাদিনের ধকলেও ঘুম এল না।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশটা ঘোর অন্ধকার।

তেইশ

অনন্ত মেসে ফিরল বুধবার রাত্রে। তখন চারিদিক নীরব। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। পিছন দিক থেকে এসে জানালায় মুখ বাড়িয়ে ডাকল—কমলেন্দু!

শ্মশানযাত্রীর মতো মলিন ও রুক্ষ একটি মুখ। খোঁচা খোঁচা কালো চাপদাড়ি। অতিশয় উজ্জ্বল দুটি চোখ এবং ঈষৎ উঁচু শ্বদন্ত দেখেই তড়াক করে উঠল।

দরজা খুলে চাপা কণ্ঠে বলল—তুই ?

—হ্যাঁরে! তুই কবে ফিরেছিস ?

—গতকাল।

—এদিকের খবর সবর সব শুনেছিস ?

—হ্যাঁ। সেজন্যই তো ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না।

—ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলতে বলতে জামা, প্যাণ্ট, জুতো মোজা খুলে ফেলল। কি বিটকেল দুর্গন্ধ! নাকে গামছা চেপে বলল—শ্যালা। কোন নর্দমায় পড়েছিলি?

—নর্দমাই বলতে পারিস। এক কাপড়েই তো চলছে। ঘামে, বৃষ্টির জলে কতবার শুকোল। যাক গে এগুলো কামিনকে দিয়ে কাচা করিয়ে রাখিস। আমি স্নান করে আসি। কিছু খাবার আছে রে?

—দেখছি।

হাতে তেলের শিশি ও সাবান নিয়ে গামছাটা গায়ে দিয়ে জন্মদিনের পোশাকে বেরিয়ে গেল বাথরুমের দিকে।

কমলেন্দু মেসের ঠাকুরকে উঠিয়ে বলল খাবার আছে?

—এখন কি থাকবে বাবু।

—অনন্ত এসেছে, খাবে কি?

—ওঃ তাই নাকি! ধড় ফড় করে উঠল। একটু ভেবে বলল ভাতে জল দিয়ে দিয়েছি। তাই ছেঁকে দিচ্ছি। আর পোস্ত বাটা, ডিম ভাজা করে দিচ্ছি।

—তাই কর। ঘরেই খাবার আনবে।

অনন্তর স্নান করতে একটু সময় লাগল। গায়ে অনেক ময়লা ছিল তো। কাচা কাপড় পরতে পরতে বলল—মনে হচ্ছে প্রাণটা এল।

ঠাকুর খাবার নিয়ে এল কাঁচা লঙ্কা, পিঁয়াজ, পোস্ত বাটা, ডিমভাজা দিয়ে জল ছাঁকা ভাতেই অমৃতের আস্বাদন।

খেতে খেতে বলল—পুলিশ যখন লাঠি চালু করে দিলো তখন ভীষণ হাউ মাউ শুরু হয়ে গেল। আমি এক ব্যাটার লাঠি কেড়ে ঘা কতক বসিয়েছিলাম কিন্তু কি বলব যত শ্যালা কাওয়ার্ড। এমন পালাতে লাগল যে প্রতিরোধ করার কোনো চেষ্টাই নেই। আমারও ঘাড়ে দু'চার লাঠি পড়ল। কেমন বেঘোর হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর দেখলাম কালো বাউরী আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে বাউরী ছেলেরা ছিল ওরা পিছন ফিরতে দিলো না ধাওড়া পেরিয়ে এক দু-নম্বর চানকের পাস দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম হগুনিয়ার বাউরী পাড়ায়। সারা দিনরাত বেরুতে দিলো না। মাইরি। এই লোকগুলোর আমার উপরে এমন মায়া পড়ে গেছে যে আশ্চর্য না হয়ে পারি না।

—তারপর?

—ওরাই কলিয়ারীর খবরাখবর এনে দিলো। সুমিতদার অ্যারেস্টের খবরে বিচলিত হয়ে পড়লাম। রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে ভোরে উঠে আসানসোল। সেই থেকে পার্টি, লীডার, উকিল, মোক্তার করে বেড়াচ্ছি সুমিতদাকে জামিন করাবার জন্য। কিন্তু আমি তো কখনো কোর্ট দেখিনি। শ্যালা হদিশ করতেই দুদিন খরচ হয়ে গেল।

থালার উপরেই হাত ধুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়ল।

বলল—এখন রাত বারোটা। ঠিক চারটের সময় উঠিয়ে দিস।

—আর সুবীর কোথায়?

—হ্যাঁ। ওর খবর জানি। পুলিশে খুঁজছে শুনেই হাওড়ার ট্রেনে চড়ে বসেছে। ওর মেসোমশাই কলকাতার পুলিশ অফিসার। তাঁর কাছেই গেছে। ঐ শ্যালা ডি. সি. ওকে ফাঁসাল। শুধু একটাই রাগ ও আমার বন্ধু। না হলে সুবীর আমাদের আন্দোলনে ছিল না।

—ও শ্যালা আমাকেও ধমক দিয়েছে কিন্তু তোর সঙ্গে ওর এত কিসের রাগ?

অনন্ত হাসতে হাসতে বলল—তাও বুঝিস না।

—ওঃ। কল্যাণীর জন্য।

—হ্যাঁ। আশাভঙ্গ সঞ্জাত ক্রোধ। শ্যালা! সুন্দরী মেয়ে প্যায়দা করেছিস বাজারে হটকেকের মতো বিক্রি হবে। তো আমার পিছনে লেগেছিস কেন? আমি ছাড়া কি কাস্টোমার নেই।

ওর রাগের কথায় কমলেন্দু হাসতে হাসতে বলল—সে তুই যাই বল এই অফারটা নিতে পারতিস। তার উপরে কল্যাণীর একটা ভালোবাসার টান আছে।

—সে তো শুচিরও আছে। কিন্তু আমি কি ভালোবাসার দোকান খুলেছি? একটাই হৃদয় একজনকেই দেওয়া যায়। বুঝেছিস। ঘুমো।

পাশ ফিরে চোখ বুজল। একটু পর ঘুমিয়ে পড়ল।

কমলেন্দু জেগে রইল। অনেক দুঃখ কষ্টের সময় পার হয়ে তার বন্ধুটি ঘুমিয়েছে। ওকে পাহারা দিতে হবে তো। ঠিক সময়ে জাগিয়ে দিতে হবে তো। না হলে যে ধরা পড়ে যাবে। অনন্তকে ও বড্ড ভালোবেসে ফেলেছে।

ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠে আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিল।

বলল—দশটা টাকা দে।

কমলেন্দু টাকা বের করে বলল—একটা কথা তোকে বলতে ভুলে গেছি। গৌরী এসেছিল তোর খবর নিতে। বেচারীর মুখ শুকিয়ে আমসি। এমন ব্যাকুল চাউনি যে দেখলেই তোর মন টন টন করবে। অতটান কেন রে?

—ও আমার প্রেমে পড়ে গেছে।

—শ্যালা! ওর পিঠে থাপ্পড় মেরে বলল সব মেয়ে তোর প্রেমে পাগল।

—দেখতেই তো পাচ্ছিস। তোর মতো নেকু পার্টি আছি। দস্তুর মতো হিরো।

বারান্দায় বেরিয়ে পড়েছিল। কমলেন্দু বলল—সাবধানে থাকিস।

—হ্যাঁ।

—গৌরী আবার আসবো বলেছে—কি বলবো?

—কি আবার? বলবি এসেছিল চলে গেছে। আবার শনিবার আসবো।

—আচ্ছা! কিন্তু ওকে ডেট বলা কি ঠিক হবে? যদি ফাঁস করে দেয়।

—যতই হোক প্রেমিকা তো! প্রাণের টান আছে। কাউকে বলবে না। বুকে গেঁথে রাখবে। বলে দিস শনিবার।

হাসতে হাসতে চলে গেল।

অনন্ত যে হাসির ছলে তার জীবনের ধ্রুব সত্যটি বলে দিয়ে গেল এবং শনিবার শব্দটিতে বিশেষ অর্থ রেখে গেল অঙ্কতে লেটার পাওয়া কমলেন্দু তার তাৎপর্য ধরতে পারল না। সেও হেসে হাত তুলল।

তখনো আঁধার কাটেনি। তাই শুয়ে পড়ল।

আকাশ মেঘলা। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। দামোদরের জল মাটির পাড়ে এসে আছাড় খাচ্ছে। গুর গুর শব্দ। ভেজা মাটির পথ দিয়ে দুটি ছায়ামূর্তি হেটে যাচ্ছে প্রাণের আবেগে। কারো মুখে সাড়া নেই।

চারিদিকে ঘন অন্ধকার। ঝক ঝক করছে নদীর জল। মিট মিট করছে কলিয়ারীর বিজলী বাতিগুলো। পথ দেখা দায়।

তবু এই বৃষ্টিপাত এই অন্ধকার তাদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অন্ধকারেই গা ঢাকা দিয়ে পুলিশ ও গুপ্তচরের চোখ এড়িয়ে গৈরী যে ঘরটায় থাকে তার জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ছাঁচ দিয়ে জল পড়ছিল। জানালার টিনের আগল ও দুটি লোহার রড। সেইখানে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে ডাক দিয়েছিল।

শনিবারের রাত। গৈরীর কান খরগোসের মতো খাড়া। অনন্তেরই প্রতীক্ষায়। কমলেন্দু মারফৎ ঐ একটি শব্দেই বুঝে নিয়েছিল তার ইঙ্গিত। তারপরে কি ঘুম হয়?

অথচ বাদলা রাতে সবাই ঘুমুচ্ছে পরম আয়েসে। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসেছিল ও। ঠিক জায়গায় দুজনের দেখা। পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে চলল দামোদরের দিকে।

একটি শ্যাওড়া গাছ। নিবিড় ঘন পত্র পল্লব। অসংখ্য জোনাকীর আলো। পায়ের নিচে ভিজে মাটি। কচি কচি ঘাস।

অনন্ত বলল—এইখানেই বোস গৈরী। শুকনো মাটি তো পাবি না। ভিজে ঘাসের উপরেই বসে পড়ল। পরস্পরের গায়ে গা দিয়ে খুব কাছাকাছি। অনন্ত ওকে আরো কাছে টেনে নিল।

অস্ফুট কণ্ঠে গৈরী বলল—উঃ কতদিন পর।

—হ্যাঁ! শ্যালা প্রেম নয় বুকফাটা ব্যাপার। কি করে যে দিনরাত কাটে?

—ক'দিন থেকেই তোমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছিলাম।

—কেন রে?

—নতুন খবর আছে।

—কি ?

—ফল ধরে গেছে।

—এ্যাঁ অনন্ত চমকে উঠল।

গৈরী একটু হেসে ওর বুকে মুখ দিয়ে বলল—খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। তাই না ?

—যার হবার তার তাড়াতাড়িই হয়। শরীরে ত্রুটি বিচ্যুতি না থাকলে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু ব্যাপারটা তো কেলেঙ্কারী হয়ে গেল।

—তাতে কি ? আমার মাথায় তো সিঁদুর আছে। ঐ দোহাতেই কেটে যাবে।

—পরের নামে সিঁদুর পরবি আমার সন্তানের মা হবি ?

—সে কি করবে ? একটা তো আড়াল চাই—কৈফিয়তও চাই। সিঁদুরটা দেখে ভয় পাচ্ছিলে এখন ওইটাই রক্ষা কবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনন্ত বলল—নীতি ও বিবেকের সঙ্গে কি চূড়ান্ত বেইমানি। মিথ্যা পরিচয়ের গ্লানি নিয়ে জন্ম নেবে আমার সন্তান। মনে হয় সব ছিঁড়ে খুঁড়ে ছারখার করে দিই। খুলে যাক মুখোশ। বেরিয়ে আসি সাদা মুখে। মিথ্যার সঙ্গে কোনো আপস নেই।

গৈরী ওকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বলল—তার কি সময় চলে যাচ্ছে ? তোমার বড় রাগ। দপ করে জ্বলে ওঠো। একটু ঠাণ্ডা হও তো। এতদিন পর কাছাকাছি এসেছি—ভালো করে আদর কর

অনন্ত শান্ত হলো। ভিতরে নয়—বাইরে।

জোনাকী জ্বলা শ্যাওড়া গাছের নিচে জননী হবার সম্ভাবনা নিয়ে যে প্রেয়সী তার বুকের সঙ্গে সেঁটে আছে অসীম মমতায় তার মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—তোর মুখটা দেখতে পাচ্ছি না রে।

—আমিও তো !

—চুমু দে।

—নাও।

হৃদয়ের সেই তন্ত্রীগুলি প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে জেগে উঠল যার জাগরণ না হলে প্রাণের বার্তা উহ্যই থেকে যায়। গাছের পাতা বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল টপ টপ করে। ব্যাঙগুলো নানা স্বরে ডাকছে। বুঝি বা মিলন রাগিণী।

অনেকক্ষণ পর গৈরী নিজেকে সামলে নিল। ভিজে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে পরে বলল—আরো একটা খবর আছে।

—কি ?

—আমার গাওনার দিন ঠিক হয়ে গেছে। ৫ই শ্রাবণ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল অনন্ত। বিহ্বলতা কাটতে সময় লাগল।

ধীরে ধীরে শান্ত হলো। ক্লান্ত ও খিন্নকণ্ঠে বলল—এই ভয়ই করেছিলাম। এই আমাদের প্রেমের পরিণতি। জেনেশুনে বিষ করেছি পান। অথচ নীলকণ্ঠ হবার সাধ্য নেই।

—কি করব বল ?

—কি করবি ? পেটে বাচ্চা নিয়ে স্বামীর ঘর করতে যাবি। লোকনিন্দা থাকবে না। ভয় ভাবনা থাকবে না। অনায়াসে অবলীলায় ঘরণী, গৃহিণী, জননী হয়ে যাবি। ছোটলোক আর কাকে বলে ?

কি বিস্ময়কর হতাশা সেই কণ্ঠস্বরে। কত তিক্ত, কত বিষাক্ত তার অর্থ।

—আমাকে এত ছোট মনে করছ ?

—বড় মনে করবো কি করে ? আজ আমি অন্ধকারের জীব। পেঁচার মতো লুকিয়ে থাকি। সূর্যের আলোতে মুখ দেখাবার জো নেই। হাজতের দিকে পা বাড়িয়ে আছি। বিচারকের রায় শুনবার জন্য প্রতীক্ষা করছি। চাকরীটা তো যাবেই। এই সময়ে তুইও আমাকে দাগা দিবি গৌরী ? তবে আমি কি নিয়ে বাঁচবো ?

গৌরী থর থর করে কাঁপছিল। অনন্তকে ধরে টাল সামলাল।

বলল—উঃ! কি বলবো তোমাকে ? গা-ঢাকবার চিন্তাতেই ডুবেছিলাম। কিন্তু তোমাকে দাগা দেবো একথা ভাবলে কি করে।

—তাহলে ওসব কথা বললি কেন ?

—সে তো খবর হিসাবেই বলেছি। তুমি মাথা গরম করে আছো। একটু তলিয়ে বুঝলে না। আমি কি তোমাকে দাগা দিতে পারি ? তাহলে আকাশটা ভেঙে মাথায় পড়বে না ? এই বুঝলে আমাকে—

কান্নায় ভেঙে পড়লো ও।

আঘাতটা বড় তীব্র হয়ে গেছে। অনন্ত নিজের ভুল বুঝতে পেয়ে ওকে বুকে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরে দিলো।

গৌরী বলল—যতই ছোট জাতের মেয়ে হই তোমার সন্তানের গায়ে দাগ লাগাতে দেবো না। এই আমার প্রতিজ্ঞা!

—আঃ বাঁচলাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল অনন্তর বুক থেকে।

আবেগের ধাক্কাটা কাটতে একটু সময় নিল। তারপর অনন্ত বলল, চল গৌরী। এবার ফেরা যাক।

চল। গৌরী উঠে পড়ল।

চলতে চলতে অনন্ত বলল আজ শনিবার। কমলেন্দু বাড়ি চলে যাবে। আমি যে কার কাছে যাবো ? কি যে খাবো ?

—সে কি ? তুমি খাওনি ?

—না রে গৌরী! দিতে পারবি ? কিছু খাবার ?

—কেন পারব না? কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ। আমার হাতে খাবে?

অনন্ত হাসল। বলল হে ভগবান! আমি কি জাত মানি? তাহলে এই কদিন বাউড়ী ঘরে খাচ্ছি কি করে? তাছাড়া তুই আমার সন্তানের মা হতে চলেছিস তারপরেও একথা জিজ্ঞাসা করলি কি করে?

স্বভাব দোষে। আবার কী? চলো ঐ জানলার কাছে দাঁড়াবে। আমি ঠোঙাতে ভরে খাবার পার করে দেবো। নাকি এখানে বসবে? আমি এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আসবো?

—না-না। অত করতে হবে না। জানালা দিয়ে পার করে দিলেই হবে।

—কিন্তু আমার তো সাধ যায় তোমাকে কাছে বসে খাওয়াই।

মেসে গিয়ে দেখল কমলেন্দু বাড়ি যায়নি সে শুয়ে আছে এবং ও ডাকবার পূর্বেই উঠে এসে দরজা খুলে দিলো।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করল—তুই আজ বাড়ি যাসনি?

—কি করে যাবো? তুই শনিবারে আসবো বলে গেলি।

—মাইগড! তাহলে তো আরো আগে ফিরতে পারতাম।

—ঠিক আছে। ফিরেছিস তো! সেদিন ভালো করে খেতে পাসনি সেজন্য আজ মাংসের ঝোল ভাত রেখেছি।

অনন্ত আরেকবার মাইগড বলল।

গৈরীর দেওয়া রুটি তরকারিতে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়েছিল। পেট ভরেনি।

তাছাড়া ওর খাওয়ার পরিমাণটাও বেশী। গৈরী অত জানবে কি করে? ঘর সংসার তো করেনি।

অনন্ত জামা কাপড় ছেড়ে বেশ আয়েস করে স্নান করল। তারপর আরো একবার মাংসের ঝোল ভাত সেঁটে নিল। মনে মনে ভাবল খোদা যব দেতা হায় তো ছপ্পড় ফাড়কে দেতা।

একটা দুর্বিসহ সপ্তাহ পার হয়ে গেল প্রেয়সীর প্রেম, উথলে পড়া যৌবন, পেটভর্তি খাবার। এবার একটু ঘুমোতে পেলেই ষোলো আনা সুখ। সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়ল।

কমলেন্দু বলল—তোর ওদিকের কি খবর।

—আর বলিস না। কোর্ট কাছারীর ব্যাপারটা বড়ই জটিল। আর এত বিলম্বিত লয় যে তাল রাখা দায়। অনভিজ্ঞতা তো বটেই। তবে এই কদিন ঘোরাঘুরি করে বহুত রকম অভিজ্ঞতা হলো। যাইহোক, আশা করি সোমবার সুমিতদাকে জামিন করাতে পারবো। স্বপ্না কিছু টাকা কড়িও দিয়েছে।

—তোকেও তো জামিন নিতে হবে?

হ্যাঁ। সেজন্য সুবীরকে খবর পাঠিয়েছি। ও এসে গেলেই হাজিরা দেবো। এবার ঘাঁৎ ঘোঁৎ কিছু বুঝেছি।

কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল। আবার ভোরে উঠে যাবার তারা। সেদিন দাড়িটাও কামিয়ে নিল। কাচা জামাপ্যাণ্ট পরে ফিট।

কমলেন্দু ওর ছেড়ে দেওয়া জ্যামাপ্যাণ্ট একদিকে সরিয়ে রেখে বলল এত কাদামাটি কেনরে ?

—মাটিই তো মা-রে! সেই মায়ের কোলে শুয়ে মা-হবার সম্ভাবনাময়ী প্রেমিকার সম্ভাষণ করছিলাম।

—শ্যালা! সব সময়ে ইয়ার্কি! এত কষ্টেও স্বভাব গেল না।

এতবড় একটা সত্যবার্তাও কমলেন্দুর কাছে ইয়ার্কির মাত্রায় পড়ে গেল। অনন্ত ভীষণ আবেগে জড়িয়ে ধরল। কত কথা বুকপেট তোলপাড় করে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। ঠিক এই মুহূর্তে কমলেন্দুর কাছে স্বীকারোক্তি দিতে পারলেও খুব হাল্কা বোধ করত। কিন্তু পারল না। বুকটা ভারী হয়েই রইল। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলল—তুই আমার কত জন্মের বন্ধুরে ?

বলতে বলতে ওর কর্কশ গালে চুমু খেয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

সেদিন আসানসোলের সাব-ডিভিশ্যন্যাল জুডিসিয়েল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত উকিল, মোক্তার, আসামী, ফরিয়াদী, পুলিশ দারোগায় গিজ্ গিজ করছে। বাইরে বহুলোক। পতাকা ফেস্টুন উড়ছে। নেতারা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

একটা জাল দেওয়া ভ্যান এসে দাঁড়াল। তা থেকে সুমিতবাবু নামলেন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে। পতাকাওলারা স্লোগান দিয়ে উঠল। সুমিতবাবু হাত নেড়ে বন্ধুদিকে স্বাগত জানালেন।

অনন্ত ঠিকই বলেছিল কোর্ট কাছারির কাজ বিলম্বিত লয়ে।

ওরা যে এল তো ভিতরে ঢুকতে পেল না। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। সেই অবসরে আত্মীয় বান্ধবরা দোকান থেকে মিষ্টি জল এনে ওদেরকে খাওয়াল। অনন্তও ওর এবং বিশেষ করে সুমিতবাবুর জন্য মিষ্টি জলের ব্যবস্থা করেছিল। তখনই দু'চারটে কথা!

আদালতে ডাক হলো বেলা একটার সময়। সেই একই কাঠগড়া। চোর, ছিনাল, বেশ্যা, লীডার, মালিক, ম্যানেজার সবারই জন্য এক। সে হিসেবে দস্তুর মতো সাম্যবাদ।

ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। বে-আইনী জন সমাবেশ, মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে মিছিল এবং কলিয়ারী কর্তৃপক্ষকে শাসানি, অপমান, ভীতি প্রদর্শন ও দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাবার ধারাগুলি দিয়ে সাজানো মামলা। আসামীরা সকলেই বিপজ্জনক ব্যক্তি এবং খালাস পেলে কলিয়ারীর শান্তি বিঘ্নিত হবে সেই কারণে জামিন যাতে মঞ্জুর না হয়—তার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটার মহামান্য বিচারকের নিকট শুনানীর আবেদন করেছেন।

সেজন্যই সাতটা দিন জেল হাজতে পচতে হয়েছে। জামিন যদি না হয় আরো পচতে হবে। আসামী পক্ষের উকিল ছিলেন সত্যেন চ্যাটার্জী। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। বয়স ষাটের উপর বক্তা ভালো।

তিনি বলতে শুরু করলেন, মিনিট কয়েক ধরে শাসন, শোষণ, নির্যাতন, পুরানো রেশন ব্যবস্থার গলদ, পচা চাল গম, সভাসমিতি, জন সমাবেশ, গণতান্ত্রিক অধিকার, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে।

মহামান্য বিচারক হাতের পেন্সিলটা তুললেন।

সত্যেনবাবু থেমে গেলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

উনি বললেন—আপনার এটা আর্গুমেণ্ট হচ্ছে না। জনসভার ভাষণ হচ্ছে।

—ধন্যবাদ ইয়োর অনার। শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলতে গেলে আমি মাঝে মাঝে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। দয়া করে মার্জনা করবেন।

মহামান্য বিচারক কৌতুকের ভঙ্গীতে বললেন—আবেগটা কম করে বলুন।

—ইয়োর অনার স্যার। ধন্যবাদ। আসামীদের জামিনের আবেদন পেশ করেছি। আশা করি আমাদের দেশের অসীম দুর্দশাগ্রস্থ শ্রমিকদের প্রতি মহামান্য বিচারকের সহানুভূতি আছে। তাই তাদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর হবে এই বিশ্বাস রাখি।

এরপর পাবলিক প্রসিকিউটার সাতঝুড়ি মিথ্যেকথা বলে জামিনের আবেদন নাকচ করাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহামান্য বিচারক তা গ্রাহ্য করলেন না।

জামিনের আবেদন মঞ্জুর হলো ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে আসামীদের প্রতি আনীত অভিযোগের শুনানীর তারিখ দিলেন।

বাইরে মহামান্য বিচারকের নামে জয়ধ্বনি হলো।

কাঠগড়া থেকে নেমে এসে সুমিতবাবু অনন্তকে জড়িয়ে ধরলেন। অনন্তর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল।

উনি বললেন—কাঁদিস নে। এই তো লড়াই শুরু হলো। আরো অনেক পথ বাকী। এই ক'দিন তুই যে কি করেছিস তার সব খবর আমি পেয়েছি। এই না হলে কাজের ছেলে।

—আর দাদা সাতদিন লেগে গেল জামিন করতে।

—ওর জন্য ভাবিস নে। এরপর দু'তিন দিনেই জামিন করতে পারবি। কোর্ট কাছারির কাজটা ভালো করে শিখে নে।

স্বপ্না এসে কাছে দাঁড়াল। মৃদুকণ্ঠে বলল খুব কষ্ট হলো তোমার।

—বেশী কি? তোমাদিকে দেখতে পাইনি এটাই যা কষ্ট।

অনন্ত ওখান থেকে সরে গিয়েছিল ওদেরকে কথা বলতে দেবার জন্য। স্বপ্না বলল আমার যে কি ভাবনা হয়েছিল তা তোমাকে কি বলব? ওর চোখ দুটো ছল ছল করে বৃষ্টি নামল।

পাল্টে গেল অগ্রদূত মেসের চেহারা। মূক ও বিষণ্ণ মেম্বারগুলি আনন্দে ফেটে পড়ল। ডাক পড়ল শম্ভু বাউরী ও সম্প্রদায়ের। ঢোলক করতাল বাজিয়ে ছেলেরা নেচে গেয়ে মাৎ করে দিলো। শম্ভু বাউরী শুরু করল ভাদুগান—

ভাদু তুই দেখে যা—দেখে যা—
কলিকালের রঙ্গ।
ডি. সি. সাহেব হার মেনেছে
মলিন হলো অঙ্গ
এবার ভাদু চল-ছুটে চল পুলিচাকা বন্ধ!

ওদের আনন্দ উল্লাসের শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ডি. সি. সাহেবের বাংলো থেকে সব শোনা যাচ্ছে। ওঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার গো? মেসের ছেলেরা এত উন্মত্ত কেন?

—পিপীলিকার পাখা গজিয়েছে।

—সেটা আবার কি কথা হলো?

—সুমিত, অনন্ত, সুবীর আজ জামিন পেয়েছে তো। তাই এত ঢাক ঢোলের বাদ্যি। কিন্তু আমিও ডি. সি. সাহেব। তোদের কোন বাপে চাকরী রাখে তাই দেখবো।

—এই ছাখো! ওদের উপর তোমার এত রাগ কিসের?

—সব শ্যালা বিচ্ছু! শুনতে পাচ্ছো না আমার নামে ছড়া কাটছে।

ডি. ডি, সাহেবও গম্ভীর। অনন্তর একদিনের উপকার বা তার উপরে বিউটির স্নেহ তার নিশ্চয়ই কিছু মূল্য আছে। কিন্তু তা একজনের জন্যই। সামগ্রিকভাবে শ্রমিক আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। উনি কোম্পানীর ইমানদার আদমী। কোম্পানীর স্বার্থ তাঁরও স্বার্থ।

বিউটি খুব খুশী। হাসতে হাসতে বলল—ওগো শুনছো ওরা সব ফিরেছে। মেসে দারুণ হট্টগোল।

—তাতে তোমার এত আহ্লাদ কিসের?

—বাঃ রে! তা হবে না? ওরা আমাদেরই ঘরের ছেলে।

—দিগ্বিজয় করে ফিরে এল নাকি?

—জেল হাজত থেকে তো ফিরে এল?

—তাহলে ফুলের মালা নিয়ে যাও। বরণ করগে।

—তাই তো যাওয়া উচিত।

—না হলে আমার মুখে কালি পড়বে কি করে?

—কি সাদা মুখ যে কালি পড়ে কালো হয়ে যাবে। তোমরা দুটি বন্ধুর ভিতর বাহির বেবাক কালো। জানো সেদিন ডি. সি. সাহেব আমায় কি অপমান করেছে? আমি যদি তোমার সাতপাকে বাঁধা হতাম তাহলে টাঙ্গি

নিয়ে কাটতে যেতে। কিন্তু আমি যে রক্ষিতা! আমার আবার মান সম্ভ্রম!

ওর অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর, কম্পিত ঠোঁট এবং জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে ডি. ডি. সাহেব বিচলিত হয়ে পড়লেন।

বললেন—কি হয়েছে বলবে তো?

—তোমাকে বলেই বা কি হবে? বন্ধু প্রীতিটাই বড় হোক তোমার।

—বন্ধু প্রীতি আছে এবং থাকবে। তাই বলে তুমি তো ফ্যালনা নও।

—শুনে ধন্য হলাম।

বিউটি চলে যাচ্ছিল। ডি. ডি. সাহেব হাত ধরে বললেন রাগ করো না। যাক ডি. সি. কি বলেছে?

—তোমাকে আজীবন কামনা করে আসছি। একবার ধরা দাও।

—এতেই অপমান হয়ে গেল। তোমাকে যে দেখবে সেই কামনা করবে সেই তো তোমার রূপের গরব।

বিউটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—আমি বাজারের বেশ্যা নই। অসতী হয়েছি তোমাদের পাল্লায় পড়ে। পালা করে বলাৎকার করেছ। না হলে যার সঙ্গে ঘর ছেড়েছিলাম দুখ ভিখ করে তার সঙ্গেই থাকতাম।

—তোমার যা রূপ তাতে আমরা না করলেও অন্য কারো হাতে নষ্ট হতে। মানিক রাজার ঘরেই শোভা পায়। ভিখিরীর হাতে থাকলে তা হাত মুচড়ে কেড়ে নেয়। ঐ রাঁধুনীটা তোমাকে রাখতে পারতো?

বিউটি চুপ করে গেল। ডি. ডি. ওকে টেনে বিছানায় বসাল। আদর করে গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে—রাগ করো না বিউ। পুরানো কথা মনে এনো না। আমি তোমাকে অনাদর করি না। ভালোবাসি।

বিউটি নরম হলো। ওঁর একটা হাত বাঁ হাতের উপর নিয়ে ডানহাতের আঙুল বোলাতে বোলাতে হিজিবিজি কাটছিল। ডি. ডি. ওর বালাটি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—এ দুটো পুরনো হয়ে গেছে। একজোড়া নূতন গড়িয়ে দেবো।

ও নীচু গলায় বলল—তাই দিও।

ডি. ডি.-র লোমশ হাতের উপর সরু সরু আঙুলের চালাচলে একরকম সুখবোধ হচ্ছিল। বিউটি আঙুল দিয়ে তার উপরে লিখল—ভালোবাসি!

সে লেখা ফুটে উঠল না। বিউটি হেসে ফেলল।

বলল—কি লিখলাম বলো তো?

—কি?

—ভালোবাসি!

—আ! কি মিষ্টি! জাপটে ধরে চুমু খেলেন। বললেন—বিউ! তুমি মা হও। অনেক জ্বালার উপশম হবে।

—তোমার অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হবে।

—তাতো বটেই! প্রয়োজনও তো আছে। অন্তিমকালে জল পিণ্ড তো দেবে। অসতী মায়ের গর্ভে কি সৎ ছেলে পাবে ডি. ডি.?

—ঐ তো! একটা কথার গোঁ ছাড়তে পারলে না।

বিউটি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—কিন্তু আমার তো শরীরেও গোলমাল আছে। না হলে হাজারবার না বলেও কি আটকাতে পারতাম?

খুব আশান্বিত কণ্ঠে উনি বললেন—ওটা কিছু ব্যাপার নয়। ডাঃ সেনকে আমি বলেছিলাম। উনি বলেছেন একটা অপারেশন করতে হবে। তুমি রাজি হলেই হবে।

—বেশ। তোমার কথাই রইল।

—ওহ! বিউ! তোমাকে আমি আর কেমন করে ভালোবাসবো?

চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিলো।

পঁচিশ

মেয়ের দ্বিরাগমন নিয়ে গুলু খুব ব্যস্ত ও চিন্তিত। বিয়াইয়ের কাছ থেকে একশো টাকা পেয়েছে। সভিপ্রসাদ গোমস্তার কাছে পঞ্চাশ ধার নিয়েছে মাসে প্রতি টাকায় দু'আনা সুদে। ব্যাপারটি তার কাছে ভয়ানক অবিমৃষ্যকারিতা। স্বামী স্ত্রী দুজনের মাসিক উপার্জন পঁচিশ টাকার মতো। আর সুদ দিতে হবে ছ'টাকা চার আনা।

কিন্তু না নিয়েই বা উপায় কি? দ্বিরাগমনের খরচ খরচা তো আছে। মেয়েকে গহনা দিলেই তো হবে না। শায়া, শাড়ি, ব্লাউজ, রং, তেল, সাবান, চুলের কাঁটা, মাথার ফিতে কতো কি টুকিটাকি জিনিসপত্র। জামাইকেও ধুতি জামা গেঞ্জী দিতে হবে।

নূতন জামাইয়ের সঙ্গে আত্মীয় কুটুম্বরা আসবে। ওর স্যালাদের বিরাট গুষ্টি। মংগু সরদারের ধাওড়ায় বহু আত্মীয় স্বজন। তাছাড়া নিজের গুষ্টি তো আছেই। তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে ভোজ্য দিতে হবে। শূয়োর নিজের খোঁয়াড়ে আছে। মদ তৈরি হচ্ছে। ভাত তরকারির যোগাড় চাই।

জামাই দু'তিনদিন থাকবে মেয়ে ডাগর হয়েছে। আর কি একসঙ্গে শুতে না দিলে চলে? যাকে বলে ফুলশয্যা তাকেই বলে রাসগন্ধি। ওটা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। সেজন্য ঘর দুয়ারের সংস্কার ও সাফসুতরো হয়ে গেছে। একটা চালাও বানিয়ে নিয়েছে।

গুলু তার বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ সেরে যাচ্ছে।

অবশেষে একদিন সে পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেল। এবার জামাই এলেই হলো।

কিন্তু গৌরী যে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। সেই আকাট গোয়াতু´মি না যাবো না। শ্বশুর ঘড় যাবো না।

ওর মা স্বভাবে হ্যান্‌ক্যেনে। গলা চড়িয়ে ধমকি দেয়। গুলুর সঙ্গে মেয়ের ভাবরাগ নিয়ে কথা হয়। গুলু বলে গৌরী আমার নাদান ছোকড়ী। কি বুঝবেক ভাতারের মর্ম।

ওর মা বলে—এক রেতেই বুঝে যাবেক। রসগন্ধি হোক। ভাতারের স্বয়াদ পেঞে যাবেক।

গৌরীর বুকে তখন হামানদিস্তে চলছে। কারো সঙ্গে কথা কইতেও নারাজ। গর্ভাশয়ের ভ্রূণ যেন তাকে চোখ রাঙিয়ে বলছে—'মা! আমি তোর জারজ সন্তান হব, আমাকে জনম দিলেক একজন বাপ বলব অন্যজনকে। ক্যেনে এমন পীরিত করলি?'

হে ভগবান! প্রেম নাকি পরম পবিত্র বস্তু তবে কেন এত নির্যাতন?

এখন তার সবাই শত্রু, তাকে হাড়িকাঠে ফেলে দিতে চায়। কেঁদে ককিয়ে, চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে দিয়েও মা-বাপকে বোঝাতে পারেনি। কি করেই বা পারবে? তার সমস্যা তো খুলে বলতে পারেনি।

একি বলা যায়? কোন মুখে বলবে? লজ্জা যে সবারই বড়। সত্য যে ভীষণ নিষ্ঠুর। প্রকাশ হবামাত্র দাবদাহী অগ্নি জ্বালা।

আজ যদি তার মনটা হতো সেইসব মেয়ের মতো যারা অনায়াসে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সহবাস করে আনন্দ পায়। তাহলে সেও শাড়ি গয়না পরে ধর ধর ভাবে বিয়ালা পুরুষের সোহাগ নিতো। কে বা এমন সবজান্তা আছে যে বলে দিতে পারবে। তার পেটের সাতপুর মাংসের ভিতর জন্ম নিয়েছে একটি ভ্রূণ? কিন্তু ঐ ভ্রূণটা যে ওকে চোখ রাঙাচ্ছে।

দামোদরের বালুচরে তাদের সেই মিলন রাতগুলি যখন কত না কথার মালা গেঁথেছিল দুজনে তখন যে শপথ করেছিল জীবন থাকতে দ্বিতীয় পুরুষের কাছে যাবো না তা কি ঝুটা হয়ে যাবে? দামোদর রাগ করবে। না? গুষ্টি শুদ্ধ ভাসিয়ে দেবে না উদ্দাম বন্যায়? অথবা সেদিন আকাশে যে চাঁদ ও নক্ষত্র ছিল তারা কি আগুন হয়ে ঝড়ে পড়বে না? অনন্ত দেবে না ঘৃণার ফুৎকার?

প্রেম কি ফুরিয়ে যাবে?

গুলুর ঘরে জামাই এসে গেল মহাসমারোহে। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় কুটুম্ব নিয়ে দশ বারোজন। গুলুর সম্বন্ধীরা জোর খাতির করে চবুতরায় বসল। দেদার খাতির হলো কুটুমদের। শূয়োরের মাংস দিয়ে মদের চাট বনল। হাড়ি ভর্তি মদ এনে নামানো হলো চবুতরায়। চারিদিকে শোরগোল উঠে গেল।

পালে পালে মেয়েরা সব ঘরের আনাচ কানাচ থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে বর দেখছে। সবাই খুশী। বেশ বর হয়েছে গৈরীর। লম্বা, তাগড়া, লাহাঙ্গা গড়ন। গায়ের রঙটি আবলুশ কাঠের মতো কালো। বয়স চব্বিশ পঁচিশ।

হ্যাঁ। মরদ বটে একখানা। গৈরীর বুকের দুধ মইয়ে ঘোল বানিয়ে দেবে। ছুঁড়িটার কপাল ভালো। এমন আখাম্বা মরদ পায় কে?

খাওয়া দাওয়া চলছে। আসল খাবার মদ মাংস। কিন্তু নিয়ম রক্ষা বলে একটা কথা আছে। সেই কারণে কুটুমজনদিকে আপ্যায়ন করা হয় চোভাচানা দিয়ে। সে গুড় জল, ও বুট কলাই। তারপর দই চিঁড়ে। সেই পর্ব সমাধা হলে আদিম পর্ব স্থরু হবে। কিন্তু কুটুমরা তো খালি পেটে আসেনি। সাদাচোখেও নয়। সব রঙ চড়িয়েই এসেছে। দই চিঁড়ের স্বাদ পাবে কি করে?

তাই নিয়ে হাসি ঠাট্টা। সন্ধ্যাও হয়েছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। মিট মিট করে হ্যারিকেন জ্বলছে। বেজে উঠলো মিউজিক। প্রথমে মৃদুতালে রিনিক ধিনিক। চুড়ির বাদ্য। তারপর হাত তালির সঙ্গে/ঝমক্ ঝমক্। গোবিন ও গুলু দুই লোকশিল্পী তালে তাল ঠুকল।

মেয়েরা নেপথ্যে আছে। চবুতরা থেকে দেখবার জো নেই। সব দুয়ারে দুয়ারে পুঞ্জ পুঞ্জ ভাবে সাত আটটি ঘর থেকে একই তালে চুড়ির বাদ্য হচ্ছে। কেউ তাল কানা নয়। স্থরু হলো নেপথ্য সঙ্গীত—

খায়া তো খায়া কুছ মোছমে
লাগায়া—ক্যয়সা ভেড়ুয়া।

ওহো! কিবা বাক্য! খেয়েছে তো খেয়েছে কিছু মোছেও লাগিয়েছে কেমন ভেড়ুয়া।

ভেড়ুয়া মানে বেশ্যার পতি।

সেই সম্বোধনেই কুটুমরা সব আহ্লাদে আটখানা। এঁটো হাতেই তাল ঠুকছে।

বর বাবাজীর নাম রবিলাল। ওর বাপ—মনিলাল। কাকা বাঁকেলাল। সব লালে লাল। বেশ জমিয়ে বসেছে। ফুক্ ফুক্ বিড়ি টানছে। ঢুক্ ঢুক করে মদ। বরের বন্ধু হারকু দুশাদ লিগ্যাল অ্যাডভাইস দিচ্ছে—এই রবিয়া! বেশি মাল খায় না। তাহলে আসল মালটাকেই চোখে দেখতে পাবি নাই।

রবিলাল দাঁত বের করে হাসে। ওর চোখের পাতা ভারী। মনের ভিতরটা কুব কুব করছে। বউয়ের নাকি বড় রূপের ছটা। দেখতে বড় চখ। ডাগর-ডোগর ভরন্ত গড়ন। কাছে পেলে চেটে খাবে। সেই ভাবনাতেই মশগুল। বন্ধুর বাক্যকে মনে হলো—কোনো দেবতার প্রত্যাদেশ।

গুলুর আয়োজনে কোনো ত্রুটি ছিল না। খাওয়া দাওয়া ভারী হয়ে গেল।

যে যেখানে পারল চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। বাদ্য বাজনা এবং নেপথ্য সঙ্গীতেও ভাটার টান। গায়িকাদেরও পেট ভারী। পান পাত্র তো একা পুরুষদের জন্য নয়। তাদেরও।

রবিলালকে আদর করে ডেকে নিয়ে গেল গৈরীর মামাতো ভাইয়েরা। এবার সে খাস কামরাতেই পৌঁছে গেল। সেখানে পালে পালে মেয়ে। নানা বয়সের, নানা রঙ চঙয়ের। আদিরসের খিস্তি খেউড় দিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে জামাই নিয়ে আমোদ আহ্লাদ। সে এক বিষম প্রমাদ! হাতির মতো মেয়েগুলো গায়ে পড়ছে। এক একটির ওজন দেড় মন দু'মন। লদ্ করে গায়ে পড়ছে আটার বস্তার মতো।

কিসব রসিকতা! যেন ওর জন্যই যাবতীয় মৌ জমিয়ে রেখেছে। সে নিলেই ধন্য হবে। সেই ভিরের মধ্যে কোথায় যে তার আসলি মোতি তাই ঠাহর পাচ্ছে না।

পাবার কথাও নয়। ঘরের কোনায় কাপড় ঢাকা দিয়ে সে জবুথবু হয়ে বসে আছে। এত যে আনন্দ উল্লাস কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। হাসি কান্নার উর্ধ্বে অদ্ভুত এক জ্বালার জগতে বাস করছে সে।

বৈশাখী একবাটি মদ নিয়ে কত সাধাসাধি করেছে—এই টুকতুন খা বুন। জানি তুঁই ঈ-সব ছেড়ে দিঞেছিস। কিন্তুক আজকার রেতে খেতে হয়। শরীরে ধকল বুঝায় না।

গৈরী বাটিসুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছে—খবরদার। ঈ-সব আনিস না।

মাঝরাত কাবার হয়ে গেছে। যতসব পাড়ার মেয়ে যদি জামাইকে এভাবে দোহন করতে থাকে তবে বিটিটির জন্যে কি থাকবে? এখনো বাঘের খেলা বাকী। গৈরীর বুকে পাথর চাপা থাকবে নাকি? এই দেহাতী হস্তিনীদের দলাই মালাই দেখবে?

তার সাধ নাই? ঈ-বাব্বাঃ! ডাগর ম্যেয়া!

আসরে নামল ওর মা ও মামীরা। যতসব আলু থালু, মাতোয়ালী মেয়েদিকে টেনে টেনে বের করল। অশ্রাব্য খিস্তিও ঝাড়ল।

এই সোহাগরাত সবারই জন্য একবার করে এসেছে। কারো একাধিকবার। বিয়ালা পুরুষের সঙ্গে ছাড়াবিড়া করে স্যাঙ্গা করেছে এমন মেয়ের সংখ্যাও কম নেই। নাগরের ব্যাপারও আছে কারু। তবুও কামনার কি উলঙ্গ প্রকাশ!

একে একে সবাই বেরিয়ে যাবার পর ঘরে রইল গৈরী ও রবিলাল। সেই ঘরটি যার মেঝেতে কাঁথা পেতে ভাইবোনদিকে সঙ্গে নিয়ে গৈরী শুয়ে থাকত। দেওয়ালে টাঙানো মা সরস্বতীর পট। হ্যারিকেন জ্বলছে। কালি উঠে কাঁচটা কালো করে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে ঝাপসা অন্ধকার।

বৈশাখী ঘরে ঢুকে নতুন কাঁথা পেতে দুখানি বালিশ দিয়ে বিছানা করে দিলো। বলল—আয়গে গৈরী! এইখেনে শু।

ও বাইরে চলে গেল। দরজাটাও বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরটা গরম। কুলু কুলু করে ঘাম ঝরছে সারা গায়ে। রবিলালের নতুন জামাটা ঘামে ভিজে গেছে। সে ওটা খুলে রাখল।

গৈরী তখনো ঘরের কোণে বসে। যেন লাল কাপড়ে ঢাকা একটি ঝুড়ি। রবিলাল সেইদিকে তাকিয়ে আছে। বউ যে নড়েও না চড়েও না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো সাড়াশব্দ পেল না। যেসব সংলাপ মুখস্থ করে আসরে নেমেছে তাও ভুল মেরে গেছে। নেশাটাও ছুটে গেছে। ঘুম ঘুম লাগছে। ক্লান্তিও আছে। তবু সে এই মুহূর্তে পাহাড় ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু বউ যে রা কাড়ে না। এখন কি বলে যে তাকে সম্বোধন করবে, কাছে ডাকবে তারই কোনো যুতসই সংলাপ খুঁজে পাচ্ছে না।

অনেক ইতঃস্তত করে ডাকল—বউ—এ—বউ!

গৈরী সারা দিলো না। কঠোর থেকে কঠোরতরভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চলছে ওর ভিতরে।

রবিলাল একপা একপা করে কাছে এল। আরো বারকয়েক বউ-বউ বলে ডাকল। কোনো সাড়া না পেয়ে অবাক হলো। অন্তত নড়ন চড়ন তো হবে। যে ডাকে মেয়েদের বুকে দুন্দুভি বাজে তা তার কানেও পৌছল না একি হয়? তবে কি বউ কালা? রূপেই শিমুল ফুল। নাকি নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাত পাঁচ ভেবে ওর মাথার কাপড়টায় আলতো টান দিয়ে বলল—ঘুঙ্ঘট খোল বউ! তোর মুখটা দেখতে দে।

গৈরী কাপড়টা ঝট করে তুলে নিল।

রবিলাল কাছে বসল। দু'হাতে স্পর্শ করে বলল—বাৎ বোল রে বউ! বউ কথা বলল তবে তা বড়ই অপ্রত্যাশিত। যাকে মনে হচ্ছিল লাল কাপড়ে ঢাকা দেওয়া ঝুড়ি তার থেকেই ঝুপড়ি খোলা সাপিনীর মতো খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঝঙ্কার দিয়ে বলল—ছুঁয়ো না আমাকে। তফাৎ যাও।

ত্বরিৎ গতিতে ও নিজেই সরে গেল ঘরের অন্যদিকে।

রবিলাল হতভম্ব। এমনটা সে ভাবেনি। এমন কথাও কারো কাছে শোনেনি। ন্যায্য বিয়ে করা বউ এত টাকা খরচ করে নিতে এসেছে আর সে বলে কিনা ছুঁয়ো না!

আরে বউকে ছোঁব না তো ছোঁব কাকে? ঐ হস্তিনীগুলোকে?

মনের অনুরাগ ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছে রাগে। উত্তাপ বাড়ছে এ যেন পাললিক শিলার মেটামরফোজড্ হবার প্রক্রিয়া।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একপা একপা করে কাছে গেল। কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব কোমল করে বলল ঈ তোর কি বাৎ রে বহু?

—আমি তোর স্বামী।

—না।

—কি? আমি তোর স্বামী নই? তোকে বিয়া করি নাই?

ক্রোধ এবং বিস্ময়ে ফেটে পড়লো ও। গৈরী এতক্ষণে ওর দিকে তাকালো। এক লোমশ জোয়ান। বুকটা চিতিয়ে আছে। আস্তে আস্তে বলল কখন কোন বচপনে চার পাঁচ বছর বয়সে বিয়া হএছে। তারপর দুনিয়া বহুত আগে বেড়ে গেছে। এখন সেই বিয়ার কি মানে? আমি মানি না।

—তুই পড়ালিখা লেড়কী—তুর মুখে এই কথা?

—হাঁ। এই সাফ কথা।

—কিন্তু ক্যেনে?

—আমি মুখ্যু মরদের ঘর বসত করব নাই। বিয়া মানি না।

রবিলালের বুকে শেল বাজল। যে বউয়ের জন্য সে এত স্বপ্ন দেখেছে এই তার মনের কথা। প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণা এত মর্মান্তিক। এখন সে কি করবে? ঐ সুন্দর মুখটাকে থেঁৎলে দেবে? ঐ সুন্দর শরীরটার যাবতীয় আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দেবে?

জুলুমসে কায়েম করবে পৌরুষের আধিপত্য?

ক্রোধ এবং আক্রোশের এই ভাবনায় তার মুখটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। চোখ দুটো তো লাল ছিলই। এখন তার থেকে আগুন ঝরছে। শরীরটা কাঁপছে এবং লোমগুলো কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে গেছে।

স্থির দৃষ্টিতে গৈরীর দিকে তাকিয়ে দু'পা এগোল।

ঠিক তেমনিভাবে গৈরীও ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল জুলুম করবি ন'কি?

রবিলাল থেমে গেল। চিবিয়ে বলল—তবে তো কিসস্যা খতম। তোরও গরম খতম। দেখবি নাকি?

—কি দেখাবি? গৈরী ফুঁসে উঠল।

সপাটে একটি চড় বসিয়ে দিলো রবিলাল। বলল—শালী? তুই কি মনে করেছিস আমি এত বুড়বক বটি? তোর এত কিসের গরম বুঝি না?

চড় খেয়ে গৈরীর মাথাটা ঝামরে গেল। উল্টে পড়েই যেত দেওয়াল ধরে টাল সামলাল। আত্মরক্ষার জন্য ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু রবিলাল আর কিছু করল না।

বিছানায় বসে ফোঁস ফোঁস শব্দে শ্বাস ছাড়তে লাগল।

গৈরী ঠায় দাঁড়িয়ে। রবিলাল বলল—আরে ছোকড়ী, মরদের সঙ্গে শোওয়া

যদি তোর এত হারাম তবে সিঁদুর পরেছিস ক্যেনে? চুড়ি পরেছিস ক্যেনে? কোন ভাতারের নামে? শালী রাণ্ডী কাঁহিকা।

গৈরীর ভিতর বাহির রাগে, দুঃখে, লজ্জায়, বেদনায় হাহাকার করছে। হ্যাঁ। এই তার ন্যায্য পুরস্কার। স্বামী তো বটে। তার প্রেম ভালোবাসা পাবার সেই তো হক্‌দার। সমাজের স্বীকৃতি নিয়ে এসেছে। বিয়ের লাইসেন্স আছে। তাকে বঞ্চিত করেছে বলেই তো এত ক্রোধ। এই তো পুরুষ মানুষের স্বভাব ধর্ম।

সে যদি আগে থাকতেই মনটাকে অন্যত্র বাঁধা না দিত তবে এই সোহাগ রাত কত না পুলকে শিহরিত হতো। এমন মরদ কটা-মেয়েতে পায়? এ যে পৌরুষের জলন্ত প্রতিমূর্তি।

চোখ কেটে জল বেরুচ্ছিল। গালটা চিন্ চিন্ করছে। রবির চড়টা খুব জোরেই পড়েছে। একেবারে বেমক্কা ঝাড়। গালে হাত বুলোতে বুলোতে আঁচল দিয়ে চোখ মুছল।

ক্রোধ ও কান্নার মিশ্রিত আবেগ তার গলা দিয়ে ফুটে বেরুল তুই কি মানুষ? না জন্তু জানোয়ার? একটা ম্যেয়াকে চড়াঞে মরদ হঞে গেইছিস।

রবি গর্জন করে উঠল—চোপ! বকৃতাম বন্ধ কর। নহী তো হালত রদ্দি করে দিব।

গৈরী ফুঁসে উঠল—কর। তোর যা মন চাই তাই কর। কিন্তুক শুনে লে যদি কোনো বেইজ্জতি করেছিস তবে আমার লাশ পড়ে যাবেক।

—আরে যা যা। হালত এ্যায়সা রদ্দি করে দিবো যে তুই আমার পা ধরে মাফি মাগবি।

গৈরী অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল—আমি এখনি তুর পা ধরে মাপ চাইছি ভিখ মাগছি তুই আমাকে ছেড়ে দে।

গৈরী সত্যি সত্যিই ওর পায়ে ধরল।

রবি বলল—ছাড়ব ক্যেনে? ছাড়বার জন্যে ত বিয়া করি নাই।

—বলছি তো বিয়া মানি না। উঠে দাঁড়িয়ে আবার সেই তেরিয়া ভাব।

—ক্যেনে মানিস না?

—আমার দুসরা আদমী আছে। তার সাঁথে মুহাব্বত আছে। আর আমাকে ঘরকে লিবি? ঘরে নিঞে কি করবি?

রবিলাল থম্ মেরে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল—হাঁ। ঘরকে লিব। তোকে আমার দিলকী রাণী করে রাখব।

গৈরীর অষ্টাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল।

ছাব্বিশ

রবিলাল ওর কাছে এসে দাঁড়াল। দুপা তফাত থেকে বলল—দ্যাখ পিয়ারী! পয়লা জোয়ানীতে বহুত আওরৎ ভুল করে। তুইও করেছিস। আমি মানিয়ে লিবো। তুই আমার কাছে আয়।

আঃ! কী ভীষণ আকর্ষণ! এই বুঝি সে হেরে যায়। এই লোকটা তার স্বামী। তাকে সিঁদুর দিয়েছে। তার পরপুরুষকে নিবেদিত দেহমন ও প্রেমের গ্লানি মেনে নেবে! সে সংসার পাবে। স্বামীর সোহাগ পাবে। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে যেন পাহাড়ী ঝর্ণা।

একটু—আর একটু সময় দাও—

রবি ওর কাঁধে হাত দিয়ে আহ্বান করল—আয়!

ঝন্‌ন্‌—একটা ঝাঁঝ পড়ল গৈরীর মাথায়। যেন একটা করুণ সুরের রাগিনীতে আচ্ছন্ন হয়েছিল। হঠাৎ বাঘ ডাকল হালুম করে।

ভয়ে এবং প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠল—না। আমার গায়ে হাত দিস না। তাহলে মরামুখ দেখবি। ছিটকে গেল দূরে।

ক্রুদ্ধ আক্রোশে রবিলালের শরীরটা দুলছে।

কর্কশ কণ্ঠে বলল—শালী—কুত্তীর বাচ্চী! তোর বাপে লেড়কীর বিয়া দিঞেছে, রুপিয়া লিঞেছে আর আজ দখল দিবার সময় বাহানা। বিটিকে দুসরা মরদের সাথে পটরি খিলাঞে রুপিয়া কামাবার মতলব। বাপ-বেটি দুজনকেই এমন শিক্ষা দিব যে জিন্দেগী ভর খেয়াল থাকবেক!

ওঃ এইসব বাক্যবাণ—যার এক একটি কথার ধার ছুরির মতো, ভার লোহার মতো, তাই তার বুকে অবলীলায় এসে আঘাত করছে এবং সে তা সহ্য করছে। না করে উপায় নেই। সে যে সত্যিই তাকে বঞ্চনা করেছে। তাদের দেশ ও সমাজের রীতিপদ্ধতি অনুসারে গঠিত মানসলোক এই ভাবনাতে জর্জরিত। একটা পাপবোধ মনের মধ্যে ক্রিয়া করছে কিন্তু আত্মসমর্পণ করলে যে পাপের মাত্রা সহ্য সীমার বাইরে চলে যাবে—তার সন্তানের কাছে চিরকালের জন্য অপরাধিনী হয়ে পড়বে। প্রেমের মৃত্যু ঘটবে। এই লোকটা তাকে যে ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে সে তাই হয়ে যাবে। লড়াইয়ের ময়দানে একবার যখন নেমে পড়েছে তখন জান কবুল করে লড়েই যাবে।

চোখের জল মুছে দুয়ারে বার বার ধাক্কা দিলো—মা! এ মা! দুয়ার খুলগে।

দুয়ার খুলল না! কিন্তু বাইরে যে অনেকগুলি মেয়ে আড়ি পেতে আছে তা বুঝতে বাকি থাকল না। ওরা তাহলে কি তামাসা দেখছে? এই লোকটা যদি তাকে বলাৎকার করে তবুও তো কারো সাহায্য পাবে না।

ওঃ ভগবান!

বুক ফেটে কান্না এল। চোখ দুটো অন্ধকার হয়ে আসছে। ভিতরে তীব্র স্রোত। বেদনার তীক্ষ্ণ মোচড়! মাথা ঘুরছে।

খুলে গেছে ঘোমটা। টাল খেয়ে গেছে যত্ন করে বাঁধা খোঁপা।

রবিলাল থাবা দিয়ে ওর খোঁপাটা ধরে মোচড় দিয়ে বলল—আবে ছোকড়ী! আর তোকে কোন বাপে রাখবেক?

গৈরী হ্যাঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। এক গোছা চুল গেল রবির হাতে। কয়েকটা চুলের কাঁটা ফুটল গৈরীর ঘাড়ে এবং রবির হাতেও। যন্ত্রণায় মাথা ঝন্‌ঝন্ করছে গৈরীর! কিন্তু সে ক্রোধে অজ্ঞান। সাপের মতো দুলছে। কোথায় গেছে ঘোমটা পরা বৌয়ের কমনীয় মুখ। দু-চোখ ভর্তি জল এবং বিদ্যুৎ। খোঁপা খুলে বেনী লুটোচ্ছে পিঠে। কাপড় টেনে গিঁট দিয়ে দাঁড়িয়েছে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলছে—ডোক্‌রা হারামজাদা! বহুদ বরদাস্ত করেছি। আর নয়। এই দ্যাখ তুর সোহাগ সিঁদুর পুঁছে দিলাম। চুড়ি ভেঙে দিলাম।

ঝন্‌ঝন্ শব্দে দেওয়ালে হাত ঠুকে কাঁচের চুড়িগুলো ভেঙে দিলো। সিঁদুর দিলো মুছে।

এই লে তুর বাপের টাকার গহনা!

পটাপট টান মেয়ে গয়নাগুলো খুলে ফেলে দিলো।

বলল—আর আমি তুর কেউ লই। আজ থেকে রাঁঢ় হলাম।

ঠক্‌ঠক্ করে দরজায় মাথা ঠুকতে লাগল।

রবিলাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। বলল—শ্যালী! রাঁঢ় যদি হলি তবে ইজ্জত নিয়ে যাবি কুথায়?

বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রাণকাটা চিৎকার করে উঠল গৈরী—বাপু আমাকে বাঁচাও!

রবিলাল ওর মুখটা চেপে ধরে কাপড় নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলো। গৈরী এই চরম মুহূর্তটির জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। প্রত্যেকটি কাপড় গিঁট দিয়ে পরেছিল। শাড়ি ব্লাউজের ভিতর ডবল ইজার ফ্রক ব্রা। প্রাণপণে প্রতিরোধ করতে গিয়ে ঘরের হাঁড়িকুঁড়ি উলটে পড়ল। টিন নানা শব্দে বেজে উঠল। গলা দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না কিন্তু গোঙানীর শব্দে ঘর কাঁপছিল।

নতুন শাড়ি পড় পড় শব্দে ছিড়ে ফর্দ ফাঁক। কিন্তু তখন সে দ্রৌপদী। একটা ছেঁড়ে তো আরেকটা। গৈরী ছিটকে পড়ল দরজায়। চিৎকার করে উঠল—বাপু—আমাকে বাঁচা—

দরজা খুলে গেল। একই সঙ্গে অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ। তাদের মুখে ভয় ও বিস্ময়।

গুলু সবাইকে ঠেলে ভিতরে ঢুকে বলল—আরে বিটিয়া!

গৌরী ওর বাপকে সজোরে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সে এক বৈসাদৃশ্য দৃশ্য। শাড়ি ছিঁড়ে ফালা ফালা। চুল খুলে আলু থালু। ভীষণ হাঁফাচ্ছে। থর থর করে কাঁপছে।

রবি গর্জন করে উঠল—শ্যালা বেইমান! বিটির সাদী দিলি রূপিয়া লিলি। জরু বলে ঘর করবো নাই।

কে বা কারা ওকে বাইরে নিয়ে যেতে যেতে বলল এত রাগারাগি করিস না জামাই। গৌরীকে আমরা বুঝাঞে রাজী করাবো।

রবি বলল—উ রাজী হবেক নাই। আমার কাছে কবুল করেছে। যে উয়ার দুসরা আদমীর সাথে মুহব্বৎ আছে। পড়া-লিখা শিখেছে নাকি মুহাব্বত করছে। আমি ইয়ার বদলা লিবো!

ভোর হয়ে গেছে। ঘর ফাঁকা, হাঁটু ভাঁজ করে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে গৌরী। সন্ধ্যাবেলায় কত পারিপাটি করে খোঁপা বেঁধে দিয়েছিল ওর সহেলীরা। তা এখন ছিঁড়ে খুঁড়ে আলু থালু চুলের রাশি মেঝেতে লুটিয়ে আছে। ঘাড়ের উপর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। শাড়ি ব্লাউজ ছিঁড়েই গেছে। ফুলে ফুলে কাঁদছে। দমকে দমকে পাঁজর কাঁপছে।

গুলু ওর কাছে এসে দাঁড়াল। মাথায় হাত রেখে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ডাকল—গৌরী। বিটিয়া।

গৌরী মুখ তুলল। করুণ কোমল মুখটি কাজলে, সিঁদুরে, চোখের জলে চুব্‌চুবে হয়ে গেছে। বামগালে পাঁচ আঙুলের কালশিটে ছাপ। নাকের নোলক ঝুলছে মাংস কেটে। ঠোঁট, কপাল কাটা কাটা রক্ত জমে আছে।

গুলু শিউরে উঠল। ওঃ এত মার মেরেছে তার সাধের বিটিকে। লোহার মতো কঠিন হাতটা তার মুখে বুলোতে লাগল।

অসীম ব্যাকুলতায় বাপের পা দুটি ধরে গৌরী বলল—বাপু! আমাকে তুই বাঁচা বাপু। শ্বশুরাল আমি যাবো নাই।

গুলু বলল—ক্যেনে অমন করছিস বিটি? সব বিটি ছ্যেলা শ্বশুর ঘর যায়। তার লেগেই বিয়া সাদী। তুই ক্যেনে অবুঝ হছিস?

—আমি যাবো নাই বাপু।

—ক্যেনে?

—কি করে উয়ার ঘরকে যাবো? আমার পেটে যে বাচ্চা আছে।

—গৌরী!

বিস্ময়ের সীমানা পার হয়ে কেমন আর্তকণ্ঠে ডেকে উঠল গুলু। মনে হলো এখুনি এই কুলখাগী বিটিকে গলা টিপে শেষ করে দেয়।

ক্রোধ এবং বিস্ময়ের বিমূঢ়তা কাটিয়ে সে বলল—এই জন্তেই তুকে লেখাপড়া শিখতে ইস্কুলে পাঠাঞেছিলম?

—ক্যেনে পাঠালি বাপু? যদি না পাঠাতিস তবে তো কিছু হতো নাই। ডাং মুখ্যু মরদের ঘর করতে যাবক নাই। আজ ই কথা বললে কি হবেক? তুরা আমার মরদের সঙ্গে ছাড়াবিড়া করাঞে দে-গা!

গৌরী সোজা হয়ে বসল। গুলু ওর দিকে তাকিয়ে আরেকবার চমকে উঠল। দুটি হাত খালি। ব্যাটাছেলের মতো পরিষ্কার। একটিও চুড়ি নেই। মাথার সিঁদুরটাও লেপা পোঁছা। সারা মাথায় ও কপালে লেগে আছে।

—ঈ কি করেছিস বিটি?

—বিধবা হঞেছি।

—হে ভগমান! পেটে বাচ্চা আছে বলছিস। তার বাপটি কে হবেক?

—যে আজ্ঞাঞেছে সেই হবেক?

—নাম?

—না। এখন বলব নাই।

—না বললে কি করে হবেক?

—সেটি আমি বুঝব। তুইও যদি এমনি করবি তবে জীবনটি ঘুচাঞে দিব। দামুদরে সাঙিন বান পড়েছে। দিব ঝাপাঞে।

—তাই করগা। তুর জ্বালাতে ঘরগুষ্টি জ্বলে গেলম।

ভীষণ ব্যথিতভাবে গুলু চলে গেল।

ফোঁড়া পাকবার সময়ই যত টনটনানি ব্যথা। অসীম যন্ত্রণা ফুটবার সময়। কিন্তু একবার ফুটে পুঁজ রক্ত বেরিয়ে গেলেই সব ব্যথার অবসান।

গৌরীর জীবনেরও পাকা ফোঁড়া ফুটে গেছে। নারী জীবনের যা কিছু লজ্জা, গ্লানি, অপযশ নিজের মুখেই প্রকাশ করে দিয়েছে। আবার কিসের ভয়? এবার এসপার কি ওসপার। কে আছে বদলা লেনেওলা মরদ। সেও দুনিয়ার মেয়ে।

সকাল হতে যা দেরি। চবুতরায় লোক জমে গেল। রবিলাল এসেই তার নিদ্রিত বাপ কাকাকে টেনে তুলে জানিয়ে দিয়েছে এক রাণ্ডী কসবির সঙ্গে তুরা আমার বিয়া দিঞেছিস। ভ্যাখ গা কেমন বলছে আমার দুসরা আদমী আছে। ভাতারের ঘর করব নাই।

ওর বাপ কাকা এমন করে উঠল যেন খরিষ সাপের ল্যাজে পা দিয়েছে! সাপটা ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখুনি ডাং মারতে হবে।

মনিলালের রাগ বেশী। সে লাফিয়ে উঠল। চল বহুকে এখনি ধরে নিঞে ঘরকে যাবো।

বাঁকেলাল চলতা পুরজা আদমী। দাদার লিগ্যাল অ্যাডভাইসার। তার রাশ সেই টেনে ধরতে পারে। বলল দাঁড়া। হুড়বড় করিস না। বিহান হোক। মংগু সরদারের পাড়ায় খবর দিই। আমাদের লোকজন আসুক।

ওদের প্রস্তাবটি [illegible] রয়ে গেল।

তারপর গুলুকে ডাকা হলো। সে এত লোকজন দেখে ঘাবড়ে গেল।

মনিলাল জবরদস্ত গলায় বলল—ক্যাবে শ্যালা চোর চুহাড়। তোর রাণ্ডি বিটিকে লিয়ে আয়। আমরা এখনি লিয়ে যাবো।

গুলু মিন্ মিন্ করে বলল—হঁ হঁ। আমরা উয়াকে বুঝাছি।

—বুঝাবি কিরে? টাকা লিবার সময় মনে ছিল নাই। যা বিটি লিয়ে আয়।

—উ আসবেক তবে ত!

—ক্যেনে আসবেক নাই। শ্যালা বেইমান। মেরে খাল খিঁচে দিবো।

গুলুর চুলগুলো ধরে ফটাফট চড় বসিয়ে দিলো! টানতে টানতে নিয়ে গেল গুলুর ঘরকেই। তার পিছনে দশ পনেরো জন লোক। হাঁক দিয়ে বলল—ডাক তোর বিটিকে।

মেয়েরা সব তটস্থ। হাউ মাউ করে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

গৈরী দাঁড়াল চৌকাঠের সামনে। চার পাঁচটি নানা বয়সের মেয়ে ওকে তৎক্ষণাৎ ঘিরে ফেলল। গৈরী বলল—ছাড় তুরা। কে কত মরদ আছে তাই দেখব। জুলুম বাজী করতে এসেছে—বাড়া মরদ।

রবিলাল ওর দিকে তর্জনী তুলে বলল—এই শ্যালী এক নম্বর রাণ্ডি!

গৈরী ঝঙ্কার দিলো।—চোপ। ভোক্‌রা বেজন্মা। মুখ সামলে বাৎ কর। আমি যদি রাণ্ডিই হব তবে ক্যেনে তেড়ে দিব?

মনিলাল বলল—এত কিসের নখড়া! চল রবিয়া আপনা আওরৎ হিম্মতসে দখল করে লে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে রবিলাল লাফ দিয়ে গৈরীকে ধরে ফেলল। টানতে টানতে উঠোন পর্যন্ত নামাল। গৈরী প্রাণফাটা চিৎকারে গোটা পাড়া কাঁপিয়ে দিলো। ওরা আক্রোশে গর্জন করে উঠল।

ঝনাৎ করে পড়ল রবিলালের মাথায় এক লাটি। গৈরীকে ছেড়ে রুখে দাঁড়াল ও। তখন ওদের সামনে দুটি ছোকরা। হাতে লাঠি। দুজনেই চরিতরের ছেলে। গৈরীর মামাতো ভাই জগদীশ—হরেরাম।

জগদীশ বলল শ্যালা! তু এতো মরদ।—আমাদের ঘর থেকে জুলুমসে বিটি লিয়ে যাবি।

পটাপট চালের বাতা ভাঙতে লাগল। ফটাফট লাঠি চলতে লাগল। গুলুর ঘর থেকে চবুতরা পর্যন্ত রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্র। মেয়েদের চিৎকার ও আর্তনাদে, দাঙ্গাবাজ মরদগুলোর গর্জনে, রক্তলহান চেহারায় উৎসব মুখরিত পাড়াটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

মনিলালের দলে মংগু সরদারের লোকগুলি নিয়ে বিশ পঁচিশজন। আর চরিতরের কিষণের সব কুলি। এমন কি মেয়েরাও লাঠি, ঝাঁটা নিয়ে দাঙ্গা করছে। হাতাহাতি চুলোচুলি, লাঠালাঠি। মনিলালের দলকে মারতে মারতে রেল লাইন

পার করে দিলো। ওদিকে মংগু সরদারের লোকজনও লাঠি, বল্লম, টাঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। রেললাইনের দুদিকে দুই দাঙ্গাবাজ দল পরস্পরের প্রতি তীব্র আক্রোশে যুদ্ধ ঘোষণা করে খিস্তি খেউড়ের বান ডাকাচ্ছে।

আসরে নামলেন ডি. সি. সাহেব। তিনি শ্রম কল্যাণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি! শ্রমিকরা যদি নিজেদের মধ্যেই দাঙ্গা করে তাহলে আর কল্যাণ হলো কী? অথচ তাদেরকে দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ অবস্থাতেই রাখতে হবে! না হলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবেন কি করে? শ্রমিকরা এখন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ফাটল ধরাবার এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়।

কোম্পানীর আর্মি ফোর্স অর্থাৎ চাপরাশীদিকে হুকুম দিলেন আসামী গুলু, চরিতর, কিষণ, জগদীশ, হরেরাম ও তাদের দলের দাঙ্গাবাজ ছোকরাদিকে বেঁধে আনো। আচ্ছাসে ধোলাই দাও। শ্যালাদের গরম হয়েছে। বিটির বিয়া দিবি আর শ্বশুর ঘর পাঠাবি নাই।

চাপরাশীরা হৈ হৈ করে আসামী ধরতে গেল। কিন্তু এক গুলু ছাড়া কাউকে পেল না। সবাই সটকে গিয়েছে। গুলুও পালিয়ে যেতে পারত কিন্তু গৈরীকে ঘরে রেখে কোথাও যেতে মন সরেনি।

মংগু সরদার ডি. সি. সাহেবের পেয়ারের লোক। তিনি তো তাদেরকে মদৎ দেবেনই। ডাক পড়ল হেড গোমস্তা সভিপ্রাসাদের। উনি শ্রমিকদের মহাজন গুলু তার খাতক। এই সুযোগে বেশ করে দোহন করে নিক।

জগদীশ ও হরেরাম তরতাজা জোয়ান। ইউনিয়ন করে। ভীষণ একরোখা। দাঙ্গার সূত্রপাত তাদের লাঠি থেকেই। গৈরীর লাঞ্ছনা তাদের সহ্য হয়নি।

পিসতুতো বোনকে নিজের বোনের মতোই ভালোবাসত! গৈরী লেখাপড়া করত বলে পাড়াতে আলাদা খাতিরও ছিল। যে কারণেই হোক সে যখন শ্বশুর ঘর যাবো না বলছে তখন কেন জুলুম করবে? জামাই কেন গৈরীকে অমন নিষ্ঠুরভাবে মারধোর অত্যাচার করবে? ওর চোখের জল করুণ মুখ এবং গায়ের রক্ত দেখেই তো মাথার ভিতর ক্রোধ উঠছিল শন্ শন্ করে।

তাছাড়া মেয়ে যে সমাজের ক্যাপিট্যাল অ্যাসেট সে সমাজে বুকের উপর দিয়ে জুলুমসে মেয়ে নিয়ে যাবে এটা তারা বরদাস্ত করে কী করে? তাজারক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। আর লাঠি যখন একবার চালু হয়ে গেল তখন অন্যান্যরা তো দাঁড়িয়ে দেখতে পারে না।

দুনিয়ার হরেক হুজ্জুতের পিছনে জড়, জমিন, যোনী।

রাম রাবণের লড়াই থেকে আজও চলছে এবং চলবে। দুনিয়া যতই সভ্য হোক। সে শুধু গাড়ি, বাড়িতেই। ভিতরটা একই রকম।

সাতাশ

রেশন আন্দোলনের ব্যাপকতা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। দামুলিয়াতে কোনো শ্রমিক নিতে আসেনি। তারা রেশন বয়কট করছে। সেই আন্দোলন অন্যান্য কলিয়ারীতেও ছড়িয়ে পড়ছে।

স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার, চীফ পারসোন্যাল ম্যানেজার, সেক্রেটারী টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার, লেবার মিনিস্টার, লেবার কমিশনার প্রভৃতি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায়।

মেসে বসে সুমিতবাবু সেই সব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছিলেন। কাগজ কলমের কাজে, চিঠিপত্র লেখা ও হিসেব নিকেশে অনন্ত খুব তুখোড়। সে ফুটবলের কোচিং ক্যাম্পে গেছে বলে সুমিতবাবু অসুবিধা ভোগ করছেন। বাকী যেসব স্থানীয় নেতা তারা হুকুম তামিল করতে পারে, লড়তে পারে, ভাষণ দিতে পারে কিন্তু কাগজে কলম ঠেকাতে গেলেই তা ভাঙবার উপক্রম হয়ে যায়।

সেই সময়েই রক্তলহান শরীরে ছুটতে ছুটতে হাজির হলো জগদীশ ও হরেরাম। ওদের মুখে দাঙ্গার খবর শুনেই থ হয়ে গেলেন। গৈরীকে কেন্দ্র করে এত বড় দাঙ্গা? কিন্তু সে শ্বশুর ঘর যাবে না কেন?

এর কারণ মেসের মধ্যে কমলেন্দুর এক আধটু জানা। সে মুখে কুলুপ দিলো।

সুমিতবাবুকে যেতেই হবে। ডি. সি. সাহেবের হাত যখন পড়েছে তখন সে যে কতভাবে ঘোঁট পাকাবে, কত রকম নকশা দেবে তা উনি জানেন।

সামনে লড়াই। শ্রমিকদিকে একতাবদ্ধ করে বৃহত্তর আন্দোলনের সামিল করতে হবে আর এই সময়েই অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাও একটা মেয়ে নিয়ে। এত অকিঞ্চিৎকর কারণে এরা এত বৃহৎ কাণ্ড করে বসে যে তার সামাল দেওয়াই দায়।

হরিহর গান্ধী, তিলক সিং, যমুনা যাদব ও আরো জনকয়েককে সঙ্গে নিয়ে অফিসের দিকে রওনা হলেন।

ডি. সি. সাহেবের অফিস জম জমাট। গুলু আসামী। একদিকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। ধোলাইও হয়েছে।

মংগু সরদার লম্ফ ঝম্ফ করছে—গাওনার দিনে বিটি পাঠাবেক নাই আবার কুটুমদিকে মেরে লাশ বানাবেক ইয়ে নেহী চলে গা। হাম লোগ বদলা লেগা।

জাতকে জাত বৈরী। সেই ফরমূলায় চরিত্তর কিষাণের সঙ্গে ওদের বাপের আমল থেকে রেষারেষি। আবার গৈরীর সঙ্গে রবিলালের বিয়ে হয়েছিল ওরই ঘটকালিতে। কাজেই ওর জ্বালাটা সবচেয়ে বেশী।

সভিপ্রসাদও এসে পড়লেন। লেবার সাহেবদের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় হৃদ্যতা। ওদের পারস্পরিক অশুভ আঁতাত গুলুকে কোথায় নিয়ে যেত কে জানে? দলবল সহ সুমিত চ্যাটার্জীর প্রবেশ অনেক কিছুই ভেস্তে দিলো।

উনি এসেই হুকুম জারির গলায় বললেন, হরিহর গুলুর বাঁধনটা খুলে দে। ওকে চা জল খেতে দে।

হরিহর ওর বাঁধন খুলে দিলো। গুলু ওদের পায়ে পড়ল।

ডি. সি. সাহেবের তখন গা জলছে। বললেন, ওহে সুমিতবাবু! তুমি এখানে কি ফোপর দালালি করতে এলে?

—আপনাদের শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ করতে।

—ভারী যে দরদ। জানো ওরা দাঙ্গা ফৌজদারীর আসামী।

—তাতে আপনার কি? দেশে ফৌজদারী আদালত আছে।

—তবে কি পুলিশের হাতে তুলে দেবো?

—নিশ্চয়! কিন্তু একা গুলুকে নয়। যারা বাড়ি থেকে মেয়ে ধরতে গিয়েছিল তাদেরকে বাঁধতে হবে।

—ঐ মেয়েটি ওদের ঘরের বউ। গাওনা করাতে এসেছিল। এটা সামাজিক সমস্যার ব্যাপার। ইউনিয়নের মাথা গলাবার নয়।

—ম্যানেজমেণ্টের মাথা গলাবারও নয়।

—সভিপ্রসাদ বললেন—ঠিক আছে। এই মামলা আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি উভয় পক্ষকে ডেকে, পঞ্চায়েৎ করে দেবো।

—সে মীমাংসা যদি শ্রমিক নির্যাতনের প্যাঁচকল হয় তাহলে আমরা মানবো না।

—আচ্ছা বাবুজী, আপনি আমাকে একবার চেষ্টা করে দেখতে দিন যদি মীমাংসা না হয় তবে আপনারা যা ভালো হয় করবেন।

—আচ্ছা।

গুলুকে নিয়ে উনি চলে গেলেন।

সভিপ্রসাদ উত্তর প্রদেশের লালা কায়েত। ওঁর বাপ ছিলেন ছোট গোমস্তা। উনি হয়েছেন বড় গোমস্তা। রেল লাইনের পাশে তিন চার বিঘে জায়গা নিয়ে ওঁর বাসা। তারের বেড়া দেওয়া বাউণ্ডারী। পাঁচখানা গোলঘরের একটা সারি। পুরোটা দখল করে নিজের লোকজন ঢুকিয়ে রেখেছেন। তারা সব কলিয়ারীতেই কাজ করে। একদিকে খাটাল। আঠারোটা গাই মোষ। ফাটকবাজারে তিনটে দোকান। একটি মুদিখানা, একটি কাপড়ের আর একটি লোহা-লক্কড়ের। নিজস্ব আটাচাকী। গম পেষাই হয়। দামোদরের ধারে ধারে যেসব পতিত জমি কোম্পানির কেনা ছিল তাও দখল করে চাষ আবাদ করেন নিজস্ব হালজোতে। নিজের কোয়ার্টারের পাশেই একটি চাপরাশী ধাওড়া। প্রায় দশ-বারোজন চাপরাশী থাকে। তারা ভজন ভজন আটার রুটি সাঁটে। ডন বৈঠক কুস্তি লড়ে। কোম্পানির বিষয় সম্পত্তি পাহারা দেয়। কুলি ধাওড়ায় মেয়েদিকে তোপ করে এবং পেশাদার লড়াকু হয়ে দাঙ্গা করতে যায়। কেউ কেউ চুরি ডাকাতিও করে।

সভিপ্রসাদ নিজে কুশীদজীবী। কুলিকামিন দিকে ধার উধার দেয়। ক্যাশ কাউণ্টারে বেতন পেমেণ্টের সময় কেটে নেয়। এসব কায়দাকানুন বাপের আমল থেকে চলছে। এই যে সম্পদ মজুত করেছেন তাও দু'পুরুষ ধরে। ওঁর বাপ এখনো বেঁচে আছেন। দেশে গিয়ে জমিদারী কিনেছেন।

তাহলে কি রমরমাটাই না চলছে। কোথায় লাগে ডি. ডি., ডি. সি.। তাদের রোজগার তো ওয়াইন, উক্তম্যান, ডাক্তার, উকিলেই খেয়ে দেয়। দমে ফুটানি উড়ায়।

ধীর অথচ অনিবার্যভাবেই ঘটে যাচ্ছে যুগের পরিবর্তন। একদা কয়লা শিল্পে শ্রমিক রিক্রুটমেণ্ট ছিল প্রধান সমস্যা। সেইজন্যই ছোট বড় গোমস্তা, চাপরাশী, দালাল, সরদার, আড়কাঠি।

একবার সেই প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাণিজ্যিক মন্দার কারণে নিম্নমানের কয়লার চাহিদা ছিল না। তার ঠ্যালাতে বেবাক কুলিকামিনকে বিনা টিকিটে আপট্রেনে চড়িয়ে দিয়েছিল গোমস্তা চাপরাশীর দল। বেচারীরা ঠাসাঠাসি ভিড়ে পেচ্ছাব, পায়খানা মাখামাখি করে রেল পুলিশের ধোলাই খেতে খেতে ঘরে ফিরেছিল। কতক বা রাস্তাতেই মরে হেজে ফুরিয়ে গেল।

কিন্তু যারা সেই সময়টা কোনোরকমে গজাল ঘষড়ে বছর পাঁচ-সাত টিঁকে গিয়েছিল তারা আজ শেঠ। অবশ্য যাদের সে এলেম ছিল।

বহু কলিয়ারী জলের দরে বিক্রি হয়েছিল। কত যন্ত্রপাতি, লোহা লক্কড়, ঘরবাড়ি, কয়লা ডিপো নিলামে চড়েছিল। সেই সময় যারা যুদ্ধের বাজারে পয়সাকড়ি কামিয়েছিল তারাই ক্রেতা। কত জমিদারী হস্তান্তর হয়েছিল।

সভিপ্রসাদের বাপ সেই সময়টা মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। তারপর যখন বাজারের মন্দা কেটে গিয়ে তেজী ভাব দেখা দিলো। তখন তার তেজারতি ব্যবসাও ফেঁপে উঠল। কিনে ফেললেন জমিদারী।

যুদ্ধের সময় শ্রমিকের চাহিদা ছিল যুবতী মেয়ের মতো। কয়লা বিক্রি হতো হট কেকের মতো। গোরখপুরী শ্রমিকদিকে আনবার জন্য এক বিরাট সংস্থা চালু হয়ে গেল।

সেই সময়ে সভিপ্রসাদ প্রচুর সংখ্যায় গাজীপুরী, ভোজপুরী, ভাগলপুরী শ্রমিক আমদানি করেছিলেন। তারা অথবা তাদের বংশধর বা আত্মীয়-স্বজনেরা আজও আছে। খাদে লোডারের কাজ করে। তারা সব কায়িকশ্রমে ও মাথার বুদ্ধিতে গরু মোষের সমগোত্রীয়। কিন্তু স্বভাবে হিংস্র। বড়ই স্বার্থপরবশ। একটা টাকা, এক বোতল মদ বা একটা যুবতীর জন্য জান লড়িবে দিতে পারে।

মনিলাল, বাঁকেলাল, রবিলাল, মংগুরা তো সেই গোষ্ঠীর এক প্রজন্ম। গৌরীর উপরে কতক্ষণে দখল কায়েম করতে পারে সেজন্য মরিয়া। সে যে অন্য কাউকে

ভালোবাসে, তার জীবন যৌবন বন্ধক পড়ে গেছে এগুলো কোনো ব্যাপার নয়। তার হাতে কোবালা দলিল আছে! চাই দখল।

ভোগের জন্য, বংশবিস্তারের জন্য। রমণী যে ক্ষেত্র। সন্তানরা বিষয়-আশয়। তাহলে সে হলো ক্যাপিটালের ক্যাপিটাল।

আর তাদের অহঙ্কার। দ্বিরাগমনে বউ নিতে এসে খালি হাতে ফিরে গেলে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। অপমানের চূড়ান্ত। কুটুমদের কাছে মুখ দেখাবে কি করে?

দিওয়ানী, বে-শরম, বে-রহম যাইহোক বউ তো বটে! জোয়ানী তো আছে। মরদের মহড়া নিতে তো পারবে। ছেলে তো বিয়োবে। তাহলেই হলো।

সন্ধ্যার আকাশে মহুয়ার গন্ধে বাতাস ম-ম। গোমস্তাবাবুর চবুতরায় সিমেণ্ট বাঁধানো চত্বর। একটু দূরে একটি অশ্বত্থ গাছ। তার গোড়ায় সিঁদুর মাখা নুড়ি পাথর।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন এক ও দু'নম্বর চালু ছিল তখন এখানে একটি সাঁওতালপাড়া ছিল। সাহেব কোম্পানী তাদেরকে উঠিয়ে নেবুলিয়া রোডের ধারে ধাওড়া বানিয়ে বসত করতে দিয়েছিলেন। বর্তমানে সেই ধাওড়ার নাম জামজুড়ি। সেখানকার বহু সাঁওতাল কুলিকামিন খাদে কাজ করে।

সেও আজ অনেককাল হলো। কিন্তু তখনকার অশ্বত্থ গাছ ও সিঁদুর মাখা নুড়ি-পাথর এখনো আছে। বাঁদনা পরবের সময় রাবণ মাঝি আর গুষ্টির মাঝি মিঝানরা এসে পুজো দেয়। মুরগি বলি করে। লাগরা বাজিয়ে গায়। সেই বোঙার থানটিও সভিপ্রসাদ দখল করে নিয়েছেন। তার জন্য হুলমাল বা সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়নি। বেচারীরা বড়ই গরীব।

চবুতরা গুলজার। গৈরী হরণ মামলার শুনানী হচ্ছে। আসামী ফরিয়াদীরা আপন দলবল নিয়েই এসেছে। গৈরীকেও আনা হয়েছে। সঙ্গে এসেছে মাসী পিসিরা!

ঝোলাখাটে কম্বল পেতে সভিপ্রসাদ বসে আছেন। হাতে হাতে খৈনী টেপা হচ্ছে। এবং হাত বদল হচ্ছে গাঁজার কলকের।

মনিলালের দাবি সোচ্চার। গৈরীর বিয়ে থেকে শুরু করে দ্বিরাগমনের দিন করা পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার বিবরণ, টাকা-পয়সার লেনদেন, গয়না গড়ানো, দ্বিরাগমনে বউ আনতে যাওয়া, কুটুমের আদর অ্যাপ্যায়ন, ছেলের ফুলশয্যার আয়োজন, সেখানে গৈরীর প্রত্যাখ্যান, সিঁদুর মোছা, চুড়ি ভাঙা, গুলুর প্রবেশ ও নায়িকা উদ্ধার, তারপরে ধোলাই পর্বের জানমান জখমের বিবরণ বাঁকেলাল তার ঠেট দেহাতী ভাষায় এমন বর্ণনা করল যে উপস্থিত জনমণ্ডলীর মনে একটা ছাপ এঁকে দিলো। গুলুর সমর্থকরাও এই কাজটি যে ঘোরতর অন্যায়

হয়েছে তা স্বীকার করতে বাধ্য হলো। গুলুও কোনো প্রতিবাদ করতে পারল না।

রবিলাল তার এজাহারে বলল—বিলকুল ধোঁকাবাজি! গুলু উয়ার বিটিকে বাজারে ভাড়া খাটায়। সেই গরমে উয়ার বিটি সোহাগ রাতে মরদকে বলে—ছুঁও মৎ! উ নিজের মুখে কবুল করেছে যে উয়ার দুসরা আদমীর সঁথে মুহাব্বৎ আছে।

গৈরীর মাসী, পিসি ও আত্মীয় স্বজনরা তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলল—খবরদার আমাদের বিটির নামে বদনাম দিস না। ডোকরা হারামজাদা ঠেঙাঞে মুখ ভেঙে দিব।

সেই সময় বাদ-প্রতিবাদে একটা শোরগোল উঠল। সভিপ্রসাদ তা থামিয়ে দিয়ে আসামী পক্ষকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিলেন।

ওদের সারকথা—গৈরী আমাদের লেখাপড়া জানা বিটি। সোহাগ রাতে ঐ আখাম্বা মরদের কাছে যায় নাই ভয়ে। তো এমন চড় মেরেছে যে উ মরেই যেত। তারপরে কোন মেয়া সে মরদের ঘর করতে রাজী হবেক? উ রাজী হয় নাই ত উয়ারা বিহানবেলায় লোকজন নিঞে জুলুমসে টানতে নিঞে যেছিল। আমরাও জুলুমসে ছাড়াঞে নিঞেছি। থোড়া বহুত চোটঘাট লেগেছে। আমার বেটা দুটিও ঘায়েল হঞেছে।

সে তো দেখাই যাচ্ছে। দশ-বারোজন চোট খেয়ে রক্তলাল শরীরে ডাক্তারবাবুর কাছে পৌছেছিল। এখনো তাদের রক্তমুখ শুকোয়নি। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে কঁকিয়ে বেড়াচ্ছে।

—কিন্তু গৈরী শ্বশুরাল যাবেক নাই ক্যেনে?

সভিপ্রসাদের অমোঘ প্রশ্ন। গৈরীকেই ডাকা হলো তার জবাব দিতে।

গৈরী মাথা নীচু করে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ জ্যেঠাবাবু—

সভিপ্রসাদ চমকে উঠলেন। আরে একি দুনিয়া মেয়ের সম্বোধন নাকি? এত সহবৎ শিখলো কোথায়? হ্যাঁ—হ্যাঁ কালির আখর আছে পেটে। মা সরস্বতীর মাহাত্ম্য আছে বৈকী!

উনিও কোমল স্বরে বললেন—হ্যাঁরে বিটি! শ্বশুরাল ক্যেনে যাবি নাই?

—আমি এই বিয়া মানি না।

উনি অবাক। ওর দিকে তাকালেন। হাতে চুড়ি নেই, মাথায় সিঁদুর নেই, বিধবা না কুমারী তাই বোঝা দায়।

বললেন—এইটি কি কথা হলরে। তবে যে গোটা সমাজটাই উলটে যাবেক।

—উলটাবার জন্যই ত প্রতিজ্ঞা করেছি। সেই পাঁচ বছর বয়সে বিয়া দিঞেছে! কি বুঝতম বিয়ার মর্ম? দশ বছর ধরে চুড়ি আর সিঁদুরের বোঝা বঞেছি। তাই শেষ করে দিঞেছি।

—লেখাপড়া শিখে এই বুদ্ধি হলো ? ও তুর মা বাপ কুটুমজনে যে বিয়া দিলেক সেটি কিছুই লয় ?

—বলছি তো। অমন বিয়া দিএেছিল ক্যেনে ? লেখাপড়া শিখালেক ক্যেনে ? এখন বলছে একটা ভাং মুখ্যুর ঘর করগা তা পারব ক্যেনে ?

সভিপ্রসাদ ভীষণ বিরক্ত। তাঁর মুখের সামনে একটা মুনিয়া মেয়ে এত বড় বড় কথা বলতে পারে এটা তিনি কখনো ভাবেননি। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন—ঠিক আছে। আমি সব বুঝে নিয়েছি।

সওয়াল জবাব শেষ। জাজমেণ্টটাই বাকী। সভিপ্রসাদ বিচারক। ওঁর কোনো জুরি নেই। প্রয়োজনও নেই। তখনকার দিনে শ্রমিকদের কাছে ওঁর একটা কথার মূল্যই কোর্টের হাকিমের মতো।

উনি বললেন—আমি বুঝে দেখলাম গৈরীর শ্বশুর ঘর না যাওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। গুলু তার বিয়াইয়ের কাছে টাকা-পয়সা নিয়েও বিটি পাঠায় নাই। ঈ বহুত ইমানের খিলাপ। উয়ার দোষ ষোলো আনা। সেইজন্য গুলুকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হবেক। গৈরীকে শ্বশুর ঘর যেতে হবেক।

গুলু ওঁর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—হুজুর ! দেওতা ! মাফ করুন।

—তিনদিনের মধ্যে দেনাপাওনা ফারখৎ করে গৈরীর গাওনা করাতে হবেক।

উনি চলে গেলেন। রায় ঘোষণার পর বিচারক এজলাসে থাকেন না।

আটাশ

অনন্ত এসে পড়ল সেইদিন রাত্রেই। কমলেন্দু কোচিং ক্যাম্পে গিয়ে সব খবর দিয়েছে। সেখান থেকে এসে সুমিতবাবুকে বলল—দাদা ! গৈরীকে বাঁচান।

ততক্ষণে সভিপ্রসাদের বিচার প্রহসনের খবরও ওঁদের কাছে এসে গেছে।

উনি বললেন—গোমস্তার সঙ্গে ডি. সি.-র যোগসাজসেই এই বিচারের প্রহসন। এর মোকাবিলা করতে হলে গণ-আন্দোলন চাই। আর আগামীকাল সকালেই থানায় নিয়ে গিয়ে ওর শ্বশুরগুষ্টির নামে ডায়েরী করাতে হবে। মারধোর, নির্যাতন এবং ধর্ষণের অভিযোগ দিতে হবে।

—ধর্ষণ তো হয়নি। তা কি টিঁকবে ?

—ওরে থানা পুলিশ কোর্ট কাছারীতে কিছুটা বাড়াবাড়ির প্রয়োজন আছে। আর যাইহোক আইনের চোখে গৈরী এখনো নাবালিকা।

—এখন আমাদিকে লড়াইয়ের একটা স্ট্রাটেজি তৈরি করতে হবে। গোমস্তা চাপরাশীদের ঘুঘুর বাসা ভাঙতে হবে। একটা জোর আঘাত দিতেই হবে। তাহলে শ্রমিকদের মনোবল বাড়বে। কিন্তু অনন্ত তুই আমাকে একটা কথা সত্যি করে বল গৈরীর সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক ?

—খুব আপন সম্পর্ক দাদা। এই জগতে প্রেম ভালোবাসাটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ। সেটাই করে ফেলেছি।

—ভুল করেছিস।

—শুধু ভুল নয়—অপরাধ। দুনিয়ার বেবাক কবি, শিল্পী, লেখক প্রেমের জয়গান করেন। কিন্তু সত্যই যদি কেউ করে ফেলে তবে সে হয় অপরাধী। তাহলেও আমরা হারবো না। দেখছেন তো গৈরীর মনের জোর।

—এ খবর আর কে জানে?

—কমলেন্দু জানে। আর গৈরীর তরফে কেউ জানে কিনা তা জানি না।

—অলরাইট। ব্যাপারটা গোপন থাক। তুই যা অ্যাকশন কমিটির মেম্বার দিকে ডেকে নিয়ে আয়। এখুনি মিটিং করবো।

সেই রাতেই ইউনিয়নের অ্যাকশন কমিটির মিটিং হলো। দীর্ঘ পরামর্শের পর স্থির হলো—শ্রমিকদিকে অত্যাচার করার যে আদিমতম প্রথা তা হচ্ছে সরদারী ও গোমস্তা গিরির মাধ্যমে জুলুম বাজী, বিচারের প্রহসন ও শোষণের ফাঁক ফোকর তৈরি করা, এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। সুদের রাজ খতম করে মুক্তির আলো দেখাতে হবে।

আজ তো কয়লা শিল্পে শ্রমিকের কোনো অভাব নেই তাহলে গোমস্তার কি প্রয়োজন? ওই পদটা আছে বলেই নিত্য নতুন শ্রমিক আমদানি হচ্ছে ও পুরানোদিকে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। অতএব মালিকের কাছে দাবি রাখা হোক গোমস্তার পদ তুলে দেবার জন্য।

এসব খসড়ার ভাষ্য রচনা করে একটি স্মারকলিপি তৈরি হলো। সুমিত চ্যাটার্জী সেক্রেটারী। অন্যান্যেরা সদস্য। সকলেই সহি করে শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ছত্রিশ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকপত্র তার পরদিন বড় সাহেব থেকে শুরু করে কোম্পানির ডাইরেকটার পর্যন্ত সর্বত্র পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে সব বাসায় ফিরলেন।

পরদিন সকালে গৈরী তখনো মুখ ধোয়নি। অজস্র বাক্যবানে বিদ্ধ আপন মর্ম যন্ত্রণায় ব্যথিত একটা রাত কাঁদতে কাঁদতেই কেটেছে। চোখ মুখ ফুলে গেছে। গালের কালশিটে দাগটা ছাপ মেরে বশে আছে। স্তন দুটি টন টন ব্যথায় ফেটে পড়ছে। এমনিতেই তো এই সময়ে মেয়েদের স্তনে একটা মিষ্টি মধুর ঠনঠনে ব্যথা থাকে। তার উপর পাশবিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত রবিলালের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য আক্রমণের একটা বৃহৎ অংশ তার উপরেই পড়েছে। কালকার দিনটা ঘোর উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে বলে অতটা বুঝতে পারেনি। আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

নর্দমার সামনে উবু হয়ে বসে দাঁতে দাঁতন ঘষছিল। হঠাৎ এতগুলি লোক

দেখে ঘাবড়ে গেল। অনন্তকে দেখে আরো চমকে উঠল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল। হরিহর গান্ধী, তিলক সিং, যমুনা যাদব, কালু মশহর, রামদেও পাশমন আর অনন্ত তাদের উঠোনে দাঁড়িয়ে।

অনন্ত বলল, তোর বাপু কোথায় রে গৈরী ?

—আছে কুথাও।

—ডাক ওকে। মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। থানায় যেতে হবে। জলদি কর। আমরা বাইরে চবুতরায় বসছি।

গৈরীর সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছে। অনন্তকে দেখার পর থেকেই ভিতরে ভূমিকম্প সুরু হয়ে গেছে। কিছুতেই সামাল দিতে পারছে না। অযথাই চোখ ফেটে জল আসছে।

ওরা সব চবুতরায় দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। চরিতার একটা খাটিয়া এনে বসতে দিলো। ওরাও আধঘণ্টা কথা বলে ওদেরকে উত্তেজিত করে ফেলল। গোমস্তা বাবু যে ভগবান নয়, চাপরাশীরা যে যমদূতের মতো ক্ষমতা ধরে না, ডি. সি. সাহেবের চাল চহরম ষড়যন্ত্র যে ফাঁস করে দিতে পারে, শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যে এসব অশুভ শক্তিকে ঝড়ের মুখে কুটোর মতো উড়িয়ে দিতে পারে তার ব্যাখ্যায় শাসন ও শোষণের ভিন্ন ভিন্ন পন্থাগুলিকে বিশ্লেষণ করে ওদের মগজে ঠুসে দিলো।

ওরা একবাক্যে সায় দিলো গুলু ও গৈরীকে তোমরা থানায় নিয়ে যাও।

মুখ ধুয়ে সাফসুতরো শাড়ি ব্লাউজ পরে গুলুর পিছনে পিছনে গৈরী যখন এসে চবুতরায় দাঁড়াল তখন ওকে বেশ দেখাচ্ছিল। বরাবরের জম-জমাট সাজ পোশাক, রঙ বাহার শাড়ি, তার ঘোমটা মাথার তালু পর্যন্ত সিঁদুর, হাতভর্তি চুড়ির রনক ঝনক বাদ দিয়ে সাদা সাপটা ড্রেসে আলাদা রকম মনে হচ্ছিল।

তবু তার চোখের পাতা দুটি ভারী। কাজল পরেনি। তাই একটু ফাঁকা। মুখটি জলে ধোওয়া কচি পুঁই পাতার মতো ঝক্ ঝক্ করছে। ঠোঁটের আগায় একটু হাসিও লেগে আছে।

অনন্ত ভাবল—আহা। বেচারীর উপর কত না ঝড় বয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে চলল ওরা। মেসের কাছে সুমিতবাবু সঙ্গ নিলেন। অন্যেরা নিজের কাজে চলে গেল। সবাই মিলে হৈ-হাল্লা করতে যাবার কি দরকার ? তার চেয়ে ধাওড়ায়, ধাওড়ায়, খাদের অন্ধকারে গোলাইয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে ছোট ছোট মিটিং করলে বেশী কাজ হবে।

সুমিতবাবু ডাক্তারবাবুর কাছে গৈরীর উপর অত্যাচারের একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট নিলেন। উনি না বলেননি। তবে চেকআপ করেছেন।

সুমিতবাবুকে একান্তে ডেকে বলে দিলেন—গৌরী প্রেগন্যাণ্ট! এটা কি করে হলো ?

—হতে পারে। আমি খবর নিচ্ছি।

হসুনিয়া মোড়ে বাস ধরে থানায় পৌছতে বেলা দশটা বেজে গেল। দারোগাবাবু বাইরে গিয়েছিলেন। ওদেরকে বসতে হলো।

থানা চত্বরের মধ্যেই একটি বটগাছ। তার নীচে ওরা দাঁড়িয়ে।

সুমিতবাবু বললেন—ডায়েরীতে কি কি লেখাতে হবে তা গৌরীকে বুঝিয়ে দে। আমি তোদের জন্য দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। গৌরীকে খেতে বলবি। ওর খালি পেটে থাকা ঠিক নয়। এসো গুলু।

গুলুকে নিয়ে চলে গেলেন। অর্থাৎ ওদের দুজনকে একান্তে মনের কথা খুলে বলবার অবকাশ দিলেন। এই না হলে গার্জেন। অনন্ত ওর প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধ করল।

গৌরী একটা শিকড়ে বসে আছে। পায়ের নীচে ভিজে মাটি। সবুজ ঘাস। এক গুছি ঘাস ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কাটছে। মাথাটা নীচু। অনন্তের দিকে তাকাতে পারছে না। ভিতরটা কেমন গুড় গুড় করছে ভয়ে লজ্জায়।

অনন্ত বলল—মুখটা তোল। একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলি যে।

গৌরী হাঁটুর উপর থুতনি রেখে ওর দিকে এক পলক চাইল। কথা বলল না।

অনন্ত বলল— হ্যাঁরে! তোর খুব কষ্ট হয়েছে।

—সে কি বলে বোঝাতে পারব ?

—যাক। খুব লড়েছিস।

—আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম—তা রেখেছি।

—খুব ভালো করেছিস। এই তো চাই। মেয়েদের মধ্যে এমনি লড়াকু হিম্মৎ।

—কিন্তু তোমরা না এলে আজ আমি জীবনটা ঘুচিয়ে দিতাম।

—সে কি রে ?

—হ্যাঁ তো! কত আর পারবো ?

—পারতে হবে গৌরী। জীবনের এখন অনেক বাকী।

—আর কি আমার লেখাপড়া হবে ?

—কেন হবে না ?

—শরীরের এই অবস্থা নিয়ে কি করে স্কুলে যাবো ?

—সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে।

—সিঁদুর মুছে দিয়েছি। এখন আমি না সধবা না কুমারী। আবার বিধবাও নই। এক পরিত্যক্তা নারী। এই আমার বর্তমানের পরিচয়। অথচ গর্ভে সন্তান।

গৌরী এখন যে বিন্দুতে অবস্থান করছে তার নির্ণয় সে করে ফেলেছে। অনন্ত নিজেও এতটা ভাবেনি। সত্যি তো! বুকের মধ্যে কত সাহস থাকলে কোনো মেয়ে এমন অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

গৌরী আবার বলল—তোমার উপর বিশ্বাস রেখেই আমি এত কাণ্ড করেছি। এবার তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর। আমি আর ভাবতে পারছি না।

অনন্তর মনে হলো এই মুহূর্তে ওকে বুকে চেপে ধরে বলে—তুই আর আমি অভিন্ন।

বলল—তুই কিছু ভাবিসনে গৌরী, আমি তোকে সিঁদুর দেবো।

গৌরী ওর দিকে তাকাল। চোখের তারা দুটি টলটল করছে। পাতা দুটি ভিজে গেছে। বলল—সিঁদুর দেবে? তার মানে বোঝ তো?

—কি?

—আমি তোমার ধর্মপত্নী হয়ে যাবো।

—তাই তো। তুই-ই তো আমার ধর্মপত্নী। আমি কি ছেলেখেলা করছি নাকি?

—তারপর? তোমার জাতকুটুমে আমাকে নেবে?

—না। তা নেবে না।

—তবে?

—তবে আর কি? জাতকুটুম ছেড়ে দেবো। তুই আর আমি আলাদা সংসার পাতবো। গৌরী চুপ করে রইল। অনন্তর কথাগুলো কিরকম যেন স্বপ্নের মতো মনে হলো। স্বপ্নের কোরকে মোড়া রইল ভীষণ আশঙ্কা।

ডায়েরী লিখিয়ে ফিরতে অনন্ত ও গৌরীর চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। দুজনের কানে বাজল দামোদরের ডাক। তারপর সে চলে গেল বাপের সঙ্গে। অনন্ত এল মেসে। সুমিতবাবুর ঘরেই ঢুকল। উনি তখন খাটে বসে জুতো খুলছেন। মুখটাও থম্‌থম্‌ করছে।

বললেন—গৌরী প্রেগন্যাণ্ট। তা জানিস?

—হ্যাঁ।

—এতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয়েছে তোর?

—সে জ্ঞান ছিল না দাদা। প্রথম দর্শন থেকেই দুর্নিবার আকর্ষণে পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেছি। তারপর যা হয়েছে সবই প্রকৃতির ব্যাপার।

—কিন্তু এরপর কি করবি?

—ওকে নিয়ে সংসার করবো?

ওরে এ আবেগ থাকবে না। বাস্তবের আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

—তার মোকাবিলা করবো দাদা। আজ আর শরৎচন্দ্রের সমাজ নেই। শিল্প-সভ্যতার যুগে বাস করছি। কি মূল্য জাত সমাজের?

—তোর মা একথা শুনলে সহ্য করতে পারবেন?

—তা হয়তো পারবেন না। কিন্তু আমার বাবার আত্মা শান্তি পাবেন। তিনি সারাজীবন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। আমি আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলাম। ছোটলোকের মেয়েকে ভোগ করলে জাত যায় না দাদা বিয়ে করলেই জাত যায়। এ ভণ্ডামি আমি সহ্য করবো না।

—তোর কথা শুনে ভালো লাগল। যা স্নান করগে। ভগবান তোর মঙ্গল করুন।

শ্রাবণের ভরা দামোদর উন্মত্ত উদ্দাম। প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে।

গুম্ গুম্ গুম্ গুম্—অবিরত এক শব্দ তরঙ্গ যেন লক্ষ ডম্বরুর আবহ সঙ্গীত। মেঘ ঝুলে পড়েছে পাহাড়ের কোলে। দামোদরের ওপারে বিলীয়মান দিক চক্রবাল। ঘোর অন্ধকারে উন্মত্ত দামোদরের গেরুয়া জলরাশিতে উথাল-পাথাল ঢেউ মাঝে মাঝে আকাশ চেরা বিদ্যুৎ প্রভা। সেই বিপুল কোলাহলময় জল কল্লোল, ঘোর রজনীর তামস ভ্রূকুটির সামনে দাঁড়ালে ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। অথচ প্রেমিক মনের কি আশ্চর্য লগণ ঘটন—তারই প্রেক্ষাপটে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনন্ত গৈরী।

তাদের পিছনে লক্ষ জোনাকী জ্বালা শিমুল গাছ। সম্মুখে দামোদর।

রাত ভয়ঙ্কর।

অনন্ত সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে মেটে সিঁদুরের থান, রূপোর টাকা, ফুলের মালা, লোহা, শাঁখা একগোছা চুড়ি। সেগুলি একে একে পরিয়ে দিলো গৈরীকে বলল—গৈরী! তুই আমার ধর্মপত্নী। তোর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিলাম। তার সাক্ষী রইল—অনার্য দামোদর, ঘোর অন্ধকার রাত, বিদ্যুতের ঝলক। বিরাট বিপর্যয়ের মধ্যেই না মহতের সৃষ্টি। তুই আমার আঁধার মানিকরে। আয় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

দামোদরের দিকে মুখ করে হাঁটুতে ভর দিয়ে পাশাপাশি বসে প্রার্থনা করল—হে জ্যোতির্ময় ঈশ্বর আমাদের প্রেমকে সার্থক কর।

ঝর ঝর বৃষ্টিপাতে ঝরে পড়ল ঈশ্বরের আশীর্বাদ। প্রেম শাশ্বত সত্যের প্রভায় রচনা করল স্থায়ী মুহূর্ত।

উনত্রিশ

গৈরী স্বপ্ন দেখছে। চাঁদের মতো ছেলে হয়েছে ওর। দামাল শিশু। হামা টেনে বেড়ায়। খলবল করে হাসে। সদ্য ওঠা দুটি দাঁত ঝিক্ ঝিক্ করে।

তাকে বুকে নিয়ে স্টেশনের বেঞ্চে বসে আছে। অনন্ত দুধের ফ্লাস্ক খুলেছে। একদিকে বাকসো বেডিং। ট্রেনটা হুইসল দিয়ে প্লাটফরমে ঢুকল।

কোথায় যাবে ওরা?

ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখল ঘুলঘুলি দিয়ে ভোরের আলো ঘরে ঢুকছে। ছোট বোন দুটি ঘুমে নেতিয়ে আছে। ভাই দুটি নূতন চালাতে শুয়ে। বিটির দ্বিরাগমনের প্রস্তুতি পর্বে যা বানিয়েছিল তা কাজে লেগে যাচ্ছে। এখন গৌরীর হাত পা ছড়িয়ে শোবার অনেক জায়গা। যদি কোনোদিন অনন্ত এসে পড়ে। আঃ। কতই না ভালো হয়।

ধ্যেৎ! কি যা তা ভাবছে? সে কি কুলিকাবাড়ি নাকি যে দুনিয়া ধাওড়াতে আসবে? সে সাহেব হবে।

হাসি পাচ্ছে ওর। পেটটা চিক্ চিক্ করছে। নাভির নীচে এক সারি চামড়া ফাটার দাগ উঠেছে। এই নাকি অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার লক্ষণ।

উঠে পড়ল। দেওয়ালে টাঙানো ঠাকুর দেবতার ছবিকে প্রণাম করল। আয়নাতে মুখ দেখল। বুকের উপর ফুটে থাকা জোড়া কদমের ফুল দেখল। বোঁটা দুটো কলো হয়েছে। টিপে দেখল রস বেরুচ্ছে।

এঃ মা! দুধ জমে গেছে।

মাতৃত্বের পরম গৌরব। রমণী জননী না হলে এই ভাবের উদ্দীপণ হয় না। পয়োধর পয়ঃস্বিনী হয় না। আর তার সৌন্দর্যও এমন রমণীয় হয় না। পরমা প্রকৃতির প্রসন্ন বিভায় তার মুখ ঝলমল করে উঠল।

আসুক না ঝড়-ঝাপটা। হিম্মৎসে মোকাবিলা করবে।

গোমস্তাবাবুর বুক জোড়া আক্রোশ। রাগে অষ্টাঙ্গ জ্বলছে। তিনদিন পার হয়ে গেল তবু তার হুকুম তামিল হলো না। খাদের লোকজন বিধি ব্যবস্থা করে বেলা সাড়ে নটা নাগাদ একদিককার উরু অনাবৃত করা ধুতির কোঁচা ধরে নাগরা জুতোর মচ মচ শব্দ তুলে বাসায় ফিরছিলেন।

তখন চবুতরায় বসেছিল প্রেতাত্মার মতো দুটি মাল মনিলাল ও বাঁকেলাল। রুক্ষ, কর্কশ। চোখ মুখ বসে গেছে। সারা মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি। মাথার উপর রুক্ষ চুলের বোঝা। দমভরে গাঁজা টেনেছে তাই চোখ লাল। সেই থেকে এখানে পড়ে আছে স্নানও নেই ঘুমও নেই। মাথার ভিতর অযুত পিপীলিকার বিষ-দংশন অমন সুন্দর বউ বে-হাত হয়ে গেল।

কি করে তাকে নিয়ে যাবো? না হয় বদলা নেবো। কত কী ভেবেছে। কোনো ভাবনাতেই কূলে এসে তরী ভেড়েনি। থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া—উঃ শ্যালা গুলু—তুই এত বেইমান! তুর বিটি এমন রাণ্ডী!

গোমস্তাবাবু কাছে আসতেই জোড় হাত করে দাঁড়াল—গোড়লাগি বাবা!

উনি রাগে ফেটে পড়লেন—আ গয়া শ্যালা চুহাড়কা বাচ্চা!

—মোর ক্যা কসুর বাবুজী? মনিলাল হাত জোড় করে কাঁপছে।

—তোর বহু হরদম রাস্তা পর ঘুরে ফিরে। যাও—খিঁচকে লে-যাও। যাও।

অত সাহস ওদের নেই। রাস্তা থেকে মেয়ে লোপাট করতে যেসব আয়োজন, উপকরণ ও অর্থবলের প্রয়োজন তা ওরা কোথায় পাবে? ওরাও তো মেহনতী শ্রমিক। ঘর গুষ্টি কয়লা গাদায় পড়ে থেকে কাজ করে বলেই খেতে পায়। ন্যূনতম সাধ আহ্লাদ ছেলের বিয়ে দিয়েছে। এবার দ্বিরাগমনে বউ আনবে। তার জন্য নায্য টাকা দিয়েছে। তবু যদি বউ বলে—যাব নাই তবে সেটা কি কম দাগা হলো?

ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

গোমস্তাবাবু একজন লোক পাঠালেন গুলুকে ডাকতে। সে লোকটা ফিরে এসে বলল—উ এল নাই বাবু।

—এল নাই? এত সাহস। ফির যাও। ছট্টু লট্টুকে লিয়ে যাও। না আসে তো বেন্ধে লে আও।

ছট্টু লট্টু নাম করা পালোয়ান। ইয়া লাহাঙ্গা জোয়ান। টাঙ্গির মতো গোঁফ। একবার চোখ ঘোরালে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। সভিপ্রসাদের ডান হাত বাঁ হাত। ওদেরকে দিয়ে কত যে লেবারের হাড় ভেঙে মুর্দা বানিয়ে দিয়েছেন তার সংখ্যা নেই। হাতির মতো মস্তিতে ওরা গেল আর পুঁটি মাছের মতো গুলুকে ধরে নিয়ে এল?

এগুলো হর হামেশার ঘটনা। নতুনত্ব কিছু নেই। রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। লোকজন দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে? ফ্যা ফ্যা করে হাসে।

কিন্তু এই প্রথম দেখা গেল একটি ব্যতিক্রমী চিত্র।

গলাফাটা চিৎকার ও গালি দিতে দিতে হাতা খুন্তি, বঁটি, কাটারী নিয়ে একপাল নানা বয়সের মেয়ে ছুটে আসছে হুনিয়া ধাওড়া থেকে। তাদের পুরো ভাগে গৈরী।

সাইডিংয়ে যে হুনিয়ারা ওয়াগন লোড করছিল তারা ছুটে এল কাঁটা বেলচা হাতে। তাদের সামনে জগদীশ, হরেরাম।

উপর ধাওড়া দিক থেকে ছুটে এল একদল লেবার। তাদের সামনে রামধনি। আর একদল পাঞ্জাবী, বিহারী, লেবার নিয়ে ছুটে এল গুরুনাম সিং। লোক বাড়তেই লাগল কোঁড়া ধাঙড়, হস্থনিয়া বাউরী পাড়ার ছোকরারা, জামজুড়ির মাঝিরা। দেখতে দেখতে লোক জমে গেল। সবারই মুখে উত্তেজনা।

জগদীশ ও হরেরাম ঝাঁপিয়ে পড়ল ছট্টু ও লট্টুর উপর। বিরাট লাশ নিয়ে ওরা যখন একবার পাশ ফেরে এদের হাতের কাঁটা বেলচা ততক্ষণে ওদের ঘাড়ে চোট বসিয়ে দেয়। দুজন দু'দিকে ছিটকে পড়ল। ছাড়া পেয়ে গুলুও সরে পড়ল।

লোকজন দেখে সভিপ্রসাদ ঘাবড়ে গেছেন। রাগে, অপমানে টকটকে পরিষ্কার মুখটা লাল হয়ে গেছে।

কি রকম জড়িত কণ্ঠে বললেন—তু লোক ক্যেনে এসেছিস?

জবাব দিলো গৈরী—আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এই জুলুমের রাজ বন্ধ করবেন কি না ?

—আমি কি জুলুম করেছি ?

—জুলুম নয় ? কেন ধরে এনেছেন আমার বাপুকে ? উয়াকে ধোলাই করে আমাকে শ্বশুর ঘর পাঠাবার কথা কবুল করাতে ? কত বড় কোর্টের হাকিম আপনি যে বিচার করে রায় দিঞেছেন। আমি আপনার রায় মানি না। গরীব মুখ্যু লেবার দিকে চুষে চুষে বহুত বাড় বেড়ে গেইছে।

কে একজন বলল—সুদ খেঞে খেঞে বেটা মোটা হঞে গেইছে।

আরেকজন বলল—বেবাক চর্বি ধস্কাঞে দাওহে।

একজন পাঞ্জাবী বলল—সাডে কো চুক্ হুঁ।

একজন বিহারী বলল—ইয়ে শ্যালা ভঁবড়ীবালা পাহালমান দোনোকে হাবিস কর দেও। খাদানমে গিরা দেও। তব ইস্কা গরম টুটেগা। আরেকজন ঠেকা দিলো—ইয়ে দো বেগানা কুত্তা বহু লেনে আয়া। দামুন্দরমে ভাসা দেও।

একজন বাঙালি ছোকরা বলল—মড়ার মতো ভাসতে ভাসতে চলে যাক। ওদের কলিয়ারীতে পৌঁছে যাবে।

নানা মুখে নানা ভাষায় নানা খিস্তি খেউড় সহ এমন সব বাক্য তাঁর উপর বর্ষিত হচ্ছে যে রাগ, দুঃখ, অপমানকে অতিক্রম করে এই বুঝি তাঁর প্রথম বোধোদয় হলো যে শ্রমিকদিকে এতদিন ধরে যত শোষণ করে এসেছেন তার প্রতিফল শুরু হলো।

বললেন—আমি তোমাদিকে দেশ থেকে নিয়ে এসে কলিয়ারীতে চাকরি দিয়েছি। আর আমাকেই বেইজ্জত করছো।

আবার গৈরীর উত্তর—চাকরি আপনি মেহেরবানী করে নাই দেন গোমস্তাবাবু।

লোক এনেছেন কমিশন পেঞেছেন। সুদের দায়ে বন্ধক রেখেছেন। একজন ঠেকা দিলো—দু তরফা কমিশন। লেবারের কাছে, কুম্পানীর কাছে। আরেকজন বলল—বিশ টাকা উধার দিঞে ঘরগুষ্টিকে কিনে নিয়েছে ? সারা জীবন টাকা দিঞেও উশুল হয় নাই। বাপের দেনা বেটাতে শোধ করছে। বাঙালি ছোকরা বলল—ফাটকবাজারে দোকান ফাঁদ এড়েছে। শ্যালা উয়ার দোকানে মাল লিতেই হবেক। আর উ ডবল দাম লিবেক। তার উপরে সুদ জুড়বেক। কি শ্যালা ঘুঘুরে।

একজন যাত্রার আসরে অভিনয় করার ভঙ্গীতে বলল—লেবার দিকে চোর বেনাঞেছো, মাতাল বেনাঞেছো, বউ-বিটিদিকে রাণ্ডী কসবি করেছো। তবু শ্যালা তোমার সাধ মিটে নাই ? গৈরীর দিকে নজর। কি মনে করছো—উয়াকে শ্বশুরবাড়ীর নাম করে ব্যবসা করবে ? আমরা তা হতে দিব নাই।

গুরুনাম বলল—সাডে কো টেংরি উতাড় লুঁ।

বহু চিৎকার, চেঁচামেচি, শ্লেষ, বিদ্রূপ, কটূক্তির মধ্যে দু চারটি নমুনা। জনতার মুখ একবার খুলে গেলে সে একেবারে জোড়ের বানের মতো খরস্রোতে বইতে থাকবে। তোড় সামলানো দায়। কে কবে তার কাছে লাঞ্ছিত হয়েছে, কার টাকা কেড়ে নিয়েছেন, কার মেয়ে কেড়ে নিয়েছেন, কাকে জুতো পেটা, কাকে লাঠি পেটা, কাকে খাবার বন্ধ, কাকে জীবনেই শেষ করে দেবার হুকুম দিয়েছেন তার উল্লেখ করে আপন আপন গায়ের ঝাল ঝেড়ে দিচ্ছে। কেউ কেউ এমন গালও দিচ্ছে যার অর্থ তাঁর মা বোন ও মেয়েকে প্রকাশ্য ধর্ষণ বোঝায়।

সভিপ্রসাদ একেবারে চুপ। একটা কথা বললে দশটা গাল ভেসে আসছে। কার মুখে হাত দেবেন? সবাই ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

গুলু মুনিয়া এতবড় মরদ! গৈরী এতবড় হিরোইন!

তাদের জন্য এতবড় অপমান সইতে হচ্ছে। মনটা বিষিয়ে গেল। মনিলালকে বললেন—তোমরা যাও। আর এদিকে এসো না।

লেবাররা হৈ হৈ করে উঠল—ভাগাও শ্যালা লোগকা।

কিছু লোক ওদেরকে তেড়ে নিয়ে গেল। দু-চার ডাণ্ডা মারও পড়ল। মংগু সরদার ওদেরকে রক্ষা করে নিয়ে গেল।

পরব শেষ। লেবাররা সব শ্লোগান দিতে দিতে গেল—

—জুলুমকা রাজ খতম করো।

—হারাম খোরকো হালাল করো।

ত্রিশ

হঠাৎ এজেন্ট বদল হয়ে গেলেন।

এবার যিনি এলেন তাঁর নাম মিঃ ড্যানিয়েল 'শ। দো-আঁশলা মাল। মিঃ ব্যারাকলউয়ের বাস্টার্ড সান। ওঁর মা পানমোহরায় মিঃ ব্যারাকলউয়ের রক্ষিতা ছিলেন। ছেলেটি তখন রাঁচি মিশনারী স্কুলে পড়ত। পানমোহরায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় ওঁর মাকে ভীষণ নির্যাতন করা হয়েছিল। উনি দামোদরে ঝাঁপ দিয়ে মরেছিলেন।

তাতে অবশ্য ছেলেটির লেখাপড়ার কোনো ক্ষতি হয়নি। পাদ্রী সাহেবরা দেখতেন। তারপরে তো মিঃ ব্যারাকলউ এক লাখ টাকার একটা ফাণ্ড তৈরি করে একটা মিশনারী সম্প্রদায়কে ট্রাস্টি নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর আশ্রিতাদের একটি তালিকা দিয়ে ঐসব মেয়েদের ছেলেমেয়েরা যাতে যতদূর খুশী লেখাপড়া শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তারই দৌলতে মিঃ 'শ ফার্স্ট ক্লাস কলিয়ারী ম্যানেজার। বুদ্ধিমান ছাত্র

ছিলেন। মাইনিং পড়েছেন গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে। বিয়ে করেছেন একজন আর্মেনিয়ান লেডীকে। ছেলেমেয়ে দুটি।

দামোদর কোল কোম্পানীতে দশ বছর যাবৎ চাকরী করছেন বড় বড় পোস্টে। আণ্ডারচক কলিয়ারীতে এজেন্ট ছিলেন। কাজে-কর্মে তুখোড়। পুরো ইউরোপীয়ান স্টাইলে থাকেন।

দামুলিয়া কলিয়ারীতে এসে তাঁকে পড়তে হলো শ্রমিক অশান্তির মুখে। রেশন আন্দোলন নিয়ে রোজ কিছু না কিছু ঘটনা ঘটছে। ধাওড়ায় ধাওড়ায় ইউনিয়নের লোক ঘুরছে। তারা পিকেটিং করছে। রেশন নিতে দিচ্ছে না। ইচ্ছা থাকলেও অনেকে আনতে পারছে না। দু-একটা মারপিট হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা চীফদের টেবিল পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে।

তখন কোম্পানীর চীফ পার্সোন্যাল ম্যানেজার ছিলেন একজন জবরদস্ত সাহেব। ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার। তিনি যখন পুলিশ সুপার ছিলেন একাধিকবার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মিছিলে গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর সরকারি চাকরীতে অবসর নিয়ে ব্রিটিশ ফার্মে বৃহৎ শ্রম-বিভাগের মাথার মণি হয়ে বসেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে কিনা কে জানে কিন্তু তিনি চাইলেন এসব ঝামেলা যেন মিটিয়ে নেওয়া হয়। শ্রমিক অশান্তি যেন বাড়তে না পায়।

নীতিগত কারণেই তিনি ঝামেলা মিটিয়ে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমত এই বৎসরটা চলছে কোম্পানীর শতবর্ষ পূর্তি। বছর শেষ হলে তিনিও চলে যাবেন অবসর নিয়ে ? নিজের দেশে সাসেক্সে কটেজ কিনেছেন। লয়েড ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা সেখানেই ব্যবসা ফেঁদেছেন। এবার মিসেসকে নিয়ে বাকী জীবনটা হোলী বাইবেল পাঠ করে আর অমৃতপুরুষ যীশু খৃস্টের ভজনা করে কাটাবেন। পাপের তো কম সঞ্চয় হয়নি। তাঁর যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ যথা হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি তো মানবিক বিচারেও পাপ। তাই চার্চে কিছুদিন স্বীকারোক্তি দেবেন।

দ্বিতীয়ত : একদা কয়লা কুঠিতে কুলিকামিন অন্বেষণ করে এনে বহাল করতে হতো। সে কাজের কাজী ছিলেন গোমস্তা।

যুগের কি পরিবর্তন ! আজ সেই শ্রমিক দিকে ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্য। সে কাজেও গোমস্তা।

এটাও কোম্পানীর নীতি। ট্রেড ইউনিয়নের শাখা প্রশাখা সব কলিয়ারীতে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রমিক আন্দোলন রক্তক্ষয়ী হয়ে পড়লে তার হ্যাপা যে কত তার অভিজ্ঞতা আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে।

তাছাড়া পার্লামেণ্ট থেকে খনি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ট্রাইবুন্যাল বসাবার

হুকুম বেরিয়েছে। নেহেরুজী নিজে বলেছেন আমাদের দেশে খনি শ্রমিকদের দুর্দশার শেষ নেই। তার অবসান প্রয়োজন।

কাজেই দেশের সরকার যদি মদৎ করেন তাহলে মালিক, ম্যানেজাররা ক'দিন ঠেকিয়ে রাখবেন? জোয়ার আসছে। প্রথম ট্রাইবুন্যালের রায় ঘোষণার জন্যই অপেক্ষা।

কয়লা কুঠির শ্রমিক আন্দোলনের এই তাৎপর্যময় ঐতিহাসিক পটভূমিতে তাদের কোম্পানীর নীতি ছিল ধামা চাপা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে যতদিন চলে। তারপর এসপার ওসপার।

এই সময় ঘটে গেল আরো একটি ঘটনা।

গোরখপুরী শ্রমিকদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। তাদের রেশন নিয়মিত ভাবেই আসত! ওদের ক্যাম্পেই সাপ্লাই হতো। সাহেব সুবো, বিশিষ্ট বাবু সম্প্রদায় ক্যাম্পের কম্যাণ্ডরের সঙ্গে যোগাসাজস করে তাঁদের নিজেদের জন্য উৎকৃষ্ট মানের রেশন আনা করিয়ে নিতেন।

একদল শ্রমিক সেই রেশনের ট্রাক লুঠ করে দিলো। মাত্র জন দশ বারো ছোকরা রাস্তার উপর ট্রাকটাকে দাঁড় করিয়ে চাল, ডাল, গম শ্রমিকদিকে বিলি করে দিলো। অত যে বড় বড় পালোয়ান নিত্যদিন ডজন ডজন রুটি সাঁটছে আর ডন বৈঠক করছে তাদের হিম্মত কুলোল না মোকাবিলা করার।

ফলত আবার পুলিশ দারোগা। কিছু নির্দোষ শ্রমিক গ্রেপ্তার এবং অনন্তর ছুটোছুটি কোর্ট কাছারিতে হাজির জামিন করানোর জন্য। এই বিশেষ কাজটিতে ওর অভিজ্ঞতা বাড়ছে।

পর পর তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেল। দু'বার পুলিশ কেস হলো। কম পক্ষে দশবার মিটিং মিছিল হলো। প্রত্যেকবার মিটিংয়ে লোকসংখ্যা বাড়ছে। রেশন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে অন্যান্য কলিয়ারীতেও। কোথাও এক সপ্তাহ কোথাও দু' সপ্তাহ করে রেশন বন্ধ আছে।

ইউনিয়ন হুমকি দিয়েছে অবিলম্বে যদি এর ফয়সালা না হয় তাহলে ধর্মঘটের ডাক দিতে বাধ্য হবে।

অতঃপর প্রত্যেক কলিয়ারীতে একটা করে ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং করার প্রস্তাব এল কোম্পানীর তরফ থেকে। ইউনিয়ন তা গ্রহণ করল।

মিটিং শুরু হয়েছে। আলোচনার শুরুতেই সুমিতবাবু ছত্রিশ দফা দাবি সম্বলিত স্মারক লিপি পেস করলেন যার কপি আগেই দেওয়া হয়েছে। যার প্রথম দফা রেশন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে অনুরূপ পরিমাণের রেশনের যে বাজার মূল্য হয় তাই নগদ দিতে হবে।

হেড অফিস থেকে একজন সাহেব এসেছিলেন। তিনি নিজেকে শ্রমিকদের সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মনে করেন। বললেন—রেশন ব্যবস্থা তুলে দিলে আমাদের অনেক হ্যাপা কমে যায়। এজন্য একটা পুরো এসটাব্লিশমেণ্ট চালু রাখতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে শ্রমিকদের ন্যূনতম খাদ্য যদি রেশনে না দেওয়া হয় তাহলে ঐ টাকা দিয়ে তারা বাজারে খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজন মতো কিনবে না। মদ দোকানে চলে যাবে।

ইউনিয়নের একজন সদস্য বললেন—আপনারা যে চাল দেন তাও তো মদ দোকানে চলে যায়। দেখছেন না যেদিন থেকে রেশন বন্ধ হয়েছে সেদিন থেকে ধেনো মদের দোকানগুলোর নাভিশ্বাস উঠছে। ওরা এবার ঝাঁপ বন্ধ করলে বাঁচে।

সুমিতবাবু বললেন—ওসব কথা ছাড়ুন। কলিয়ারী শ্রমিক যে পয়সা পেলেই মদ দোকানে দৌড়বে এ ধারণা আপনার কি করে হলো?

—আমার অভিজ্ঞতায়।

—অভিজ্ঞতাটা আরেকবার ঝালাই করুন। আসলে পরিবেশ মানুষকে ঐ রকম করে ফেলে। ভালো পরিবেশ ও ভালো বন্ধু-বান্ধব পেলে শ্রমিকদের ভাবী প্রজন্ম এসব নেশা ভাঙ, নোংরামি থেকে দূরে থাকবে তা হলফ করে বলতে পারি।

—আপনি একটা উদাহরণ আমার কাছে এনে দিন।

—একটি তো নিশ্চয় পাবেন। দশ বারোটি এমন ছেলেমেয়ে এনে দিতে পারি যারা একদা বিড়ি খেত, মদ খেত, নোংরামি করত তারা এখন সব ছেড়ে মন দিয়ে পড়াশুনা করছে।

মিঃ 'শ এজেণ্ট বললেন—এগুলো কোনো ইস্যু নয়। আজ যদি বাজারে ফাটকাবাজী হয় তাহলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম চড়ে যাবে। কুলিকামিনরা খেতে পাবে না। কাজ করবে কি করে?

—ঐ পচাধসা চাল, গম, জোয়ার, বাজরা খেয়ে তো ওলাউঠায় মরে যাবে।

ডি. সি. সাহেব বললেন—কে বলে পচাধসা?

আমরা বলি নমুনা পরীক্ষা করতে পারেন। ওসব অখাদ্য খেয়ে আমরা সবাই পেটের অসুখে ভুগছি।

—তাহলে তোমরা কাজ কর না। একজন কর্মক্ষম ব্যক্তির পাকস্থলী আগুনের মতো জ্বলে। খাবার পেটে গেলেই ভস্ম।

—আপনি এ ব্যাপারে একটা থিসিস লিখে ফেলুন।

—ঠাট্টা কোর না সুমিত। এটা মিটিং।

—তাই আপনি শ্রমিকদিকে মাতাল বলছেন, প্রকারান্তরে ফাঁকিবাজ বলছেন।

ম্যানেজার বললেন—কথাটা মিথ্যা নয় সুমিতবাবু। আপনাকে ভেন্টিলেশন অফিসারের কাজ দেওয়া হয়েছে। আপনি তা না করে ট্রেনিদিকে দিয়ে করিয়ে নেন। কাল থেকে খাদে ওভারম্যানের কাজ করবেন। দেখবো কত কাজের লোক।

—ঠিক আছে! তাই হবে। কিন্তু আমরা কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি যেজন্য ডেকেছেন তার ফয়সালা করুন।

সেই নিয়ে বহু ধানাই-পানাই, টালবাহানা। হেড কোয়ার্টারে বারবার টেলিফোন। অবশেষে স্থির হলো রেশন বাবস্থা আপাতত চালু থাকবে। যাতে পচাধসা মাল না দেওয়া হয় তা দেখবার জন্য একজন ইউনিয়নের সদস্য থাকতে পারে। পরবর্তী মিটিং হবে হেড কোয়ার্টারে মিঃ ভার্মা ডেপুটি পারসন্যাল ম্যানেজারের অফিসে। সেদিন স্থির হবে রেশন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া যাবে কি না? এখন শুধু স্টাটাস কো মেইনটেইন করা হোক।

মিনিটস তৈরি হলো। সহি সাবুদও হলো। ইহাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

মিঃ 'শ এজেন্ট হয়ে আসাতে সবচেয়ে খুশী হয়েছেন ডি. সি. ও ডি. ডি.। কারণ উনি বারমান সাহেবের ভাবশিষ্য। অর্থকরী ব্যাপারে বিশেষ পটু। নারীঘটিত ব্যাপারেও এলেমদার আদমী।

তাঁর চার্জ নেবার দু'দিনের মধ্যে এই মিটিং। কলিয়ারীর সব কিছু হাল হকিকত এখনো তিনি পাননি। তবে ভূত বাংলোর খবর ঠিকই রাখেন। সেই সব মক্ষিরানীরা এখন কে কোথায় আছে তারও খবর সংগ্রহ করছেন।

লাঞ্চের পর মিটিং সুরু হয়েছিল চায়ের সময় পার হয়ে গেল। এখন শ্রাবণের আকাশে সন্ধ্যা নেমেছে। মিটিংয়ের পর নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা। তার পরই তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—চলুন। মিসেস ডি. ডি.-র সঙ্গে আলাপ করে আসি।

এই প্রস্তাবের পিছনে ডি. সি.-র একটু ফুস্ মন্তর আছে। তিনিই তাঁকে ভূত বাংলো এবং বিউটির কথা বলেছেন। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ডি. ডি. সাহেবের বাংলোয়।

উনি সবেমাত্র কলিয়ারী থেকে ফিরেছেন। তখনো হাফ প্যাণ্ট ছাড়েননি। এজেণ্টের গাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তবে তাঁর প্রভুভক্ত প্রাণ। বিনয় গদ গদভাবে আপ্যায়ন করে নিয়ে এলেন। তাঁর মধ্যবিত্ত ড্রয়িংরুমের সবচেয়ে ভালো চেয়ারটিতে বসতে দিলেন। উনি বসতে বসতে বললেন, আপনারাও বসুন।

ওঁরা দু'জনে দুটি চেয়ারে বসার পর বললেন—আমাদের কোম্পানীতে ডি. ডি. ও ডি. সি.-র নাম একটা কিংবদন্তীর মতো। ম্যানেজার থেকে ডাইরেকটার

পর্যন্ত প্রত্যেকে আপনাদের প্রশংসা করেন। তাই আমার ইচ্ছা ডিউটিজ অ্যাণ্ড রেসপনসিবিলিটিজের শুকনো ফরম্যালিটিজের ওপরে একটু অন্তরঙ্গ ও ঘরোয়া সম্পর্ক গড়ে তুলি।

ডি. ডি., ডি. সি. দুজনে একবাক্যে বললেন—আপনি মহানুভব।

ওঁকে দেখেই বিউটির মনটা তিতো হয়ে গিয়েছিল। তথাপি একটু ড্রেস পেন্ট করে আসতে হলো। হাসি মুখে নমস্কার করল।

ডি. সি. পরিচয় করিয়ে দিলেন—মাই ওয়াইফ!

—ভেরী গ্লাড টু মিট ইউ মিসেস ডি. ডি.! উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেন।

বিউটি কিন্তু হ্যাণ্ড শেক করতে হাত বাড়াল না। পাশ কাটিয়ে গিয়ে—বলল, আমাদের কি সৌভাগ্য যে এত বড় একটা জঁাদরেল সাহেব এই গরীব খানায় এসেছেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য দেখুন আপনাকে যে বসতে দেবো তার মতো একটা ভালো চেয়ারও নেই।

—ওঃ নো নো। আপনি দয়া করে কিছু ফিল করবেন না। আমি খাদের মানুষ এই ঠিক আছি।

বিউটি মুচকি হেসে চলে গেল। খানিক পর হুইস্কির বোতল ও গ্লাস ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এসে টেবিলে রাখল। তিনটি গ্লাসে ঢেলে দিলো।

মিঃ ’শ বললেন—থ্যাঙ্ক ইউ মিসেস ডি. ডি.। এই জন্যই মিঃ বারমান আপনার এত প্রশংসা করতেন। আমি জাটু ডি. কোলিয়ারীতে যখন ম্যানেজার ছিলাম উনি তখন এজেন্ট। জিনিয়াস মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার।

ডি. ডি., ডি. সি. দুজনেই তাঁর কৃপাধন্য পুরুষ। এমনভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে বাউ করলেন যেন গডফাদার। বললেন, উনিই আমাদের নতুন জীবন দিয়ে গেছেন।

বারমান সাহেবের কথায় ওঁরা মশগুল হয়ে গেলেন। এই শ্রেণীর লোকদেরও শ্রদ্ধা ভক্তি করার লোক থাকে।

—ডি. সি. বললেন—তুমি এক গ্লাস নিলে না কেন বিউ?

—না আমার ভালো লাগে না।

মিঃ ’শ বললেন নিন না—তাহলে আড্ডা জমবে ভালো।

প্লিজ! আমাকে মাফ করুন।

কথায় কথায় ওঁদের আলোচনা অন্য দিকে মোড় নিলো।

মিঃ ’শ বললেন—কলিয়ারীতে এই শ্রমিক আন্দোলনের উৎস কোথায়?

—উৎস ইউনিয়ন।

—ঠিক! কিন্তু তাদের ব্রেন সাবসটেন্সের ঠিকানা কি? অর্থাৎ কোনো কিছু করার আগে পরিকল্পনা ও কৌশল ঠিক করা। সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কাজ করার জন্য তো বুদ্ধির দরকার। সেগুলো কোথা থেকে আসে?

—অগ্রদূত মেস থেকে।

—হতেই পারে। ইয়ং অ্যাণ্ড ইনটেলিজেণ্ট ছোকরারা থাকে। তাদের নেতৃত্ব কে দেয়?

ডি. সি. বললেন, সুমিত চ্যাটার্জীকে তো দেখলেন। সেই সেক্রেটারি। তাঁর পিছনে প্রায় সব ট্রেনিরাই আছে। তাদের মধ্যে আবার অনন্ত শর্মা! ভেরী ডেন্‌জারাস বয় এবং ইন্‌টেলিজেণ্ট। পোয়েট বাই নেচার।

—অ্যাণ্ড সো আইডিয়েলিস্টিক। হতেই পারে। ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলুন।

অনন্ত'র প্রসঙ্গ উঠতেই বিউটি একটু চমকে উঠল। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল—আরেকটা নতুন বোতল খুলবো নাকি মিঃ 'শ?

—নো থ্যাঙ্কস! আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে। উঠতে হবে। পারস্পরিক বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশের পর উনি উঠলেন।

বিউটি নিজেকেই প্রশ্ন করল—উনি কি জন্য এসেছিলেন?

ভূত বাংলো গরম। চিকেন বিরিয়ানীর গন্ধে ভুর ভুর করছে। সেই সঙ্গে দামী হুইস্কির মধুগন্ধ।

উর্দিপরা বেয়ারারা খুব ব্যস্ত। বড় হলঘরটায় রঙিন বাল্ব জ্বলছে। কি রকম মোহনীয় পরিবেশ। এক একটি টেবিল ঘিরে চারটি করে গদি আঁটা চেয়ার। অতিথিরা আরাম করে বসুন।

দেশী, বিদেশী নানা ডিজাইনের সাহেব ও মেম সাহেব চেয়ার দখল করে বসে পড়েছেন। অর্কেস্ট্রায় মিহি সুর বাজছে।

বিউটিকে আনবার জন্য মিঃ 'শ গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। সেটা এসে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়াতে যা দেরি। মিঃ 'শ ছুটে এলেন। নিজের হাতে খুলে হাতটা বাড়িয়ে বললেন—গুড ইভনিং মিসেস ডি. ডি.। ওয়েল কাম।

—ধন্যবাদ।

এসব কেতার সঙ্গে ও পরিচিত এবং পরিমিত হাসিতে অভ্যর্থনার জবাব দিতেও জানে।

মুখের উপর হাল্কা প্রসাধন। চুলগুলোকে চুড়ো করে বেঁধেছে। পরনে ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ি। তাতেই সে মনোলোভা।

একটা টেবিল আগে থেকেই সাজানো ছিল। সেখানে বসেছিলেন মিসেস 'শ ও তাঁর ছোট্ট মেয়েটি। মিঃ 'শ তাঁদের সঙ্গে বিউটির আলাপ করিয়ে দিলেন।

মিসেস 'শ আর্মেনিয়ান লেডি। দয়া করে মিঃ শ'য়ের সংসার করেন। তাঁর নিজস্ব এণ্টারপ্রাইজ আছে। বড় ব্যবসা চলছে আসানসোলে। এসব ওঁর বাপেই দিয়ে গেছেন।

একজন ইয়ং হ্যাণ্ডসাম বয়ফ্রেণ্ড আছে। সপ্তাহে একদিন তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্ট-

মেণ্ট থাকে। সেসব তথ্য মিঃ শ'য়ের অজ্ঞাত নয়। সংসার ধর্ম চালিয়ে যান পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপরে। ছেলেমেয়েদের কাছে নিজেদেরকে ছোট করতে চান না বলেই।

বিউটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ও তাঁর প্রতি মিঃ শ'য়ের মনোযোগ দেখে তিনি যা মনে করলেন তার ইঙ্গিত কথাবার্তার মধ্যে ফুটে উঠল না। বরং বেশ সৌহার্দপূর্ণ বলা যেতে পারে।

বেয়ারা ড্রিঙ্কস্ নিয়ে এল। এ বস্তুটা যে অনিবার্যভাবেই এসে যাবে তা ও জানত। প্রত্যাখান করলে এমন পীড়াপীড়ি স্বুরু হবে যে সে এক আদিখ্যেতার দৃশ্য। কাজেই ও গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল—ধন্যবাদ।

মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস 'শ তাঁদের মেয়ে স্বইটি এবং বিউটি একটা টেবিলকে ঘিরে বসেছেন। মিসেস 'শ তাঁর মেয়েকে চামচে করে হুইস্কী দিচ্ছেন। আস্বাদনটা এখন থেকেই জেনে রাখতে হবে তো। আর দু'বছর পর টিন এজ স্বুরু হবে। তারপর বয় ফ্রেণ্ড আসবে। তখন ?

নাচগানেরও ব্যবস্থা ছিল। একটা ক্যাবারে ড্যান্সার ভাড়া করে আনা হয়েছিল। চড়া স্বরের অর্কেস্ট্রার সঙ্গে সেও নেচে যাচ্ছিল। নির্দিষ্ট কোনো ড্যান্স ফ্লোর ছিল না। সেজন্য হলঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তার পরিক্রমা। অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন। কেউ বা একটু বেশী সময় নিচ্ছিলেন। কেউ বা ওর অনাবৃত কোমরে হাত দিয়ে স্পর্শানুভূতি পাচ্ছিলেন।

বেশ যখন জমে উঠল। তখন সে বিবস্ত্র হতে শুরু করল। চেন দেওয়া শার্ট ও প্যান্ট। চর চর শব্দে খুলে ফেলল। চারিদিক থেকে হাততালি পড়ল।

অবশেষে কটিতে ঝালর দেওয়া একটি জাঙ্গিয়া ও স্তনের বোঁটাটুকু ঢাকা দেওয়া একটি ব্রেসিয়ার পরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী সঞ্চালন করতে করতে মুক্ত দেহের প্রদর্শনী খুলে দিলো।

সাহেবরা খুব খুশী। নেশাও জমে এসেছে। কেউ বা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। কেউ বা দেখেই আনন্দ পাচ্ছে।

সমে এসে ঝাঁঝ পড়ল। নাচ শেষ।

মিঃ শ' ঘোষণা করলেন—এবার ডিনার পরিবেষণ হোক।

পাশের ঘরে ঢুকে ডিনার। অতিথিরা লাইন দিয়ে প্লেটে খাবার তুলে নিয়ে নিজের নিজের চেয়ারে বসে খেতে শুরু করলেন।

বিউটি মিসেস শ'কে বলল—আপনাকে উঠতে হবে না। আমি নিয়ে আসছি।

উনি ধন্যবাদ দিলেন।

একে একে তিনটি ডিশ এনে টেবিলে রাখল। খাওয়া স্বুরু হলো।

ডিনার পর্ব চোকার পর একে একে সব প্রস্থান করছেন। মিঃ শ' বিউটীর

কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মিসেস শ' ও তাঁর মেয়েকে আগে ডেসপ্যাচ করে দিলেন।

বিউটি একা। ডি. ডি. ও ডি. সি. অন্য চেয়ারে বসে মাল টানছেন। ওদের ডিনারে তত রুচি নেই।

মিঃ শ' এসে ওর পাশে বসলেন। বললেন—মিসেস ডি. ডি. আপনি একটা গ্লাস তো এখনো শেষ করেননি।

—মাই গড! আমি অনেক খেয়েছি না হয় আপনার মিসেসকে শুধাবেন।

—ওঃ। আমি সব দেখেছি। নিন আরেক গ্লাস।

—ডিনারের পরে?

—তাতে কি আছে? আমার অফারে এক গ্লাস খেতেই হবে।

অগত্যাই নিতে হলো। তাতে যে ওর নেশা হবে না তা ও জানে। মিঃ শ'। ওর পিঠের ওপর আলতোভাবে হাত রেখে বললেন, মিসেস ডি. ডি.! আপনি সত্যিই বিউটিফুল।

—তাই বুঝি?

—সিওর। মিঃ বারমান আপনার কত যে প্রশংসা করতেন তা বলে শেষ করা যাবে না।

—উনি আমাকে ভালোবাসতেন।

মিঃ শ' দুম্ করে বলে বসলেন—আমি কি আপনাকে ভালোবাসতে পারি না বিউটি?

বিউটি একটু থেমে কেটে কেটে বলল—ওটা খরচ হয়ে গেছে মিঃ শ'। অন্যকে দিয়ে ফেলেছি।

—আই সী!

মিঃ শ' একটু নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। তবে হতাশ হলেন না। এক চান্সে তো গোল হয় না। অনেক ড্রিবলিং, অনেক পাশ কাটিং করে ডিফেন্সে ফাটল ধরানোর পরই একটা শট নেওয়া হয় যা থেকে গোল পাওয়া যায়? মিঃ শ'য়ের এই শটটা বেমক্কা হয়ে গেছে। বিউটির ভিতরে যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে তাতে এখনো ফাটল ধরেনি।

বললেন—আশা করি আমরা বন্ধু হতে পারবো।

—ওঃ সিওর!

—থ্যাঙ্ক ইউ বিউটি।

বিউটির ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বাব্বা:! কি আপদ।

কিন্তু এই এঁটোল চিমড় মাল কি অত সহজে রেহাই দেবে? সে যাইহোক আজকার দিনটা তো বাঁচল।

একত্রিশ

গৈরীর এখন দিন কাটে তো রাত কাটে না। নিন্দা, বদনামের চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বাইরে মুখ দেখানো দায়। যে সে টিটকিরী মারে। মায়ে কথা বলে না। বাপে ঘর বাস করে না। দু'বেলা খাবার সময় আসে। ডিউটি করে। বাকী সময় গাঁজায় দম দিয়ে পড়ে থাকে। বাপ সোহাগী বিটি বাপেরও আদর ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছে যেন।

ছোট ভাইদুটিও জেনে গেছে সব। তারাও বুঝতে শিখেছে। পাড়াপড়শীর মধ্যে বড় ভোজী বৈশাখী মাঝে মধ্যে আসে কথা বলে। ফাল্গুনী ওর সহেলী। তার বিয়ালা পুরুষ আছে। তার গরবে ধর ধর। তবু যা হোক আসে। আর কারু সঙ্গে বাক্যালাপ হয় না।

আগে সে গোটা পাড়া মাতিয়ে বেড়াতো, সব ঘরেই অবারিত দ্বার ছিল, সবাই ওকে ভালোবাসত। সব যেন উল্টে গেছে।

অথচ ওরাই ওর জন্য দাঙ্গা লড়েছিল, সভিপ্রসাদের হাত থেকে গুলুকে ছাড়াবার জন্য কাঁটা বেলচা নিয়ে হাজির হয়েছিল। আজ তারা কথা বলে না।

কেন?

প্রশ্নটি তাকে পীড়া দেয়। এমন কি অপরাধ করেছে? শুধু প্রেম! তার জন্য এত?

দিনকয়েক ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও মানসিক যন্ত্রণায় কাটানোর পর সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠল একটা সংকল্প নিয়ে সে আবার স্কুলে যাবে। অনন্ত বলেছে—পড়াশোনা ছাড়িস না। ওর মতো জিনিস নেই। ওটা চালিয়ে যা!

হেনী সকালেই ভাত রাঁধত। গুলুর রাতপালি ডিউটি ছিল। বেলা আটটার পর ধাওড়ায় ফিরত। দেই রাঁধা ভাত হেনী খেয়ে ডিউটি যেত। গুলু এসে খেত। যেহেতু গৈরী ঘরেই থাকতো সেজন্য দিনের রান্না, ভাইবোনদের খাওয়া-দাওয়া ও করাত।

সেদিন সকালে স্নান করে এসে বলল, মা। তুকে রাঁধতে হবেক নাই। আমি রেঁধে দিচ্ছি। আজকে থেকে ইস্কুলে যাব।

—আবার ইস্কুল! যেন আকাশ থেকে পড়ল।

গৈরী বলল—অমন চোখ ডেমাডেমি দিছিস ক্যোনে?

হেনী ঝন্ ঝন্ করে বলল—ঐ ইস্কুল যেঞেই তো এত কাণ্ড করলি। না রাখলি সরম ভরম। না রাখলি জাতকূল। হাত আর্জা পাপ করে বসে আছিস। আবার ইস্কুলের নাম করিস না।

গৈরী বলল—তুর কথাতেই। আমার স্বামীতে বলেছে লেখাপড়া করতে। তুর কথাতে ছেড়ে দিব মনে করেছিস?

—অঃ। বাড়া তুর সোয়ামী। যেমন কুটুম জনকে ভোজ দিঞে তাদের

কাছে চুড়ি, সিঁদুর দিঞে বিয়া করেছে তেমনি কথা বলছিস। উসব ছাড়। ঈ ঘরে থাকতে হলে যেমন বলব তেমনি করতে হবেক।

—না হলে তেড়ে দিবি ন'কি? তাই দে। তুদের জাতকুল নিঞে তুরা ধুঞে খা। আমাকে তেড়ে দে।

দপ্ দপ্ করে ঘরে ঢুকে গেল।

হেনী একটুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে স্বগতোক্তির মতো বলল—শুনলে গা জ্বলে যায়! বিয়ালা পুরুষের ঘর সংসার হলো নাই। বাপটিকে কুকুর বিড়ালের মতন অপমান করালোক তবু মন ভরল নাই। এখন আবার ভাতার দেখাছে। মর ক্যেনে? মরে খালাস হ।

সকালের সেই তিক্ততার পর গৈরীর আর স্কুল যাওয়া হয়নি। ভাই দুটিকে স্কুল পাঠিয়ে দিয়েছে। বোন দুটি খেলা করছে। ঘর ফাঁকা হাতেও কোনো কাজ নেই!

উবু হয়ে বসে অনন্তকে চিঠি লিখছে—

শ্রীচরণকমলেষু,

শতকোটি প্রণামের পর লিখি যে আমার বড় কষ্ট। ঘরে বাইরে গঞ্জনা আর তিরস্কার। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমিও তো আর একবারও এলে না। তোমাকে না দেখে মরে যাচ্ছি। এবার দেখা দাও। না হলে আমি তোমার মেসকেই চলে যাবো। হ্যাঁ। তখন সামলাবে।

আশায় রইলাম। নিরাশ কোরো না। প্রণাম নিও। ইতি

তোমার দাসী।

কি করে পাঠাবে এবার?

এই সমস্যা নিয়ে যখন ভাবছে তখন বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে চিঠিটি ব্লাউজের ভিতর ঢুকিয়ে দিলো।

ঘরে ঢুকলো ওর মা।

গৈরীর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। এমন অসময়ে তার মা কেন?

বলল—কি হলো মা? ঘুরে এলি যে!

হেনী বলল—আজকে ডিউটি যাই নাই বিটি।

—তবে কুথাকে গেইছিলি?

—বলছি তুকে। এক গিলাস জল দে। খাব।

গৈরী ওকে এক গ্লাস জল এনে দিলো। জলটা খেয়ে হেনী বলল, আমার কি একটি ভাবনা? তুর লেগে ভেবে ভেবে মরে গেলাম।

—আমি কি তুর এতই বুকের কাঁটা হলাম মা? বল ক্যেনে? চলে যাব। কুনু দিন তুদের কাছে মুখ দেখাব নাই।

গৈরীর চোখে জল চিক্ চিক্ করছিল। ওর মা বলল—অমন বলিস না বিটি। রাগে তাপে কখন কি বলি তার ঠিক নাই। উসব কথা লিস্ না।

উঠে চলে গেল। কিসব শিকড় বাকড় শিল-নোড়া দিয়ে বাটল। একটি কাঁসার গ্লাসে করে মিশিয়ে আধ গ্লাস করল।

গৈরী দেওয়াল ঠেস্ দিয়ে বসে ছিলো। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল —রাগ করিস না বিটি। তুঁই আমাদের চখের মণি। কি বলব? এমন কাজ করে ফেললি যে লজ্জায় মুখ দেখাতে লারছি। আমার কথাটি শুন বিটি। এই তাবিজটি বেঁধে লে আর এই ওষুধটি খা।

গৈরী ব্যাপারটা না বুঝেই বলল—ক্যেনে মা?

—ক্যেনে আবার? কত খুলে বলতে হবেক। অনেক কষ্টে তিন চারদিন যেঞে এসে তবে এই ওষুধটি সুশী বাউরীর কাছে পেলাম।

সুশী মানে সুশীলা। বারমান সাহেবের ব্ল্যাক হিরোইন। তার দেওয়া ওষুধ।

গৈরী বলল—কিন্তুক কিসের লেগে?

—পেটটি সাফ হঞে যাবেক বিটি। দায় থেকে খালাস পাবি।

—কি বললি?

—রাগিস না বিটি। পাপের ফল ফেলে দে।

—মা! তুঁই এমন কথা বলতে পারলি?

—সাধ করে কি বলছি? তুর ভালর লেগেই বলছি। এইটি যদি বিয়ালা পুরুষের দিয়া ফল হতো তবে আজ কত সুখ। কিন্তুক—

গৈরীর অন্তর বেদনা তীব্র ঘৃণায় ফেটে পড়ল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—মা! তুঁই যখন পয়লা পুয়াতি ছিলিস তখন আমিই ত তুর পেটে ছিলাম এই ওষুধটি তখন ক্যেনে খেঞে লিস নাই মা? তবে ত আমার জনম হতো নাই। তুরও হ্যাপা থাকত নাই।

হেনী রেগে গেল। বলল—ঐ পাপের ফলটি নিঞে কি করবি?

—পুষে রাখব। পাপ হোক, পুণ্য হোক—আমারই ত বটে। আমার স্বামীতে দিঞেছে ভালোবাসার ফল।

—উ কাকে বাপ বকবেক?

—আমার স্বামীকে।

—কে তুর সোয়ামী?

—আছে। সময় হলেই দেখতে পাবি। এখন থেকে ক্যেনে পট্ পটাছিস্।

উঠে চলে গেল।

হেনী বড়ই হতাশ। আজ খেলে কালকে ভাতের চাল নেই। আর এই সময়ে এই কেলেঙ্কারী। ধিক্ ধরে গেছে জীবনে।

স্বভাবসিদ্ধভাবে গজ গজ করতে লাগল—হুঁ। আর তুর সোয়ামী আসছে। সে থালভরা তুর থাপরার পারা গতর পেঞে দমে চুষে খেয়ে লিঞেছে। আবার কিসের লেগে আসবেক? দায় লিতে? এমন মানুষ এই পিথিমীতে জনম লেয় না।

দুপুরেও খাবার রুচল না গৈরীর। আর কিসে রুচবে? জীবনটাতেই অরুচি ধরে গেছে। সকালে সেই তিক্ততার পর এক দফা রাগারাগিতে ভাত রুচেনি। দুপুরে শুরু হলো বুক ভাঙা কান্না।

শ্রাবণ দিনের গুম্সানি গরম। ঘরে বাইরে একই রকম। আকাশে মেঘ ঝুলে আছে। যখন তখন ঝরে পড়ছে।

গুলুর ঘরে চাল ফুটো হয়ে জল পড়ে। খোলা খাপরা পেতে সে জল ধরে রাখে। মেঝেটা ভিজে স্যাঁৎ স্যাঁৎ করছে। তারই ওপর খালি গায়ে শুয়ে আছে। রাশীকৃত চুল ছড়িয়ে আছে ঘর ময়। বুকের উপর শাড়ির আঁচল। হাঁটুর উপরে শায়া। সারা পিঠঁ উদোম। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে লোমকূপে। গল্ গল্ করে ধারা বইছে, পিঠে, গলায়, বুকে, বগলে, উরুসন্ধিতে। সারা গা গজ গজ করছে। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে মুখ মুছছে। গায়ে মাছি বসছে ভন্ ভন্ করে। ভীষণ বিরক্তিকর।

সারা দুপুর কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত। একটু ঘুম যদি বা এসেছিল, মাছির জ্বালায় হলো না। জাগল কিন্তু উঠল না। বারান্দায় পায়ের সাড়া পেয়ে গায়ের কাপড় শুধু গুছিয়ে নিলো।

ঘরে ঢুকল বৈশাখী। বলল—কই লো গৈরী ঘাটে যাবি নাই?

—না ভোজী! তুরা যা।

একটা দেওয়ালের ওপারেই বৈশাখী-জগদীশের ঘর। বার বার মা-বিটিতে ঝগড়া শুনেছে। তখন থেকেই মনটা কর কর করছিল গৈরীর জন্য। আসতে পারেনি নানা কাজ কামের জন্যই। এখন এসেছে খবর নিতে।

জিজ্ঞাসা করল—ফুফুর সঁথে তুর এত কিসের ঝগড়া গৈরী।

কি হবেক? উয়ার কথাবার্তা তো জানিস। আঁৎ কল্জা ছিঁড়ে দেয়। বৈশাখী ওর কাছে বসল। বলল—উঠ। কাপড়-চুপড় পর। এমন করে পড়ে আছিস ক্যেনে? আন্ধার ঘরে কাথে রূপ দেখাছিস।

—এই রূপ আমার কাল হঞেছে ভোজী। দিব একদিন দামুদরে ফেলে।

—আঃ। অমন বলিস না।

একরকম জোর করেই তুলল ওকে।

গৈরী একটা ব্লাউজ পরল। এলোথোঁপা করে চুল বাঁধল। বার কয়েক হাই তুলল। জল দিয়ে মুখ ধুল।

লে সিঁদুর পর। দিঞে চল। আমার সাথে ঘাটে চল। হরদম ঘরে ঢুকে থাকলে কি মন ভালো থাকে?

সেই সবই করল ও। মুখ মুছল, চুল বাঁধল, সিঁদুর পরল, মাথার ওপর এল্যুমিনিয়ামের হাঁড়ি নিয়ে চারটি মেয়ে বৈশাখী, কুন্তী, ফাল্গুনী ও গৈরী মিছিল করে দামোদরের দিকে হাঁটতে লাগল।

সন্ধ্যার সময় একটু সহজ হলো। বৈশাখীও ঘরের কাজ সেরে ওর কাছে এসে বসেছিল। এমনি টুক্ টাক্ কথার মাঝেই বৈশাখী বলল।

—তুর যে কেমন ভালোবাসা বুন বুকে পাথর দিঞেই জোয়ানী যাবেক।

—বলিস্ না। অমন শাপ শাপান্ত দিস্ না।

—হ্যাঁরে গৈরী—তুর দাদা বলছিল তুঁই যদি উয়ার নামটি বলিস তাহলে ধরে এনে তুর সঁথে বিয়া দিঞে দিবেক।

—বিয়া ত আমার হঞেছে ভোজী।

—ঈ বাবা! কখন হলো? আমরা দেখলাম নাই, ভোজ খেলাম নাই। জামাইকে লিঞে নাচলম নাই। আর বিয়া হঞে গেল। কে সাক্ষী আছে?

—সাক্ষী আছে দামুদর, আকাশের বিজলি, ধরতি মাঈয়ি!

ঈ-সব কাজের কথা লয় গৈরী। তুই নামটি বল। তুর দাদার অনেক লোকজন আছে। উ ছোকরাকে ধরে আনবেক।

গৈরী একটু হেসে বলল—না ভোজী। উ নিজেই আসবেক।

—তাই কি আসে রে?

ওর মায়ের কথারই প্রতিধ্বনি। দুনিয়াতে বিশ্বাস বলে কিছুই নাই।

—উ বহুত ইমান্দার আদমী ভোজী।

—ইমান্দার আদমী হলে কি তুর পেটে বে-জন্মা ছ্যোলা অজ্ঞাত।

—কি বললি? বে-জন্মা ছ্যোলা!

—তা লয় ত কী? লোকে কি বলছে? গৈরী একটি বে-জন্মা ছ্যোলা পেটে লিঞে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করছে।

—ওঃ মাগো—শেষে তুরা এই বললি ভোজী?

এ দুঃখের সীমা নেই। বন্ বন্ করে মাথা ঘুরছে। ঘন ঘন চাবুক পড়ছে পিঠে। মুখটা ফ্যাকাশে। এক মুহূর্ত স্থির থেকে বলল—তুরা মনে করছিস আমি এমন বেউশ্যা যে ন্যাংটা হঞে নেচে বেড়াছি। যার তার সঁথে লটর পটর করছি। তবেই বে-জন্মা ছ্যোলা এসেছে পেটে। ছিঃ ছিঃ।

শাঁ করে চলে গেল। ঘরে খিল্ দিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

বৈশাখী বার বার কপাট ঠুকে বলতে লাগল, গৈরী গৈরী! কপাট খুল বুন। আমার দুষ হঞেছে। আর বলব নাই। কপাট খুলে দাঁড়াল কেমন বিহ্বলভাবে।

বলল, তুর ক্যেনে দুষ হবেক ভোজী? দুষ আমার। কিন্তুক তুদের পায়ে পড়ছি এমন করে আমাকে খঁটা দিস্ না। পাপ, পুণ্য, ভালোবাসা যাইহোক সব আমার—আমিই তার জ্বালা পুয়াব। যেদিন না পারব সেদিন দামুদরে শরীরটি ফেলে দিব।

বৈশাখী ওকে সত্যিই ভালোবাসত। অনেকক্ষণ ধরে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, ভুলিয়ে, ফুসলিয়ে, কান্নাকাটির স্রোতে বাঁধ দিয়ে নিজের ঘরে গেল।

রাত কাটছে উপবাসে।

বে-জন্মা! বে-জন্মা!

একটি শব্দ লক্ষ লক্ষ হাতুড়ির মতো দম্ দম্ শব্দে পিটছে ওর মাথায়!

হে ভগবান! আমার ভালোবাসার এই দাম? একথা আমি কাকে বলব? কে বুঝবে আমার কথা? আমার পেটের ছ্যেলা বে-জন্মা!

হা-হা হা—

বুক তোলপাড় করা কান্নায় ভেঙে যাচ্ছে।

বিকৃত মুখ। অশ্রু ও ঘামে কদাকার। লম্ফ বাতির হলুদ শিখা থির থির করে কাঁপছে। উগরে দিচ্ছে কালোশীষ। কয়লাকুঠির কালো যবনিকায় অনার্য রমণীর হৃদয় বেদনা পাহাড়ী ঝর্ণার বেগবতী স্রোতের মতো তীব্র থেকে তীব্রতর হতে হতে ভয়ঙ্কর চাপের মুখে এসে পড়েছে।

বত্রিশ

কোম্পানীর দীর্ঘসূত্রতার কারণে প্রস্তাবিত মিটিংটা হতে আরো কিছুদিন লেগে গেল। শেরগড়ের হেড কোয়ার্টারে মিটিং। কোম্পানীর তরফে দু'তিনটি কলিয়ারীর ম্যানেজার, এজেন্ট, লেবার সাহেব, হেড কোয়ার্টারের শ্রমিক বিশেষজ্ঞ অফিসারটি এবং ডেপুটি চীফ পারসোন্যাল ম্যানেজার মিঃ ভার্মা! ভিন্ন ভিন্ন ইউনিয়নের তরফে দেবেন সেন, সুধীর রুদ্র, জয়ন্ত পোদ্দার, সুমিত চ্যাটার্জী, অনন্ত শর্মা ও অন্যান্য কলিয়ারীর সেক্রেটারী, সভাপতিরা। হাউস ফুল। মিটিং খুব জোরদারভাবে চলছে।

ইউনিয়নের দাবি ছিল শ্রমিকদের প্রতি যে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। একটা কলিয়ারীতে দু'দিন ধর্মঘট হয়েছিল। তাতে বেশ কিছু বিশৃঙ্খলা, ল অ্যাণ্ড অর্ডারের অবনতি ও পুলিশের গুলীচালনার ঘটনা ঘটেছিল। শ্রমিকরা কুড়ি ঘণ্টা খাদে আটক ছিল।

সেজন্য সেই কলিয়ারীর সেক্রেটারী দাবি জানিয়েছিলেন—পুলিশের গুলি-চালনার নিন্দা করতে হবে। শ্রমিকদিগকে কুড়ি ঘণ্টা ধরে কেন খাদে আটক করা হয়েছিল ম্যানেজমেণ্টকে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে ও ক্ষমা চাইতে হবে।

যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। যাদের নামে

পুলিশ ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে মামলা দায়ের করেছে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

দামুলিয়া কলিয়ারীতে এক সপ্তাহের পয়সা কেটে নেওয়া হয়েছে কিন্তু রেশন দেওয়া হয়নি তার তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হবে ও রেশন দিতে হবে।

শ্রমিক রিক্রুটমেণ্টের প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে গেছে তখন শ্রমিকদিকে শোষণের জন্য গোমস্তার পদ রাখার কি প্রয়োজন? ও পদটা অবিলম্বে তুলে দেওয়া হোক।

রেশন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে বর্তমান বাজার দর হিসেবে নগদ টাকা বেতনের সঙ্গেই দিতে হবে।

প্রত্যেকটি ইস্যু নিয়ে দীর্ঘ বাদ বিতণ্ডা।

মিঃ ভার্মাও সেই আলোচনায় সক্রিয় অংশ নিচ্ছিলেন।

এক সময় বললেন—তাহলে বাকী রইল কি?

দেবেনবাবু বললেন—এখনো অনেক বাকী। আমরা তো বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের জন্য ট্রাইব্যুনালে মামলা এনেছি। ছত্রিশ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন চলছে। তার সঙ্গে এর সম্পর্ক সামান্যই।

এই ইস্যুগুলো এসেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জুলুমবাজীর প্রতিবাদে।

মিঃ শ' বললেন—জুলুমবাজী কেন বলছেন? শ্রমিকরাই তো রেশনের ট্রাক লুঠ করেছে।

অনন্ত বলল—আর আপনারা টাকা নিয়েও রেশন দেননি।

মিঃ ভার্মা বললেন—এটা কি হলো মিঃ শ'?

—আমি চার্জ নেবার আগে এমনি কি একটা হয়েছিল। তার ব্যবস্থা নেব।

—ধন্যবাদ। বাকি দাবিগুলো?

মিঃ ভার্মা বললেন—দেখুন ম্যানেজমেণ্টকে ক্ষমা চাইতে হবে, পুলিশকে নিন্দা করতে হবে—এগুলো সব সেন্টিমেণ্টাল ইস্যু। শ্রমিকদের তাতে কি লাভ? এসব সেন্টিমেণ্টাল ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে একটা খসড়া করুন। আমরা বিবেচনা করব। চীফের সঙ্গে কথা বলব।

দেবেনবাবু বললেন—ফিউচার টেন্সের আশ্বাসে কি ভরসা? কলিয়ারীতে গিয়েই তো আপনাদের সাহেবরা বাঘ বনে যাবেন। একটা মিটিং করতে হলে দশদিন আন্দোলন করতে হবে। স্বভাবতই শ্রমিক অশান্তি বাড়বে বই কমবে না।

মিঃ ভার্মা বললেন—এই বছরটা আমাদের কোম্পানীর শতবর্ষ পূর্তি চলছে। একে শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনের পক্ষপাতী আমরা। আপনারাও উস্কানি-মূলক প্রচার ও প্ররোচনা বন্ধ করুন। আসুন আমরা একটা শান্তিচুক্তি করি।

ওহো। ব্যাপারটি বড়ই সুখদায়ক। ম্যানেজমেণ্ট নিজেই শান্তিচুক্তি চাইছেন। বেশ-বেশ। তাই হোক।

দেবেনবাবু বললেন—বেশ। আমরা ভেবে দেখছি।

—ও কে! লাঞ্চের পরে আবার বসা যাবে। আমিও চীফদের সঙ্গে আলোচনা করে নিই।

পারস্পরিক আলোচনার সময় একমাত্র অনন্ত ও কমিউনিস্ট নেতারা ছাড়া কেউ বিপক্ষে গেলেন না।

অনন্তর বক্তব্য ছিল শ্রমিক আন্দোলনে একটা গতি সঞ্চারিত হয়েছে। প্রচার খুব ভালো হচ্ছে এবং আমরা শ্রমিকদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি এসে পড়েছি। এ সময়ে আন্দোলন তুলে নিলে একটা ভাটার টান এসে যাবে। শ্রমিকরা আবার তাদের মদ, ভাং, জুয়া, রাণ্ডি নিয়ে মেতে উঠবে। তার ফলে ম্যানেজমেণ্ট নিজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা করার সুযোগ পাবে আর আমরা পিছু হটব।

অন্য একজন নেতা বললেন, তা ঠিক। তবে আমাদের গোপন কার্যকলাপ চালু রাখতে হবে। আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করতে হবে এবং এই শান্তিচুক্তির দরুণ শ্রমিকদের জন্য যদি কিছু নগদ দক্ষিণা আদায় করে দিতে পারি তবে তাদের আস্থা বাড়বে। এটাকে শ্রমিকদের জয় বলে চালাতে কোনো অসুবিধে হবে না।

অল্প স্বল্প বিতর্কের পর শান্তিচুক্তির দিকেই ঝোঁকটা বেশী দেখা গেল। সুমিতবাবুও অনন্তকে বললেন, অতটা জঙ্গী মনোভাব নাই বা নিলি। এসব কূটনৈতিক ব্যাপার। একটু আস্তে চলা ভালো।

অতঃপর লাঞ্চের পরেই কোম্পানীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বিচার বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে শ্রমিকদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হলো এবং কোম্পানী শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

সর্তাবলী সম্বলিত একটি পাঁচ পাতার চুক্তি উভয় পক্ষের সহি-সাবুদ করে পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং পরস্পরের প্রীতি ও সৌজন্যের স্মারক হিসেবে একটি ভোজসভায় পানাহার করলেন।

আহার পর্বে চীফ পারসোন্যাল ম্যানেজার ও চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার কয়েক-মিনিটের জন্য এসে শুভ কামনা করে চলে গেলেন।

কিন্তু অনন্তর মন খুঁত খুঁত করছে। মনে ইচ্ছে কমিউনিস্টরাই ঠিক বলছেন—শান্তিচুক্তি এক ধোঁকার টাটি।

হঠাৎ মিঃ ভার্মা এসে অনন্তর পিঠে হাত রাখলেন।

অনন্ত চমকে গিয়েছিল। ওঁর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

উনি বললের—আই ওয়ান্ট ইউ ইয়াংম্যান। সুমিতবাবুকে নিয়ে এসো, কথা আছে।

একপাশে সরে গিয়ে একটা সোফার উপর উনি বসলেন। সুমিতবাবু ও অনন্ত তাঁর সামনে।

উনি বললেন—মিঃ শর্মা! আমি তোমাকে অনেক আগেই মার্ক করেছি। তুমি যে শ্রমিক ইউনিয়ন করছো তাও আগে থেকেই জানতাম। এক্ষেত্রে অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা যে পরামর্শ দেয় তা হচ্ছে এসব থেকে সরে গিয়ে নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করা। নয় কী?

—হ্যাঁ স্যার। সে উপদেশ অনেকের কাছে পেয়েছি।

—আমিও যদি সেই কথা বলি তবে তা হবে তোমার কাছে বোঝার মতো। নয় কী?

—অফ কোর্স!

—কিন্তু আমি সে উপদেশ দেবো না। তোমাদের উপরে আমার একটা দুর্বলতা এসে গেছে। তা কেন জানো—তোমরা কিছু সৃষ্টি করতে পারো। নিশ্চয়ই মনে করতে পারো আমি সারারাত জেগে তোমাদের প্রোগ্রাম দেখেছি। খুশী হয়েছি।

—হ্যাঁ স্যার।

—নাউ মিঃ চ্যাটার্জী! অনন্ত তো আছেই। তাছাড়া অগ্রদূত মেসে বেশ কয়েকটি চৌকশ ছোকরা আছে। তাদেরকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করুন। মৌলিক বিষয় নিয়ে। ওসব ভাড়াটিয়া শিল্পী দিয়ে গানবাজনা, নাচের আসর নয়। এমন করবেন যাতে প্রতিভার ছাপ থাকে। তা যে আছে এটাও আমি জানি। কোম্পানীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে একটা স্মারক পুস্তিকা বেরোবে তাতে সেই অনুষ্ঠানের ছবি ছাপা হবে। খরচ-খরচা কোম্পানী দেবে। আপনারা কিছু করুন যাতে সুনাম হয়।

সুমিতবাবু বললেন—আচ্ছা! সে চেষ্টা করব।

—অনন্ত! তোমার উপরে আমার অনেক আশা আছে। তুমি কবি, লেখক। তোমাকে কিছু করতেই হবে। তবে দেরি নয়। পুজোর আগেই।

—আচ্ছা স্যার।

—ও কে? থ্যাঙ্ক ইউ!

দুজনের সঙ্গেই করমর্দন করলেন।

ধাওড়ায় ধাওড়ার বেজে উঠল ঢোলক, মাদল, কাঁসি, বাঁশি, ঝাঁপি, করতাল। কতোদিন পর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস। কোম্পানীর সঙ্গে ইউনিয়নের শান্তিচুক্তি

হয়েছে। যারা বরখাস্ত হয়েছিল তারা চাকরী পেয়েছে, যারা জেল হাজতে ছিল তারা ছাড়া পেয়েছে, যাদের নামে মামলা ঝুলছিল তারাও রেহাই পেয়েছে। এক সপ্তাহের রেশন ফ্রি। তারপর থেকে নগদ বিদায়।

স্ফূর্তির জোয়ার কি বাগ মানে?

হাঁড়ি হাঁড়ি ধেনো মদ বোতল বোতল মহুয়া।

হস্নুনিয়া বাউরী পাড়ায় সুশীলা পায়ে ঘুঙুর পরে নাচল। শম্ভু বাউরী নতুন ভাদু গান বাঁধল।

আয় লো ভাদু, বসলো ভাদু
আমার ভাঙা পীঁড়িতে
মনের মতোন সাজাঞে দিব
ফরাস ডাঙা শাড়িতে

তেটে খেটে ধিন। তেটে খেটে ধিন। চাড্ডুম। চাড্ডুম।

বারমান সাহেবের ব্ল্যাক হিরোইন সুশীলা তখনো রসের বিনোদিনী। বিপুল নিতম্ব দুলিয়ে স্তনযুগল স্পন্দিত করে এমন মনোহারী নাচ নাচল যে বাউরী পাড়া রসে কাদা।

ঝরিয়ার রসিক শিওপূজন সিং নাগরা জুতো মচ মচ করে ওর ঘরে আতিথ্য নিল। ঝনাৎ করে ফেলে দিলো রূপোর টাকা।

নরহরি, কালোহরি, সুধীর বাউরী, কামালউদ্দীন দমে মদ খেয়ে আমোদ করল। শম্ভু বাউরী ঢুলু ঢুলু চোখে সুর্মা দিয়ে রসিক নাগর বনে গেল।

জামজুড়িতে মাদল নাগরা বাজছে। ফুলমণি, নীলমণি, কালোমণি, হীরামণিরা মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজে সার দিয়ে দাঁড়াল। বড় মঙ্গলা মাঝি বাজনদার। তার কাঁধে মাদল। নাগরা বাজাচ্ছে রবি হাড়াম। ময়ূর পাখা হাতে নিয়ে মাঝি ছোকরারা ঘোর নাচে মেতে গেছে।

কালো কালো কৃষ্ণকলির দল পরস্পরের হাতে ভাঁজ দিয়ে গান ধরেছে—

হেসাঃ স্বাকাম হিপীড় হিপীড়
ইঞা মল মল শাড়ি লিপীড় লিপীড়
দেলাবেন দেলাবেন কয়লাকুঠিতে।
সেড়। সেড়!! সেড়। সেড়!!
ছিরিক। ছিরিক!!

যূথ নৃত্যের তাল, লয় ও ঝঙ্কারে মহুয়া বন মাতাল। আভাঙ্গা বর্ষাকালে ফাল্গুন এসেছে এমন তাদের খুশীর জোয়ার। নাচতে নাচতে রাত বাড়ছে। গাছের ডালে লম্ফবাতি দুলছে। কৃষ্ণকলিদের যৌবনপুষ্ট দেহভঙ্গিমা আলো-আঁধারের রহস্যময়তায় ডুবে গেছে।

ঢোলক বাজছে যমুনা যাদবের ধাওড়ায়। চবুতরায় গোল হয়ে বসে ইয়া লাহাঙ্গা জোয়ানের দল অপার আনন্দে রামধুন গাইছে—জয় জানকী জীবন জয় রাম।

এতোয়ারীর ধাওড়ায় ভজন গান—কহে কবীর শুন ভাই সাধু—

গুরুনামের ধাওড়ায় জোরদার হয়ে উঠেছে ভাংড়া নাচ।

মুনিয়া ধাওড়ায় দুই লোকশিল্পী—গোবিন ও গুলু।

ফাগুনে ফাগুয়া, চৈত্র মাসে চৈতা আর শ্রাবণের গান—কাজরী।

পিয়া বিন রাত কায়সে বিতায়ুঁ…

যেমন সুরলহরী তেমনি তালবাদ্য!

কাজরী গাথার বিরহ বেদনা যার বুকে বাজবার তার ঠিকই লাগছে। বাপে ঢোলক বাজাচ্ছে, বিটির বুক টাটাচ্ছে। গোবিনের গলায় সুরের ঝর্ণা বইছে, গৈরী চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

এত যে আনন্দ উল্লাস, গোটা ধাওড়া মেতে গেছে কিন্তু তার মনে সুখ নেই। সেই যে একটা দিনে তার মায়ে নিয়ে এসেছিল গর্ভপাতের ঔষধ, বৈশাখী বলেছিল বেজন্মা সন্তান, সেইদিন থেকে ও কেমন যেন হয়ে গেছে।

বুক ফেটে যাচ্ছে কিন্তু মন স্থির করতে পারছে না। ভীষণ রাগ হচ্ছে অনন্তের ওপর। সে তো সব জানে। কি যে দুর্গতি ভোগ করছে তা বুঝতে কি ওর বাকী আছে?

তবু একবার কেন আসছে না? তার কি মনে হয় না গৈরীর একটা খবর নিই? যত লাঞ্ছনা আমিই সয়ে যাবো? তাকে কিছুই করতে হয় না!

ভাবনার স্রোতটা তেমনি উল্টো মুখে বইতে শুরু হলো—অমনি বুক তোলপাড়।

মুখ বিকৃত করে আপন মনেই বলল—না। আর পারবো না। পারবো না। পারবো না।

তেত্রিশ

রাত বয়ে যাচ্ছে। ফ্যানের একটানা গোঁ গোঁ শব্দ। স্টিম ইঞ্জিন চলছে হস্ ফস্ করে। সর সর করে চলছে ডুলি। হরদম লোল হারিস। বোঝাই টব গাড়ি উঠছে। খালি টব গাড়ি নামছে। রেজিংয়ের কাঁটা বেড়ে যাচ্ছে মিনিটে মিনিটে।

পিটটপে বিজলি বাতির হলুদ আলোগুলো অসংখ্য পোকায় ছেয়ে গেছে। উড়ে উড়ে পড়ছে টালোয়ান, ঘণ্টাওলার মুখে।

অগ্রদূত মেস গভীর সুপ্তিতে মগ্ন। ঘরে ঘরে নিবিড় ঘন শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। অনন্ত বসে আছে হাতে কলম নিয়ে। সামনে পড়ে আছে ডায়েরীর খোলাপাতা!

ওদিকের বিছানায় কমলেন্দু ঘুমোচ্ছে। ঘড় ঘড় শব্দে শ্বাস বইছে। অনন্তের মাথায় ঘুরছে একটা আইডিয়া। ভাব এবং ভাবের অনুষঙ্গে ঘুম পালিয়ে গেছে। সাদা কাগজে ফুটে উঠছে আখর।

মিঃ ভার্মার কাছে গ্যাস খেয়ে ও বেশ প্রেরণা বোধ করেছে। তার ওপরে স্মিতবাবু দিলেন উস্কানী—লিখে ফেল্ অনন্ত।

—কি লিখব দাদা?

—সেটা কি আমি বলে দেব? ভাবের সঙ্গে কারবার হচ্ছে তোর। একটু ভাবনা-চিন্তা কর। ঠিক এসে যাবে। আরে লেগে পড়।

এই লেগে পড় কথাটাই গুরুতর। সেই থেকে ও ভাবছে কি নিয়ে লেগে পড়বে? ঢাল তরোয়াল কই? আইডিয়া কি মুখের কথা? মগজটা কি ভাবের দোকান? হুট হাট চাইলেই মাল বেরিয়ে আসবে? একটা কবিতা লিখতে একমাসও লাগে, এক ঘণ্টাও লাগে আবার নাও হতে পারে। হঠাৎ যদি এসে গেল তবে মারো ছক্কা। না হলে খাও ধাক্কা।

কয়লা তো একদিনে হয়নি। এর ইতিহাস আছে। ভূ-প্রকৃতির বিচিত্র ক্রিয়া প্রক্রিয়া আছে। নৈসর্গিক কারণে টাল-মাটাল যুগ সন্ধিক্ষণ আছে। তাকে কি একটা রূপকের মতো করে তুলে ধরা যায় না?

অনন্ত ভাবনার একটা খেই খুঁজে পেল।

বিপুলা এই পৃথিবীর গর্ভাশয়ে কত অমূল্য রত্নরাজি। নৈসর্গিক কারণে তার উৎপত্তি। পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা। জড়, উদ্ভিদ ও জীব সৃষ্টির ক্রম বিবর্তনের উল্লেখ আছে পুরাণে। হতে পারে তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয়।

শান্ত সমাহিত ধরিত্রীর বুকে তুমুল প্রলয় কল্লোল।

প্রকৃতি ও মানুষের সংগ্রাম. প্রলয় কল্লোল নিমজ্জিতা ধরিত্রীর ব্যাকুল আর্তনাদ, যন্ত্র সভ্যতার যুগে জননী ধরিত্রীর সর্বং সহা মাতৃমূর্তির রূপকল্প নির্মাণে সচল হয়ে উঠেছে অনন্তর লেখনী।

ঠক্ ঠক্! ঠক্ ঠক!

—কে? চমকে উঠল অনন্ত।

—আমি!

একটা অস্ফুট ধ্বনি। অনন্ত লাফিয়ে উঠল। ব্যগ্রহাতে দুয়ার খুলে দিলো। বিমূঢ় দৃষ্টিতে দেখল বেপথুমতী গৌরী চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

বলল—এ কি রে? তুই?—এত রাত্রে? কি হয়েছে?

—আমি আর পারছি না।

বহু কষ্টে চেপে রাখা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ল। ঝর ঝর ধারায় এমন ভাবে কাঁদতে শুরু করল যে অনন্তর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। ওর হাতটা ধরে টেনে এনে বলল—বোস।

বিছানাটার কাছে এনে দাঁড় করাল কিন্তু গৈরী মেঝেতে বসে খাটের বাজু ধরে মুখটা বিছানায় গুঁজে দিলো। তারপর শুধু কান্না আর কান্না। অনন্ত কিছুতেই থামাতে পারছে না। যত সে চাপা গলায় কাঁদতে বারণ করছে গৈরীর কান্না ততই বাঁধন হারা হয়ে মুখ বুক ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

কমলেন্দুর ঘুম ভেঙে গেল। সাড়া দিলো না। চুপচাপ তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। অনন্ত পরম যত্নে গৈরীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করছে ওর চিবুক ধরে মুখটাকে তুলে রাখতে। দুটো শরীরে কোনো ব্যবধান নেই।

অনন্ত ওর মুখটা তুলে অশ্রুসিক্ত গালে চুমু খেয়ে বলল—এমন করে কাঁদিস না গৈরী। তোর কান্না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর গৈরী বলব—আমি কি করব তুমি বলে দাও।

অনন্তর বুকে মুখটা গুঁজে দিয়ে আবার ফুঁপিয়ে উঠল।

অতন্ত ওকে আরো নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে বলল—কি হয়েছে বলবি তো?

—লোকে বলছে তোর পেটের ছ্যেলা বে-জন্মা!

বে-জন্মা! বে-জন্মা!

জাতকের ঘৃণ্য পরিচয়। জনক জননীর লজ্জা ও কলঙ্ক। অনন্তর মগজে তড়িৎ কম্পনের ঘূর্ণিবলয়। আঘাতটা সামলে নিয়ে বলল—না। সে আমাদের ভালোবাসার ফল। বল গৈরী—কি করতে হবে? কি করলে এই কলঙ্ক মুছে দেওয়া যাবে?

গৈরী ওর দিকে তাকাল সোজাসুজিভাবে। নিবিড় কালো দুটি চোখ। উপচে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। টল্ টল্ করছে তারা। ঠোঁট দুটি কাঁপছে। সারামুখে ছ্যেবড়া ল্যাবড়া সিঁদুর কাজল। কান্না তার এই প্রথম নয়। হয়ত বহু যুগ থেকে কাঁদছে।

অনন্ত বলল—বল গৈরী। আমাকে কি করতে হবে?

গৈরী বলল—কেউ তো বিশ্বাস করে না যে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ। তোমার নামও বলিনি। বলবও না। তুমিই আমার আত্মীয় কুটুমদিকে বলবে—গৈরী আমার স্ত্রী। পারবে বলতে? পারবে চুড়ি পরিয়ে দিতে?

অনন্ত নীরব।

একি ভীষণ সমস্যা! কুলিধাওড়ায় গিয়ে একথা কবুল করলেই তো হৈ হৈ পড়ে যাবে। আর কি অন্য উপায় নেই?

গৈরী উঠে দাঁড়াল। চোখমুখ মুছে ওর দিকে পিছন করে শাড়িটা গুছিয়ে

পরল। বলল—আমার লজ্জা, ভয় কলঙ্ক—তুমিই মুছে দিতে পার। আর কেউ নয়। কথাটা ভেবে দেখবে। আমি চললাম।

দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছিল। অনন্ত ওর হাত ধরে বলল—দাঁড়া! আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

—না। একাই যেতে পারব।

হাত ছাড়িয়ে দরজা পার হয়ে থমকে দাঁড়াল। আবার ফিরে এসে বলল—তোমাকে প্রণাম করে যাই। আর যদি কখনো দেখা না হয়।

অনন্তর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। গৈরী ওকে প্রণাম করল। সে ওর মাথায় হাত দিলো। গৈরী দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল তখনো সে দাঁড়িয়ে রইল। বুকচাপা ক্ষোভে স্বগতোক্তি করল—আমার গর্ভিনী স্ত্রী লজ্জা, ভয় ও কলঙ্কের তাড়নায় রাত্রির অন্ধকারে পাগলিনীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমি নিশ্চিন্ত বসে আছি। কেন? সে অনার্যকন্যা বলে। এত নীচ আমি? ছিঃ ছিঃ! ধিক আমার পৌরুষ!

কমলেন্দু বলল—গৈরীকে তুই একা ছেড়ে দিলি?

—তুই জেগে আছিস?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তো সব শুনেছিস?

—হ্যাঁ।

—কি করব বল তো?

—তোকে আর বলার কিছু নেই। জানতাম যে প্রেম করছিস কিন্তু সেকস পর্যন্ত এগিয়ে গেলি কি করে? এইটুকু সংযম নেই তোর চরিত্রে। মেয়েটা প্রেগন্যাণ্ট হয়ে গেল! ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

অনন্ত মাথা হেঁট করে বসে আছে। প্রাণের বন্ধু ছাড়া কে বা এমন ভাষায় ভৎর্সনা করতে পারে? এরপর যে শুনবে সেই তাকে ধিক্কার দেবে। তার মা শুনলে মরমে মরে যাবেন। যে ছেলেকে নিয়ে এত গর্ব তার অধঃপতন তিনি কি করে সহ্য করবেন?

ওঃ। কি মর্মান্তিক যন্ত্রণা! একটা ভুল কি নিষ্ঠুরভাবে বদলে দিতে পারে একটা মানুষের জীবন।

কমলেন্দু বলল—গৈরীর শেষ কথাটার মানে বুঝতে পেরেছিস—যদি আর কখনো দেখা না হয়।

—হ্যাঁ!

—তোকে প্রণাম করে গেল। মানে এটা শেষ সাক্ষাৎও হতে পারে। শ্যালা! তবু তুই তাকে একা ছেড়ে দিলি। বুঝলি না—কি অসীম বেদনায় একটা যুবতী মেয়ে রাতের অন্ধকারে এতদূর ছুটে এসেছে। ওর দিকটা ভেবেছিস?

ভাবছি। নিশ্চয় ভাবছি। ভাবতে ভাবতে মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যাকালে ভাবনা ছিল ধরিত্রীর গর্ভাশয়ে পালল্লিক শিলাস্তরের ক্রমবিবর্তন।

আর এখন ভাবছি গৈরীর গর্ভাশয়ে একটি ভ্রূণ। এই জাতক কি পিতামাতার ভুলের ফসল? এ কি মাতার লজ্জা? পিতার পাপ? নারী নরকের দ্বার। সেই তাকে কামনার আবর্তে টেনে নিয়ে গিয়ে নরকের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

—কথা বলছিস না কেন? শ্যালা মারব দু'চড় দু' সারি দাঁত ঝরে যাবে! কাওয়ার্ড! অমানুষ!

বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ল অনন্ত—মার। যত খুশী মার। শুধু চড় কেন লাঠিপেটা কর। আমি কিচ্ছু বলব না।

থর থর করে কাঁপছে ও। ভীষণ যন্ত্রণায় বুকটা ফেটে যাচ্ছে। কমলেন্দু উঠে চলে গেল। একটু পর সুবীরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

অনন্ত কাৎ হয়ে পড়ে আছে বিছানার উপর। চোখ কর কর করছে।

সুবীর বলল—কি হয়েছে?

কমলেন্দু বলল—ওকেই জিজ্ঞাসা কর। শ্যালা গৈরীর সর্বনাশ করে এখন ন্যাকা সাজছে।

অনন্ত বলল—না-না। আমাকে তোরা এত অমানুষ মনে করিস না। আমার ভালোবাসার ফাঁকি নেই। ধোঁকা নেই। লুকোচুরি হয়ত আছে তবে প্রতারণা নেই। শুধু একটু সময়—আমি ভালো করে ভেবে দেখি এর কি উপায় করা যায়?

সুবীর বলল—অনন্ত! মনটাকে শক্ত কর। ভালো যদি বেসেছিস তবে আর ভাববার কি আছে রে? মজনুর মতো লড়ে যা।

—ঠাট্টা করছিস?

—নারে। তোকে সাহস যোগাচ্ছি। কিভাবে তোকে মদৎ করতে হবে তাই বল। আমরা তোর সঙ্গে আছি।

অনন্ত বলল—ব্যস। এই একটা কথাই যথেষ্ট! তোরা আমার সঙ্গে থাকবি?

সিওর!

সকাল হতে যা দেরি। অনন্তর ঘরেই এই গুরুতর প্রশ্নটির মীমাংসা করতে দরজা বন্ধ করে আলোচনায় বসেছেন ওদের তিন বন্ধুর সঙ্গে সুমিতবাবু।

রাত্রের ঘটনা আনুপূর্বিক শোনার পর উনি বললেন—আমি তো আগেই বলেছি অনন্ত—হয় তুই ডুববি না হলে একটা মেয়েকে ডোবাবি।

—আপনি জানতেন?

—হ্যাঁ। আমি ও ডাক্তারবাবু দুজনেই জানি। কিন্তু এখন উপায় কী? তোরা কি ভেবেছিস?

সুবীর বলল—অনন্ত গৈরীকে বিয়ে করতে রাজী আছে। তাই ব্যবস্থা করে দিন।

—ব্যাপারটা কি অত সোজা? গৈরীর স্বামী আছে। আইনত ডিভোর্স হয়নি। তাছাড়া সবারই তো জাতপাত, রীত নেয়ত আলাদা। ওদের মুরুব্বিরা ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে কে জানে?

কমলেন্দু বলল—যদি রাজী না হয় তাহলে একটা অন্তঃস্বত্ত্বা মেয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। কারণ ও যাবার সময় অনন্তকে যা বলে গেল তার এই মানেটিই হয়।

অনন্ত বলল—তোরা ওদের সরদারের সঙ্গে কথা বল। আমার নামটা আপাতত গোপন রাখ। যদি রাজী হয় তো ভালো না হলে গৈরীকে নিয়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাব। নামটা বলে দিলে তাতে অসুবিধে হবে।

সুমিতবাবু বললেন—বেশ আমি সেই চেষ্টা করছি। ঘাবড়াস না। একটা কিছু করবই। ওরাও তো জাঁতাকলে পড়েছে। অন্তসত্ত্বা মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারলে কোন বাপ না বেঁচে যাবে!

চৌত্রিশ

ডাক পড়ল চরিতর, কিষণ, গোবিন ও গুলুর।

সুমিতবাবুর ঘরে এসে মেঝেতে হাঁটু পেতে বসল। অনন্তরাও চারজন। মেস তখন ফাঁকা। সবাই ডিউটি গেছে। ওরাই ডিউটি কামাই করে মেসে আছে। জীবন মরণের সমস্যা। আলগাভাবে ছেড়ে দিতে পারে না।

সুমিতবাবু বললেন—তোমাদিকে ডেকেছি গৈরীর সম্পর্কে আলোচনা করতে। ব্যাপারটি গুরুতর। ভেবেচিন্তে কথা বলবে।

ওরা চুপচাপ। চারজনেই চোখ তুলে একবার সুমিতবাবুকে দেখল তারপর আবার মাথা নিচু করল।

—গৈরীর বাচ্চা হবে। তা তোমরা জানো?

—হাঁ বাবুজী।

—ওর সম্পর্কে তোমরা কি ভাবছো?

—কি ভাওনা করব বাবুজী? উ বিটিটি দিওয়ানা হঞে গেইছে। আর আমাদের বুদ্ধিতে কুছু হবার লয়। যার সঙ্গে পীরিত করে এত কাণ্ড হঞে গেল সে আদমী থোড়েই আসবেক। বিটিটির যা দশা তা কুছুদিন মরেই দিবেক। আমাদের একটি বিটি থরচ হঞে গেল বাবুজী। ক্যেনে যে লেখাপড়া শিখতে ইসকুলে পাঠাঞেছিলম। ছোটলোকের ঘরে মা সরস্বতী আসবার লয়।

চরিতর আক্ষেপে প্রায় ভেঙে পড়ল। গুলু ফোঁস ফোঁস করে বার কয়েক নিঃশ্বাস ছাড়ল। অনন্ত ওর বন্ধুদের দিকে তাকাল।

সুমিতবাবু বললেন—না হে অত হতাশ হচ্ছ কেন? আমি তো আছি। সেই আদমীর পাত্তা লাগিয়েছি। সে গৈরীর সব দায় লিবেক।

—দায় কি করে লিবেক বাবুজী? কি না কি জাত।

—ভদ্রলোকের জাত।

—সে বুঝেছি বাবুজী! উ বিটির কি সুনিয়া মরদে মন উঠে? লেখাপড়া শিখে মাথাটি বিগড়ে গেইছে।

—কেন? তোমরা কি অন্য জাতে বিটি দিবে নাই?

কিষণ বলল—দিতে তো হয় না বাবুজী। নিজের জাত কুটুম ছেড়ে দুসরা জাতকে বিটি দিলে কুটুমে নিন্দা করবেক।

—নিন্দার কি বাকী আছে?

চরিতর বলল—হুঁ বাবুজী! কুলখাকী বিটি! সরমভরম লাজলজ্জা বেবাক দিঞে বসে আছে। ঘরেই বা রাখব কী করে?

গুলু বলল—গলায় ফাঁস লেগে গেইছে বাবুজী। কুনুরকমে বিটির মাথায় সিঁদুর চড়লেই বাঁচি।

অনন্ত বলল—সিঁদুর ত চড়েছে। ভগবান সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়েছে।

চরিতর বলল—ভগবান ত সব কুছুরই সাক্ষী বাবুজী। দরকারের সময় তো আসবেক নাই। কুটুম জন ঈ-কথা মানবেক ক্যেনে?

সুমিত বলল—তবে তোমরা কি করতে বলছো?

মোক্ষম প্রশ্ন? ধানাইপানাই নয়। সিদ্ধান্ত দাও।

ওরা চারজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। গুলু বিড় বিড় করে নিজেদের ঠেঠ ভাষাতে কিছু বলল।

চরিতর বলল—আমাদের কুটুমজনের সামনে বিটিটির মাথায় সিঁদুর দিঞে চুড়ি পরাঞে স্যাঙ্গা করুক। জ্যাতে ওঠার ভোজ দেক্।

সুবীর ধমকে গেল। গলায় ঝাঁঝ দিয়ে বলল—ঝাড়ু মারো তোমাদের জাতে। জাত বামুনের ছেলে তোমাদের ঘরের মেয়ে নিতে, চাইছে। তাতে আবার বাহানা। যাও পুষে রাখ গা বিটিকে। সে যদি মরদ হয় তবে নিজের বউকে ঠিকই নিয়ে আসবে।

চরিতর মিন্ মিন্ করে বলল—রাগ করছেন কেন বাবুজী?

—রাগ করব না। স্যাঙ্গা করতে হবে, ভোজ দিতে হবে। জাতে উঠতে হবে। এসব কি কথা হে? বামুনের উপরে কি জাত আছে?

গোবিন জোড় হাত করে বলল—ব্রাহ্মণ! বাবা তাকে পেন্নাম করতে হয়।

কিষণ বলল—ব্রাহ্মণকে বিটি দিব কি করে? উয়ারা ঘরে ঢুকতে দিবেক ক্যনে? ছুঁয়া গেলে ডুব দিঞে চান করে। না-বাবুজী। ঈ-হবার লয়?

—কি?

—চুড়ি—সিঁদুর—স্যাঙ্গা।

—কেন?

—ক্যেনে কি বলব? ঈ জীবনে বিটিটির আর ঘর-কন্না হবেক নাই। কে উয়াকে ঘরে ঢুকতে দিবেক বাবুজী? থু থু করে বাহার করে দিবেক। সে অপমানের লেগে বিটি দিব?

অনন্ত রাগে রাগে বলল—আর সে লোক যদি তোমাদের মেয়েকে নিয়ে চলে যায় তাহলে মান কোথায় থাকবে? তোমরা জাত কুটুমের নাম করে ওর সন্তানকে জারজ বানাতে চাইছো? তারপর ওকে বলবে বেশ্যা—যে ওকে ভালোবেসে সন্তান দিয়েছে সে এত কাপুরুষ মনে করেছ।

সুমিতবাবু বললেন—আঃ। রাগারাগি করছিস কেন।

—কি বলছেন দাদা। এই লোকগুলো ঘর গুষ্ঠি মিলে গৈরীর জীবনটাকে অতীষ্ঠ করে দিয়েছে। মনে রাখবে তার স্বামী আছে।

চরিতর বলল—হুঁ বাবু। আমরা তো তাকেই দেখতে চাইছি।

সুমিতবাবু বললেন—নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। সে বেইমানও নয়, কাপুরুষও নয়। কিন্তু তোমাদের রেওয়াজ তার পক্ষে মানা শক্ত। যতই হোক সে একটা ভদ্রলোকের ছেলে। তার পক্ষে মুনিয়া ধাওড়াতে গিয়ে স্যাঙ্গা করা সম্ভব নয়।

চরিতর বলল—তাহলে সে কি করবেক বাবু? একেই তো মান-সম্মান সব গেইছে। তারপর যদি স্যাঙ্গাও করব নাই বলে তবে হলো কী? এক তো বে-জাতে আমাদের বিটি দিতে নাই। জাত কুটুমে পতিত করবেক। তারপরে এই কথা!

সুমিতবাবু বললেন—দেখ স্যাঙ্গা শব্দটার মধ্যেই ছোটলোকী সংস্কার। আমরা দ্বিতীয়বার বিবাহকেও বিবাহ বলি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ এবং স্বামীপরিত্যক্তা নারীর বিবাহ আকছার হচ্ছে। তারও আচার অনুষ্ঠান একই।

—কিন্তুক আমাদের চুড়ি পরাঞে সিঁদুর দিলেই স্যাঙ্গা।

—এইখানেই আমাদের আপত্তি। তোমাদিকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি। মেনে নাও।

—বলুন।

—মা কল্যাণেশ্বরীকে তো তোমরা মানো?

—হুঁ। ক্যেনে মানব নাই?

—চল। আমরা সবাই ঐ দেবী স্থানেই যাই। সেখানেই বৈদিক মতে আমরা বিয়ে দেব। যাগযজ্ঞ, সিঁদুর দান, মালাবদল সবই হবে।

গুলু বলল—কিন্তুক বাবু ব্রামহনকে বিটি দিব কী? তার পায়ের ধূলা নিঞে জল খেতে হয়। ঈ-ত কঠিন কথা বলছেন।

সুমিতবাবু বললেন—তোমার বিটি তো কঠিন কাজই করেছে।

চরিতর বলল—কিন্তুক বাবু ব্রামহনের ছ্যেলাতে ছুটুলোকের বিটি নিঞে ঘর করতে পারবেক?

—হুঁ। পারবেক।

—তাকে জেতে পতিত করবেক নাই?

—করবেক। তার ঘরগুষ্টি তাকে পতিত করবেক। তোমরাও তোমাদের বিটিকে পতিত করবে। দুই পতিত পতিতপাবন হরির নামে সংসার করবে। হিম্মৎ আছে বলেই তো।

গুলু বলল—শেষতক আমাকেই পতিত হতে হবেক। যতই হোক বিটিকে তো ছাড়তে লারব।

চরিতর বলল—আঁঠি যখন গলাতে লেগেই গেইছে তখন আর গতি কি?

গুলু বলল—যা হয় হবেক। কপালের ফের কে ঘুচাতে পারে? কুলথাকী বিটির মাথায় সিঁদুরটি তো চড়ুক। তার একটি ভাতার হোক। পেটে যেটি এসেছে তার একটি বাপ হোক। ঈ-বারে ছ্যেলাটিকে দেখান বাবু।

সুমিতবাবু একবার অনন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন—এর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে।

চারটি মুনিয়া মুরুব্বি একসঙ্গে বিস্ময়ে ফেটে পড়ল—অনন্তবাবু!

বিয়েটা কল্যাণেশ্বরীতেই হলো। আর্য ও অনার্যের বৈধ মিলনের সামাজিক লাইসেন্স। বধূবেশিনী গৈরীর পরনে লাল শাড়ি। সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর।

কাঁসি, বাঁশি, ঢোল, হারমোনিয়াম নিয়ে মুনিয়া মুরুব্বিদের সঙ্গে জনকয়েক বৌ বিটি এবং ছেলেছোকরা ট্রাক ভাড়া করে এসেছিল। বিয়ে শব্দের মধ্যেই যাদু। সে বনে, বাদাড়ে, পাহাড়ে, পর্বতে দেবস্থানে বা লোকালয়েই হোক মাতন একটা থাকবেই। মেয়েগুলি গান জুড়ে দিয়েছিল।

মালাবদল, সম্প্রদান, সিঁদুর দান, হোম যজ্ঞ, সপ্তপদী বৈদিক নিয়মেই হলো। বর ও বধূ মা কল্যাণেশ্বরীকে প্রণাম করে বাইরে এল।

রাস্তা পার হয়ে ফাঁকা ডাঙা। গোটা কয়েক পলাশ গাছ। তারই নিচে লুচি ছাঁকা হচ্ছে। বর ও বধূকে একটি তালাই পেতে গাছতলাতে বসতে দিলো। হাতে হাতে বিলি হতে লাগল লুচি বঁদে।

ওদিকে তখন চারটি মুনিয়া মুরুব্বির সঙ্গে সুমিতবাবু ও সুবীরের আলোচনা। তারাও পাথরের উপর বসেছে এবং বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে।

কিষণ বলল—গৈরীকে কি করবেন বাবুজী? জামাই কি উয়াকে সাঁথে করে নিঞে যাবেক?

সুমিতবাবু বললেন—কোথায় নিয়ে যাবে বল? ও-তো মেসে থাকে। তার একটা ঘরও না হয় আমরা খালি করিয়ে দেব। কিন্তু অতগুলি বেটাছেলের সঙ্গে একটা জুয়ান বিটি ছ্যেলা কি করে থাকবেক?

—সে তো বটেই। তাহলে উপায়?

—বাপ মায়ের কাছেই যাক এখন। পরে অন্য ব্যবস্থা করা হবে। গুলু বলল—আমি জানতম বাবু—ঈ-বিটির ঘর-সংসার হবেক নাই। তবু ভালো যে মান রইল। পেটের ছ্যেলাটিকে কেউ বেজন্মা বলতে লারবেক। একটি বিটির দায় আমিই বইব।

কিষণ বলল—বিটি-জামাইকে এক সঁথে যেতে হয়। জামাই যাবেক তো?

এ প্রশ্নের উত্তর অনন্তই দিতে পারে! তাই ওকে ডাকল।

গাঁটছড়া সহ বিয়ের চাদরটি গৈরীর হাতে দিয়ে ও এল।

সুমিতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—খেয়েছিস অনন্ত?

—হ্যাঁ দাদা।

—গৈরী খেয়েছে?

—হ্যাঁ। খাচ্ছে।

—ওরা বলছে বর-কনে জোড়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়।

অনন্ত একটু গুম হয়ে থেকে বলল—অন্য সময় যাব দাদা। আজ গৈরীকেই নিয়ে যেতে বলুন।

—কেন রে?

—আমার ভীষণ লজ্জা করছে। কি করে যে মুখ দেখাব তাই ভেবে উঠতে পারছি না। আমাকে সামলে নেবার জন্য একটু সময় দিতে বলুন।

দীর্ঘদিন বাংলা মুলুকে থেকে বাংলা ভাষা ওরা ভালোই বোঝে। ঘাড় নেড়ে বলল—ঠিক আছে বাবু। তাই হবে। যে ইমান আর ধরমের কাজ আপনি করলেন তাতেই আমরা বেঁচে গেছি। না হলে কি গতি হতো আমাদের বিটিটির?

মালপত্র, লোকজন ট্রাকে চড়ার পর বৈশাখী গৈরীর হাত ধরে টানল। তখনো ওর হাতে ধরা আছে বিয়ের গাঁট ছড়াটি। অনন্ত কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ও ওদের সঙ্গে যাবে না। শুনে-থেকেই বুকে মোচড় দিয়ে কান্না আসছে। পা যেন আগে পড়ছে না। পুনঃ পুনঃ টানাটানিতে ও চলল। অনন্তর দিকে এমন

করুণ, এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে দেয়। কাজল আঁকা চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

ট্রাক চলে গেল। অনন্তের জন্য অপেক্ষা করেছিল নিন্দা ধিক্কার, প্রশংসা ও অভিনন্দন। বিয়ে স্যাঙ্গা তো হামেশাই হচ্ছে। প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে নরনারীর বিরহ মিলনের কত না ঘটনা। কিন্তু একটি মিলন নিয়ে সারা কলিয়ারীতে এমন মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো যে অনন্ত ভেবে পায় না এরপর কি হবে? এমন কি মেসের দেওয়াল পত্রিকাটিও ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, প্রশংসা ও অভিনন্দনের চাপান উতোরে স্নায়ু উত্তেজক রচনার ভারে চিত্রিত হয়ে উঠল।

ইহ বাহ্! মাকে আমি কি কৈফিয়ৎ দেবো?

যে স্নেহময়ী জননীর একটু খানি হাতের স্পর্শে রোগ যন্ত্রণা সেরে যায় তার বুকে কত বড় আঘাত দিলাম। এই কি জ্যেষ্ঠ পুত্রের কর্তব্য। কেন আমি এমন করে ডুবে গেলাম? ফাস্ট এড কম্পিটিশনের দিনগুলোতে কেন আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারিনি? কেন তখনই আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি?

কলিয়ারীতে সিক রিপোর্ট দিয়ে মেসের ঘরেই পড়ে রইল। গৌরীর নাম পর্যন্ত মুখে আনল না। নুনিয়া ধাওড়ার দিকে পা বাড়াল না।

যখন ওদের মিলন ছিল অবৈধ তখন কত না ঝুঁকি নিয়ে ছুটে গেছে। আর আজ যে সে তার বিবাহিতা স্ত্রী তবু একবার চোখের দেখাও দেখছে না।

মন পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে। ওর বন্ধুরা কত রকমে বোঝাচ্ছে কিন্তু সব বুঝেও প্রচণ্ড আত্মগ্লানিতে নির্জীব হয়ে পড়েছে।

একদিন সকালে কমলেন্দু গেল বিউটির কাছে। বলল, দিদি! অনন্তকে আপনি বোঝান। অনুশোচনায় পুড়ে মরে যাচ্ছে। একবার মেসে চলুন।

বিউটি বলল—ভাইটি আমি মেসে গেলে অন্য রকম মানে হবে।

—যা হয় হোক দিদি। অনন্তর প্রাণের চেয়ে তো দামী কিছু নয়। অমন একটা সবল সুন্দর প্রাণবান ছোকরা কি হয়ে গেছে তাই দেখবেন।

ওর ব্যাকুলতা দেখে বিউটি হেসে ফেলল। তোমার বন্ধুটি কি সব সময়েই গাঢ় রসের কারবারী। যেমন প্রেম তেমনি বন্ধুত্ব। ফিকে হবার জো নেই।

—আপনি ঠাট্টা করছেন দিদি। জানেন না—ও ভীষণ সিরিয়াস।

—জানি—জানি। চল আমি যাচ্ছি।

এই অগ্রদূত মেসেই একদিন ওর চরম সর্বনাশ ঘটেছিল। তাই উৎসব অনুষ্ঠান ছাড়া এদিকে পা বাড়াতো না।

অনন্ত চিৎপাত দিয়ে শুয়েছিল। বিউটির ডাক শুনেই ধড় ফড় করে উঠল। ব্যস্ত হয়ে বলল—বোস দিদি।

খাটে বসে বিউটি বলল—কি হয়েছে তোমার? এমন অসময়ে শুয়ে আছো কেন?

—সবই তো জানো দিদি। তোমার বকুনিটা এখনো বাকী আছে। সেটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও।

বিউটি মুখ টিপে হেসে বলল হুঁ। দুষ্টু কম হওনি। বিয়ে করেছো কোথায় বৌ নিয়ে দিদির কাছে বেড়াতে আসবে তা নয়। আবার ঠেস দিয়ে কথা বলছো।

—যদি কোনোদিন বৌ নিয়ে আসি তবে তুমি ঘরে ঢুকতে দেবে?

—কেন দেবো না?

—সে যে ছোট জাতের মেয়ে।

তুমি তো বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তাহলে তাকে জাতে তুলতে পারবে না কেন?

অনন্ত হতাশ কণ্ঠে বলল—কি বলব দিদি? ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও তিরস্কার শুনে শুনে পাথর হয়ে গেলাম। ভদ্রলোকের ঘরের দুয়ার আমার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

একটু দুঃখিত স্বরে বিউটি বলল—তা জানি। শুনলাম বৌয়ের নাকি বাচ্চা হবে?

—হ্যাঁ। সেইটাই তো আরো লজ্জার।

—লজ্জা কি? সন্তান ভালোবাসার ফল। মানুষের জড় শিকড়। ভালোই তো হয়েছে। জলজ শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়ালে কি বন্ধন দূর হয়?

—যাক্ তবু একটা আশার কথা শুনলাম।

—ওঠো! এমন করে নিজেকে ক্ষয় করো না। যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে মন খারাপ করো না।

কমলেন্দু এল চা ও মিষ্টি নিয়ে।

বিউটি হেসে বলল—ও বাব্বা! আতিথেয়তা শুরু করে দিলে।

—খান দিদি। আপনি তো কখনো আসেন না।

বিউটি নিজেই ডিশে সাজিয়ে নিল। খেতে খেতে বলল—তুমি যদি স্বাভাবিক না হও অনন্ত তাহলে তোমার এই বন্ধুটি পাগল হয়ে যাবে।

অনন্ত হাসল—আমাদের একজনের জ্বর হলে তিনজনেরই বডি টেম্পারেচার বেড়ে যায়।

বিউটি ঘাড় নেড়ে বলল—তোমরাও বন্ধু। ডি. ডি., ডি. সি.-ও বন্ধু। কিন্তু কত ফারাক। দুটি জাহান্নমের মুশাফির আমার মাথায় যে কলঙ্কের পাহাড় চড়িয়ে দিয়েছে তার তুলনায় তোমাদের বন্ধুত্ব মানবিকতার জ্বলন্ত উদাহরণ। ওঠ ভিউটি যাও।

অনন্ত বলল—আজ কখন যাব? সময় চলে গেছে।

—সেকেণ্ড শিফটে যাবে। কাজ না করলে গতরে খিল ধরবে। মগজে জং ধরবে। চিতপাত হয়ে পড়ে থেকো না।

বেশ অভিভাবকের স্বরে কথা বলে উঠে পড়ল। যাবার সময় বলল—বৌকে নিয়ে আসবে একদিন।

বিউটি ওর মনের ব্যাটারীটাকে ভালোই চার্জ করে গেল। চারটের সময় সুবীর ও কমলেন্দু ওকে ধরে নিয়ে গেল ডিউটি করতে।

পঁয়ত্রিশ

যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চায় অনন্ত। কটা দিন বাকী ছিল শনিবার আসতে তাই ও সেকেণ্ড শিফট ডিউটি করেই কাটিয়ে দিলো। খাদের গরমে সিদ্ধ হয়ে স্বেদ ও অশ্রুর প্রবাহে বেশ কিছুটা গ্লানি ধুয়ে গেল। ক্রমশই ধাত ফিরে আসছে।

এখন সে গৈরীর জন্য ভাবে। ৩০শে শ্রাবণ বিয়ে হয়েছে ওর। তারপরই ভাদ্র মাস পড়ে গেছে। এখন মাঠে মাঠে ধান, ভ্যাপসা গরম। প্রাণ ধারণে কষ্ট আছে। তার চেয়েও কষ্ট গৈরীর জন্য। সে তো একটা মেয়ে। স্বামীকে তো কাছে পেতে চায়। কিন্তু কি করল ও? গাঁটছড়াটি ওর হাতে তুলে দিয়ে সেই যে দুজনে দুটি পথে এল। আর দেখা হলো না। না জানি কত কষ্টে আছে ও।

এবার নতুন করে জীবনের কথা ভাবতে হবে। গৈরীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে হবে। তিনবছর খাদের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। মাইনিং সরদারী পরীক্ষায় পাশ করে সার্টিফিকেটও পেয়ে গেছে। অন্য কোথাও চাকরি নিলেই হয়। কিন্তু পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে শ্রমিক আন্দোলন। আজ সেও শ্রমিকদের একজন। তাদের সুখ দুঃখ তারও সুখ দুঃখ।

রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেলা হয়ে গেল। এতক্ষণে মেসে গুলজার শুরু হয়ে গেছে। সুমিতবাবুর গলাটা সবচেয়ে চড়া। অনন্তকে ডেকে বললেন—কাল মিঃ ভার্মা ফোন করেছিলেন। দুর্গাপূজার আগেই অনুষ্ঠান করতে হবে। পারবি?

—আপনি কি বললেন?

—বললাম অনন্ত একটা জব্বর আইডিয়া নিয়ে ভাসছে।

সুবীর বলল—এ শালা দিওয়ানা হয়ে গেছে দাদা। ওর দ্বারা কিছু হবে না। পারেন তো গৈরীকে নিয়ে এসে ফিট করে দেন, তারপর দেখবেন—কলম থেকে আগুন বেরুচ্ছে।

কমলেন্দু বলল—ওদিকে গৈরী হাপসে মরছে। আর এ শ্শালা ভ্যানিটিতে তা দিচ্ছে। দুনিয়া ধাওড়ায় গেলে প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে।

সুমিতবাবু বললেন—তাই নাকি রে? তা আগে বলতে হয়। আমি এখনি ওকে ডাকিয়ে আনাচ্ছি। মেসের একটা ঘরও খালি করে দেবো। কি বলিস?

—দাদা! ওদের সঙ্গে আপনিও ঠাট্টা করছেন।

সুবীর বলল—ঠাট্টা কিসের রে? যা সত্যি তা তোর বলতে কি হচ্ছে? মনের কথা খুলে বল বাপ।

অনন্ত বলল—ওদের কথা শুনবেন না দাদা। আমি আপনাকে দুদিনের মধ্যে লেখাটা পড়ে শুনিয়ে দেবো। তবে দুদিন ছুটি পেলে ভালো হতো।

সুবীর বলল—ওটা কোনো ব্যাপার নয়। আর কি চাই তোর বল?

দু-দিস্তা সাদা কাগজ, এক দোয়াত কালি, একটি কলম, পাঁচ প্যাকেট চারমিনার সিগারেট, দুটো দেশলাই—আর—

কমলেন্দু বলল—আর গৈরী।

—মারবো শ্যালা এক থাপ্পড়। ঘুরে ঘুরে একটাই কথা।

দুদিনের দিন সন্ধ্যায় সুবীর তার জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে পড়তে শুরু করল অনন্তর লেখা নৃত্যনাট্য—'অগ্নি সংস্কার'। তিন বন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

অনন্তর লেখা যত ভাল, হাতের লেখা ততই টানা। স্বচ্ছন্দভাবে পড়া যায় না। সেজন্য কমলেন্দু পরিষ্কারভাবে কপি করেছে। সুবীর তারপর পড়েছে জিভ ও কণ্ঠস্বরের সাযুজ্য রাখতে।

সুমিতবাবুর ডাকে সবাই এসেছে অসীম, অপূর্ব, দীপক, হেমব্রাম, সুনীল, সত্যেন, স্বপ্না, শুচি, কল্যাণী, ভারতী ও আরো আট দশটি ছেলেমেয়ে। ডাক্তারবাবু এসেছেন চীফ গেস্ট হয়ে। আর এসেছেন ডি. সি. ও ডি. ডি. সাহেব। ওরা তো হিজ মাস্টারস ভয়েস। হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ পালনই তাদের ধর্ম।

দুটিই দৃশ্য। শুরু হচ্ছে—মঞ্চ অন্ধকার। ঘোর দুর্যোগ। ভয়ঙ্কর প্রলয় কল্লোল। বিদ্যুৎ বিদীর্ণ আকাশ। মিউজিকে মেঘ ডম্বরু। গুম গুম পাহাড় ভাঙার শব্দ। ভীষণ জলকল্লোল। শন শন করে বয়ে যাচ্ছে ঝড়। জীবজন্তুর বিকট আর্তনাদ।

প্রবেশ করলেন ধরিত্রী। আলুথালু বেশ। বাতাসের দাপটে উড়ে যাচ্ছে নীল শাড়ি। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। আলো আঁধারের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমক। আতঙ্কে তাঁর চোখ দুটো ফুটে বেরিয়ে যাচ্ছে যেন।

'সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করলেন—

দ্বিতীয় দৃশ্যে এল যন্ত্র সভ্যতার যুগ। মৃতের পাহাড় তখন ধরিত্রীর গর্ভাশয়ে। তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে পাললিক শিলায়।

কালো কালো মানুষ এল হাতে গাঁইতি, শাবল, ঝুড়ি নিয়ে। সুরঙ্গ কাটল মাটির তলায়। এল গোরা সাহেব হাতে ছড়ি নিয়ে। হঠাৎ ভেঙে পড়ল ছাদ। সমাধিস্থ হলো সেইসব কুলিকামিন।

এল খুঁটা লাগাবার মিস্ত্রী মজুর। ছাদকে যোগান দিয়ে রাখল। কিন্তু ভেসে গেল জলস্রোতে। তখন তারও উপর বাঁধ তৈরি হলো। কাজ থেমে নেই। নিত্য নতুন খাদ খুলছে। বিদীর্ণ হচ্ছে ধরিত্রীর গর্ভাশয়। এল যন্ত্রদানব। কাজ ত্বরান্বিত হলো। ফুটল বারুদ।

আবার একদিন বিস্ফোরণ হলো খনিতে। মিথেন গ্যাস, কয়লা গুড়ো ও আগুনের নিবিড় যোগসাজসে।

বসল নিরাপত্তা কমিটি। ব্যবস্থা গ্রহণের ফিরিস্তি লাগু হলো ছাদ, জল, আগুন, গ্যাস, বিস্ফোরণ, যান্ত্রিক দুর্ঘটনার মোকাবিলা করতে। লড়াই চলল, মানুষ ও প্রকৃতিতে।

বন্দী হলো দুরন্ত দামোদর। বিভিন্ন ড্যাম দিয়ে বাঁধা হলো তাকে। উৎপন্ন হলো জল বিদ্যুৎ। তাপ বিদ্যুৎ।

দাউ দাউ করে জ্বলছে ব্লাস্ট ফার্নেস। নিয়ন লাইটের আলোতে মাতা ধরিত্রীর লাশকাটা হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে। তখনো তিনি আর্ত ও পীড়িত।

অবসন্ন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

পড়া শেষ হলো হাততালি শুরু হলো।

—দারুণ।

—মার্ভেলাস!

—লা—জবাব।

সুমিতবাবু বললেন—একেবারে তাক লাগানো ব্যাপার! খুব খাটতে হবে। তোমরা সব পারবে তো?

—নিশ্চয়।

চরিত্র অনেকগুলি। ব্রহ্মা, ধরিত্রী, ঝড়, জল, বিদ্যুৎ, গাছপালা, বনস্পতি, জীবজন্তু, সরীসৃপ, ডাইনোসর, দামোদর, অজয়, গঙ্গা, গোদাবরী, মালিক, ম্যানেজার, মালকাটা, শ্রমিক, যন্ত্রদানব, ছাদ, গ্যাস, বিস্ফোরণ কয়লা কণা, আগুন, বাতাস, বারুদ, জল-প্লাবন. বিদ্যুৎশক্তি, বাষ্পশক্তি, ড্যাম, ব্লাস্ট ফার্নেস, নিয়ন লাইট, সভ্য মানুষ।

সবই চরিত্র। তাদের সঙ্গে একজন সূত্রধর। যিনি তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে খেই ধরিয়ে দেবেন। ওটা সুবীর করবে। অনন্ত দামোদর। স্বপ্না ধরিত্রী।

এইভাবেই ভাগ হয়ে গেল এক একজনের রোল। কমলেন্দু কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল পার্ট লিখতে।

সুমিতবাবু একজন নাচগানের মাস্টার ঠিক করলেন। মঞ্চসজ্জা ও সাজপোশাকের ভার তিনি নিজে নিলেন।

লেখাটি শেষ হতে যা দেরি। তারপর দিন আবার খাদের ডিউটি। ডি. ডি. সাহেব বললেন—স্যাণ্ড স্টোয়িং পাইপে জ্যাম ছাড়াতে হবে। পারবে অনন্ত?

—হ্যাঁ স্যার।

—অলরাইট। লোকজন নিয়ে চলে যাও।

একজন ফিটার, একজন হেলপার, দুটি টেণ্ডেল মজদুর নিয়ে ও খাদে নেমে গেল। এটা ওর হামেশার কাজ। সব হদিস জানে। পাইপ যেখানে ফেটেছে তাও খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। লোকজনকে কাজে লাগিয়ে একটা বালির ঢিপিতে বসে পড়ল। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। ঘামের গায়ে খুব মিষ্টি লাগছে। বেশিক্ষণ থাকলে ঘুমিয়েই পড়বে এমন একটা আলস্য সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে।

একটা কবিতা লিখলে হয়। অনেকদিন পর কবিতা লেখার কথা মনে পড়ল। পরিবেশটি ভালো। চারিদিক নিস্তব্ধ। দু'একটা আরশুলা উড়ছে ফর ফর করে। মাঝে মাঝে মিস্ত্রীদের হাতুড়ী ঠোকার শব্দ ভেসে আসছে। অনেকদূরে ওদের বাতিগুলো কয়েকটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে।

পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে লিখল—

এবার ফিরে যাব আমার ছোট্ট ঘরে।
নিকানো উঠোন, মাটির দেওয়াল,
খড়ের চাল।
হাতা, খুন্তি, কলসী নিয়ে আমার
দেহাতী বউ
আনাড়ী হাতে সংসার পেতেছে।
উদোম আতুল ছেলেটার গায়ে পরিয়ে
দিয়েছে
লাল জামা, কালো টুপি এবং
উলের মোজা।
সে যদি আমাকে হঠাৎ দেখতে পায়
তবে নাকের নোলক দুলিয়ে হাসবে।
পায়ে মল বাজবে ঝুম্ ঝুম্ শব্দে।
ঠোঁট ফুলিয়ে বলবে—কতদিন পর এলে!

ধেৎ! এটা কবিতা হচ্ছে নাকি? এতো আপন মনের মাধুরী মেশানো স্বপ্ন সাধ। এই নিয়ে কি কবিতা হয়? কবিতার জন্য গভীর ভাব চাই।

চিন্তাসূত্র হঠাৎই ছিন্ন হয়ে গেল। একটা খাদের কুলি এসে ওর হাতে একটি চিঠি দিল। চিঠিটি সুবীরের। কাম শার্প। আরজেণ্ট!

লে বাবা! হঠাৎ কি হয়ে গেল? কোনো বিপদ-আপদ? একসিডেণ্ট? নাকি গৈরীর কিছু হয়েছে?

অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে খাদ থেকে উঠল।

প্রাক দ্বিপ্রহরের কলিয়ারী। চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। যান্ত্রিক শব্দ ও টালোয়ানদের ছুটোছুটি করে টব গাড়ি ঠেলা চলছে দ্রুত গতিতে। এই তো কাজের সময়।

বাতিঘরে বাতি জমা দিয়ে দ্রুত পায়ে মেসের দিকে ছুটল। মেসটাও ফাঁকা। যেন কেউ কোথাও নেই। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই থ।

—মা!

বাংলা অভিধানের মিষ্টতম শব্দ মা। শরীরের অণু পরমাণুতে আনন্দের স্রোতস্বিনী ধারা। জীবন প্রভাতের মূর্তিমতী উষা। পরম কল্যাণদায়িনী মাতা। যা উচ্চারণে সপ্তস্বরা বীণার ঝঙ্কার। যা শ্রবণে হৃদয়ের পরতে পরতে হর্ষ ও গর্বের তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস!

অনন্ত দাঁড়িয়ে আছে দুয়ারে। ওর খাটে বসে আছেন পিসিমা ও পিসেমশাই। মা বসেছেন খাটের পাশেই একটা কাঠের বারুদ বাকসে।

—মা!

মাতৃমূর্তির এক প্রতিচ্ছবি অনন্তর বুকে গাঁথা আছে। ঈষৎ ফর্সা গায়ের রঙ। মাথার উপর নিবিড় কালো চুলের বোঝা। ছোট্ট কপাল। খর্ব ও কৃশকায়। দু'চোখের দৃষ্টিতে অপার স্নেহের আলোকরশ্মি! সাদা থান পরে তুলসীতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ।

—মা।

অনন্ত পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

কিছুক্ষণের নীরবতা। অনন্তর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সুবীর ও কমলেন্দু।

ওর পিসেমশাই বললেন—তোকে নিয়ে আমাদের এত গর্ব অহঙ্কার সব ধূলিসাৎ করে দিলি অনন্ত। তোর মায়ের কথা মনে পড়লো না?

অনন্তর বুকটা দুমড়ে উঠল। এই সেই অনিবার্য প্রশ্ন একদিন না একদিন যার মুখোমুখি হতেই হতো। কি কৈফিয়ৎ দেবে তার হাজার মুসাবিদা মনে মনে ফেঁদে রাখলেও ঠিক এই মুহূর্তে কোনো উত্তর যোগালো না। সুবীরের মুখের দিকে তাকাল। এত যে স্মার্ট ছোকরা তারও মুখে কথা নেই। কমলেন্দুর দিকে তাকাল। অত যে বুদ্ধিমান ছাত্র সেও বাক্যহারা।

মায়ের সেই স্নেহ কোথায়? ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুনের ফুলকি! সুবীরের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা বোস বাবা!

—হ্যাঁ মাসিমা।

ওরা তিন বন্ধু একটা খাটেই বসল।

উনি বললেন—আজ আমার বলতে লজ্জা হচ্ছে যে আমার ছেলে ইন্দ্রিয়ের দাস। একটা মেয়ের রূপ দেখে ভূতভবিষ্যৎ জাহান্নমে পাঠিয়ে দিলো। একবার মনে পড়ল না মায়ের হৃদয় বেদনা। কুল গৌরব, বংশ মর্যাদা। অমন কঠোর আদর্শবাদী বাপের এত অসংযমী ছেলে।

একে আমি গর্ভে ধরেছি এ লজ্জা রাখি কোথায়?

সবাই চুপ। অনেকক্ষণ পর সুবীর বলল ভুল তো মানুষ মাত্রেরই হয়।

—এটা কি একদিনের ভুল? একটা ছেলের একটা মেয়ের মনের মধ্যে ঢুকে পড়া কি অত সহজ? তার হদিস কি কেউ পাবে না? তোমরা ওর নিকট বন্ধু। কোনো পূর্বাভাস পাওনি? মায়ের কাছে সত্য কথা বল।

কমলেন্দু বলল—তা অবশ্য পেয়েছি মাসিমা।

—তাহলে রাশ টানোনি কেন?

মা যে এমন কথা বলতে পারেন, এভাবে জেরা করতে পারেন সে ধারণা অনন্তের ছিল না। ও ভাবত মা আমার সরল, কোমল সহজিয়া মনের মা। স্রেফ মা।

—বল বাবা, চুপ করে আছো কেন? তোমরা কি ফেরাতে পারতে না?

—কি জানি?

—এটা কি সৎ বন্ধুর কাজ হলো?

সুবীর ও কমলেন্দু মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ঘাড় হেঁট করে আছে। বেচারীরা মাথা তুলতে পারছে না।

অনন্ত বলল—ওদেরকে কেন দায়ী করছো মা?

দায়ী কাউকেই করিনি বাবা!—এই আমার বিধিলিপি। তোমার বন্ধুরা নিজের মায়ের কোলে সোনার চাঁদ ছেলে হয়ে রইলো। কপাল পুড়লো আমার।

অনন্তর অন্তকরণে গভীর রক্তক্ষরণ। গল্ গল্ করে পড়ছে। তীব্র বেদনায় সারা অন্তর টন্ টন্ করছে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে গেছে। কেমন বিকৃত কণ্ঠে বলল—মা। সব কিছুর জন্য আমিই দায়ী। আমার বন্ধুরা নয়। বহু ভাগ্যে মানুষ এমন বন্ধু পায়। তাদেরকে কিছু বলো না মা। তোমার পায়ে পড়ি শাস্তি যা দেবার আমাকে দাও।

মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল। ওর মায়ের পা দুটো ধরে কাঁদছে। শক্ত সবল পেশীবহুল একটা শরীর অবলীলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। স্থাণুবৎ বসে আছেন মা। দুটো চোখ জলে টলটল করছে। অথচ তারা দুটিতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

সুবীর বলল—অনন্তকে ক্ষমা করুন মাসিমা।

পিসেমশাই বললেন—অনন্ত কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। ওর দিকে তাকাও বৌদি।

পিসিমা বললেন—ছোটবেলায় যে অনন্ত কাঁদলে তুমি খেতে ভুলে যেতে সে আজ কেঁদে মরে যাচ্ছে তবু তুমি পাষাণের মতো বসে আছো বৌদি।

কি করবো? যেন কোনো ঈথারবাহিত কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি।

—ওর মাথায় হাতটা রাখো। মনে শান্তি পাক্।

ধীরে ধীরে দুটি হাত অনন্তর মাথার উপর নেমে এল। একরাশ কোঁকড়া চুলের মধ্যে দশটি আঙুল ডুবে গেল। বেদনার সমুদ্র থেকে উত্থিত হলো। একটি শব্দ—অনন্ত।

অনন্তর নাভিমূলে সার্ধ ত্রি-বলয়াকৃতি সর্পিনী সুপ্তি ভঙ্গের যন্ত্রণায় সহসা গর্জন করে উঠল। তারই সঙ্গে সঙ্গে অনার্য দামোদরের সঘন কম্পিত সর্ব অবয়ব সহসা ফেটে পড়ল বুকফাটা আর্তনাদে।

মা!

ভেঙে পড়লেন জাহ্নবী দেবী। তুষার মৌলি হিমাদ্রি ভেদ করে বেগবতী স্রোতস্বিনী সব অহংবোধকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। মাতৃস্নেহের দুকুলপ্লাবী অশ্রুধারার কি আশ্চর্য মহিমা কারো চোখ শুষ্ক রইল না।

অনেকক্ষণ পর আবেগমথিত হৃদয়বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হলো। অনন্ত উঠে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝেতেই বসে রইল। ওর মা চোখ মুছে আবার স্থির হয়ে বসলেন।

সুবীর বলল—অনন্তকে ক্ষমা করেছেন তো মাসিমা?

—ছেলেকে ক্ষমা না করার মতো পাষাণী মা তো আমি নই বাবা। কিন্তু যার বৌ ঘরে এলে সানাই বাজতো, উলুধ্বনি হতো, মঙ্গল উৎসবের আনন্দে বধূবরণ হতো সে কিনা একটা নিচ জাতীয়া মেয়ে, তাই দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রী যাকে গাঁয়ের বাউরীরা বলে স্যাঙ্গার কনে তাকে বিয়ে করল!

একে আমি কি করে বরণ করে নিয়ে যাবো?

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারল না। উনি আবার বললেন, সে তো একটা বিবাহিতা মেয়ে ছিল। সীমন্তিনী। তাহলে জেনে শুনে অনন্ত কেন পরের বৌয়ের প্রতি প্রলুব্ধ হলো? তার দিকে তাকানোই উচিত হয়নি।

অনন্ত বলল—অত বোধবুদ্ধি ছিল না মা।

—কেন ছিল না? তুমি তো মুখ্যু নও। আর সেই মেয়েটিও মুখ্য নয়।

—জানি না মা। হয়তো ওই আমার ললাট লিপি! যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি দুর্নিবার আকর্ষণে আমাদের দুটো জীবনকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। নিজের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করেছি। কিন্তু আমার বিবেকও আমাকে ঐ পথটাই দেখিয়ে দিল।

—ধিক্ তোমার বিবেককে। বিয়ের আগেই বউ অন্তঃসত্ত্বা! এই তোর বিবেক?

সুবীর বলল—এত খবর আপনি কোথায় পেলেন মাসিমা?

—কেউ অজ্ঞাত শত্রু নয় বাবা। আমাদের শত্রুরাই আমাদের উঁচু মাথা হেঁট করে দেবার জন্য শতকণ্ঠে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। কানে বিষ ঢালছে। যাক-গে আমরা এখুনি চলে যাবো। ওর বউকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করবো? ডেকে দাও।

ছত্রিশ

পিসিমা ও পিসেমশাই মেসেই খাওয়া দাওয়া করলেন। সুবীর নিয়ে এল ফল, মিষ্টি, দুধ। অনন্ত গেছে গৈরীকে ডাকতে।

একটা ডিশে ফল, মিষ্টি সাজিয়ে জাহ্নবীদেবীকে বলল—খান মাসিমা।

—ছেলেদিকে উপোসী রেখে মায়ের কি খাবার রোচে? এই তোমার বুদ্ধি?

—আমাদের যে দেরি হবে মা।

—হোক দেরি। ওসব ঢাকা দিয়ে রাখো। তোমাদের সঙ্গেই বসব।

সুবীর নাচার! এরপর কথা চলে না।

অনেকক্ষণ পর অনন্ত এল। পিছনে গৈরী। পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি। কুঁচি দিয়ে ঘাঘরা করে পরা। আঁচলটা বাঁ দিকের নীবি থেকে পিঠের উপর দিয়ে সামনে দিকে বুকের উপর মেলে দেওয়া। ঘোমটা দেওয়া মুখ। ডাঁটো পুরু দেহাতী বধূটি আলতাপরা খালি পায়ে মল ঝুম ঝুম করে এল।

ঘরে ঢুকে অনন্ত আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—মা, পিসিমা, পিসেমশাই। গৈরী দূর থেকে গড় হয়ে প্রণাম করল।

জাহ্নবী দেবীর ভিতরে কি এক বিজাতীয় ঘৃণার স্রোত কিল বিল করে উঠল। মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। অনন্ত ওর মাকেই দেখছিল। মুখটা ফিরিয়ে নিতেই ওর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। হয়তো কিছু আশা জেগেছিল মনে।

সুবীর বলল—বোস গৈরী!

গৈরী মেঝেতেই বসে পড়ল মুখটা নীচু করে। কি যেন বিরাট গুরুতর পরীক্ষা দিতে হবে তেমনি হয়ে গেল ওর মুখটা। এই একটি ব্যাপারে অনন্ত ও গৈরী এক ছাঁচে ঢালা। ওদের মনের দুঃখ, বেদনা, আনন্দ মুখেই ফুটে ওঠে।

জাহ্নবীদেবী বললেন—তুমিই গৈরী?

—হ্যাঁ মা!

—শুনেছি তুমি অন্তঃসত্ত্বা। ক' মাস হলো?

—চার মাস চলছে।

এটা একটা নির্দিষ্ট সংবাদ। সুবীর ও কমলেন্দু এত কাছে থেকেও জানত না।

জাহ্নবী দেবী বললেন—ছিঃ। তোমার লজ্জা করছে না।

যেন একটা চাবুক। ফট্ করে মুখেই পড়ল। তেমনি এক অব্যক্ত ব্যথার রেখা চিহ্ন ফুটে উঠল গৈরীর মুখে। একটু পর সামলে নিল। অনন্ত মাথা হেঁট করে বসেছিল খাটে। ওর দিকে তাকাল। সে নীরব। মুখটা মলিন।

গৈরী আস্তে আস্তে বলল—আমার লাজ-লজ্জা আপনার ছেলের পায়েই সমর্পণ করেছি। আর তিনি তা রেখেছেন।

—তাই বুঝি আমার ছেলের মুখ পুড়িয়ে কালো করে দিলে?

—তিনি অগ্নির মতো বহ্নিমান। তার মুখ পোড়াবার সাধ্য কারো নেই।

সুবীর অনন্তর মুখের দিকে তাকাল। মনে মনে তারিফ করল এই উত্তরটির। পিসেমশাই ঘাড় দোলালেন। পিসিমা স্বগতোক্তি করলেন—বাঃ।

গৈরী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আছে। কোমরের উপরে একটুখানি খোলা জমি ঝক্ ঝক করছে। ঘাগরার কুঁচি আর চওড়া পাছাতে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। পায়ের পাতা দুটি অনাবৃত। বাঁ ও ডান পায়ের অনামিকা ঈষৎ বাঁকা। পাঁচটি আঙুলেই রূপোর চুটকি। টকটকে আলতার উপর ধুলো বসেছে।

ঘোমটার ফাঁকে নাক ও চিবুক দেখা যাচ্ছে। নাকের ডগায় এক বিন্দু ঘাম এবং নোলকটি ঝিলিক দিচ্ছে। ভিতরটা কল কল করে ঘামছে।

নিজেদের ঠেঠ্ কথ্য ভাষা যেমনই বলুক বাইরের কারো সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে হলে কোনো জড়তা আসে না।

জাহ্নবীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—আগে তোমার বিয়ে হয়েছিল?

—হ্যাঁ মা।

—বিবাহিতা মেয়ে হয়ে অন্য পুরুষে মন মজালে কোন যুক্তিতে?

—যুক্তি নয় মা। আবেগ বলতে পারেন।

—আবেগটাই বড় হলো? নৈতিকতার কোনো মূল্য নেই? এমন করে মজলে যে সতীত্বটাও বিলিয়ে দিতে বাধল না।

—রক্ত মাংস হৃদয় মন একাকার না হলে ভালোবাসার টান কোথা থেকে আসবে মা?

সুবীরের মনে হলো হাততালি দেয়। অনন্ত চমকে উঠল। ঠিক এইরকম একটি কথা ওকেও বলেছিল প্রথম মিলনের প্রাক্কালে। এই তাহলে ওর বিশ্বাস।

জাহ্নবীদেবী মুখ বিকৃত করে বললেন—ছিঃ ছিঃ। এত ঢ্যাটা মেয়ে তুমি?

গৈরীর চোখদুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল। ঘাড়টা তুলে বলল—তাই বলে আমি অসতী নই মা। যাকে ভালোবেসেছি তাকেই দেহমন উজার করে দিয়েছি। ফাঁকি দিতে চাইওনি, দিইওনি।

—সে যদি তোমাকে ফাঁকি দিত?

—এই শরীরটা দামোদরের বানে ভাসিয়ে দিতাম। কিন্তু তেমন বিশ্বাসঘাতক সন্তান গর্ভে ধারণ করার লজ্জা আপনি কোথায় রাখতেন মা?

সবাই থ। অনন্ত ভাবতেই পারেনি গৈরী এমন জবাব দেবে।

ওর পিসিমা বললেন, বাব্বাঃ। পটাপট মুখের উপর জবাব।

জাহ্নবীদেবী বললেন—সে আঘাত আরো মর্মান্তিক হতো। কিন্তু তুমি কি বলে তোমার বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ?

—তা কেন বলছেন মা? বিয়ে হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে। অভ্যাস বসেই সিঁদুর পরতাম। মনের মধ্যে তার ছায়াটিও ছিল না। জীবনের প্রথম যে পুরুষটির মূর্তি মনের ভিতর ছাপা হলো তিনি আপনার ছেলে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। অনন্তর পিসেমশাই বললেন—সবই নিয়তি।

জাহ্নবীদেবী বললেন—পারস্পরিক মেলামেশা হতেই পারে। তাইতে বিবাহকে অস্বীকার করা যায় না।

—অবোধ শিশুর বিয়ের জন্য সে দায়ী নয়। ওতে আমার হাত ছিল না। আমার যত দায়িত্ব আমার ভালোবাসা নিয়ে। সেজন্য বলতে পারেন আমি আপনার ছেলেকে প্রলুব্ধ করেছি। সন্ধ্যারাত্রে উনি দামোদরের কিনারে ডিউটি করতেন। আমি পাগলের মতো তাঁর কাছে ছুটে গেছি। আমি অনার্য কন্যা তো মা। তাই ছিলাম দুর্বার। আপনার ছেলের কোনো দোষ নেই। সব দোষ আমার।

এতক্ষণে গৈরীর চোখে জল দেখা দিল। আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে স্বীকারোক্তি দিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

সুবীর বলল—আবার কান্না জুড়ে দিলি কেন?

—বেশ করছি কাঁদছি।

—তবে গলা ছেড়ে কাঁদ।

—কাঁদবই তো আমার মতো কে লাঞ্ছিত হয়েছে? এত অপমান কে সয়েছে? গাওনার নামে একটা মরদকে ঠেলে দিয়েছিল আমার ঘরে। ভগবান জানেন কিভাবে নিজেকে রক্ষা করেছি। কি নির্যাতন ভোগ করেছি। সব বলেছি আপনার বন্ধুকে।

সবাই চুপচাপ। গৈরীর অন্তর্বেদনার রাশ খুলে গেছে। সবটুকু উজার না হওয়া পর্যন্ত থামবে না।

বলেই চলেছে—কত বলব তিরস্কার ও ভর্ৎসনার কথা। কেউ ভালো করে কথা বলেনি। আমার মা ওষুধ নিয়ে এসেছিল পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করবার জন্য। আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আত্মীয়ারা বলল—বেজন্মা ছেলে পেটে ধরেছিস। তবু হেরে যাইনি।

জাহ্নবী দেবীর কাছে এসব তথ্য জ্ঞাত, কিছু অজ্ঞাত। কিন্তু গৈরীর অশ্রুজলে ভেজা উক্তি এমন এক সরল সত্যের মাত্রা পেয়ে গিয়েছিল যে তাঁরও ভিতরটা টন্ টন্ করে উঠল! তবু মন টলল না।

বললেন—আচ্ছা, অনন্তের যে আরো ভাইবোন আছে, বিধবা মা আছে তাদের কথা কি ভেবেছো? সমাজের কথা ভেবেছো?

—ভেবেছি মা। আমি তাঁর জীবনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছি।

—সব বুঝেও আমার ছেলেকে মায়ের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে?

—তা কেন মা? আপনার মনের মতো মেয়ের সঙ্গে ছেলের আবার বিয়ে দেবেন। আমি কোনো দাবি নিয়ে যাবো না।

—তোমার সন্তান?

—যিনি জন্ম দিয়েছেন তিনিই পিতা। এই দায়িত্বটুকু তাঁর থাকবে। বাদবাকী আমার। আমি দুনিয়ার মেয়ে। মাথায় ঝোড়া বয়ে সন্তান পালন করব। বোঝা হব না।

জাহ্নবীদেবী বেদনার্ত কণ্ঠে বললেন—আমি তো কোনো পাপ করিনি। তবে আমার সন্তান এমন হলো কেন? মাকে দাগা দিল কেন? সে কি জানে না সন্তান মায়ের কত বড় অবলম্বন? সে কি করে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিল? সবারই আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য আছে। আমার কি আছে। মা হয়েছি কি কাঁদবার জন্য?

জাহ্নবীদেবীর কান্না সপ্তসিন্ধুর কল্লোলিত তরঙ্গের মতো সারা মন প্রাণ তোলপাড় করে বয়ে যাচ্ছে। মুখটা গুঁজে দিয়েছেন দুই হাঁটুর মধ্যে। দমকে দমকে কাঁপছে অস্থিসার শরীর।

অনন্তর বুকে পাহাড় ভাঙছে। দুম্ দুম্ শব্দে দুন্দুভি বাজছে।

গৈরী লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে। কেউ তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। সে কাঁপছে। তার অনাগত ভবিষ্যৎ কাঁদছে।

অনেকক্ষণ পর উনি মাথা তুললেন। মুখ মুছে বললেন চল ঠাকুরঝি! আর দেরি হলে ওদিকের বাস পাবো না।

ওঁরা উঠে পড়লেন। তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। সূর্য পাটে বসেছেন।

বারান্দায় বেরিয়ে অনন্ত বলল, রাগ করে চলে যাচ্ছো মা?

—কি মূল্য আমার রাগের? এই হতভাগী বিধবাকে তো তোর কাছেই হাত পেতে দাঁড়াতে হবে।

অনন্ত মাথা হেঁট করে দাঁড়ালো। বুকচাপা বেদনার মুহূর্ত!

ওর পিসেমশাই বললেন, পূজোতে বাড়ি যাবি তো অনন্ত?

হ্যাঁ!

ওর মা বললেন—কি জন্য যাবি ? লোক হাসাতে ? পাড়াপড়শীর টিটকিরি শুনতে ? যেতে হবে না তোকে। আমি বেঁচে থাকতে বাড়িতে ঢুকিস না।

অনন্ত চুপ করে রইল। মা আজ কত কঠোর।

স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়াল গৌরী। অব্যক্ত বেদনা হৃদয়ে মোচড় খাচ্ছে। দুটি চোখ জলে টল্ টল্ করছে। শাশুড়ী তার মুখ দেখল না।

ওঁরা চলতে সুরু করে দিলেন। অনন্তর পিসিমা ইচ্ছা করেই একটু পিছনে রয়ে গেলেন। অনন্তর সঙ্গে বয়সের বিশেষ পার্থক্য নেই। পিঠোপিঠি ভাই-বোনের মতো মানুষ হয়েছেন। পরস্পরের খুব টান।

অনন্তকে কাছে ডেকে বললেন—বউয়ের তো কথা খুব। শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়েছিস বুঝি ?

—না পিসিমা। ও বরাবরের মুখরা। ভয় ডর নেই। লাজ লজ্জাও নেই।

—দেখে শুনে বেশ বউ করেছিস তাহলে। বৌদির জেরার মুখে তোরা মিন্ মিন্ করলি কিন্তু ও কেমন ঝাড়া ঝাপ্টা জবাব দিয়ে দিলো। তবে ওর মনটা বড় সৎ রে। তুই যেন অনাদর করিস নে।

চলতে চলতে মোরাম রাস্তায় পৌঁছে গেলেন।

বললেন—হ্যাঁ রে! তোর বউয়ের পা দুটোই তো দেখলাম। মুখটা ভালো করে দেখতেই পেলাম না।

—দেখবে পিসিমা ?

—হ্যাঁ।

গৌরী তখন বারান্দা থেকে নামছে। অনন্ত ওকে কাছে ডেকে বলল, পিসিমা তোকে দেখতে চাইছেন। যা প্রণাম করগে। মুখটা খুলে দাঁড়াবি।

গৌরী ওঁকে প্রণাম করে ঘোমটাটা সরিয়ে দিলো।

উনি বললেন—আহা! বেশ বউ! ফোটা ফুলের মতো মুখ। মনে কষ্ট রেখো না মা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কি আর ঠিক হবে পিসিমা ? গৌরীর কণ্ঠস্বরে রাজ্যের নৈরাশ্য।

—তোমরা একটা নতুন সমাজ গড়বে। সংস্কার মুক্ত নির্মল সমাজ।

গলায় জোর দিয়ে কথাগুলো বলে চলতে লাগলেন।

অনন্ত গৌরীকে বলল—তুই ফিরে যা গৌরী। আমি মাকে বাসে চড়িয়ে দিয়ে আসি।

ও চলে গেল। গৌরী সেখানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত ও হতাশ ভঙ্গীতে এক পা এক পা করে মোরাম রাস্তার উপর হাঁটতে লাগল।

ভিতরটা বেদনায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ছিঃ। তারই জন্য একটা সংসার ছার-খার হতে বসেছে। মা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। স্বামী মাথা তুলে দাঁড়াতে

পারছেন না। তিনি আজ সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এই তাঁর ভালোবাসার ফল।

রাস্তার উপরেই মাথা ঠুকতে মন হচ্ছিল। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে সামলে নিল।

হাঁটতে হাঁটতে দামোদরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। গেরুয়া জলধারা ছল ছল করে বয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশটা লাল। তার প্রতিবিম্ব জলে। গৌরী দাঁড়িয়ে আছে উদাসী চোখ মেলে। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না।

কানে বাজছে শাশুড়ির ধিক্কার। তাঁর কান্না।

সেই যখন তার নিজের মায়ে কর্কশ কণ্ঠে ভৎর্সনা করতো, যখন তাকে কথায় কথায় বলতো—মর। মরে খালাস হ। এত লোক মরে তুই মরিস না ক্যেনে? বুকের উপরে বসে আছিস। কুলখাকী, সাতভাতারী বেজন্মা ছ্যেলার মা হতে লাজ লাগছে নাই।

তখন অহরহ মনে হতো আজই দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

পারেনি। গর্ভাশয় থেকে একটি ভ্রূণ প্রবলভাবে ঘোষণা করেছে আমি আসছি।

সেই তাকে এতদূরে নিয়ে এল।

আজ যদি নূতন করে মরণের ভাবনা ভাবতে হয় তবে কি সে বলবে না—মা! আমাকে তুর এত অবহেলা!

অনন্ত বলবে না—তুই আমাকে কেন দাগা দিলি? তাই যদি দিবি তবে ভালোবাসা করলি কেন?

উঃ ভাবতে পারে না। চারিদিকে বন্ধন। স্বামীর, সন্তানের, বেঁচে থাকার সাধের। অথচ কি যন্ত্রণা!

ক্রমে ক্রমে রাত হয়ে এল। চরাচর ছেয়ে গেল অন্ধকারে। শুক্ল পক্ষ চলছে। শুক্ল পক্ষের চাঁদ উঠেছে। সেই মলিন জ্যোৎস্নার মাঝে ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে আছে একাকিনী।

অবশেষে সে বসে পড়ল ঘাসের উপর। হাত পা ছড়িয়ে ব্যাকুল কান্নায় ভাঙতে ভাঙতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মনে হলো বহুদূর থেকে অনন্ত ডাক দিচ্ছে—গৌরী…

ধড়ফড় করে উঠে বসল। ওঃ এমনি করে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ক্লান্ত ও বিষণ্নভঙ্গীতে চলতে চলতে ধাওড়ায় এল। স্বামী, সন্তান, সংসার সব যেন গাঢ় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

অনন্ত একটু একটু করে নিজেকে সামলে নিয়েছিল কিন্তু ওর মা এসে আবার ওকে হতাশার অন্ধকারে ঠেলে দিলেন। এবার অবশ্য সিক্ রিপোর্ট দেয়নি।

নিয়মিতভাবে ডিউটি যাচ্ছে। কাজ করছে। সন্ধ্যায় এসে নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে কিন্তু বুকে বিঁধে আছে এক সূচীতীক্ষ্ণ শলাকা।

মানুষের জীবন যন্ত্রণা প্রকাশের একটা মাধ্যম দরকার। কাগজের উপর কালির আখর টেনে ভাষায় মূর্ত করে তার যন্ত্রণাকে। নিজেকে উজার করে দেয় ডায়েরীর পাতায়।

কমলেন্দু পড়ুয়া ছাত্র। প্রতিদিনই সে রাত জেগে পড়াশোনা করে। বইয়ের পাতায় অনন্তর মন নেই। সে তখন ডায়েরী লেখে।

"আমার জন্য বাড়ির দরজা বন্ধ। আমি দুর্বল, অসংযমী, ইন্দ্রিয় পরায়ণ। আমার গর্ভাধারিনী জননী এই ভাষায় আমাকে তিরস্কার করেছেন। গৈরীকে ডাকিয়ে এনে জেরায় জেরবার করে দিয়েছেন। প্রাকারান্তরে তাকে অপমানই করেছেন। মুখ দেখেননি। রাগে ঘৃণায়। আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারিনি। কি লজ্জা!

আমিও গৈরীকে মুখ দেখাতে পারিনি। তাকে ভর্ৎসনা শুনতে হবে জানলে ডেকে আনতাম না। সে নাকি যাবার সময় টলতে টলতে গেছে। কত দুঃখ বয়ে নিয়ে গেছে বুকে।

কিন্তু এই যে দুঃখ যন্ত্রণা এর পিছনে তো কোনো মহৎ কল্পনা নেই। কোনো কার্যকারণের সম্পর্ক যাতে মানুষের কল্যাণ হতে পারে তাও নেই। এটা নিছক আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অথচ আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। খনি শ্রমিকদের নিত্যকার দুঃখ যন্ত্রণা ভারবাহী পশুর মতো জীবন যাপনের গ্লানি, শোষণ ও নির্যাতনের বলি হয়ে দিনগত পাপক্ষয় করার প্রয়াস বিস্ফোরণের মুখে উড়িয়ে দেবো। তাদেরকে অধিকার সচেতন করবো। স্বাধীন দেশের নাগরিক হবার যোগ্য করে তুলবো।

কিন্তু কি হলো? বড় বড় নেতারা শান্তি চুক্তির আড়ালে বসে শাসকের শাসন দণ্ড দৃঢ়তর করার সুযোগ করে দিলেন। যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা গণ আন্দোলনের রূপ. নিতে পারতো। ভেঙে যেত সাহেব সুবোর কূট চক্রান্ত। এজেণ্ট সাহেবের অহংকার। ঝড়ের মুখে কুটোর মতো উড়ে যেত সভিপ্রসাদের সাধের গোলদারী। শ্যালা সুদখোর।"

মঞ্চস্থ হলো অগ্নিসংস্কার। অভাবনীয় সাফল্য। হাততালি ও অভিনন্দনে ধন্য হলো শিল্পী ও কলা কুশলীরা।

বৈশাখী, কুন্তী ফাল্গুনী ও গৈরী এসেছিল সে অনুষ্ঠান দেখতে। গৈরীর বুকটা ফুলে ফুলে উঠছিল। সে কি গর্ব ওর।

শো শেষ হবার পর কমলেন্দু অনন্তকে ডেকে আনল। তারপর সবাই মিলে মেসে গেল। খাওয়া দাওয়া হৈ-হল্লা হলো। বৈশাখী ও কুন্তী অনেক ঠাট্টা

তামাশা করে যাবার সময় বলল—গৌরী আজ রেতে তুমার কাছে থাক জামাই। না হলে তুমিও ঘুমাতে লারবে। গৌরী তো কেঁদেই মরবে।

কমলেন্দু বলল—বলেছিলাম এই শয্যায় যেন তোমাদের ফুলশয্যা হয়। হলো তো! চিয়ার ইউ।

সেই একটা রাত এল ওদের জীবনে স্বপ্নের রাত।

তারপরই পুজো শুরু হলো। বিশাল মেস বাড়ির একটা ঘরে দুজনের কূজন গুঞ্জন। দুটো দিন কেটে গেল ভালোবাসার আবেশে। দশমীর দিন ওদের নিমন্ত্রণ হলো বিউটির বাংলোতে।

গৌরীর ভিতরে লজ্জা ও ভয়ের গুর গুরানি। কথায় কথায় বিউটি ওর আড়ষ্টতা ভেঙে দিয়ে বলল—এবার তুমি যথার্থই অনন্ত'র বউ হও গৌরী।

চোখ ডাগর করে ও বলল—সে কি দিদি? আমি কি ওর বউ নই?

—তুমি ওর সাতপাকে বাঁধা বউ। কিন্তু দুজনের দুরকম মডেল চলবে কেন? দেহাতিনী বধূর রূপসজ্জায় তুমি যে নিজেকে ছাপামারা করে রেখেছো। এই খোলস ছাড়ো। ছাঁচ বদলাও।

দু'হাতে গোছা গোছা কাঁচের চুড়ি, রূপোর গয়না, লাল ফলের মালা, নাকের নোলক, পায়ের মল, আঙুলের চুটকি, ঘাঘড়ার মতো কুঁচি দিয়ে পরা শাড়ি, ফতুয়ার মতো ব্লাউজ খোলা করিয়ে সাবানের ফেনায় সারা গা ধোলাই করলো। তেল চুকচুকে চুলের বাহারী খোঁপা ভেঙে শ্যাম্পু দিল। এক সেট নূতন শায়া শাড়ি ব্রেসিয়ার ব্লাউজ পরিয়ে হাল্কা প্রসাধন করল। হাতে লোহা শাঁখা, একজোড়া করে সোনার চুড়ি, গলায় শুত এবং কানে রিং পরিয়ে অলংকরণের কাজ শেষ করলো। বিরাট চুলের বোঝা পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করল চালচিত্র। সিঁথিতে গুঁড়ো সিঁদুর ও কপালে টিপ পরিয়ে দাঁড় করালো আয়নার সামনে।

অনন্তকে ডেকে বলল—তোমার বউকে চিনতে পারো?

ও অবাক হয়ে দেখল। বলল—উঃ দিদি! কি করেছো?

—আমি কুমোরের মেয়ে। কেমন একটা প্রতিমা সাজালাম বল তো?

—দারুণ।

—রূপ থাকলেই রূপসী সাজানো যায়। গৌরী তো রূপবহ্নি।

—কিন্তু ওর বন্য সৌন্দর্যটা—

—রূপান্তরের প্রয়োজন আছে। জীবনের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সাজ পোশাকের পরিবর্তন প্রয়োজন। তোমাদিকে ভিন্ন দেখাতো। এবার সমান সমান দেখাবে। সপ্তসুরের তরঙ্গ রাশিতে কোন সুরটি যে কখন মর্মস্পর্শী হয়ে উঠবে তা কে বলতে পারে? না হলে ভ্রষ্টা নারীর অন্তরে এতো স্নেহের প্রস্রবন কোথায় লুকিয়েছিল? নিশ্চয়ই তার জীবন রঙ্গে। সারা কলিয়ারীতে দিদি

বলে ডাকবার মানুষ এই একটিই, বাকী লোকে যে তাকে কি বলে তা তার অজানা নয়। তাহলে সে অনন্ত-গৈরীকে ভালোবাসবে না তো কি?

ওরা সেই ভাবনা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। হঠাৎ গৈরী ওর জামা ধরে টানল। অনন্ত মুখ ফিরিয়ে বলল—কি?

ফিস্ ফিস্ করে ও বলল—চল না—দামোদরে প্রতিমা ভাসান হচ্ছে দেখি গিয়ে।

অনন্ত মুখ টিপে হাসল এবং অ্যাবাউট টার্ন-করে ফরোয়ার্ড মার্চ শুরু করে দিলো। জ্যোৎস্নায় প্লাবিত দামোদরের বালুকাবেলা। দু'পাশে তটভূমিতে ঝাপসা অন্ধকারে ঢাকা গাছ গাছালীগুলোকে মনে হচ্ছে অপার রহস্যময়।

ঢাক বাজছে। প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা হচ্ছে। হাউইবাজী উড়ছে। তারাফুল জ্বলছে। রঙে রঙে ছেয়ে গেছে আকাশ। লাল নীল আলোর বন্যা বইয়ে দিচ্ছে বারুদের ফুলঝুরি।

নীল আলোর ঝলকানি দিচ্ছে ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন। জরুরী কাজ চলছে তিন ও চার নম্বর চানক ও সাইডিংয়ে। ঢাকের বাদ্য ছাপিয়ে উঠছে ঠাঁই ঠাঁই হাতুড়ী পেটার যান্ত্রিক শব্দ।

ঢাকে বাজছে বিসর্জনের বাদ্য। যন্ত্রে বাজছে শিল্প বিপ্লবের বাদ্য। সেও এক বিসর্জনের বাজনা। পুরানো যুগের বিসর্জন।

চারদিন অনবরত কাজ করে পট পরিবর্তন হয়েছে কলিয়ারীর চালচিত্রে।

বিজ্ঞান ও কারিগরী কৌশলই তো যুগান্তরের বার্তা নিয়ে আসে। যে বার্তা—শ্রমিক ছাঁটাই ও মালিকের মুনাফা কামাবার বার্তা। ওয়েল্ডিং মেশিনের নীল আলোতে সে বার্তা পৌছে গেছে সমঝদারের কাছে।

কাল থেকে শুরু হবে নূতন যুগ। তারপর?

নিসর্গের রূপ-রস-গন্ধ ও শব্দে আবেগ জড়ানো অনন্তর চোখ দুটি প্রখর হয়ে উঠল সেই যান্ত্রিক শব্দ ও দৃশ্যের মর্ম বুঝতে পেরে। গৈরীর হাত ধরে দাঁড়াল সেই যুগ সন্ধিক্ষণে।

ডাক দিচ্ছে অনাগত ভবিষ্যৎ।

কাল বয়ে যাচ্ছে নিরয়ণ কালচক্রের অমোঘ নিয়মে।

এ তো সরকারী কয়লাকুঠির সাত ভাতারের বেহুদা কারবার নয়, মালিক জমানার অ্যাকশন প্রোগ্রাম। যেমন তাদের কারিগরী কৌশল তেমনি তোড়জোড়। চারদিন ছুটির মধ্যেই বদলে দিল তিন ও চার নম্বর পিটটপের ভূগোল। আর কয়লার টবগাড়ি উল্টে বেলচা কোদাল দিয়ে ঝাড়াই করার ব্যাপার নেই। মাথায় ঝুড়ি বয়ে ওয়াগন বোঝাইয়েরও কাজ নেই।

নতুন প্রক্রিয়ায় ডুলি থেকে বোঝাই টব গাড়ি বের করে ঠেলে দেওয়া হলো

টিপলারে। ইলেকট্রিক মোটর চালিত টিপলার এক পাক ঘুরে সব কয়লা উগরে দিল নীচের চলমান বেল্ট কনভেয়ারে। সেখান থেকে বাঙ্কার। তারপর স্ক্রিনিং প্ল্যান্ট। স্ল্যাক, রাবল ও স্টিম তিনরকম সাইজে কয়লা ভাগ হলো চালনা দিয়ে। তারপর পড়ল গিয়ে সোজা ওয়াগনে।

কুলি কামিনরা হায় হায় করে উঠলো। একি সর্বনাশ। মেশিনে যদি ওয়াগন বোঝাই হয় তাহলে ওরা কি করবে?

হপ্তা হাজরি শূন্য। চারশো জন ওয়াগন লোডার বেকার। এতদিন যারা গাড়ির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষি ও ঝগড়া বিবাদ করত তারা এক জায়গায় জুটল। অনেক শলা পরামর্শ করল। কোথায় গেল জাতপাতের ক্ষুদ্র স্বার্থ। নিজের রুজি রুটির তাগিদে চরিতরও কিষণকে ধরল। যারা একদিন মংগু সরদারের ধাওড়ায় গিয়ে গুলুকে জাতে পতিত করার দল ভারী করেছিল তারাও বুঝল শিরে সংক্রান্তি কাকে বলে।

মংগু সরদার কোম্পানীর পেয়ারের লোক। চরিতরের যেমন ছেলেমেয়ে, ভাই ভাইপো নিয়ে একটা বড় গোষ্ঠী আছে ওরও তাই আছে। যদিও অতবড় নয়।

ডি. সি. সাহেব তাদেরকে অন্যান্য কাজ দিয়ে খুশী করে দিয়েছেন। মংগুকে করেছেন মুনশী। চরিতরের উপর টেক্কা দিতে আরও যা দরকার করবেন।

কিন্তু তার গোষ্ঠি বহির্ভূত শ্রমিকরা তো বেকার হলো। তারা কেন আসবে না ইউনিয়নের টিকিট কাটতে?

অতঃপর অনন্তকে এসে বসতে হলো ওদের চবুতরায়। মংগু বাদে সব সরদার হাজির।

উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা। কথার পিঠে কথা। খবরের পর খবর। অনন্ত গোটা ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝে নিল।

কথায় কথায় রাত বাড়ছে। এখানে সেখানে পুঞ্জ পুঞ্জভাবে বসে গাঁজার কল্কেও চালাচ্ছে। মদ খাবার পয়সা নেই। না হলে দশ বিশ বোতল এসে যেত।

অনন্ত বলল—কথা তো অনেক হলো। এবার লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়। এতগুলো মানুষের পেটের ভাতের সমস্যা। জান কবুল করেই লড়তে হবে।

—তা তো বটেই। সবাই সমর্থন করল।

—আর বোঝা কমাও বুড়ো বুড়ি, বাচ্চা-কাচ্চা, বে-কামের জানানা দেশে পাঠিয়ে দাও। লড়তে হলে পিছু টান রাখা ঠিক নয়।

শকুন্তলা বলল—কি করতে হবেক তাই বল ভাইটি। যা বলবে তাই করব। ইয়ার মধ্যে তুই তুই নাই। সাহেব খাসভরারা আমাদের লহু চুষে খেঞেছে।

জোয়ান কালে মজা লুটেছে। এখন পেট উপোস দিএ্রে মরি। আমরাও ইয়ার বদলা লিব।

চরিতর যদি বা কিছু সমঝোতার সুযোগ হলে মানতে রাজী হবে। ওরা তা নয়। তিতরে ভিতরে যে তুষের আগুন জ্বলছিল তাই এখন লক্লকে শিখা বিস্তার করছে। শুধু একটা পথ বাৎলে দেওয়া। নেতৃত্ব দিলেই জান কবুল করে লড়ে যাবে।

অনন্ত বলল—সুমিতদা তোমাদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গেছেন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের সঙ্গে। তোমরা কাল আটটার সময় মিছিল করে অফিসে এসো। এজেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। মিটিং করবো। স্মারক পত্র দেব। দরকার হলে পুলিচাকা বন্ধ করবো। তামাম কলিয়ারী বন্ধ। সাইডিংয়ে ওয়াগন বন্ধ। ঠিক হ্যায় ?

—জরুর। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর একসঙ্গে ধ্বনিত হলো।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে। লোকজন চলে যাচ্ছে। অনন্তও যাবার জন্য তৈরি। চরিতরকে বলল—সরদার। আর পিছে হঠার জো নেই। কাল সকালে বেবাক কুলিকামিন নিয়ে অফিসে এসো। আমি চলি।

গৈরী কোন অন্ধকারে বসেছিল কে জানে ? হুস্ করে হাজির হলো।

বেশ ভ্রূকুটি করেই বলল—যাবে কি রকম ? খেয়ে যাও।

অনন্ত ওদের জামাই। চবুতরাতে বসে ইউনিয়নের মিটিং করে চলে যাবে এটা হতে পারে না। হাত ধরে টেনে নিয়ে এল। গুলুর বারান্দাতেই বসতে দিল। শুরু হলো প্রণাম। কত যে ছেলে মেয়ে ওকে প্রণাম করে গেল তার সংখ্যা নেই। তারপর গান। অনন্তর কি সাধ্য তার অর্থ বোঝে।

মস্ত বড় কাঁসার থালায় ফুর ফুরে ভাত। মুরগির মাংস। ডাল তরকারি। নানা রকম ভাজাভুজি। ওকে চারিদিক থেকে ঘিরে বসেছে কতকগুলো বৌ-ঝি। বয়সে যুবতী। গা-ভর্তি রুপোর গহনা। মাজা ঘষা রঙ। কে বলবে এই মেয়েগুলি কয়লার ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ওয়াগন বোঝাই করে। যদি চাকরি থাকতো তাহলে আরো কত না আমোদ স্ফূর্তি করতো।

কথা অনেক হলো। হাসি ঠাট্টাও কম নয়। অনন্ত খেয়ে দেয়ে হাত ধুলো। ওদের বড় ভোজী বৈশাখী এক প্যাকেট সিগারেট ও একটি দেশলাই এগিয়ে দিলো।

অনন্ত বলল—ও বাব্বা। আয়োজনের কিছু ত্রুটি নেই ভোজী।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে বলল এবার তাহলে ছুটি দাও। আমি চলি।

বৈশাখী বলল—যাবে কেন জামাই ? হুনিয়া ঘরে ভাত খেয়েছো, হুনিয়ার

বিটি নিয়েছো। আর কি তোমার জাত আছে? রাতটা মুনিয়া ঘরে থাকলে নতুন কি ক্ষতি হবে? বরং কিছু পাওনা হবে।

ইঙ্গিত পূর্ণ ভঙ্গীতে গৈরীর দিকে তাকাল। অনন্তের বুকের ভিতরটা ছলাৎ করে উঠল। বড় কোমল জায়গায় ঠোকা দিয়েছে ভোজী। মুনিয়া ধাওড়ায় জামাই হবার যেটুকু বাকী ছিল তাও সেদিন পুরো হয়ে গেল।

সুমিতবাবু সাসপেণ্ড হয়ে গেলেন। সেদিন যে মিছিল সমাবেশ হলো তাতে উনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাই কর্তব্যে অবহেলা, বে-আইনী জন সমাবেশ, কোম্পানীর বিরুদ্ধে উস্কানি মূলক ভাষণ ও জনতাকে ক্ষিপ্ত করে কর্মাধ্যক্ষের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে অপমান করা ও দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা—ইত্যাদি অভিযোগ ছিল চার্জশিটে।

তার চেয়েও বেশি দুশ্চিন্তার কারণ ঘটল স্বপ্নার বাড়িতে। ওর বাবা যা-তা অপমান করলেন ওদের দুজনকেই। স্বপ্নার তা সহ্য হলো না। রাতটা ফুরোতে যা দেরি। সকালেই সে সুটকেস হাতে মেসেই চলে এল।

ব্যস। আবার কি? বেজে গেল বিয়ের বাজনা। অনন্ত গৈরীর মতো ওদেরও বিয়ে হলো কল্যাণেশ্বরীতে।

সেই একটা সময়। খনি শ্রমিকদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ। ছোট বড় সব কোল কোম্পানীর মালিক, ম্যানেজার, ডাইরেক্টার ও চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারদের চোখের ঘুম চলে গেছে। তামাম খনি অঞ্চল জুড়ে শ্রমিক আন্দোলন।

তার মোকাবিলার জন্য নিত্যনূতন দমনমূলক ব্যবস্থা। শ্রমিক ঐক্য ভেঙে চুরমার করার নানাবিধ কৌশল। ষড়যন্ত্র। ইতঃস্তত মারদাঙ্গা, খুন খারাবী, নারীধর্ষণ চলছে। চাকরীতে জবাব তো মামুলি ব্যাপার। ইউনিয়নের কর্মীদিকে জীবন হাতে নিয়ে কাজ করতে হতো। মালিকের ভাড়াটিয়া গুণ্ডা কখন যে ছোবল মারবে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

এই বিভীষিকার মধ্যে কাজ করে যায় সুমিত, স্বপ্না, অনন্ত, গৈরী, গুরুনাম সিং, কৃপাল সিং, রামধনি, এতোয়ারী, হরিহর গান্ধী, তিলক সিং, রাম স্বরূপ, জগদীশ, চরিতর, শম্ভু, শকুন্তলা, ফুলমণির দল।

আন্দোলনের ঢেউ লোকসভাকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। বাম দক্ষিণ সব দলীয় নেতারা খনি শ্রমিকদের প্রতি দমন নীতির কথা পুনঃ পুনঃ লোকসভায় আলোচনার মধ্যে টেনে এনেছিলেন। বহুবিধ প্রশ্নোত্তর হয়ে গেছে ও হচ্ছে! শ্রম মন্ত্রক সুবিচারের আশ্বাস দিয়েছেন।

স্বয়ং নেহেরুজী বলেছেন খনি শ্রমিকদের আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত। তাদের উপর দমন পীড়ন চলছে। সরকার তা সমর্থন করে না।

ট্রাইবুন্যাল বসেছে। নানা দাবি দাওয়ার সঙ্গে চাকরীর স্থায়িত্বের জন্য শ্রমিক

নেতারা জোর দাবি তুলেছেন। শুনানী চলছে। প্রায় শেষ পর্বে এসে গেছে। জাজমেণ্টের জন্য সবাই অপেক্ষা করছেন।

আবার শ্রমিকদের একটা অংশের মরসুমী স্বভাব ধর্মও ছিল। তারা সব ক্যাজুয়াল লেবার। চাষবাস ধানকাটার সময় দেশে চলে যেত। ফাল্গুন ও বৈশাখে বিয়ের লগন। পৌষমাসে বাঁদনা পরব। নিত্য নূতন শ্রমিকের দল আসত ও চলে যেত।

ইউনিয়ন নূতন শ্রমিক ঢোকার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। সভিপ্রসাদের মতো গোমস্তা তার দালাল, আড়কাঠি, সরদাররা হাজার চেষ্টাতেও তা পেরে উঠছিল না। ফলত শ্রমিকের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। এই ঘাটতিটা পূরণ করতে না পারলে প্রোডাকশন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। তাই প্রায় সব কলিয়ারীতেই প্রোডাকসন নিম্নমুখী ছিল। অশান্তি শুরু হলে তার জের মিটতে চায় না। আর তার প্রথম ধাক্কাটা প্রোডাকসনেই পড়ে।

ওয়াগন লোডারদের বিনা নোটিশে ছাঁটাই নিয়ে পর পর কয়েকটা মিটিংয়ে কোনো ফল হয়নি। সর্বশেষ মিটিংয়ে সি এম এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন পুরুষদিকে খাদে কয়লা লোডারদের কাজ দেওয়া যেতে পারে। মেয়েদিকে কাজ দেওয়া সম্ভব নয়।

নীতিগত কারণেই ইউনিয়ন সে প্রস্তাবে রাজী হয়নি। কারণ তাতে মালিকের স্বার্থটাই পূরণ হবে। শ্রমিকদের লাভ নেই। পুরুষরা তো যে কোনো কাজ করতে পারে। কোম্পানীরও খাদে লোডারের দরকার। মেয়েদের কি হবে?

তাছাড়া এমন মেয়ের সংখ্যা অনেক যাদের পুরুষ নেই। মেয়েরা নিজের রোজগারে ছেলেপুলে মানুষ করছে।

শকুন্তলা ফুলমণিরই সেই দশা। কোন যৌবনকালে তারা স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছে। অথচ স্বামীর দেওয়া সন্তানগুলি তাদের ঘাড়ে চড়ে আছে। তাদেরকে তো তাড়িয়ে দিতে পারে না। বাপে তো ছেড়ে দিয়ে পার পেয়ে গেছে। মায়ে কি ছাড়তে পারে?

তাছাড়া সব সন্তান যে একই স্বামীর প্যায়দা তাও নয়। বিয়ের পর স্যাঙ্গা তারপর আবার স্যাঙ্গা। এক পুরুষ ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাস-এসব তো আছেই। সেজন্য দায়ী হতে পারে স্বভাব ধর্ম অথবা দায়ে পড়ে। যৌবন কালে তাদের যৌবন লুটবার রসিক তো কম ছিল না। এসব সামাজিক সমস্যা। অন্যায় ও অবিচারের শিকার।

ইউনিয়ন তাদেরকে ফেলে দিতে পারে না। নাকের বদলে নরুণ নিয়ে আন্দোলনের ধারও কমিয়ে দিতে পারে না। যত বেকার হবে ততই তো তাদের দল পুষ্ট হবে। শুধু পুরুষদের চাকরীটা মেনে নিলে যারা চাকরী ফিরে পাবে

তাদের দীর্ঘদিন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করার পর পেটে ভাত পড়লেই ঢিলে হয়ে যাবে। আর কি তাদের লড়াইয়ের জোর থাকবে ?

কাজেই ইউনিয়ন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।

এজেণ্ট সাহেব প্রচার স্বরু করে দিলেন শ্রমিক নেতাদের অনমনীয় মনোভাবের জন্য আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে অনন্ত খুব দুঃখিত। মুনিয়া ধাওড়ায় তার নিত্য যাতায়াত। সেখানকার দারিদ্র্য সে নিজের চোখে দেখছে।

অন্যের কথা কি বলবে ? চরিতরের বউ বিটিদের গা থেকে গয়না খসে পড়ছে। যে বৈশাখী, কুন্তীর গায়ে সেরের ওজনে রূপোর গয়না দুলত তাদের গলা কোমর ফাঁকা হয়ে গেছে। টস্ টসে মুখগুলো শুকিয়ে আমশি। ফাল্গুনী গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেয়।

এই মেয়েগুলির প্রতি অনন্তর একটা দুর্বলতা গড়ে উঠেছে। হওয়াই স্বাভাবিক। ফাল্গুনী গৈরীর সহেলী। ওরা দুজন বৌদি। বৈশাখীর দুটি ছেলে। স্বভাবটি সরল কোমল। গৈরীকে স্নেহ করে। সেই কারণে অনন্তর প্রতিও একটা টান পড়ে গেছে। আর এই অন্তরের সম্পর্কটি এমন মধুর এত আকর্ষণীয় যে তা এক তরফা হয় না। ওদের যদি অনন্তর প্রতি টান থাকে তবে অনন্তর কেন থাকবে না ?

সে ভাবে ওদের যদি আবার চাকরী হয় তবে কত না খুশী হবে। আবার ওদের মুখে কোমল লাবণ্যের ছোঁয়া লাগবে। সোহাগে আদরে স্বামীর অন্তর ভরিয়ে দেবে।

এই সব মেয়ের জাতই আলাদা। এদের আন্তরিকতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

শীতের ভোর। ধোঁয়া ও কুয়াশায় ঢাকা রাত্রির অন্ধকার সবে মাত্র ফিকে হয়ে আসছে। রেলের পাইলট ইঞ্জিন পঁচিশটি খালি ওয়াগন নিয়ে কলিয়ারী ঢুকবার মুখে ফাটকবাজারের কাছে এসে থেমে গেল। ঘন ঘন সিটি মারতে লাগল।

রেল লাইনের উপর বড় বড় কাঠ ও পাথর দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে প্রায় দু'তিনশো পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক লাইনের উপর বসে আছে। দু'তিনটি ভাটার মতো আগুন জ্বলছে। রেল লাইনের আড়াআড়ি এক সারি পতাকা উড়ছে। শ্রমিকরা শ্লোগান দিচ্ছে—পাইলট ইঞ্জিন ফিরে যাও।

দূর থেকে এসব দেখেই ইঞ্জিনের চালক দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

জগদীশ, হরেরাম, রামধনি, গুরুনাম সিংয়ের দল টপাটপ ইঞ্জিনে উঠে ইঞ্জিন ড্রাইভার ও খালাসীকে টেনে নামিয়ে দিল। ওদিকে শম্ভু বাউরীর দল গার্ড সাহেবকেও নামিয়ে দিয়েছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেল। লোকজনের ছুটোছুটি। ম্যানেজার এজেন্টের ঘন ঘন টেলিফোন। পুলিশ, রেলওয়ে সবদিকে খবর টেলিফোন বাজছে হ্যালো হ্যালো—

অনন্ত মেসে ঘুমোচ্ছিল। একজন ওয়াগন লোডার তাকে খবর দিয়ে গেল। সে আবার সুমিতবাবুকে উঠিয়ে ভোরের ওয়াগন অবরোধের সংবাদ দিয়ে বলল—দাদা। এরা তো বেশ মুস্কিল করে ফেলেছে।

উনি বললেন—মুস্কিলের কি আছে? শ্রমিকরা যখন নিজেই অগ্রণী হয়ে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে তখন আমাদের কর্তব্য তাদের সামনে দাঁড়ানো। তুই স্পটে চলে যা। আমি যাচ্ছি।

অনন্ত ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে দেখল মুনিয়া ধাওড়ার সব কুলিকামিন সেখানে মজুত। তাছাড়াও অন্যান্য ধাওড়ার কুলিকামিনরাও এসে জুটেছে এবং আরো আসছে।

গৈরীর হাতে একটা পতাকা। সে রীতিমতো উত্তেজিত।

এক হাত কোমরে। ডান পা-টা সামনে বাড়ানো। মুখটা টক টক করছে। ঠোঁট দুটো ফুলছে। যেন চিৎকার করে কিছু বলতে চাইছে এমনি ভঙ্গী।

অনন্তকে দেখে থমকে গেল। মুখটা ঘুরিয়ে নিল ওর দিক থেকে। স্বভাববশত কোমর থেকে হাতটা তুলে মাথার ঘোমটা সরাল। ওর মুখে না ফুটল আপ্যায়নের হাসি—না একটি কথা।

অনন্তর কি রকম নতুন নতুন লাগল ওকে। নাম ধরে ডাকল—গৈরী!

মুখ ঘুরিয়ে বলল—কি?

ওর কণ্ঠস্বরের রুক্ষতায় অনন্ত আর একবার চমকাল।

বলল—এ তোরা কি করেছিস রে?

—কি আবার? দেখতে পাচ্ছো না?

—এতসব করবার আগে আমাকে তো বলতে হতো!

—বলবো আবার কি?

—বলবি না?

—না। তোমরা হচ্ছো গান্ধীবাবার শিষ্য। শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমরা আর শান্তি শান্তি করে উপোস দিতে পারবো না।

—কিন্তু এর পরিণাম জানিস?

—জানি তোমার যদি ভয় লাগছে তবে এই নাও চুড়ি পরে মেসে বসে কবিতা লিখো গে। বড় বড় বিস্ফোরক কবিতা।

হাত থেকে একটা চুড়ি খুলে নাচাল। ওর পাশে দিদি-বৌদি শ্রেণীর কয়েকটি মেয়ে মুখ টিপে হাসল। অনন্তর মাথায় রাগ চড়ে গেল। গৈরীর হাত

থেকে জোর করে পতাকাটা নিয়ে তুলে ধরে শ্লোগান দিল—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ।

শ্লোগানের ধ্বনিতে উথাল পাথাল জন সমাবেশ।

সুমিতবাবু, তিলক সিং, হরিহর গান্ধী প্রমুখ নেতারাও এসে হাজির হলেন। কোথা থেকে মাইক নিয়ে এল একজন। শুরু হলো ভাষণ।

ব্যস। হটযোগে হট আন্দোলন লাগু হয়ে গেল।

গোবিন গান ধরল—

মেরে মাঙ্ পুরা করো!
না হ্যায় মেহেরবাণী
না হ্যায় জুলুমজারী
হকিকৎ হ্যায় হামারী।

সুরটা গরম। বোল তার চেয়েও। গোবিন যেন চারণ কবি। এই গোবিনকেও নতুন করে চিনল ওরা।

ওয়াগন অবরোধ আন্দোলনের শুরুটা গা-জোয়ারী হলেও পরে নেতারা এসে সেটাকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের রূপ দিয়েছিল। রেল লাইনের উপর বসে ভাষণ-শ্লোগান, গণ জাগরণের গান ইত্যাদিতে হিংসার ভাবটা কাটিয়ে উঠেছিল।

তখন এল পুলিশ। পর পর দু ভ্যান। দুজন অফিসার ও জনদশেক পুলিশ সোজা সেখানে এসেই নেতাদিকে গ্রেপ্তার শুরু করে দিলেন। সুমিতবাবু তেমন কিছু বাধা দেননি। কিন্তু অনন্ত রুখে দাঁড়াল। সরাসরি অফিসারকে চ্যালেঞ্জ করে বলল—কোন আইনে আপনি আমাদের গ্রেপ্তার করবেন?

উনি বললেন—থানায় চলুন। আইনটা বুঝিয়ে দেবো।

—না। যাবো না।

অন্য অফিসারটি বলল—তোর বাপ যাবে।

অনন্তর ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। সপাটে একটি চড় বসাল অফিসারের গালে। বলল—খবরদার। বাপ তুলে কথা বলবে না।

ওর কথা শেষ হলো না। একজন পুলিশ মাথায় লাঠি মারল। দুজন ওকে চ্যাঙদোলা করে তুলে ভ্যানে চড়িয়ে দিলো।

গোবিন চিৎকার করে উঠল—মারো শ্যালে পুলিশকো।

শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি লড়াই। লাঠি চার্জ।

গৌরী অনন্তকে ধরে নিয়ে যেতে দেখে ভ্যানের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। জগদীশ ওর রাস্তা আটকে বলল—মৎ যা। জলদি হিঁয়াসে ভাগ। সব জানানা হঠো।

তারপরই সে হুঙ্কার দিলো—সারে জানানা ভাগ যাও।

গৌরী ওর কথাটা এক পলকেই বুঝে নিল। তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে দৌড়াল।

অন্যান্য মেয়েরাও এদিক ওদিক ছুটে পালিয়ে গেল। কেউ কেউ লাইন ধারে দাঁড়িয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে লাগল।

সে এক ভীষণ বিশৃঙ্খল অবস্থা। মারদাঙ্গা, ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি। উভয় পক্ষের জখমী জোয়ান মাটিতে পড়ছে। রক্ত বইছে। তালেগোলে সভিপ্রসাদের লোকজন দাঙ্গা লড়তে নেমে পড়েছে। ছট্টু সিং, লট্টু সিং ফরি খেলে বেড়াচ্ছে।

ঢিল পড়ছে অবিরল ধারায়। রেল লাইন বরাবর শ্রমিকদের দখলদারী। ঢিল তো হাতের কাছেই। জনকয়েক পুলিশ ঘায়েল হয়ে গেল।

কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের মাথায় যখন ঢিল লাগল তখন তিনি ফায়ারিং অর্ডার দিলেন।

এক রাউণ্ড, দু রাউণ্ড, তিন রাউণ্ড।

গুলি চলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা যে যেদিকে পারল দৌড় শুরু করল। পড়ি কি মরি দৌড়ে কতলোক হোঁচট খেয়ে পড়ল। কতক গুলি খেয়ে পড়ল।

ফাটকবাজার ছত্রখান। আহত শ্রমিকদের রক্তে ভেসে পথের ধুলো ভিজে গেল।

আর বুকে বুলেট নিয়ে পড়ল গোবিন। চরিতর সরদারের ভাই। এক মহৎ সঙ্গীত শিল্পী। যার রামধুন শুনলে শ্রোতারা রোমাঞ্চিত হতো।

এদিক সেদিক আহত ও গুরুতর আহত মানুষের আর্ত চিৎকার ও রক্তপাতে বোঝা যাচ্ছিল না কে মরল বা কে বাঁচল। তারই মধ্যে পড়ে গোবিন আর্তনাদ করে বলল দুনিয়ার শ্রমিক জিন্দাবাদ।

আসামী বোঝাই করা পুলিশের ভ্যানটা তখন রাস্তার উপর ছুটে যাচ্ছিল। তারা শুধু গুলির শব্দই শুনল আর কিছু বুঝতে পারল না। ভাবলো ফাঁকা আওয়াজ।

কিন্তু অনন্তের মনে কু ডেকে উঠলো। তার গর্ভিণী স্ত্রীকে ঝাণ্ডা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এসেছে।

মাত্র তিন চার মিনিটের মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেল। গালমন্দ, উত্তেজনা তো চলছিলই। সেসব গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। শ্রমিকরা বোধ হয় ভেবেছিল রগড়টা এইভাবেই চলবে।

রেল লাইনের পাথর তুলে ঢিল মারা শুরু হলে ওরা ভাবল বুঝি বা পুসিশকে আটকে দিতে পারবে। কিন্তু পরিণামে যে গুলি চলবে এটা কেউ ভাবতেই পারেনি।

যাদের চোট ঘাট ছোট খাটো তারা তো নিজেদিকে টেনে হিঁচড়ে ধাওড়ায় ঢুকে গেছে। যারা উঠতে পারেনি তাদেরকে পুলিশ উঠিয়ে গাড়িতে চড়াচ্ছে।

গোবিনের তখনো প্রাণ আছে। রেল লাইনের পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে হাত

দিয়ে এমন মাটি আঁচড়েছে যে সেখানে গর্ত হয়ে গেছে। জন দুই পুলিশ ওকে ওঠাবার জন্য সেখানে গিয়ে ওর ইন্তেকাল দেখে থমকে গেছে।

তখনই অসম সাহসে ভর করে গৈরী ও ফাল্গুনী ছুটে এসে গোবিনের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

গৈরী ঝন্ ঝন্ করে বলল—ক্যায়া দেখতা হ্যায়। গোলী মে কলিজা ফোড় দেকর অ্যারেস্ট করনে আয়া।

গৈরীকে আগে আসতে দেখে আরো দশটি মুনিয়া মেয়ে আগে পিছে ছুটে এল। দেখতে দেখতে আরো।

পুলিশ দুজন সেখান থেকে সরে গিয়ে তাদের অফিসারকে খবর দিলো। ওঁরা গা করলেন না। যে কজনকে ভ্যানে তোলা হয়েছে তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানো, রেল লাইনের অবরোধ সরিয়ে তা চালু করা, খালি ওয়াগন নিয়ে পাইলট ইঞ্জিনকে সাইডিংয়ে পাঠানো ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত।

ঘটনার বিবরণ, মারমুখী শ্রমিকের হাতে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের আঘাতের বিবরণ এবং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি চালানোর ব্যাপারটাকে লাগসই করে রিপোর্ট লেখা ইত্যাদির জন্য অনেক মাথা খাটাবার, বুদ্ধি খরচ করবার প্রয়োজন তাই হতভাগ্য গোবিনের মুমূর্ষু অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর নেই।

মুনিয়া মেয়েরাই ওকে খাটে চড়িয়ে ধাওড়ায় নিয়ে গেল তখন সেটা একটা লাশ। গুলি খেয়ে পড়বার সময়ও জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়েছিল। তারপর নিথর।

আরো দুর্দৈব গোবিনের লাশ সৎকারের জন্য মুনিয়া ধাওড়ায় একটাও পুরুষ মানুষ নেই। পুলিশ ধাওড়ায় ঢুকে গেছে এবং যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরে ভ্যানে তুলছে। সেজন্য সবাই ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

গৈরী পটর পটর করে দুটো কথা বলেছিল বলে একজন অফিসার ওর গালে চড় বসিয়ে কাঁচা খিস্তি করে বললেন, আর বেশী বাৎ করবি তো আখাম্বা মরদ লেলিয়ে দেবো তোকে রেপ করতে। এমন লাথি মারবো যে পেট খসে বাচ্চা বেরুবে। তোর লীডার ভাতারকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো।

সে সব শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। গৈরীর ভাই দুটি বড় হয়েছে। ওরাই গৈরীকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিলো। জানে যে তাদের দিদি কারো কথা হজম করে থাকবার মেয়ে নয়। পাল্টা জবাব দেবেই। তখন আবার কি হবে কে জানে?

গৈরীও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। চড় খেয়েই আক্কেল গুড়ুম। একটাও পুরুষ মানুষ নেই। এক পাল মেয়ে হাউ মাউ করে কাঁদছে। এক গাদা বাচ্চা কাচ্চা ভয়ে পালাচ্ছে। হামা টানা বাচ্চা নর্দমায় পড়ে কঁকাচ্ছে।

নেহাত সুরেশ ও মহেশ মায়ের পেটের ভাই তাই ওকে ছেড়ে যায়নি। কিন্তু ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। এ অবস্থায় প্রতিবাদের কণ্ঠ চুপসে যেতে বাধ্য।

আর একদল পুলিশ রামধনির ধাওড়ায় ঢুকে বাসমতীকে বেইজ্জত শুরু করে দিয়েছে।

এতোয়ারী সরদারের বড় ধাওড়ার পাশে একটু তফাতে ওর এক কামরার মাটির ঘর। যে দুজন পুলিশ রামধনির তালাশ করতে ওখানে ঢুকেছিল তারা একা বাসমতীকে দেখে লোভে পাগল হয়ে গেল।

সে বেচারী আটমাস পোয়াতী। নিজের শরীর নিয়ে সশব্যস্ত। তারপর এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পুলিশ, লাঠি, গুলি, রক্ত দেখে ভয়ে কাঠ। হঠাৎ দু'দুটো মরদ তাকে ধরে যেরকম লপটা লপটি, কাপড় টানাটানি শুরু করল যে প্রথমটায় একেবারে হকচকিয়ে গেল। নারীর সহজাত প্রতিরোধ প্রবণতায় নিজেকে ছাড়াবার ও কাপড় চোপড়ের আবরণ যাতে খুলতে না পারে সেজন্য মরণ পণ লড়াই করছিল। কিন্তু যখন বুঝতে পারল যে মারধাক্কা দিয়ে তাকে শায়েস্তা করার চেয়ে তাকে ধর্ষণ করার জন্যই ওরা তৎপর তখন সে এমন মরীয়া হয়ে উঠল যে কাপড় চোপড়, লজ্জা শরম সব ত্যাগ করে বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

ওর ছেঁড়া খোঁড়া শাড়ি রইল পুলিশের হাতে আর ও দিগম্বরী হয়ে দৌড়াল পথে। পুলিশও তৎক্ষণাৎ পিছু ধাওয়া করল আর সভিপ্রসাদের মিলিটারী জেনারেল ছট্টু সিং ওকে প্রায় ধরেই ফেলল।

কিন্তু কোথা থেকে কিভাবে যে একটা বল্লম এসে ছট্টু সিংয়ের পেটে গেঁথে গেল তা কেউ বুঝতেই পারল না। দুজন হতভম্ব হয়ে দেখল দিগম্বরী বাসমতী ছুটে গিয়ে একটা ধাওড়ায় ঢুকে পড়ল আর পেটে গাঁথা বল্লম নিয়ে ছট্টু সিং দুটো পাক খেয়ে জ্যান্তব আর্তনাদে সারা ধাওড়া কাঁপিয়ে পড়ে গেল।

এদিক ওদিক গলিঘুঁজি, চালে চালে ঠেসাঠেসি ঘন বসতির ধাওড়ায় কোথায় যে কে ঘাপটি মেরে বসেছিল কে জানে? পুলিশ অফিসাররা ছুটে এসে সারা ধাওড়া ঘেরাও করার হুকুম দিলেন। ধাওড়ায় তখন তুমুল শোরগোল। পূর্ণগর্ভা বাসমতীর উদোম হয়ে ছুটে পালাবার দৃশ্যটাই নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবারই রক্ত গরম করে দিয়েছিল।

পুলিশের গুষ্টির শ্রাদ্ধ করে গালি দিতে দিতে কাতারে কাতারে বেরিয়ে এল সব। ধাওড়া ঘেরাও করে আর কি করবেন? এদের সামনে দাঁড়ানোই দায়। তাহলে আবার গুলি চালাতে হয়। মৃতদেহের পাহাড় বানিয়ে দিতে হয়। অত ক্ষমতা ওদের নেই। পুলিশকে ধাওড়া ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে হলো।

গোবিনের লাশ আনবার জন্য তবু তো একদল মেয়ে ছিল। নিজের বউ, বিটিয়া ছিল। অশ্রুনদীর বন্যা বয়েছিল। এখনো চলছে কান্নার ঢেউ। কিন্তু ছট্টু সিংয়ের লাশ ওঠাবার একটা লোকও নেই।

আর্তনাদ করতে করতে এক সময় সে মারা গেল। সেখানকার মাটি রক্তে, জলে, মল মূত্রে ভরে গেল। অবশেষে তার নিথর দেহ কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল।

মানুষের জীবন নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলত এইভাবেই তার জীবনের সমাপ্তি ঘটল। এও বুঝি প্রকৃতির প্রতিশোধ।

বিকেল নাগাদ কলিয়ারীর অফিস পুলিশ অফিসার, কোল কোম্পানীর অফিসার ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতায় ভরে গেল। সারা কলিয়ারীতে তখন ১৪৪ ধারা জারি হয়ে গেছে। তারই মধ্যে গৈরী ও বাসবতী এসে নিজেদের প্রতি অত্যাচারগুলির মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়ে গেছে।

গোবিনের মৃতদেহ তখনো পোড়ানো হয়নি। নেতারা এসে মালা দিয়েছেন। শোকসভা করেছেন। গোবিনের মতো একজন সঙ্গীত সাধকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে শ্রমিকদিগকে শপথ নিতে বলেছেন—যে সংগ্রামের জন্য গোবিন আজ শহীদ হলো তার আত্মার শান্তির জন্য সংগ্রামের দীপশিখা যেন অনির্বাণ থাকে—এমনি সব বড় বড় কথা।

গোবিনকে ভালোবাসে না এমন মানুষ ক্বচিৎ, এমন কি মিঃ ভার্মার মতো অতবড় অফিসারও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ছেলেমেয়েরা তো গোবিন চাচা বলতে অজ্ঞান। বড়রাও তার শোকে বিহ্বল। দূর থেকে লোক আসছে ওকে শেষবারের মতো দেখতে। ওর গানের গুণগ্রাহী তো কম ছিল না।

নেতারা এসে যাবার পর পুলিশ অফিসাররাও আশ্বাস দিয়েছেন যে যারা দাঙ্গা হাঙ্গামার সঙ্গে জড়িত নয় তাদেরকে ধরপাকর করা হবে না।

তারপর থেকে দুনিয়া পাড়ার মুরুব্বিরা একে একে ফিরতে শুরু করেছে। চরিতর ও কিষণ গোবিনের খাটের বাজু ধরে বসে আছে। প্রাণের ভাই আজ চলে গেল তাদেরকে ছেড়ে। শোক দুঃখের কথা কি বলতে আছে? বোবা হয়ে গেছে।

বেশী বয়সে বিয়ে করেছিল বলে গোবিনের বউয়ের বয়সটা কম। ফাল্গুনী ওর বড় মেয়ে। গৈরীর চেয়ে বছর খানেকের বড়। আরো চারটি অপোগণ্ড আছে। একটি ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সে জামাইটি সুরেশের মতো। মৃত শ্বশুরের ধারে পাশে ঘুর ঘুর করছে। বড় জামাই আসতে পারেনি কারণ সেও ঢিল ছোড়ার দলে ছিল এবং গুলিতে চোটও খেয়েছে। জগদীশ ওকে লুকিয়ে রেখেছে। ফাল্গুনী কেঁদে কেঁদে হাপসে গেছে।

ঘরে হাঁড়ি চড়েনি। কারো পেটে দানাপানি পড়েনি। এমন কি বাচ্চা কাচ্চাদের মুখেও এক বাটি ফেন ভাত ওঠেনি। কি যে দুঃসময় তার বুঝি পরিমাপ হয় না।

এমনি করেই সন্ধ্যা নামল।

পুলিশও ধাওড়া ঘেরাও করার প্রহরা তুলে নিয়ে শুধু রেললাইন বরাবর মোতায়েন আছে। পাইলট ইঞ্জিন খালি ওয়াগন সাইডিংয়ে দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বোঝাই হয়নি। কারণ গুলী চলার পর থেকেই খাদ বন্ধ। চারবাজা পালিতেও কোনো শ্রমিক খাদে নামেনি। এও একরকমের অঘোষিত ধর্মঘট। তা ভাঙবার জন্য কোম্পানীর তরফ থেকে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কারণ পর পর দুটি হত্যাকাণ্ড, কমপক্ষে পনেরোজনের গুরুতর আঘাত এবং স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তার সামাল দেওয়াই দায় হয়ে পড়েছে।

নেতারা তো কেউ বসে নেই। তাঁরা চীফ মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার, লেবার মিনিস্টার এমন কি প্রাইম মিনিস্টারকেও টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। টেলিফোন তো হচ্ছেই। সন্ধ্যার খবরে রেডিওতে এ খবর প্রচারিত হয়েছে। কাজেই গুরুত্ব কম নেই।

রাত বারোটার পর গোবিনের লাশ পোড়াতে নিয়ে গেল। এত দেরি হবার কারণ মুনিয়া ছেলেদের জন্য প্রতীক্ষা। বিশেষ করে জগদীশ ও হরেরামের। সবদিক যখন শুনশান হলো, পুলিশের বুটের শব্দ স্তিমিত হয়ে এল তখন ওরা আত্মপ্রকাশ করল।

এ জগতে নিরপরাধ মানুষগুলিরই শাস্তি হয়। গোবিন তার সঙ্গীত সাধনা নিয়ে এতই মগ্ন থাকতো যে এসব আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল না। তবু সে মানুষ। নিজের জ্ঞাতি কুটুম্বের দিনের পর দিন অনাহার অর্ধাহারে ব্যথিত হয়েছিল বৈকী। না হলে যাবে কেন?

তাই সে শহীদ হলো।

—তার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

ক্রোধ, হিংসা ও প্রতিহিংসার চাপান উতোর চলছে শ্রমিক, মালিক ও নেতাদের মধ্যে। বিশেষ করে পুলিশের হাজতে যে পঁচিশ ত্রিশজন শ্রমিক ও নেতা পচে মরছে তাদের উপরে আক্রোশ পড়েছে বেশী।

একটা গোয়াল ঘরের মতোন নোংরা কাদা প্যাচ প্যাচে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। খেতে তো দেয়নি। পেচ্ছাপ পায়খানা করারও জায়গা নেই। সুমিতবাবু প্রতিবাদ করতে গিয়ে রুলের গুতো খেয়েছেন।

তারপর বিকেল বেলায় অনন্তকে আলাদা করে ডেকে নিল। কারণ তার বউয়েরই গলা বড়। সেই ইনিয়ে বিনিয়ে পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী বলেছে। আর সে পুলিশ অফিসারকে চড় মেরেছে।

আবার যে মুনিয়াদের কাছ থেকে ওয়াগন অবরোধ শুরু হয়েছে তাদেরই জামাই অনন্ত। কাজেই সেই যেন সব কিছুর হোতা, উদ্গাতা এবং নান্দীকার এমনি একটা ধারণা জন্মে গেছে থানার বড় বাবুর। অনন্ত গৈরীর নারী নক্ষত্র

ওর জানা। কোম্পানীর সঙ্গে বহুত দহরম মহরম। কত যে মাল খেয়েছে কে জানে অনন্তকে নিজের হাতে পেটাতে লাগল।

আঙ্কিক নিয়মের হিসেব করা মার। শরীরের গাঁঠে গাঁঠে হাড়ে মজ্জায় অসহ্য যন্ত্রণা। মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তখন একটা ঘুপচি ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিলো।

সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি খনি শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা তাঁর কাছে আবেদন রেখেছিলেন খনি শ্রমিকদের উপর যে নিত্যনতুন অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই যাচ্ছে তার সুরাহা করার জন্য।

আই. এন. টি. ইউ. সি., এ. আই. টি. ইউ. সি., পি. এস. পি., খনি মজদুর ইউনিয়ন প্রভৃতি ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বিধানসভা ও লোকসভাতেও কয়লা অঞ্চলে অত্যাচারের কথা তুলে ধরতেন।

দামুলিয়া কলিয়ারীতে পুলিশের গুলিচালনা, তা থেকে উদ্ভূত ঘটনাবলী মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোয় তিনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অহেতুক কাউকে জেল হাজতে যেন আটকে রাখা না হয়। খনি শ্রমিকদের আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত। যতক্ষণ না হিংসার আকার নেয় ততক্ষণ যেন পুলিশী জুলুম না হয়।

হাজতবাসী শ্রমিক নেতারা ওতেই ছাড়া পেয়ে গেল। কোর্ট ওদেরকে জামিন দিয়ে দিলেন। অবশ্য এর আগেও আদালতে জামিনের আবেদন মঞ্জুর হতো। সদাশয় বিচারকদের সহানুভূতি শ্রমিকদের উপর ছিল।

ইউনিয়নের কর্মীরা সেদিন ট্রাক ভাড়া করে ওদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে কলিয়ারীতে ফিরে এল।

অনন্ত এত মার খেয়েছে যে তখনো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। মেন রাস্তা থেকেই কুলিকামিনের ভিড়। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে ফুল নিয়ে। ট্রাকটা আস্তে চলছে। তাতে ওরা ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে।

ট্রাকটা মেসের কাছে এসে দাঁড়াল। সবাই নামল। অনন্তকে ধরে ধরে নামাল। গৈরী কোর্টে গিয়েছিল তখন থেকেই সে অনন্তর কাছছাড়া হয়নি। অথচ তার নিজেরই শরীরের এমন অবস্থা যে ধকল সয় না।

মেসের বারান্দা, লন এবং সামনের রাস্তা লোকে গিজ গিজ করছে মাইকও এসে গেল। সুমিতবাবু জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। অনন্তকে দেখিয়ে পুলিশের অত্যাচারের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় বললেন। তারপর ঘোষণা করলেন আমাদের আন্দোলন থেমে থাকবে না। দুনিয়ার শ্রমিক এক হও।

হৈ-হল্লা, উত্তেজনা কেটে যাবার পর খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে রাত বারোটা

বেজে গেল। অনন্ত ও গৈরীকে, সুমিতবাবু ও স্বপ্নার জন্য একটি করে ঘর ছেড়ে দিয়ে বাকী ঘরগুলিতে ট্রেনিরা জায়গা করে নিল।

অনন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকদিন পর ঘুম নেমেছে চোখে। কি যে ঝড় বয়ে গেছে ওর উপরে তা মনেও আনতে পারছে না। নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সারা সন্ধ্যা জুড়ে মেসে যে হল্লা, হাসি-মস্করা, প্রতিবাদ, প্রতিশ্রুতির বান বয়ে গেছে অন্য সময় হলে অনন্তই তার পুরোভাগে থাকতো। তার গলাই শুনতে পাওয়া যেত ডি. সি. সাহেবের বাংলো পর্যন্ত। কিন্তু সেই নীরব।

মেঝেতে বিছানা করেছিল। গৈরী ওর কাছেই বসে আছে। অনন্তকে যত দেখছে তত ওর ভিতরটা যন্ত্রণায় মোচড় দিচ্ছে। এক সময় চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ল অনন্তর মুখে।

অনন্তর ঘুমটা ফিকে হতে জেগে উঠল। ওর দিকে তাকিয়ে বলল—কাঁদছিস কেন? আমি তো এসেছি।

গৈরীর ভিতরটা ডুকরে উঠল। মুখ বিকৃত করে বলল—আমার জন্যই এত কাণ্ড হয়ে গেল।

অনন্ত ড্যাব ড্যাব করে তাকাল।

গৈরী বলল—সেদিন আমিই সবাইকে উত্তেজিত করেছিলাম। আমিই বলেছিলাম চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকলে ফয়সালা হবেক নাই। লড়তে হলে জান কবুল করতে হবেক। জান গেল তবে আমার নয় গোবিন মামার। আজ আমি ফাল্গুনীর কাছে মুখ দেখাতে লারছি। মেরে তুমার হাড়মাস সিজাঞে দিলেক তাই আমি দেখছি। ইয়ার চেঞে আমার মরণ হলো নাই ক্যেনে?

অনন্ত ওর মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল লড়াইয়ের ময়দানে নেমে আর আক্ষেপ চলে না গৈরী। আমার জন্য কষ্ট পাস না। দু'চারদিনেই ঠিক হয়ে যাবো। যত দুঃখ গোবিন মামার জন্য।

শহীদ গোবিন্দ মুনিয়ার জন্য ওরা দুজনে অনেক অশ্রুপাত করল।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে এল। সারাদিন কাজেকর্মে কাটত। বিকেলের দিকে কোথাও না কোথাও মিটিং থাকতো। আজকাল তো একটা কলিয়ারী নিয়ে আবদ্ধ না। পাশাপাশি কলিয়ারীতেও যেত। শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়নের মতাদর্শ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে বোঝাত। ওর একটা স্বাভাবসিদ্ধ দক্ষতা ছিল। সহজ ভাষায় সুন্দর করে বলতে পারতো। হাস্যকৌতুকের মধ্যে শ্লেষ মিশিয়ে মগজের ভিতর ঠেসে দিত। সেজন্য শ্রমিকরা ওকে পছন্দ করত। বড় বড় মিটিংয়ে ভাষণ দিতে ডাক পড়ত।

এই সময়ে সুমিত চ্যাটার্জীর নামে চাকরি জবাবের চিঠি এসে গেল। কর্তব্যে অবহেলা ও শৈথিল্যের অভিযোগে তাঁকে যে চার্জশীট দিয়ে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল তারই একটা লোক দেখানো তদন্ত করে জবাবী পরোয়ানা ধরিয়ে দিল।

শাস্তি অনন্তেরও হলো। তবে ওর চাকরি জবাব নয়। ওর শ্বশুর শাশুড়ি গুলু ও হেনীর চাকরির জবাব। আর ওর উপরে ফরমান এল—চারবাজা পালিতে খুঁটা কুলির কাজ করার।

কাজে সে কুন্ঠিত নয়। কালো বাউরী, খুঁটা মিস্ত্রীর সঙ্গে পুরা পালি সমান সমান কাজ করে। কিন্তু সহ্য হয় না হেনীর কান্না। মাথা চাপড়ে, পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে। লাগাতার অভিশাপ বর্ষণ হচ্ছে—কুন খাল ভরা এমন করলেক গো? সে যেমন নিব্বংশ হয়। আঁটকুড়া হয়। খাল ভরাদের লাশ শিয়াল শুগুনীতে খায়।

অনন্ত বড়ই বিব্রত। গৈরীকে বলল—তুর মাকে থামতে বল। এমন তো হবেকই। তার জন্য কেঁদেকেটে লোক হাসি করতে হবে? এই কি লড়াকু হিম্মৎ?

গৈরী বলল—সে কথা আমরা বুঝি। মা কি বুঝবেক?

—অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। ইউনিয়ন থেকে কিছু খোরাকীর ব্যবস্থা হবে। আমি তো দিনে এক টাকা সাড়ে সাত আনা হাজরি পাই। সবাই এক জায়গায় জুটে মাড় ভাতের যোগাড় হবে।

সেই দুঃখ কষ্টের দিনে গৈরীর ছেলে হলো। আঁধার মানিক। পুরো পরিবার এই একটি শিশুকে কেন্দ্র করে নূতন ভাবে বাঁচার আশ্বাস পেল।

কমলেন্দু সেকেণ্ড ক্লাস পাস করেছে। এই খবরটি আসার পর থেকেই অগ্রদূত মেসে উৎসবের হাওয়া লেগেছে। অনন্তরও উৎসবের হাওয়া লেগেছে। অনন্ত ও সুবীরের প্রাণের বন্ধু। তেমনি প্রাণের রস নিংড়ে উষ্ণ অভিনন্দন জানালো প্রচণ্ড চুম্বনে।

কমলেন্দু বলল—তোরা কিরে? এখনো ছেলেমানুষি গেল না।

—তুই একটা গাণ্ডু। শ্যালা তোর বউ আছে—তার কাছে যা।

সুবীর বলল—তুই একটা বিয়ে কর। তোর বিয়েতে আমি ভাংড়া নাচ নাচবো। আবার কিরে? ছোট সাহেব তো হলি।

—তোরা কি করলি? একসঙ্গে তিন-জনে যদি পাশ করতাম তবে কি খুশীটা হতো বল দিকি।

অনন্ত বলল—জ্ঞান দিস না কমল। সবাই যদি পরীক্ষায় পাস করে সাহেব হবে তবে কে দেখবে হতভাগ্য কয়লা শ্রমিকদের দুঃখ দরদ? আমার পথ আলাদা হয়ে গেছে। সুবীর আসছে বছর পাস করবে। প্রমিশ কর সুবীর।

সুবীর বলল—প্রমিশ!

—হাই। পার্টি হয়ে যাক।

সেই হৈ হুল্লোড়ের পর অনন্ত ও কমলেন্দু নিজের ঘরে বসেছে।

কমলেন্দু বলল—অনন্ত ! আমি তোর ছেলেকে এখনো দেখিনি ।

—আপশোস ! বহুত আপশোস ! এমন চাঁদপানা বেটাকে দেখিসনি রে ?

—মজা করিস না । তোর উচিত ছিল একদিন আমাকে আর সুবীরকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া ।

অনন্তর পরিহাস তরল কণ্ঠস্বর হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গেল । দূর আকাশে মেঘ দুন্দুভির মতো বলল—তোদেরকে যে বাচ্চা দেখানোর জন্য নিয়ে যেতে পারিনি সে দুঃখ আমার চেয়ে কার বেশী আছে বল । আসলে কি জানিস ঐ ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে তোদেরকে নিয়ে যেতে চাইনি । গৈরীও আর আগের গৈরী নেই । বড় কষ্টে আছে ।

—আমি জানি । দু'তিনদিন আগেই দেখা হয়েছিল । এখন আরো বেশী স্মার্ট হয়েছে । তুই আর দারিদ্র্যের অজুহাত দিস না । কবে ট্রান্সফার হয়ে যাবো—তার ঠিক আছে কি ?

পরদিন সকালেই তিন বন্ধু একসঙ্গে বেরুল । লোকে বলে থ্রি মাসকেটিয়ার্স ! চার বছর যাবৎ অগ্রদূত মেসকে জমিয়ে রেখেছিল ওরা । এবার খসে পড়ার বেলা এল । কমলেন্দুকে কোম্পানী আণ্ডার ম্যানেজার করে অন্য কলিয়ারীতে দেবে । এটাই ওদের নিয়ম । সুবীর চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবছে । কেন না সেকেণ্ড ক্লাশ পাশ করতে হলে যে পড়াশুনার প্রয়োজন তার সময় করে উঠতে পারছে না । কারণ হুল্লোরবাজ ছেলে । প্রচুর বন্ধুবান্ধব ! মেসটিকে তো অনন্ত ইউনিয়নের হেড কোয়ার্টার বানিয়ে দিয়েছে । তার সঙ্গে তারও নাড়ীর যোগ আছে । কাজেই এত ভিড়ের মধ্যে ওর পক্ষে প্রস্তুত হওয়ার অসুবিধা আছে ।

অনেকদিন পর ফাটকবাজারের লোকজন ওদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখে ভাবল—বুঝি বা কোনো নতুন কর্মসূচী আছে । যার যেমন ভাবনা ।

চবুতরাটা পার হয়ে ওরা সোজা গুলুর উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল । হেনী বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে উনুনে আঁচ দিচ্ছিল । গৈরী খালি গায়ে শাড়িটা পেঁচিয়ে ঘর ঝাড়ু দিচ্ছিল ।

হঠাৎ ওদেরকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠল । গৈরী তাড়াতাড়ি কোমরে বাঁধা শাড়ির আঁচল খুলে মাথায় ঘোমটা দিল ।

তার সেই বিভ্রান্ত অবস্থা দেখে অনন্ত হেসে ফেলল ।

সুবীর বলল—থাক থাক গৈরী তোকে অত ব্যস্ত হতে হবে না । আমরা তোর ভাশুর নই ।

গৈরী একটা দড়ির খাটিয়ার উপর বিছানার চাদর পেতে দিয়ে বলল—বসুন দাদা । কি ভাগ্য আমার যে তিনমূর্তি একসঙ্গে হাজির হলেন ।

সুবীর মিষ্টির হাঁড়িটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—কমলেন্দু সেকেণ্ড ক্লাশ পাশ করেছে। নে মিষ্টি খা।

—ওমা! তাই নাকি!

কল্ কল্ করে হেসে উঠল। এতক্ষণে ওকে স্বাভাবিক মনে হলো।

অনন্ত বলল—কমলকে তুই ছেলে দেখাসনি?

গৌরী জিভ কাটল। অনন্ত বলল—ওর টানেই ওরা এসেছে। যা নিয়ে আয়।

গৌরী মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তিনটি বাটিতে করে মিষ্টি এনে ওদেরকে দিয়ে বলল—খান দাদা। আমি বাচ্চুকে নিয়ে আসছি।

একটু পর সে নিজেও কাপড়-চোপড় বদল করে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়াল। মূর্তিমতী জননী। দু'চোখে অপার স্নেহ। মুখটি উজ্জ্বল। অসীম গর্ব তার ঠোঁটের হাসিতে। অনন্ত নিজেই অবাক হয়ে গেল। এক রমণীর এত রূপ।

হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিল।

গৌরী অভিযোগ করল—বাচ্চুর বাপ-কাকারা বিদ্যা বুদ্ধিতে কম যায় না। তবু ওর একটা নাম হলো না।

কাজল টানা দুটি চোখ। এক মাথা চুল। হাঁসা পাথরের মতো গায়ের রঙ। যেন গ্রানাইট পাথর খোদাই করে তৈরি হয়েছে একটি শিশুর মূর্তি। বাপের কোলে থলবল করছে।

কমলেন্দু ওর গালটিপে আদর করে বলল—কি রে? নাম দিসনি কেন?

—দেব—দেব। সময় তো চলে যাইনি। অন্নপ্রাশনে নামকরণ করতে হয়।

একটু অভিমানের সুরে গৌরী বলল—ওর পেটে অন্ন পড়তে কি বাকী আছে?

সুবীর বলল—ধ্যেৎ! কি উল্টো কথা বলছিস? ক'মাস বয়স হলো।

অনন্ত বলল—মাস তিনেক। সেটা কথা নয়। গৌরী ওকে গোঁদলে করে ভাতের ফ্যান নুন দিয়ে খাওয়ায়। তাই ওর অভিমান।

গৌরী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল—এসব কথা বলে তুমি কি সুখ পাও বলো তো?

কেমন সহজ সরল আলাপচারিতার মধ্যে দুঃখ দৈন্যের এমন একটা নির্মম চিত্র ভেসে উঠল যে সবাই অস্বস্তিতে পড়ল।

সুবীর তা সামাল দিতে অনন্তকে বলল—তুই কি রে অনন্ত? এমন খুঁচিয়ে ঘা করার কি দরকার? কমল—নামটা তুই দে। যেন তার একটা মানে হয়।

—সিওর। কয়লা কুঠির ঘোর দুর্যোগের সময় ওর জন্ম। বাপের স্বপ্ন শ্রমিক বিপ্লবের। তাই ওর নাম হোক—বিপ্লব। পছন্দ তো?

—হ্যাঁ!

গৈরী খুব খুশি।

সুবীর ও কমলেন্দু দুজনে দুটি রূপোর টাকা বাচ্চাটার হাতে দিলো।

গৈরী বলল—দাদা আজ আপনি আমার ছেলের নাম রাখলেন—এ কথা কখনো ভুলব না।

—বেশ। ভুলিস না। এবার উঠি। নাহলে ডিউটি কামাই হয়ে যাবে।

—আচ্ছা! গৈরী ঘাড় নাড়ল।

ওরা চলে যাবার পর গৈরী ওর ছেলের উপর হামলে পড়ল।

—তুমি বিপ্লব! কয়লাকুঠির ঘোর দুর্যোগের সময় তোমার বাপের স্বপ্নের প্রতীক? বটেই তো! তুমি যদি আমার পেটে না আসতে তবে কি তোমার বাপে কয়লাকুলিদের জন্য মাথা ঠুকে বেড়াত? নাকি আমিই তাকে পেতাম? সে তো সাহেব হয়ে যেত।

এমন কত কথা। চুমো খেতে খেতে আবেগে অশ্রুতে ওর ফুলো ফুলো গালদুটো ভরে দিলো।

এমনি সোহাগে আদরে দুঃখ দারিদ্র্যকে ভ্রূকুটি দেখিয়ে ওদের জীবন আবর্তিত হচ্ছে একটি শিশুকে কেন্দ্র করে। শিশুর হাসি কান্না ওদেরও হাসি কান্না। দাম্পত্য প্রেম ঘনীভূত। প্রেম দিয়েই জয় করেছে দুঃখ দরদের দিনরাত্রি।

সাতচল্লিশ

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রাণফাটা গরম। মাথার উপর খোলার চাল। বদ্ধ ঘরে একটি জানালা, সারাদিন হা হা করে লু বয়। সে যেন আগুনের ছ্যাঁকা। রাত্রিকালে নিঃঝুম। গরম খোলা ঠাণ্ডা হতে ভোর হয়ে যায়।

তারই মধ্যে পচে যাচ্ছে অনন্ত ও গৈরী। বিপ্লব পাথাল করে শুয়ে আছে। গৈরী অনবরত হাতপাখা টানছে। বাতাস একটু বন্ধ হলেই বিপ্লব ইছিল বিছিল করছে। মাথা শিতানে হ্যারিকেন জ্বলছে। গামছায় ঘাম মুছতে মুছতে অনন্ত ডায়েরী লিখছে—অবশেষে মজুমদার'স ট্রাইবুনাল এওয়ার্ড বের হলো। ২৬শে মে, ১৯৫৬ দিনটি কয়লাকুঠির ইতিহাসে লাল অক্ষরে লেখা থাকবে। অনেক উদ্বেগ, অশান্তি, ঘাম, রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে এই একটি এওয়ার্ড।

১৯৪৭ সালে ভারত সরকার মিঃ দেশপাণ্ডের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাংলা ও বিহারের কয়লাখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের বেতন, ভাতা, কাজের সময়সীমা ইত্যাদির তথ্যানুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার জন্য বোর্ড অফ কনসিলিয়েশনস বা আপস মীমাংসা পর্ষৎ নিযুক্ত করেছিলেন।

ব্যাপক তদন্ত ও সেই মোতাবেক সুপারিশে দিন হাজরী শ্রমিকের দৈনিক

ন্যূনতম বেতন ধার্য হয়েছিল একটাকা দশ আনা। অর্থাৎ একটাকা বাষট্টি পয়সা। কিন্তু কোনো কোম্পানী সে বেতন দিত না। বড়জোর একটাকা পঁচিশ পয়সা দিত। শেরগর কোল কোম্পানী দিত একটাকা সাড়ে সাত আনা অর্থাৎ এক-টাকা সাতচল্লিশ পয়সা। এটাই তখনকার বাজারে চালু ছিল।

চাকরির স্থায়িত্বই যদি থাকবে তাহলে গৌরীর মা-বাপের চাকরি জবাব হবে কেন? চারশো জন ওয়াগন লোডার বিনা নোটিশে বসে যাবে কেন? স্বপ্নাদি ও সুমিতদার চাকরিই বা যাবে কেন?

শাস্তি দেওয়া তো চলছেই। গোবিনের বুকে বুলেট লাগল। আমাকে খুঁটা কুলির কাজ করাচ্ছে। এমন কতজনকে কতভাবে যে হয়রান ও লাঞ্ছিত করা হচ্ছে তার সংখ্যা নেই।

এবার দেখা যাক মজুমদার'স ট্রাইবুন্যাল এওয়ার্ডে খনি শ্রমিকরা কি পেল?

সমকালীন বাজার দর অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্থাৎ রোটি কাপড়া আউর মকানের সঙ্গে আলো, বাতাস, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির খরচ ধরে দিন হাজরী শ্রমিকের মাসিক মজুরী ধার্য হয়েছে—

খাদ্যদ্রব্য—৫০·০০ পঞ্চাশ টাকা।

কাপড় বৎসরে জনপ্রতি ১৫ গজ তের আনা বা একাশী পয়সা দরে—

৪·০৬ চার টাকা ছয় পয়সা

বাড়িভাড়া বাবদ—২·০০ দু'টাকা

শিক্ষা বাবদ—১·৫০ একটাকা পঞ্চাশ পয়সা

চিকিৎসা—১·৫০ একটাকা পঞ্চাশ পয়সা

অন্যান্য (আলোবাতি সহ)—১০·০০

মোট—৬৯·০৬ উনসত্তর টাকা ছয় পয়সা।

একটি শ্রমিক পরিবারে তিনজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির হিসেবে ঐ খরচ। কিন্তু সত্যি কি তাই? স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান ছাড়াও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী থাকে। তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।

আগে যে কহাওত ছিল—ওয়াটার, কোয়ার্টার, ওয়েল, ফুয়েল ফ্রি। তাই বা কোথায়?

ধন্য দেশ! ধন্য আইন!

পরদিন সুমিতবাবু এলেন। তাঁর সঙ্গে সুধীর রুদ্র ও পাণ্ডা। তিন জনেই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ওঁদের নামেই কয়লাকুঠির শ্রমিকরা মাথা নোয়ায়।

একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং ডাকা হলো। বিয়াল্লিশ জন সদস্যের মধ্যে চল্লিশ জন উপস্থিত। দুজন সেকেণ্ড শিফট ডিউটিতে গেছেন।

সেদিন আলোচনা হলো মজুমদার'স ট্রাইবুন্যাল এওয়ার্ড নিয়ে। ওঁদের মতে এ যেন নাকের বদলে নরুন। এই এওয়ার্ড আমরা মানবো না। প্রস্তুত হতে

হবে বৃহত্তর গণসংগ্রামের জন্য। প্রয়োজন হলে লাগাতার ধর্মঘট করবো। বাংলা ও বিহারেও আশি শতাংশ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য, বাম দক্ষিণ সব দল একসঙ্গে জোট বাঁধতে রাজী। আই. এন. টি. ইউ. সি, এইচ. এম. এস., এ আই. টি. ইউ. সি., খনি মজতুর ইউনিয়ন সব একযোগে এক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করবে। দেবেন সেন, কল্যাণ রায়, কেশব নারায়ণ এক প্লাটফর্মে দাঁড়াবেন।

আগামী রবিবার তিনটেয় ডিসেরগড়ে মিটিং। মিছিল নিয়ে যাবে। এই মিটিংয়ে অনেক কিছু বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হবে।

ইতিমধ্যে তোমরা শ্রমিক কর্মচারীদের বোঝাও তামাম কোলফিল্ডে বিশ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। প্রায় দু'হাজার ইউনিয়ন কর্মীর উপর মালিকরা একতরফা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। দাঙ্গা হয়েছে পনেরোটি। আহত দুশো জন। নিহত পাঁচ জন। কারো জন্য কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দেয়নি।

শ্রমিকদের যে হারে বেতন বাড়ানোর দাবি ছিল তা পাওয়া যায়নি। স্টাফদের তো নামমাত্র বেড়েছে। ছাঁটাই কর্মীদের অবিলম্বে কাজে যোগদান করাতে মালিক পক্ষ নারাজ। ইউনিয়ন কর্মীদের উপর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেনি। তাহলে আমরা পেলাম কি?

১৯৪৭-এর বোর্ড অফ কনসিলিয়েশনের সুপারিশ এখনো কোম্পানীরা মেনে নেয়নি। এরপর ট্রাইবুন্যাল এওয়ার্ড যদি না মানে?

খবর পেলাম অনেক কলিয়ারীতে দু'নম্বরী পেমেণ্ট খাতা তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ একটা খাতায় এওয়ার্ড মোতাবেক হাজরির বিল তৈরি হচ্ছে। তার উপরে শ্রমিকদের টিপ ছাপ নেওয়া হবে আর অন্য খাতায় পেমেণ্ট হবে। মূল খাতাতে শ্রমিকদের নাম থাকবে কম সংখ্যায়। বাকী শ্রমিকদের দু'নম্বরী খাতায় পেমেণ্ট হবে ও তাদের কাগজে কলমে কোনো অস্তিত্ব রাখা হবে না। তবে আর চাকরির স্থায়িত্ব কথাটার দাম কি? আইনকে ফাঁকি দেবার কত না ছলনা কপটতা।

দেবেন সেন বলেছেন—আপীল করবেন। রবিবারের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

ডিসেরগড়, বরাচক, ধেমোমেন, কাল্লা, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বাঁক শিমুলিয়া, গিরিমিণ্ট, জামুড়িয়া, চরণপুর, চাঁদা উখরা, পাণ্ডবেশ্বর, ইত্যাদি স্থানে মিটিং হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। প্রতিটি মিটিংয়ে খনি শ্রমিকদের মিছিলের পর মিছিলের ঢেউ শ্লোগানে শ্লোগানে শোরগোল তুলে হাজির হচ্ছে। দেবেন সেন কান্তি মেহতা, মিঃ যোশী, কল্যাণ রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, সুধীর রুদ্র, জগদীশ পাণ্ডে, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রমুখ প্রথম সারির ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা কোলফিল্ডে থেকে একটা দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় দলমত নির্বিশেষে একই প্লাটফরমে দাঁড়িয়েছেন।

এক কল্যাণ রায় তামাম কোলফিল্ড কাঁপিয়ে দিয়েছেন। কি তাঁর ভাষণ; একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত করে। ম্যানেজার এজেন্টরা লক্ষ্য। চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে কথা বলেন চড়া গলায়, কম্যাণ্ড করার ভঙ্গীতে। তাঁকে দেখলেই সাহেবরা ভয়ে লুকিয়ে পড়েন এমন অবস্থা।

প্রত্যেক কলিয়ারীতে অ্যাকশন কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে। দামুলিয়ার জেনারেল সেক্রেটারী সুমিত চ্যাটার্জী। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে যাবার পর অনন্তকে অস্থায়ী সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। নতুন কমিটিতে অনন্ত পুরোপুরি জেনারেল সেক্রেটারী হলো। রাজকিশোর সিং সভাপতি। তিলক সিং কোষাধ্যক্ষ। দুজন জয়েন্ট সেক্রেটারী হরিহর গান্ধী ও যমুনা যাদব।

মোট ষাটজনের কমিটি। মেয়েদেরকে সামনে নিয়ে আসার জন্য শকুন্তলা, ফুলমণির সঙ্গে গৈরীকেও নেওয়া হয়েছে।

সেদিন মিটিং হলো অফিসের সামনে শামিয়ানা খাটিয়ে। জবরদস্ত সাহেব মিঃ শ' বারণ করতে পারেননি। দেবেন সেন মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই ঘোষণা করলেন—বাংলা ও বিহারের সমস্ত কয়লা খনিতে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ থেকে লাগাতার ধর্মঘট হবে। এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য মালিকদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে হবে। প্রত্যেকটি খনি শ্রমিক যেন তার জন্য তৈরি হয়ে থাকে মালিক, ম্যানেজার ও দালালদের ষড়যন্ত্র অত্যাচার, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মোকাবিলা করতে হবে।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সে প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হলো।

ধর্মঘটের দিন ধার্য হয়ে যাবার পর কোলফিল্ডের হাওয়া বদলে গেল। যেখানে মিটিং সেখানেই জন সমাবেশ। সেখানেই পুলিশ প্রহরা। গণ-আন্দোলন বুঝি এমনিভাবে জোয়ারের মতো আসে। সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। খনি শ্রমিকরা এক অদ্ভুত আবেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

দেড়মাস আগে সব কোম্পানীকে স্ট্রাইক নোটিশ দেওয়া হলো। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে তার কপি গেল। কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে ধর্মঘট তুলে নেবার কথা বললেন। মালিক পক্ষের সঙ্গে ইউনিয়নের দু একটা বৈঠক হলো কিন্তু ফলাফল শূন্য।

তৎকালীন সর্ববৃহৎ কোলকোম্পানী বেঙ্গল কোলের সি. এম. ঈ. মিঃ রসার বললেন, আমাদের গিরমিণ্ট ও শীতলপুরে স্ট্রাইক করতে পারবেন না।

দেবেন সেন বললেন, ঐ দুটি কলিয়ারীকেই হেড কোয়ার্টার করা হবে। স্ট্রাইক তো নিশ্চয় হবে।

সব আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় সমীক্ষক রিপোর্ট দিলেন—স্ট্রাইক ইজ মাস্ট।

আটচল্লিশ

ভারতে শিল্পায়নের আদিশক্তি কয়লা। তার তাপ নিয়েই বাষ্প উৎপন্ন হয়। প্রাইম মুভার ঘোরে। তখন এত ডিজেল ইঞ্জিন ছিল না। রেলওয়েতেও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন চালু হয়নি। রেল কোম্পানী মস্তবড় কনজিউমার। কয়লা খনিতে স্ট্রাইক মানে রেল বন্ধ। জাহাজ বন্ধ। কল-কারখানা, তাপ বিদ্যুৎ, ব্লাস্ট ফার্নেস, কোক ওভেন সবই বন্ধ। ব্যাপারটা ভাবতেই বিভীষিকার মতো মনে হয়। খবরের কাগজের সমীক্ষকরা ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন।

কলিয়ারীতে প্রভাত ফেরী, গেট মিটিং, মিছিল। চারিদিক একটা ভম্ ভম্ শব্দ। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা খনি চালু রাখার। সেজন্য যেখানে যত প্রয়োজন পুলিশ মোতায়েন করার হুকুম জারি হয়ে গেছে।

ইতঃস্তত দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলার খবর আসছে। একটা ভীষণ অস্থিরতার সময়ে কে কাকে সামলে রাখে? সবাই রাগে ও আবেগে টগবগ করে ফুটছে। সুর বাঁধা হয়েছে পঞ্চমে। বড়ই অস্থির।

মলিকরাও বসে নেই। তারাও নখে দন্তে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত। অতি গোপনে গুণ্ডা, বদমাইশ আমদানি হচ্ছে। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, বোম, বারুদ, পিস্তল, বন্দুক। তাদেরও ঘন ঘন বৈঠক হচ্ছে।

তেমনি এক বৈঠক বসেছে ভূত বাংলোতে। সবকটি ভিলেন চরিত্র সেখানে হাজির। মিঃ 'শ সবাইকে একবার জরিপ করে নিয়ে বললেন—সভিপ্রসাদজী! আপনার অ্যাকশন প্রোগ্রাম বলুন। স্ট্রাইকের দিন কমপক্ষে এক হাজার শ্রমিককে খাদে কাজ করার জন্য নামাতে হবে। ইউনিয়ন ভেঙে দিতে হবে।

সভিপ্রসাদ বললেন—হুজুর বে-ফিকির থাকুন। ইউনিয়ন ভাঙবার আদমী তৈরি আছে। গোরখপুর কমাণ্ডার সুরয নারায়ণ সিং চারশো জন লোডার দেবে। মংগু চৌহান পাঁচ নম্বরের লোডিং সরদার দেবে দুশোজন। আর আখরী খেলা তো তিলক সিং-এর হাতে। কলিয়ারী বন্ধ হবে না।

—অলরাইট! সুরয নারায়ণবাবু আপনি তৈয়ার আছেন?

—জী হাঁ।

—মংগু চৌহান?

—আমার তো দিল জ্বলিয়ে যাইছে হুজুর। ইয়ে দেখুন মনিলাল আসিয়েছে। শ্বালা অনন্ত উয়ার বেটার বহুকে লুটিয়ে লিয়েছে। ইয়ার বদলা জরুর লিব। আপনি হুকুম করুন।

—অলরাইট হুকুম দিলাম।—

—তিলক সিংকে আনলেন না কেন সভিপ্রসাদজী?

—বকত পর হোবে হুজুর।

একে একে সবাইকে কবুল করিয়ে নিয়ে মিঃ শ' ওদেরকে ছেড়ে দিলেন। তারপর ভূত বাংলোতে রইল বিশেষ কয়কজন ডি. সি., ডি. ডি. ও সভিপ্রসাদ। বিউটি তো থাকবেই যতক্ষণ মিঃ শ' আছেন!

পরামর্শ আরো গোপন থেকে গোপনতর পর্যায়ে চলে গেল।

অনেক রাত্রে ডি. সি., ও বিউটিকে নামিয়ে দিয়ে মিঃ শ' চলে গেলেন। তখন তিনজনেই টপ ভুজঙ্গ। টল টল করছে পা। ডি. সি. সাহেব ইচ্ছে করেই বিউটির গায়ে পড়লেন এবং খামচে ধরলেন।

বিউটি বলল—ডি. সি.। আপনার এত নেশা হয়নি যে পেঁচি মাতালের মতো মেয়েমানুষের গায়ে পড়তে হবে।

ডি. ডি. সাহেব বললেন—কেন ওকে টাচ্ করছিস ডি. সি.?

ডি. সি. সাহেব জড়িত কণ্ঠে বললেন—বারমান সাহেব দিয়েছিলেন একটা বারোয়ারী আওরৎ। কিন্তু তুই শ্যালা একাই ভোগ করলি। নিজের আখের গুছোতে মিঃ শ'কে দিলি। আমি বুড়ো আঙুল চুষলাম।

বিউটি তিক্ত বিষাক্ত কণ্ঠে বলল—ব্লাডি কুত্তার বাচ্চা।

ডি. সি. বললেন—ভাদ্র আশ্বিনের কুত্তা ভীষণ ডেনজারাস হয়। কথাটি মনে রেখো। তোমার এই লি-মুরোদের মরদ রক্ষা করতে পারবে না।

ফুঁসে উঠল বিউটি।

—হাঁ। এত মরদ। যাবো নাকি তোমার বাংলোতে? তোমার মাতলামি মিটিয়ে দেবো। তোমার বউ বিটিরও গরব চুকিয়ে দেবো।

ডি. সি. বললেন—কি? যত বড় মুখ নয় তত বড় বড় কথা।

প্রায় মারমুখী হয়ে উঠলেন উনি। ডি. ডি. মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন—আঃ।

কি হচ্ছে ডি. সি.? তুই কি বে-হেড হয়ে গেলি? যা তোর বউ জেগে বসে আছে।

—বাঃ বাঃ শ্যালা। আমি মাতাল! কুত্তার বাচ্চা! শোধ কেমন করে নিতে হয় দেখিয়ে দেবো! স্ট্রাইকটা আগে শেষ হোক।

টলতে টলতে নিজের অংশের দিকে চলে গেলেন। বিউটিও মুখ ব্যাজার করে গেট খুলে ঢুকে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন একা ডি. ডি. সাহেব।

ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। সত্যিই তো! যে নিজের নারীকে রক্ষা করতে না পারে তাকে তো অপমান সইতেই হবে। সে আবার পুরুষ কি? মনটা এত ছোট হয়ে গেল যে বিউটির কাছে মুখ দেখাতেও লজ্জাবোধ হচ্ছে।

বিউটি বাথরুমে ঢুকল স্নান করতে। ডি. ডি. সাহেব চেয়ারে বসে টেবিলের উপর কপালটা ভর দিয়ে দিলেন। বিউটি স্নান করে ঝোলটা হিটারে গরম হতে দিয়ে টেবিলের উপর খাবার সাজাল। ডি. ডি.-কে ডাকল।

উনি সাড়া দিলেন না। বিউটি বলল ওঠ।

—না! খাবার রুচি নেই।

—আমারই কি আছে? কিন্তু রাত উপোস দিয়ে কাল ডিউটি করবে কি করে?

উনি বিউটির একটা হাত ধরে ফেললেন। বললেন—আমাকে ক্ষমা কর বিউ।

বিউটি কৌতুক বোধ করল। বলল—হঠাৎ ক্ষমা চাওয়া কেন?

—আমি তোমার সঙ্গে পুনঃ পুনঃ অবিচার করেছি। সত্যিই যদি আমার পৌরুষ থাকতো তবে তোমাকে এমন করে লাঞ্ছনা অপমান সইতে হতো না।

—ওসব আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। এসো খেয়ে নাও।

খেতে খেতে কথা হলো না। দুটো রুটি খেয়ে ডি. ডি. সাহেব শুয়ে পড়লেন। মাথাটা টিপ্ টিপ্ করছে। কি রকম জ্যাম ধরে আছে। একটু পর বিউটি এসে শুয়ে পড়ল।

ওর শোয়ার ভঙ্গী বড়ই অশালীন। ডিপ ফ্রিজ থেকে তুলে আনা ইলিশ মাছের মতো শীতল এবং অনাবৃত। ডি. ডি. সাহেব ভাবেন তাদের জীবনে উষ্ণতা হারিয়ে গেছে। ঐ বরফ গলাবার সাধ্য তাঁর নেই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে ওর দিকে ঝুঁকে পড়লেন! নীল আলোতে বিউটিকে দেখাচ্ছে জলপরীর মতো। বললেন—তুমি কত দূরে সরে গেছ বিউ। এত কাছে আছো কিন্তু যেন কতদূরে।

বিউটি একটু উৎসুক হয়ে ওর দিকে তাকাল। উনি বললেন—আমারই দোষ। আমিই তোমার মান সম্মান অক্ষত রাখতে পারেনি।

বিউটি কাৎ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল—আজ এসব কথা বলছ কেন? আমার মন ভেজাতে?

—তোমার মন কে ভেজাতে পারে? সেটা এত শক্ত যে আমার সাধ্য নেই তার কাছে যাবার।

বিউটি হেসে বলল—বুঝেছি। তা অত ধানাই পানাইয়ের কি আছে? খেতে পরতে দিচ্ছো। তার দরুন পাওনা গণ্ডা বুঝে নাও।

—না বিউ! আমার কথা তুমি বুঝলে না। আমি বলতে চাইছি আমাদের তো কিছু স্বপ্ন ছিল। আমরা তো চেয়েছিলাম দুজনের সংসারে একটি শিশু আসবে। ভালোবাসার শিকড়। এভাবে ভেসে বেড়ানোর দিন শেষ করে থিতু হব। তুমি বোধহয় ভুলে গেছো।

বিউটি একটু চুপ করে থেকে বলল—কিছুই ভুলিনি ডি. ডি.। স্বপ্ন আমারও ছিল। সব ফুরিয়ে গেল।

—তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারো না বিউ? পারো না স্বপ্নের জগতে পাড়ি দিতে?

—তুমি কি নেশার ঘোরে কথা বলছো ডি. ডি. ?

—না বিউ ! মনের ভিতর থেকে বলছি।

—তোমার সে হিম্মৎ আছে ? পারবে আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে ?

—বল কি করতে হবে ?

—তোমার এই চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে ?

—পারব। কিন্তু সে তো দারিদ্র্যের জীবন। এতবড় চাকরি, বাংলো, লোকজন কোথায় পাব ?

—দিন গুজরানের মতো একটা চাকরি পাবে না ?

—পাব। বড়জোর ওভারম্যানের চাকরি।

—ওতেই হবে। কি প্রয়োজন টাকা-কড়ি, বিলাস ও প্রমোদের ? যদি ভালোবাসা পাই তবে দু'পায়ে মাড়িয়ে দিতে পারি দু'পাঁচটা এজেন্ট, লেবার সাহেব।

—বেশ। আমি কালকেই রিজাইন করব।

—এখন না। কিছু কাজ বাকী আছে। শপথ কর ডি. ডি. আমি যা করব তাতে তুমি মদৎ দেবে ?

—শপথ করছি। ডি. ডি. সাহেব হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। বিউটি প্রবল আবেগে সেই লোমশ হাতটা নিজের বুকে চেপে ধরল। মুহূর্ত মধ্যে দু'চোখ ভরে জল এল। অশ্রু গোপনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে বলল—ডি. ডি.। আমিও শপথ করে বলছি—শুধু তোমাকেই ভালোবাসব। তোমার ভালোবাসার জড় শিকড় ধারণ করব নিজের অঙ্গে।

ডি. ডি. সাহেব অবাক। উনি কখনো বিউটির চোখে জল দেখেননি। কত নির্যাতন বয়ে গেছে ওর উপরে কখনো কাঁদেনি। কেমন শীতল চাউনি ছিল ওর। কভু কখনো দেখতে পেত দু'একটা আগুনের ফুলকি। বরফ গলে প্রস্রবিনী ধারা যে বইতে পারে তা ছিল ধারণার অতীত। আজ সেই চোখে জল গড়াতে দেখে ওর ভিতরটা ডুকরে উঠল।

অনন্তর যে কোন পালি ডিউটি তা বিউটির খেয়াল ছিল না। ডি. ডি. সাহেবকেই বলল—অনন্তকে অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করার খবর দিতে।

সকাল দশটায় কলিয়ারীর বাংলো, কোয়ার্টার সব ফাঁকা। কেমন শুনশান্। সবাই আপন আপন ডিউটিতে আছে। যাদের চারবাজা, রাতপালি তারা ঘুমের ঘোরেই আছে। তখন অনন্ত এসে ডাক দিল—দিদি !

—এসো ভাই ! তোমার ডিউটি কখন ?

—রাত পালি।

—স্নান খাওয়া হয়েছে ?

স্নান হয়েছে। খাওয়া হয়নি।

—দিদির বাড়িতে খাবে?

—না দিদি। আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।

বড় লীডার হয়েছ। তাই দিদির বাড়িতে খাবার অবসর নেই।

—এই তো! তোমাদের অভিমানগুলো একটু কম করতে পার না দিদি?

বিউটি হাসল, বলল—তা কেন করব? মেয়েদের এটা একটা হাতিয়ার। কিন্তু তোমার উপরে আমার সত্যিই অভিমান হয়েছে। ছেলেটিকে একবারও দেখালে না।

অনন্ত লজ্জিত। বলল—এই যাঃ। ভুল হয়ে গেছে। আসলে কি দিদি—আমি আর আমাতে নেই। যাকগে আজ বিকেলেই গৌরীকে পাঠিয়ে দেব।

—ধন্যবাদ!

বিউটি উঠে গেল। একটু পর ডিশে খাবার এনে বলল—খাও।

—ধন্যবাদ!

—ফিরতি ধন্যবাদ দিলে। দুষ্টু কোথাকার!

অনন্ত হাসতে হাসতে খাওয়া শুরু করল।

বিউটি বলল—তোমাকে কয়েকটা গোপন খবর দেবার জন্য ডেকেছি। তুমি শপথ কর যে আমার নাম যেন প্রকাশ না হয়। তাহলে তোমারও খবর পাবার পথ বন্ধ হবে। আমিও বিপদে পড়ব।

অনন্ত বলল—শপথ করছি দিদি। তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি।

বিউটি বেশ গুছিয়ে ভুত বাংলোতে গোপন পরামর্শের সবটুকু বলে দিল।

অনন্ত শুনে অবাক। এঁটো হাতে বসে আছে। অনেকক্ষণ পর বলল—মাই গড। ষড়যন্ত্রের জাল এত গভীরে পৌঁছে গেছে।

—হ্যাঁ। উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি না নিতে পারো তবে স্ট্রাইক সাকসেসফুল হবে না। তোমারও জীবন বিপন্ন হবে।

—তা বুঝতে পারছি। এ জাল আমি ছিঁড়বই। কিন্তু দিদি—তুমি আমাকে একটা কথা স্পষ্ট করে বল—এ খবর আমাকে বললে কেন?

বিউটি একটু গম্ভীর হয়ে বলল—তোমার সঙ্গে আমার যে স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্ক সেজন্য বলিনি।

—তাহলে?

—কয়লা কুঠির কুলি কামিনরা আমার ভাইবোন। তাদের আন্দোলন সার্থক হোক। এটাই আমি চাই।

—তোমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে দিদি।

—যাও। খুব সাবধানে থাকবে।

—হ্যাঁ দিদি।

অনন্ত চলে গেল

ঊনপঞ্চাশ

অনন্তর চারিদিকে সমস্যা থিক্ থিক্ করছে। এক তো এতবড় সংগঠনে ঐক্য বজায় রাখাই দায়। তারপর যদি অন্তর্ঘাত হয়? ভেবে কুলকিনারা পায় না সে কি করবে?

সে নিজে এখন দারিদ্র্যের শেষ সীমা অতিক্রম করে গেছে। এক টাকা সাড়ে সাত আনা হাজরী পায় আর দিনে আঠারোটি পাতা পড়ে। সবাই খানেওলা। গৈরীর দু'ভাই দু'বোন বয়সে ছোট হলে কি হবে? খাওয়াতে সমান সমান। ইউনিয়নের খোরাকি যৎসামান্য। কি করে কুলোবে?

মেসের খাবার বন্ধ করে দিয়েছে। সে এখন পুরোপুরি কুলি ধাওড়ার কুলি। তিন পালিতে ঘুরে ঘুরে ডিউটি করে। ডিউটি যাবার আগে গোটা আষ্টেক হাতে গড়া রুটি ডাল দিয়ে খায়। হাফ প্যাণ্ট ও গেঞ্জী পরে কোমরে বেল্ট, মাথায় টুপি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। জুতো ছিঁড়ে গেছে। তাই চলছে।

ডিউটিতে সে ফাঁকি দেয় না। কালো বাউরী মিস্ত্রী তাকে কাজ করতে দিতে চায় না। পরিষ্কার বলে—না। সারাদিন ছুটোছুটি করে ইউনিয়নের কাজ করেন। রাত্রে এত খাটতে হবে না। আমরা কাজ করে নেবো।

অনন্ত বলে—শরীর যতক্ষণ বইবে ততক্ষণ বসে থাকবো কেন? এটা আমার আদর্শ। না হলে কমলেন্দু যেমন পাশ করে ছোট সাহেব হায়েছে আমিও তা পারতাম।

—তা পারতেন বাবু। আপনার যা বুদ্ধি তাতে ছোট সাহেব কি আপনি বড় সাহেবও হতে পারবেন।

—তবু আমি খুঁটা কুলি। মাইনিং সরদারী পাস করেছি কিন্তু সে কাজ দিল না। দেবেও না। স্ট্রাইক শেষ হলে অন্যত্র চলে যাব। আমার বউ ছেলে মা ভাই বোন আছে। তাদেরকে তো উপোস দিয়ে মারতে পারি না।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে এমনি সব সুখ দুঃখের কথা হয়। কালো তাকে সান্ত্বনা দেয়—বাবু আপনি তো পুরাণের পণ্ডিত। জানেন তো মহারাজা যুধিষ্ঠিরকেও ভাই বউ নিয়ে বনবাসে যেতে হয়েছিল। রামচন্দ্রকেও বনবাসে কাটাতে হয়েছিল।

এসব কি ওকে কালো বাউরীর কাছে শিখতে হবে? সে দশ বছর বয়স থেকে রামায়ণ মহাভারত পড়ছে। সে রসে একবার ডুবলে অনেক যন্ত্রণার লাঘব হয়।

তখন ভোর চারটে। পালি শুরুর ব্যস্ততা চুকিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে বালিগাদার উপর লম্বা হয়ে পড়ল। গোটা গা ঘামে গজ্ গজ্ করছে। চাণ্ডনী আয়তনে বারুদ আওয়াজ হবে এখন। সেটা হলে আবার যেতে হবে খুঁটো লাগাতে। এখন ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে নিতে পারে।

মাথায় একটা কাঠের পাটা দিয়ে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে চোখে ঘুম নেই। কত রাজ্যের চিন্তা। ভাবনগুলো এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ফক্ ফক্ করে পার হয়ে যাচ্ছে। ছায়াছবির মতো কয়েক লহমা দাঁড়িয়ে পড়ছে।

একটি হামাটানা শিশু। দুটি কচি কচি দাঁত বেরিয়েছে। চুলগুলি কালো কোঁকড়া। জোড়া ভুরু। টানা টানা চোখ। কোমরে ঘুনসি কড়ি, ভালা ফল, ধনেশ পাখীর হাড়, কবচ, মাদুলি, তকতি এবং দুটি রূপোর টাকা ছেঁদা করে পরানো। গলায় পুঁতির মালা। দু' পায়ে ও হাতে লোহার বালা। ভারী সুন্দর দেখতে। উদোম আদুল হয়ে উঠোনে হামা টানে। খুশীতে খলবল করে হাসে। দেখলে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। এ যে শিশু অনন্তের প্রতিরূপ। পুত্র বুঝি পিতারই আদল পায়।

সেই ছবিটার পর একটি ভয়ঙ্কর ছবি ফুটে উঠল। একটি মেয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলছে লক্ লক্ আগুনের শিখা।

গুড়ুম শব্দে সমস্ত সুরঙ্গ পথ কেঁপে উঠল। সেই কাঁপনের রেশ রইল অনেকক্ষণ যাবৎ। স্বপ্ন ও বাস্তবের যুগপৎ সংঘর্ষে অনন্তের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। উঠে বসল। ওঃ কি ভীষণ স্বপ্ন! কিন্তু মেয়েটি কে? ওকে তো চিনতে পারলো না?

যাক্ গে বারুদ আওয়াজ হয়ে গেছে। এবার কাজে যেতে হবে।

সেদিন ও সারাদিন ঘুরেছে। বিউটির কাছ থেকে ফিরে ভাত খেয়েই ছুটেছিল সুমিতবাবুর কাছে। এমন একটা খবর ওঁকে না দিলে পথ বাৎলাবে কে? সংগঠনে গলদ। বক্ত পর বেইমানি হবে। অন্তর্ঘাতের প্রস্তুতি চলছে খুব গোপনে, খুব তৎপরতার সঙ্গে। সেজন্য বেচারী সারাদিন রাতে ঘুমোতে পারেনি। খাদে যদি বা একটু সুযোগ পেল তো এক বিভীষিকাময় স্বপ্ন এসে তাও বরবাদ করে দিল।

বক্ত পর বেইমানি। সুযোগ পেলেই পিছন থেকে ছুরিকাঘাত। তার দাওয়াই কি?

সুমিতবাবু বিশ্বাস করতে চান না। বলেন—না না না। ওকে আমি জানি প্রথম থেকেই ও ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী। এ খবরটা যাচাই করা দরকার। আমাদিকে ভুল বোঝাবার চক্রান্ত হতে পারে। সংবাদ সূত্রের বিশ্বাস-যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

এইটাই তো বেশী ভাবনার। সুমিতবাবু যদি বিশ্বাস না করেন তবে এই

চক্রান্তের মোকাবিলা করবে কি করে ? শেষে ভরাডুবি হবে না তো ! খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

বাতিটা নিভিয়ে দিল চোখে আলো লাগছে বলে। কিন্তু কি ঘন জমাট অন্ধকার। নিজেকেও দেখা যায় না। ভয় পেয়ে গেল। বাতি জ্বালিয়ে উঠে পড়ল।

পরের দিন সন্ধ্যায় ফাটকবাজারে দাঙ্গা লাগলো। যাদব ভারসাস সিং। যমুনা যাদব লোডার সরদার। ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য। রাম অবতার সিং খোদ এজেণ্ট সাহেবের চাপরাশী। লোকে বলে বাবু সাব। বিহারের রাজপুত। সারা কলিয়ারী জুড়ে সুদের কারবার। সভিপ্রসাদের ডানহাত। গরীব দুঃখীদের রক্ত খেয়ে শরীর মন টং হয়ে আছে। ইউনিয়নের কারবার তাদের পছন্দ নয়।

ইহ বাহ্য। দাঙ্গার অজুহাতে পুলিশ এল এবং অনন্তকে অ্যারেস্ট করার জন্য তৈরি হলো।

পর পর তিনরাত্রি পার হয়ে গেল। অনন্ত একদিনও বাসায় এল না। অথচ সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে তারও কোনো সংবাদ নেই। তাহলে হলো কী ? সেই মিটিং থেকে গা-ঢাকা দেওয়ার জন্য যে গেল তারপর কোনো খবর নেই। এমন তো কখনো হয় না।

বেশ দুর্ভাবনার মধ্যে খোঁজ খবর নিচ্ছে। কিন্তু কেউ সঠিক খবর দিতে পারছে না। এমন তো হবার নয়। যেখানেই যাক গৈরীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না।

খবরটা লোক মারফৎ সুমিতবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ভাবছে। তখন শৈলেন পাল নামে একটা সেকেণ্ড ইয়ার ট্রেনি এল অনন্তর ভাই প্রশান্তকে সঙ্গে নিয়ে।

শৈলেন বলল, বৌদি ! অনন্তদার ভাই। ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

গৈরী একটা কাঠের বাকসো বের করে দিয়ে বলল, বোসো ভাই।

প্রশান্ত বসল। শ্যামল সুন্দর এক তরুণ। গোঁফের রেশ দিচ্ছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল। অপ্রসন্ন মুখে বসে আছে। ওর সামনে বিপ্লব হামা টেনে বেড়াচ্ছে। উদোম আদুল কবচ মাদুলি ঘুমসি কড়ি পরা বাচ্চা।

শৈলেন ওকে সটান বুকে তুলে নিয়ে বলল—বৌদি ! তোমার বাচ্চাটা অনন্তদার মিনি মডেল।

গৈরী মুখ টিপে বলল—হ্যাঁ। লোকে তাই বলে। কিন্তু তোমার যে জামাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে খেয়াল আছে। ওকে নামিয়ে দাও।

শৈলেন ওকে গৈরীর কোলে তুলে দিয়ে বলল—আমি চলি বৌদি।

—আচ্ছা যাও।

প্রশান্তর জন্য চায়ের জল বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করবে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ভাই ও তো পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ চতুর্থ দিন আমিও কোনো খবর পাইনি। সেজন্য ভাবনায় আছি। কি দরকার আমাকে বলবে।

প্রশান্ত কেমন উদাসীন কণ্ঠে বলল—তোমাকে বলে আর কি হবে ?

ওর বলার ভঙ্গীটা গৈরীর ভালো লাগল না তবুও নিজের মনের ভাব চেপে বলল—হবে এই যে যখনই তোমার দাদার সঙ্গে যোগাযোগ হবে তখনই সংবাদটা তাকে দিতে পারবো।

—তাহলে বলে দিও মা মৃত্যুশয্যায়। দাদাকে একবার দেখতে চাইছেন।

গৈরী চমকে উঠল। বলল—অসুখটা কি ?

—কি জানি ?

চিকিৎসা কি হচ্ছে ?

—হচ্ছে গ্রামের ডাক্তার দিয়ে।

—কোনো হাসপাতালে দাওনি ?

—না।

—কেন ?

—কে দেবে ? যার বড় ছেলে মায়ের খবর নেয় না তার চিকিৎসা কে করবে ?

—তাই বুঝি মরণ কালে খবর দিতে এসেছো ? কি বলবো তোমাদিকে ? যত ঘৃণা তো আমার উপরেই। তার জন্য মা মরে যাক ক্ষতি নেই। এই তোমাদের বাসনা। একবার ভেবেও দেখলে না তোমার দাদা কি সংগ্রাম করছে ?

গৈরীর কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ ছিল। প্রশান্ত উষ্ণভাবে বলল—আমি এসব শুনতে আসিনি।

—তা জানি। তোমার দাদা আমাকে বিয়ে করে আজ সমাজ সংসার থেকে বিচ্যুত। তোমার মা নিজে তাকে বাড়ি যেতে বারণ করেছে। তাই খবর নিতে পারেনি। না হলে অত সৎ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি মায়ের খবর নেবে না এটা হতেই পারে না। সেজন্য তার যে কত কষ্ট তা আমি জানি। যাক গে ওসব কথা। তোমরা মানো আর না মানো তোমার মা আমারও মা তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন সে দুঃখ রাখার জায়গা আমার নেই।

প্রশান্ত একটুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল—কি করবো ? আমাদের সাধ্য অতি সামান্য। তবু মাকে বলেছিলাম একবিঘে জমি বিক্রি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা

করছি। মা রাজী হচ্ছে না। বলছে নীতির বিয়েতে জমি বিক্রী করতে হবে। না হলে বাপের দেনা শুধবি কিসে!

গৌরী ওর কাছে মাটিতেই বসে পড়ল। বলল—ভাই! খরচ খরচা কিছু লাগবে না মায়ের চিকিৎসার ভারটা আমাকে দাও। তোমার দাদার স্ত্রী আমি। একেবারে পর নই। হয়তো সমাজে ঠাঁই নেই। মনে তো আছে। একটা দায়িত্ব পালন করতে দাও। না হলে তোমার দাদার কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।

প্রশান্ত এতক্ষণে সরাসরি গৌরীর দিকে তাকাল। বলল—কি করবে?

—মাকে নিয়ে এসে শেরগড় হাসপাতালে ভর্তি করে দেবো। তোমার দাদা থাকলে সেও ঠিক এই কাজটিই করতো। বলো—ব্যবস্থা করবো?

—বেশ। তাই কর।

গৌরী শাড়িটা বদল করে ওকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গেল।

বলল—দাদা! এইটি আমার দেওর। শাশুড়ির ভীষণ অসুখ। ওঁকে শেরগড় হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন।

ডাক্তারবাবু প্রশান্তর নাম, লেখাপড়া, রোগিনীর বিবরণ ইত্যাদি জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় ফরম পূরণ করে এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিলেন। ফরমে ম্যানেজারের সহির দরকার ছিল। সেটা কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ মিঃ চৌধুরী ম্যানেজার। তিনি অনন্ত গৌরী দুজনকেই চেনেন। অফিসেই ছিলেন। গৌরী ওকে ফরমটা দিতেই সহি করে দিলেন।

হরিলাল বাউরী এম্বুলেন্স ড্রাইভার। তাকে গিয়ে বলল, হরিদাদা আমার দেওরকে নিয়ে যাও। শাশুড়ি মাকে এনে হাসপাতালে ভর্তি করে দিও।

প্রশান্ত বলল—তুমি যাবে না?

গৌরী চুপ করে রইল। প্রশান্ত আবার বলল—তুমি গেলে ভালো হতো। আমি হাসপাতালের কিছু জানি না।

গৌরী বলল, যেতে তো মন চায়। কিন্তু কি করবো? উনি আমাকে সহ্য করতে পারবেন না। তখন যদি বলে বসেন হাসপাতাল যাবো না। তাহলে কি হবে?

প্রশান্ত একটু ভেবে বলল—তুমি যদি পরিচয় না দাও তাহলে মা জানবেন কি করে?

—আমার পরিচয় গোপন রাখতে পারবে? বলে দেবে না?

—না। আমি বলবো না।

হরিলাল সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওর জানতে কিছুই বাকী নেই। বস্তুত গৌরী ও অনন্ত কলিয়ারীর মধ্যে এত আলোচিত চরিত্র যে প্রায় সবাই জানে।

সে বলল—তোমার অত কথা বলবার কি আছে দিদি? বলবে আমি ডিসপেনসারীর আয়া বটি।

গৌরী বলল—এই আমার ভাগ্য! নিজের শাশুড়ির কাছেও সত্য পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবার জো নেই। যাক গে—তোমরা যাও। আমি বাচ্চাটাকে খাইয়ে দাইয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি। তোমরা ততক্ষণে নিয়ে এসো।

গৌরী একা। খুব অন্যমনস্ক। এক তো অনন্তর ভাবনায় চোখে ঘুম নেই। আজ আবার তার মায়ের এই খবর। কর্তব্যকর্ম তার বুদ্ধিতে যতটুকু কুলিয়েছে করেছে। এবার অনন্তর খোঁজে কলিয়ারী তোলপাড় করতে হবে। এই আসছে—এই আসছে করে প্রহর গুণে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

ফিরতি পথে ওদের কর্মীদের ঘরে ঘরে খোঁজ নিল। যেসব লুকিয়ে থাকার জায়গা আছে তার অন্বেষণ করল। তারপর হতাশ হয়ে ফিরল। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ছেলেটি কেঁদে কেঁদে ন্যাতা হয়ে গেছে। যাবামাত্র ওর মায়ের বকুনি খেল।

ও প্রথমে কিছু বলল না। ছেলেকে দুধ খাওয়াতে বসল। কিন্তু ওর মায়ের বকুনি থামছেই না তখন ধমক দিল—ক্যোনে চেঁচাছিস? ছ্যোলা কাঁদল ত কি হলো? ঘরে তুরা এতগুলা ম্যোয়ালোক রইছিস। চুপ করাতে লেরেছিস। আমার এখন এমনি হবেক। ছ্যোলা তুরা সকলে রাখবি।

ওর মায়ের মুখ বন্ধ হলো। ছেলেকে খাইয়ে, দাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে গেল বৈশাখীর কাছে। বলল—ভোজী! ছ্যোলাটিকে তুঁই রাখিস। আমার এখন ভাবনার শেষ নাই। উয়ার বাপের খবর পেলম নাই। ঈদিকে শাশুড়ি নাকি মরছে। উয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করতে যাব।

বৈশাখী ওকে ভরসা দিল। তখন ও স্নানাহার করে রামজীকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালে গেল। যেতে আসতে দু-আনা করে চার আনা ভাড়া। সেইটুকু পয়সা বাঁচাতে একঘণ্টা পদযাত্রা।

কাগজপত্র সব ঠিকঠাক ছিল। পরিচিত লোকজনও ছিল। ভর্তি করতে অসুবিধা হলো না। ডাক্তারবাবু পেসেণ্ট দেখে বললেন—আজ আর কিছু করার নেই। কাল সকালে ব্লাড, ইউরিন, স্টুল পরীক্ষা হবে। এক্সরে হবে।

গৌরী জিজ্ঞেস করল—উনি ভালো হবেন তো?

—আশা করি।

ডাক্তারবাবু হাঁটতে শুরু করে দিলেন। ওঁর পিছনে পিছনে ওরা করিডরে এল। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল।

প্রশান্ত বলল—কি হবে বৌদি?

এই প্রথম প্রশান্ত ওকে বৌদি বলে সম্বোধন করল। দুজনকে দেখাচ্ছিল

ভাই-বোনের মতো। গৌরী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল—ভাবছো কেন? কাল ডাক্তার সেনকে নিয়ে আসবো। আমার অনেক পরিচিত লোক আছে।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। চল মায়ের কাছেই যাই।

ওরা দুজনে জাহ্নবীদেবীর কাছে এসে দাঁড়ল।

প্রশান্ত বলল—মা! তুমি ভালো হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু বলেছেন।

—তোর দাদা এল না?

—আসবে। তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না। দাদার এখন অনেক কাজ।

গৌরী ওর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। উনি বললেন—তুমি কে মা?

—আমি আয়া!

ওরা অনেকক্ষণ বসে থেকে ফিরে এল।

বাইরে বেরিয়ে প্রশান্ত বলল—রাত হয়ে গেল বৌদি। বাড়ি ফিরবো কি করে?

—তার কি দরকার? কলিয়ারীতে থেকে যাবে।

—কলিয়ারীতে কোথায় থাকবো?

—আমরা যেখানে আছি। তুমি আমার লক্ষ্মণ দেওর। ভাত রেঁধে খাওয়াবো। দুনিয়া ঘরে খেলে জাত যাবে না তো—

গৌরী মুখ টিপে হাসল। প্রশান্ত বলল—ঠাট্টা করো না বৌদি। আগে তোমাকে যাই মনে করি এখন কিন্তু সত্যিকারের বৌদি বলে মনে করছি। তোমার রাঁধা ভাত খেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ ধাওড়া ঘরে থাকা—ওরে বাপ!

গৌরী খিল্ খিল্ করে হাসল। এতক্ষণে ওর স্বভাবচপল কৌতুকপ্রিয় ভঙ্গীটি ফুটে উঠল। চলতে চলতে প্রশান্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—আহা! সাধের দেওর আমার। তোমার কোনো ত্রুটি রাখবো না।

—হাসছো বৌদি! এত কষ্টেও তোমার হাসি বেরোয়?

—হাসতে পারলে দুঃখ-কষ্ট তোমার মন থেকে পালাবে? ভেবো না—আমি তোমার পাকা ব্যবস্থা করবো। থাকবার খাবার ভালো জায়গা।

—সেটা কোথায়?

—অগ্রদূত মেসে। তোমার দাদার সিটটা তো আছে। ঐ ঘরে শৈলেন থাকে, তার কাছেই জিম্মা করে দিচ্ছি গে। চলো।

তারপর সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলতে বলতে ওরা এক ঘণ্টার পথ হেঁটে এসে অগ্রদূত মেসে প্রশান্তর জায়গা করে দিল। সবাই ওকে বৌদি বৌদি করে। তাই বসে আড্ডা মেরে, চা খেয়ে বেরুল। রামজীকে বলল—দাদা! আমি একবার ডি. ডি. সাহেবের বাংলোতে যাচ্ছি। বিউটিদিকে বলে আসি।

একান্ন

কখনো কি ভোর হবে না? এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার রাতটা কখনো কি ফুরোবে না! এক ফোঁটা আলোর মুখ দেখতে পাবো না? গৈরী, বিপ্লব আমার ভালোবাসা এবং ভালোবাসার ফল কি কোনোদিন আমার সামনে এসে দাঁড়াবে না? আমি কি আমার গর্ভধারিনী জননীর ক্ষমা না পেয়েই মরব? আমার অপরাধী আত্মার কি সদগতি হবে?

একটির পর একটি জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে জেগে উঠছে। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে অন্ধকার রাজ্যে পড়ে আছে। এবার বুঝি ফসিল হয়ে যাবে।

আজ কদিন হলো?

কে জানে!

এখানে তো সূর্যোদয় হয় না। নিরয়ণ কালচক্র গতিহীন, শব্দহীন অন্ধকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি ভীষণ অন্ধকার। কি বিকট নৈঃশব্দ। কোথাও কোনো প্রাণের সাড়া নেই। কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই। সে যে বেঁচে আছে এই বোধটাই ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

স্মৃতিটা এখনো আছে। পর পর সব কিছু ভেবে নিতে পারে সে।

হ্যাঁ! সে তো ভাবতেই হবে। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ প্রাণ ধারণের চেষ্টা করতে হবে। এমনভাবে ইঁদুর বিড়ালের মতো ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারাতে পারে না। এই একটা প্রাণের অনেক দাম। তার উপর নির্ভর করে আছে সংসারের অনেকগুলি প্রাণী।

সেদিন মিটিংয়ের পর রঘুবীর ভুঁইয়ার ধাওড়াতে আত্মগোপন করেছিল। সরল বিশ্বাসে রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে একটি খাটিয়াতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভয় ছিল পুলিশকে। কিন্তু বিরাট কুলি ধাওড়ার অসংখ্য গলি ঘুঁজি লোকজনের মধ্যে কোথায় অনন্ত আছে তা তাদের পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। যদি বিশ্বাসঘাতকতা না হয়।

সেই বিশ্বাসঘাতকতা হলো। তবে পুলিশের হাতে না দিয়ে তিলক সিংয়ের হাতে ওকে তুলে দিল। তিলক সিং মানেই সভিপ্রসাদ মানেই মিঃ শ'। সরল অঙ্ক। বিউটি তাকে সরলভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিল। বুদ্ধিমান ছাত্র হিসেবে তার যত বড়াই ভেঙে দিল অর্ধশিক্ষিত মাইনিং সরদার।

মাত্র চারজন লোক তাকে খাট সুদ্ধ বেঁধে ফেলল। মুখে কাপড় গুজে দিল। কাপড় ঢাকা দিয়ে শবদেহ বহনের মতো করে নিয়ে গেল। হরিধ্বনিটা দিলেই ভালো করত।

আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিল কিন্তু প্রতিরোধের উপায় ছিল না। চোখ বাঁধা ছিল বলে দেখতেও পায়নি। শুধু অনুভবে বুঝতে পেরেছে কোনো একটা চানক দিয়ে নীচে নামিয়ে তাকে খাদের ভিতর বন্দী করা। খাদটা

নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত। কোথাও কোনো প্রাণের সাড়া নেই। বাতাস খুবই সামান্য। বিষাক্ত গ্যাস বোধ হয় নেই। তাহলে ও বেঁচে থাকতো না।

মাঝে মধ্যে তিলক সিং নিজেই আসে। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে। ওর সঙ্গে একজন আসে হাতে হাতিয়ার নিয়ে ওর বডিগার্ড হয়ে। তাকে সে চেনে না।

প্রথমদিন তিলক সিং খাবার নিয়ে এসে বলল, নমস্কার অনন্তবাবু।

আগে খাইয়ে নেন তারপর কথা হবে।

সেই প্রথম দর্শনেই ষড়যন্ত্রের পুরো ছকটা ও বুঝে ফেলল। কোনো উত্তেজনা না দেখিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে খেয়ে নিল। কারণ শরীর ধারণের জন্য খাবার বিশেষ প্রয়োজন। একমুঠো ভাত মানে একদিন বাঁচার আশ্বাস।

ভালো তরকারি দিয়ে ভাতগুলো খেয়ে ঘটি ভর্তি জলটা খেল।

তিলক সিং বলল, আমার অপরাধ নেবেন না বাবুজী! অনেক দিক ভেবে চিন্তে আপনাকে আটক করতে বাধ্য হয়েছি।

অনন্ত বলল—আপনি এজেণ্ট সাহেবের বংশবদ ভৃত্য। তার হুকুম তামিল করেছেন। এতে আমার কি বলবার আছে?

—বাবুজী। আমার একটা কথা আছে। যদি মানেন তবে এখনি আপনাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো।

অনন্ত নিরাসক্ত ভঙ্গীতে বলল—বলুন।

—আপনার আমার লড়াই কোম্পানীর বিরুদ্ধেই। আমি আপনারও দুষমন নই। লেবারেরও দুষমন নই। সেজন্য আপনার আমার মধ্যে একটা সমঝোতা হলে পুরো কলিয়ারীর চেহারা বদলে যাবে।

অনন্ত ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। ক্যাপল্যাম্পের আলোতে ওর মুখের রেখা পড়বার চেষ্টা করল। ওর সঙ্গীটিকেও দেখল। হাতে ভোজালি নিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে।

বলল—আমার কতটুকু ক্ষমতা?

—লেবাররা আপনার কথা মানে, বিশ্বাস করে। তারা স্ট্রাইক করবে।

—তা কেন বলছেন? আমি তো কর্মীমাত্র। স্ট্রাইক কল করেছেন ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি।

—ওরা অনেক দূরের মানুষ। লেবাররা চেনে না। তারা আপনাকে আমাকে চেনে। তাই বলছি আপনি একটা পয়েণ্টে রাজী হয়ে যান।

—কি পয়েণ্ট?

—স্ট্রাইক সমর্থন করবেন না।

—তাহলে কি হবে?

—দেখুন স্ট্রাইক করলে লেবারদের দুর্গতির শেষ থাকবে না। এমনিতেই

তো ওরা খেতে পায় না। তারপরে স্ট্রাইক হলে না খেয়ে মরবে। এত লোককে কি খাওয়াবেন ? তখন তো ওরা আমাদেরই রক্ত খাবে। আমরাই তো ওদের স্ট্রাইক করার প্ররোচনা দিচ্ছি।

—কিন্তু আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। লড়াই করতে হলে ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্য। সে পরিণতির কথা সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা তা মেনে নিয়েছে। এখন আমরা দুজন মত বদল করলেই যে সবাই মেনে নেবে তা কেন ভাবছেন ? তখন অন্য কেউ নেতৃত্ব দেবে। আমরা হব বিশ্বাসঘাতক।

তিলক সিং একটু ভেবে বলল—না। দেবেন সেন ছাড়া কি নেতা নেই ? আমরা অন্য ইউনিয়ন গড়বো। কোম্পানীর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে যাবে। তারা আমাদের দাবি মেনে নেবেন। স্ট্রাইকের আগেই যদি আমাদের দাবি স্বীকৃত হয় তবে তো জিৎ আমাদের।

অনন্ত হেসে ফেলল। কোম্পানী অনেক বড় বড় ঘুঘু অফিসার পুষে রেখেছেন আমাদের মগজ ধোলাই করতে। তারা আপনাকে ভালোই মন্ত্র দিয়েছেন। কিন্তু তিলকবাবু দাবিই যদি মেনে নেবেন তবে লড়াইয়ের ময়দানে ঠেলে দেবেন কেন ?

—সেটা ওদের নীতিগত ব্যাপার।

অনন্ত আবার মনে মনে হাসল। মিঃ শ' এ লোকটির মগজ ভালোই ধোলাই করেছেন। আমি রাজী হলেই একটি বিশ্বাসঘাতকের গ্রুপ তৈরি হয়ে যাবে। তখন কণ্টকে নৈব কণ্টকম্।

জিজ্ঞাসা করল, আমাকে তো আটকে রেখেছেন। আমার স্ত্রীকে কি করেছেন ?

একহাত জিভ কেটে তিলক সিং বলল—ছিঃ ছিঃ। কি ভাবছেন আপনি ? গৌরী আমাদের বোন। তার কিছু ক্ষতি করতে পারি কি ? সে ঠিক আছে।

ধন্যবাদ তিলকবাবু।

—বলুন অনন্তবাবু। আমার প্রস্তাবে আপনার কিসের আপত্তি ?

কিসের যে আপত্তি তা ওকে বোঝালেই কি বুঝবে ? ও তো গুরুমন্ত্র পেয়ে গেছে। এখন তারই ধ্যান করছে। সামনে বড় রকমের প্রলোভন অবশ্যই আছে। কিন্তু দলবদল করে, ঝাণ্ডা বদল করে ফায়দা লুটবার মনোবৃত্তি সে অর্জন করতে পারেনি। যে নীতি ও আদর্শ সামনে রেখে সে শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছে তাকে ঝেড়ে ফেলবে কি করে ? তা কি অত সহজ ?

কিছু আদর্শই যদি না থাকত তবে সে আজ ছোট সাহেব হয়ে যেত। কুলি ধাওড়ার নোংরা ঘেন্নায় বাস করতো না। তার ছেলেকেও ভাতের ফেন খাওয়াতে হতো না। গৌরীকেও দারিদ্র্যের বিজ্ঞাপন মার্কা বগল ছেঁড়া ব্লাউজ পরে ছেঁড়া শাড়ি টেনে বেড়াতে হতো না।

—কি ভাবছেন ?

—ভাবছি আমি তো শ্রমিক নেতা ছিলাম না। তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে আন্দোলনে অংশ নিয়েছি। কাজ যা করেছি তার প্রচার হয়েছে বহুগুণ। তাই আপনারাই আমাকে সেক্রেটারি করেছেন। সুখে-দুঃখে কাজ করেছি। কতটুকু শ্রমিক ঐক্য গড়তে পেরেছি জানি না। কিন্তু আমি তো সব ত্যাগ করেছি। আমার নিজস্ব জীবন আছে। স্ত্রী পুত্র মা ভাইবোন আছে। তাদের প্রতি কর্তব্য আছে। আমার পথও খোলা আছে। অনায়াসেই সেকেণ্ড ক্লাস পাস করতে পারি। তখন আমার জীবনের ধারাটাই বদলে যাবে। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য যে কাজ শুরু করেছি তা থেকে পিছু হটতে পারি না। বিশ্বাস-ঘাতকতা তো নয়ই। তাতে যদি এই খাদেই আমার সমাধি রচিত হয় তবুও।

তিলক সিং কিছুক্ষণ ভাবার পর বলল—তাহলে আপনাকে স্ট্রাইক শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে। তাছাড়া আমার উপায় নেই।

—এখন আমার জীবনটাই আপনার হাতে। যা ভালো বুঝবেন করবেন।

—আচ্ছা। নমস্কার।

তিলক সিং চলে গেল। তারপর আবার নিবিড় অন্ধকার। কয়লার মেঝেতে শুয়ে থাকে। আকাশ পাতাল ভাবে। সবচেয়ে বেশী ভাবনা গৌরীর জন্য। তার উপর কোনো অত্যাচার হচ্ছে না তো ? তিলক সিং মুখে যে কথা বলে গেল তা কি বিশ্বাস করা যায় ?

না জানি আরো কত মূল্য দিতে হবে ?

তা হোক। যে কোনো মূল্য দিতে সে রাজী। আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার প্রস্তুতি তার আছে।

কিন্তু তার পরেও কি আন্দোলন সফল হবে ? ষড়যন্ত্রের শিকড় যত গভীরে প্রসারিত হয়েছে তাতে কি বিশ্বাসঘাতকের দলকে সিকড় শুদ্ধ তুলে দামোদরে ভাসিয়ে দিতে পারবে ? আরো কত তিলক সিং তৈরি হয়েছে কে জানে ? সব কলিয়ারীতেই ওরা ছড়িয়ে আছে। ষড়যন্ত্র করছে। স্ট্রাইক যদি বানচাল করতে পারে তবেই তো শ্রমিকের মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। আবার কবে কতদিন পরে তাদের মেরুদণ্ড সোজা হবে কে বলতে পারে ?

হবে না—এই পোড়া দেশে মানুষের মান ইজ্জত থাকবে না। একদিন বেইমান মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বণিক রাজা হলো। সেই মীরজাফরের দল বার বার ফিরে আসছে। নূতন রূপে। মানুষের ইমান না থাকলে মান কোথা থেকে আসবে ?

এমন ভাবনা অনেক ভাবা হয়ে গেছে কত দুর্ভাবনা জর্জরিত হয়েছে। কিন্তু এই ড্যাম্প লাগা খাদের বাতাস, ঠাণ্ডা স্যাঁৎ স্যেঁতে কয়লার মেঝে, নিবিড় কালো অন্ধকার, প্রাণহীন পাতালপুরীর গভীর নৈশব্দ্য তার চিন্তা জগতের উপরে আস্তে

আস্তে ভারী শিলাস্তর চড়িয়ে দিচ্ছে। সে ভাবতেও পারছে না। ক্রমাগত অর্ধাহারে শরীরও অবসন্ন। চোখ বুজে পরে আছে। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

হঠাৎ মনে হলো অনেক দূরে এক বিন্দু আলো। চোখ দুটো ড্যাব ড্যাব করে তাকাল হ্যাঁ। সত্যিই তো! আসছে—একটা আলো আসছে। একটা নয় দুটো! ওরা কারা? উঠে বসল।

দুটো আলো কাছে এল। ওর কাছে এসে দাঁড়ালেন ডি. ডি. সাহেব এবং মিঃ শ'।

অনন্ত কথা বললো না। কয়লার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নির্জীব ভঙ্গীতে শুয়ে রইল। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরুলো। একদিন এই ডি. ডি. সাহেবের জন্য ও জান কবুল করেছিল। খাদের ভিতর বিষাক্ত গ্যাস থেকে টেনে তুলেছিল। তাই বুঝি সর্বনাশের পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন।

ডি. ডি সাহেব বললেন—অনন্ত! কেমন আছো।

—ভালো আছি।

মিঃ শ' বললেন—মাইগড! এখানে তুমি ভালো আছ?

—হ্যাঁ স্যার। মাতা ধরিত্রীর গর্ভে বাস করছি—আলোহীন, শব্দহীন, আশাহীন হয়ে গর্ভস্থ ভ্রূণের মতোই। এতদিন কিছু ভাবনা, চিন্তা, অনুভূতি বেঁচেছিল তাও ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে।

—কিন্তু তুমি বাঁচলে—দারুণভাবে বাঁচতে পারো।

মিঃ শ'য়ের কথাটা প্রায় লুফে নিয়ে অনন্ত বলল—হ্যাঁ স্যার। তিলক সিং সে প্রস্তাব দিয়েছিল।

উনি উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন—তা নিয়ে ভেবেছো কি?

—ভাবনার কোষগুলো জ্যাম হয়ে গেছে স্যার। ভাববো কি?

—তোমার ওয়াইফের জন্য ভাবনা হয় না?

—কিসের ভাবনা? আমি মরে গেলে মাথায় ঝোড়া বয়ে খাবে। প্রথম প্রেমের ভাবালুতা দারিদ্র্যের আঘাতে কেটে যাবে।

—হাউ ফানি!

মিঃ শ'য়ের বিস্ময়সূচক ধ্বনি অনন্তের কানে ব্যাঙের মতো শোনাল। ক্যাপল্যাম্পের আলোটা চোখে লাগছিল। তাকাতে পারছিল না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মিঃ শ' বললেন—কিন্তু ওকে যদি ভূত বাংলোতে তোলা হয়?

—সেটাই স্বাভাবিক। আপনার মতো মানুষ এর চেয়ে কোনো মহৎ চিন্তা করতে পারে না। আফটার অল ওর তো একটা বন্য সৌন্দর্য আছে। তাতে আপনি প্রলুব্ধ হবেন—এ তো জানা কথা।

—অনন্ত !

—কিন্তু স্যার ভূত ভোজন মরা মানুষের মাংস দিয়েই হয়। আপনার পরিকল্পনা গুণ্ডা বদমাইশ দিয়ে যদি সার্থক করতে যান তবে গৈরীর মুর্দা লাশটা পাবেন। তা দিয়ে ভালো রোস্ট হবে। নুন লঙ্কা দিয়ে খেতে পারেন।

—ননসেন্স !

ডি. ডি. সাহেব বললেন—আঃ অনন্ত ! কি আজে বাজে বকছো ? তোমার মা ভীষণ অসুস্থ। একেবারে মৃত্যুশয্যায়। সেটা নিয়ে ভাবো !

অনন্ত তার উত্তর দিল না। তার হৃদয়ে একটা নতুন শেল বিদ্ধ হবার জ্বালা অনুভব করল।

মিঃ শ' বললেন—তোমার মাকে দেখতে চাও না ?

—জননী-গর্ভধারিণী। তাকে কে না দেখতে চায় ?

—তাহলে তিলক সিংয়ের প্রস্তাব গ্রহণ কর।

—আপনি হয়ত জানেন না—আমি মায়ের পরিত্যক্ত সন্তান। তাকে চোখে দেখাই হবে কিন্তু কোনো উপকারে লাগব না ! তাহলে আর শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে বেইমানি করব কেন ?

—তুমি তোমার মাকে নিয়ে কলকাতা যেতে পার। মেডিকেল কলেজে ভর্তি কর। নিজের স্ত্রীপুত্র নিয়ে হোটেলে থাক। কোম্পানী সব খরচ দেবে।

—তারপর ?

—তারপর স্ট্রাইকের শেষে ফিরে আসবে। তোমার জন্য একটা বাংলো এবং প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যাণ্টের পোস্ট দেব। তোমার ভবিষ্যৎ তৈরি হয়ে যাবে।

অবসন্ন কণ্ঠে অনন্ত বলল—বড় চমৎকার প্রলোভন। কিন্তু স্যার—আমি নিজের ক্ষমতাতেই ফার্স্ট ক্লাস পাশ করে ম্যানেজার এজেণ্ট হতে পারি। তার জন্য আপনার মেহেরবানির দরকার নেই।

—কিন্তু তোমার স্ত্রীকে যদি রবিলালের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সে কি রকম বদলা নেবে বুঝতে পারছ ?

অনন্ত ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলল—আপনি কি আমার ভূত ভোজনের ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারেননি স্যার ? যে তার জীবনেরই পরোয়া করে না তাকে আর কিভাবে শাসানি দিতে পারেন ? সতীত্ব লুণ্ঠনের ? সে ভয় গৈরীর নেই। লুণ্ঠনকারীকে বল্লম দিয়ে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করতে পারে সে।

—ও কে ! তাই দেখা যাবে। বিষ কেমন ঝাড়তে হয় জানি।

ওঁরা চলে গেলেন।

তবু ওরা ছিল তো মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল। ওদের কাছে বাতিও ছিল। এখন আবার নীরব নিস্তব্ধ পাতালপুরীতে সে যেন ফাঁসির আসামী। হ্যাঁ। আসামীই তো ! খনি শ্রমিকদের আন্দোলন মালিক পক্ষের কাছে বিরাট

অপরাধ। অনন্ত সেই অরবাধে অপরাধী। এখন চলছে প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপার। এরপর সত্যিসত্যিই তা কাজে লাগানো হবে। গৈরীকে ধরে নিয়ে গিয়ে একপাল ক্ষ্যাপা কুকুরের সামনে ফেলে দেবে। তাকেও তিলে তিলে হত্যা করবে।

যা পারে করুক। তবু সে বেইমানী করবে না।

গৈরী পারে তো নিজের ইজ্জৎ বাঁচাক না হলে মরে যাক। কয়লাকুঠির কালো যবনিকায় কোরবানি হোক দুটি জীবনেব।

বাহান্ন

বন্ধ চানক। ব্রিটিশ আমলের এক নম্বর দামুলিয়া পিট। মাঝে দূরত্ব বেখে দুটি চানক। এক ও দু'নম্বর। প্রায় দুশো ফুট গর্ত। একদা এই খাদ থেকে প্রচুর কয়লা তোলা হযেছে। তখন ফাঁকা জায়গায় বালি ভরাটের ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য খোলা চাঙনি করে কয়লা কাটা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে শিলাস্তরে ধ্বস নেমেছে।

চানক দুটি আছে এবং এক থেকে দু'নম্বরে যাবার পথটাও আছে। প্রাকৃতিক কারণে বায়ু চলাচল হয়। এই পথটারই এক জায়গায় অনন্তকে রাখা হয়েছে। কাকপক্ষীরও টের পাবার জো নেই। এখানে আসা যাওয়াও সহজ ব্যাপার নয়। উপরে ইঞ্জিন বয়লার কিচ্ছু নেই হেড গীয়ারের পাল্লায় পুলিচাকা ফিট করে ক্রেনের তলায় বালতি লাগানো হয়েছে। হাতে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ক্রেন চালাতে হয়। চারজন লোক লাগে।

বালতিটা বড। তাহলেও দুজন লোক কোনোরকমে উঠতে পারে। মিঃ শ'য়ের সঙ্গে ডি. ডি. সাহেব। দুজনেই মরদ। গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করে চড়েছে। বালতি উঠছে ধীরে ধীরে। এদিক ওদিক দুলছে।

মিঃ শ' বললেন—ডি. ড়ি.! অনন্ত যখন রাজী হলো না তখন ওকে আটকে রেখে কি হবে? শেষ করে দিলেই হয়।

ডি ডি বললেন—সেটা কোনো ব্যাপার নয় স্যার। খাবার না পাঠালে আপসে মারা যাবে। দিন কয়েক পরে যখন উপবাসে প্রাণ যাই যাই অবস্থা হবে তখন আরেকবার তিলক সিংকে পাঠিয়ে খবর নিলেই হবে। রাজী হলে ভালো না হলে এখানেই সমাধি।

উনি একটু ভেবে বললেন—দ্যাটস রাইট।

অন্তক ওদের বাতির আবছা ছটা অনুসরণ করে হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে পিছনে আসছিল। মিঃ শ'য়ের কথাতে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তাতে তাকে হত্যা করাও হতে পারে। তাই একটু আলোর সন্ধান করতেই হবে।

ডি. ডি. সাহেবরা একটা বাঁক ঘুরে যাবার পরই চারিদিকে জমাট অন্ধকার।

বাতির ছটার ছায়া উপচ্ছায়াও নেই। তবু খাদে কাজ করার অভিজ্ঞতাতেই পায়ের শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে সঠিক বাঁকটি খুঁজে পেল। আর কি আশ্চর্য।

একবিন্দু আলো। উপর থেকে ঠিকরে পড়ছে নিচে। ও হামাগুড়ি দিয়ে যত এগোচ্ছে আলোর বৃত্তটি ততো পরিধিতে বাড়ছে। ধীরে ধীরে সে এসে পড়ল আলোর বৃত্তটির মধ্যে। দেখতে পেল একটি চানক। উপরের সূর্যরশ্মি নিচে এসে পড়েছে। উপরে হেডগীয়ার ও সেই বালতিটি দেখা যাচ্ছে। ওহো! এই তাহলে রহস্য।

কিন্তু এখানে উঠবে কি করে? কোনো উপায় কি বের করা সম্ভব?

চানক দিয়ে টুপ টাপ জল পড়ছিল। ঝির ঝির করে বাতাস বইছিল। সূর্যের আলো এবং কিছু শব্দ ছিল। এইসব নৈসর্গিক বস্তুপুঞ্জের মধ্যে কিছু শক্তিও নিহিত আছে। তারই প্রভাবে অনন্তর মনের অবসাদ কেটে যাচ্ছিল। অঞ্জলি পেতে জল নিল। খেল এবং মুখে চোখে দিল। পুরানো দিনের কাঠে ছাতু ফুটেছিল। কিরকম লতানে গাছের মতো শিকড় বাকড় ছড়িয়ে পড়েছিল। অনন্ত ভাবলো এগুলো কি খাওয়া যায় না?

খাবার থাক বা না থাক জল, বাতাস এবং আলো তো পেয়েছে। এই ঢের। এতেই সে উপরে উঠবার উপায় বের করবে।

গৈরী হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। মাথা খুঁড়ে মরছে। এত যে খোঁজাখুঁজি সব ব্যর্থ। কোথাও একটা সূত্র বের করতে পারছে না। ডি. ডি. সাহেব বলেছিলেন —খবর পেলেই জানাব। তা জানাননি। হয়ত জানাবেন না। বিউটিদির সঙ্গে দেখা করা যাচ্ছে না। দিনমানে যাবার ভরসা নেই। হাজার লোকের নজর তার উপরে। রাত্রে বাঘের ভয়।

সেই উদভ্রান্ত অবস্থাতেও ও হাসপাতালে গেছে শাশুড়ির খবর নিতে। রোজই যায়। চিকিৎসা চলছে। এক্স রে হয়েছে। ডাঃ সেন বলেছেন পেটে টিউমার। অপারেশন করতে হবে। দিনকয়েক দেখে নিই। তুই ঘাবড়াস না গৈরী। তোর শাশুড়িকে ভালো করে দেব।

জাহ্নবীদেবী সেদিন একটু সুস্থ ছিলেন। গৈরীকে দেখে চোখদুটি উজ্জ্বল হলো। গৈরী বলল—আজ কেমন আছেন মা?

—ভালো আছি।

—ডাক্তারবাবু আপনাকে ভালো করে দেব বলেছেন।

—তোমারই কৃতিত্ব মা। প্রশান্ত আমাকে সব বলেছে।

গৈরীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তবে কি প্রশান্ত ওর পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছে? কপটতা ও মিথ্যাচারের সঙ্গে অভিনয়ও এসে পড়ে। তাই সে মনের আশঙ্কা চেপে রেখে মুখে হাসি টেনে বলল—কি যে বলেন মা? আমি কি করেছি?

—বাঃ রে। তুমিই তো আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছ। প্রশান্ত বলেছে—দাদার সঙ্গে দেখা না হলে কি হবে? তুমি বলেছ—অনন্তবাবু পাঁচ হাজার শ্রমিকের নেতা। তাঁর মা যদি বিনা চিকিৎসায় মরেন তবে আমরা কি জন্য আছি? আমি দেখাশুনা করব।

গৌরী মনে মনে হাসল।

জাহ্নবীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—অনন্তর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

—হ্যাঁ মা। ওঁর সঙ্গে কার না পরিচয় আছে?

—তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয় না?

—এখন কদিন হয়নি। বোধ হয় পার্টির কাজে বাইরে গেছে।

ওঃ। তাই বুঝি আসেনি।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইলেন। গৌরী ওঁর বিছানাটা ঝাড়াঝাড়ি করে টুলটার উপর বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। জাহ্নবীদেবী বললেন, তোমার ছেলেমেয়ে কটি?

—একটি ছেলে।

—স্বামী কি করে?

—কলিয়ারীতে কাজ করে।

—লেখাপড়া জানো?

—হ্যাঁ মা। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছি।

—ইস্। আর এক বছর পড়লেই ম্যাট্রিক পাশ করে যেতে।

—বিয়ে হয়ে গেল মা। তবু হতো। বাচ্চাটা পেটে এসে গেল।

এমনিই হয়। মেয়েদের জীবনে কত যে বাধা বিপত্তি। তবে তোমার স্বামী সন্তান আছে। তাদেরকে নিয়েই জীবন পূর্ণ হবে।

—সেই আশীর্বাদ করুন মা।

—হ্যাঁ মা। তোমাকে আমি হিয়া খোলসা করে আশীর্বাদ করছি।

গৌরী ওঁর পায়ে মাথা ঠেকাল। ভিতরটা দুরু দুরু করছিল।

উনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা মা অনন্তর বউকে তুমি চেনো?

একটু থতমত খেয়ে গৌরী বলল, হ্যাঁ মা।

—সে কেমন মেয়ে?

—এমনি আমার মতোই।

—তুমি তো সোনার মেয়ে।

গৌরী হাসল। আনন্দও হলো। উত্তর দিল না।

উনি বললেন—অনন্তর বউ কি করে?

—স্বামীর সঙ্গে ইউনিয়ন করে।

—ঐ ইউনিয়ন করতে গিয়েই বুঝি ওদের ভাব ভালোবাসা?

এ প্রশ্নের উত্তর গৌরী ছাড়া আর কে জানে? কিন্তু নিজের ভালোবাসার কথা কি শাশুড়ির কাছে বলা যায়?

বলল—ভাব ভালোবাসা কখন যে কিভাবে হয় তা কে বলতে পারে মা? তবে আমি জানি ওঁদের খুব সাচ্চা ইমানের ভালোবাসা এবং তার জোরেই লড়ে যাচ্ছে! খুব ভালো মেয়ে মা।

নিজেকেই নিজে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিল। কারণ মায়ের মন ভেজাতে হলে এমনি কথাই বলতে হয়। ও এখন কথা বলতে শিখে গেছে।

উনি বললেন—কি ভালো মেয়ে? বিবাহিতা মেয়ে। তার স্বামী ছিল।

সে তো ছ'বছর বয়সের কথা। বিয়ের মর্মই বুঝতো না। বাপ মায়ের এমন করে বিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। কত সমস্যা দেখুন। ভালোবাসা রাখে না স্বামী রাখে? ওর সাহস আছে তাই ভালোবাসা রেখেছে। এতে অন্যায় কি মা?

—কি জানি মা? আমাদের গোঁড়া হিন্দুয়ানী স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে ভালোবাসা সমর্থন করে না। আমিও করি না।

গৌরীর মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। ভীষণ দুঃখ বোধে ভিতরটা টন টন করছে। তাদের ভালোবাসায় মায়ের সমর্থন নেই। মা সেকথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন। এই জন্যই বুঝি অনন্ত ওকে বলেছিল আমি না বললে মায়ের কাছে মুখ দেখিও না।

তবু ওকে মুখ দেখাতে হলো। পরিস্থিতি সেরকম হয়ে উঠল বলেই। ভাগ্যিস মা তার পরিচয় জানেন না। কিন্তু কেউ যদি বলে দেয় তাহলে মুখ দেখাবে কি করে?

জাহ্নবীদেবী বললেন, কত সাধ আহ্লাদ ছিল ছেলে পাশ করে ম্যানেজার হবে। সৎকুলে বিয়ে দিয়ে বউ আনবো। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অমন বুদ্ধিমান ছেলে কি করল? একটা ছোটলোকের মেয়েকে বিয়ে করে মুখে চুনকালি দিল। দ্বিতীয় পক্ষের কনে। আমাদের গাঁয়ের বাউরীরা যাকে স্যাঙ্গা বলে তাই করলো বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের ছেলে। সংসারের কথা ভাবল না। মায়ের ব্যথা বুঝল না।

গৌরীর মনে হচ্ছিল একটা গরম ছুরি মাংস কেটে কেটে বুকের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। এবার বুঝি কলিজাটাকে কেটে বের করবে। মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছিল। ঘোমটা আরো খানিকটা টেনে বেডের উপর ভর দিয়ে বিকৃত মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

উনি বললেন—শুনেছি বাচ্চা হয়েছে। অনন্তর ছেলে। আমাদের বংশ প্রদীপ। কে না নাতির মুখ দেখতে চায়? আমিই এক পাষাণী মা। ছেলে বউ নাতিকে পর করে দিলাম। তাই তো অনন্ত আসছে না।

উনি কাঁদছিলেন। আর গৈরীর সর্বসত্তা থর থর করে কাঁপছিল। বলতে যাচ্ছিল না মা। সেজন্য নয়। আপনার ছেলের কোনো খোজ নেই। কিন্তু বলতে পারল না। কি যেন গলায় আটকে গেল। দলা পাকানো কফ অথবা নিখাদ অশ্রু প্রবাহ।

বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিজেকে একটু সামলে নিল। বসে আছে। হঠাৎ খট্ খট্ শব্দে চমকে উঠল।

মুখ তুলে দেখলো অতি উগ্র ড্রেস পেণ্ট করে বিউটি তার খুব কাছে এসে গেছে। ধড় ফড় করে দাঁড়িয়ে বলল—দিদি।

—বাইরে আয়।

বলেই ও হিল তোলা জুতো খট্ খট্ করে বেরিয়ে গেল।

গৈরী বলল—ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসি মা।

—উনি কে মা?

—আমাদের ছোট সাহেবের মেমসাহেব।

দুপাশে সারি সারি রোগিনী। মাঝে পথ। আট দশটা বেডের পর দরজা। বিউটি কড়িডর দিয়ে বারান্দার ও প্রান্তে চলে গেছে। গৈরী তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ দেখাচ্ছিল দুজনকে মেমসাহেব ও তার আয়ার মতো।

বিউটি বলল, কিরে? কাঁদছিলি কেন।

—আপনি দেখে ফেলেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ উনি তো শাশুড়ি।

—হ্যাঁ।

—শাশুড়ি বউয়ে ভাব হলো তাহলে।

—না দিদি। ওঁকে আমার পরিচয় দিইনি। উনি তো আমাদিকে সমর্থন করেন না।

—ওঃ। যাক্ গে এসব কথা। শোন তোর জন্যই আসা। অনন্তর খবর আছে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। ভালো করে বুঝে নে। তিলক সিং ওকে দু'নম্বর খাদের ভিতর ঢুকিয়ে রেখেছে।

গৈরী আশ্চর্য হয়ে বলল—সেখানে ডুলি, ইঞ্জিন কিছুই নেই। নামল কি করে?

—সে ওরা ক্রেনের সঙ্গে রসা বালতি ফিট করে নামা ওঠার ব্যবস্থা করেছে। উপরে পাহারা দেবার লোক আছে।

—তাহলে উদ্ধারের উপায়?

—সে ভাবনা তোদের। আমার নাম যেন গোপন থাকে। তাড়াতাড়ি করবি। ওর জন্য খাবার বন্ধ করে দিয়েছে।

—আচ্ছা দিদি।

বিউটি খট্ খট্ করে চলে গেল।

একটি খবর। কিন্তু যেন বিদ্যুৎ প্রভা। গৈরীর মাথা ঘুরে গেল।

ওঃ বেইমান তিলক সিং।

না। আর একমুহূর্তও সময় নেই। জাহ্নবীদেবীর কাছে গিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি মা। খুব জরুরি কাজ আছে।

রাত নিঃঝুম। বাচ্চা কাচ্চারা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দুনিয়াধাওড়া শুন্‌শান্। চবুতরা ফাঁকা। ফাটকবাজার বন্ধ। কলিয়ারীর ঢাউস প্রপেলার ফ্যানটা চলছে গোঁ গোঁ শব্দে। স্ক্রিনিং প্ল্যান্টের ঘটাং ঘট শব্দ উঠছে। দামোদরে সেদিন ভীষণ বান এসেছিল। তারও ক্রুদ্ধ গর্জন যান্ত্রিক শব্দপুঞ্জের ওপর গুড় গুড় শব্দের এক নূতন মাত্রা যোগ করেছে।

তখন গৈরীর সেই ঘরটিতে গুম হয়ে বসে আছে গৈরী, গুলু, জগদীশ, হরেরাম, রামজী। গৈরী খবরটা দিয়ে ওদের দিকে তাকাল।

হরেরাম বলল, আজ সকালে এজেন্ট সাহেবের সঙ্গে ডি. ডি. সাহেব ওই খাদে গেইছিল। তখন বুঝতে লেরেছি ঈবারে বুঝছি ক্যেনে উখাদে নেমেছিল।

জগদীশ বলল, মনে হচ্ছে খবর পাকা। কারণ বেশ কিছুদিন থেকে লোক পাহারা আছে। তা আমি দেখেছি।

গৈরী বলল, খবর একদম পাকা। এখন উদ্ধারের উপায় বল।

গুলু বলল, কাল ভোরেই সুমিতবাবুর কাছে যেতে হবেক?

হরেরাম বলল—তাতে কি হবেক?

—লোকজন নিয়ে দু'নম্বর চানক ঘেরাও করে উঠতে হবেক।

জগদীশ বলল, এজেন্ট সাহেব সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এনে ডাণ্ডা মেরে সবাইকে ভাগায়ে দিবেক। ক্রেন, রসা, বালতি খুলে দিবেক। অনন্ত খাদের ভিতর শুকাঞে মরুক।

গৈরী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, তাহলে কি উপায় হবেক? উয়ারা তো খাবারও বন্ধ করে দিঞেছে।

জগদীশ বলল—উপায় আমি করব—য্যায়সাকে ত্যায়সা দাওয়াই দিঞে আমি উয়াকে নিঞে আসব। আজকার রাতটি যেতে দে। এক দিন উপস দিলে মানুষ মরে না। কাল রেতে জরুর বাঘের খেল দেখাঞে দিব। শালা তিলক সিং! দেখবো কত মরদ বাটিশ তুই।

ডিপার

দু'নম্বর চানকের ভাঙা ইঞ্জিন ঘরের মেঝেতে চার পাঁচজন পাহারাদার মদে মাতাল হয়ে ঘুমোচ্ছে। তাদের কাছে দুটো বন্দুকও আছে। ক্রেনের কাছে দুজন এবং চানকে দুজন পাহারাদার মোতায়েন আছে।

তখন রাত একটা। চারবাজা পালির লোকজন আপন আপন বাসায় ফিরে এসেছে। রাতপালির লোকেরা খাদে নেমে গেছে। এখন ফাঁকা অবসর। এমন ক্লান্তি ও অবসাদে আচ্ছন্ন প্রহর তো সারাদিন রাতের মধ্যে নেই। রাত একটা থেকে ভোর চারটে। তার মধ্যেই কাজ হাঁসিল করতে হবে।

জগদীশের এসব কাজে অভিজ্ঞতা খুব পাকা। হাতও পাকা। ভালো গুরুর কাছে কাজ শিখেছে। বাল্যকাল থেকেই দুর্ধর্ষ চরিত্র। দাঙ্গা হাঙ্গামা ওর রক্তে। হাতে নাতে কখনো ধরা পড়েনি। পুলিশ সন্দেহ করেই ওকে হাজতে দিয়েছে, মামলা করেছে।

গত রাত্রে বৈশাখীর সোহাগে মন ভরে গিয়েছিল। ভোর থেকেই দল ঠিক করেছে। নানাভাবে খবরা খবর নিয়েছে। সন্ধ্যা থেকেই ওত পেতে বসে আছে। কখন সেই লগ্নটি আসে।

ঈশারামাত্র ওর লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল একসঙ্গে তিন জায়গায়। জগদীশ নিজে ঢুকল ইঞ্জিন ঘরে। চারজন পিস্তল হাতে মুখে কাপড় বাঁধা লোক বিদ্যুৎ বেগে ওদের বন্দুকগুলো দখল করে নিল। চটপট বাঁধা ছাঁদা করে একদিকে ডাঁই করে ফেলল।

ক্রেনের পাহারাদার দুজন লাঠি খেয়ে পড়ে গেছে। চানকের লোকটিকেও ধরে এক জায়গায় ঢুকিয়ে জগদীশ পাহারা বসিয়ে দিলো।

ততক্ষণে ক্রেন চালু হয়ে গেছে। জান মহম্মদ মিস্ত্রী চারজন লোক নিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরাচ্ছে। কালো বাউরী বালতিতে চড়ে নীচে লোল যাচ্ছে। গুলু ঘণ্টাওলা চানক মুখে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার উত্তরে ঘণ্টা দিয়ে সিগন্যালিংয়ের কাজ করছে। খাড়া পাহারায় মোতায়েন আছে গুরুনাম সিং।

পাঁচ মিনিটেই বালতি লোল হয়ে গেল।

চানকের কাছেই বসেছিল। দুদিন খেতে পায়নি। অনাহারে শরীর শিথিল হয়ে গেছে। তবুও সে পেয়েছে বাতাস। সূর্যের আলো তৃষ্ণার জল। ওতেই ওর স্নায়ুতন্ত্র সজাগ আছে। খিদেতে পেট কন্ কন্ করছে তবু মাথায় ঘুরছে উঠবার পরিকল্পনা। সেজন্য রাত একটাতেও ঘুম নেই। কান পেতে শুনছে উপরে ঘণ্টা মারার শব্দ। একটা বাতি নেমে আসছে বালতিতে ভর করে। চোখে লাগছে সেই আলো। মনটাও শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভাবছে যে লোকটা আসছে সে তো মৃত্যুদূত হতে পারে। না হলে মাঝরাতে নামার কি দরকার?

তাকে উদ্ধার করার জন্য যে কেউ আসতে পারে এটা ভাবতেই পারছে না। কিভাবে মৃত্যুদূতের মোকাবিলা করবে সেই ভাবনাটাই বড় হয়ে উঠেছে। দিনের বেলাতে সূর্য কিরণের আভায় যে কয়েকটা কাঠের টুকরো ও একটা লোহার প্লেট সংগ্রহ করে রেখেছিল হাতিয়ার করবার জন্য তারই একটা কুড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল। যে আসছে সে নিশ্চয় তার পুরানো জায়গাটিতে যাবে। তখন পিছন দিক থেকে আঘাত করবে।

কিন্তু শুনতে পেল খুব পরিচিত কণ্ঠস্বরে কেউ যেন ডাকছে—অনন্তবাবু।

চমকে উঠল। তারপরেই ভাবল সবাই তো পরিচিত। কে যে দুশমন তা চিনবে কি করে? শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

কালো বাউরী টর্চ জ্বেলে চারিদিক দেখল। ওকে তো এখান থেকেই অন্বেষণ শুরু করতে হবে। তাই আবার ডাক দিল। অনন্তবাবু!

বালতি থেকে নামল। এদিক ওদিক দেখতে এগিয়ে চলল।

অনন্ত ওকে চিনত পারল। মনে হলো কালো যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে পৃথিবীতে বিশ্বাস বলে কোনো বস্তু নেই।

সাড়া দিলো কে?

—আমি বাবু! চিনতে পারছো না? আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

—আর কে আছে?

—উপরে জগদীশ, হরেরাম, গুলু, গৌরী সবাই আছে। দু'নম্বর চানক আমরা দখল করেছি। জলদি চল।

—সত্যি তো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—অনন্ত আত্মপ্রকাশ করল। কালো ওকে ধরে বলল—চল বাবু। কোনো ভয় নাই।

বালতিতে চড়বারও ক্ষমতা নেই ওর। কালো ওকে পিছন থেকে ঠেলে তুলে দিলো। নিজেও চড়ল। ঘণ্টা মারল।

গুলু তৈরিই ছিল। ক্রেন চালু করার সিগন্যাল দিলো। ক্রেন চালু হতে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র কিন্তু উঠতে পনেরো মিনিট লাগল। এই পনেরো মিনিট গৌরীর জীবনে যেন পনেরো বছর। অসীম উৎকণ্ঠায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। কি দেখবে সে? জ্যান্ত অনন্ত না তার মৃতদেহ, বুকে ধাই ধাই করে হাতুড়ির ঘা পড়ছে।

ওদিকে ঘন ঘন বোম বারুদ ফুটছে! অনন্ত বালতিতে উঠতে উঠতেই সে শব্দ শুনতে পেল। বলল কোথায় বোম ফুটছে?

কালো বলল—ফুটতেই পারে। লড়াই তো শুরু হয়ে গেছে। ওর জন্য ভয় নেই। জগদীশের লোক আছে তারা মোকাবিলা করবে।

বালতিটা চানক মুখ তক্ আসার সঙ্গে সঙ্গে গুলু তা থামিয়ে আস্তে করে যোগান লাগাল। হাত বাড়িয়ে অনন্তকে ধরল দুজন মিলে। টেনে তুলে নিল। অনন্তর তখন মাথা ঘুরছে। কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। গৈরী ওর হাতটা চেপে ধরল। কিন্তু ওর পায়েরও বশ নেই। গৈরী বলল দাঁড়াতে পারছো না?

—না রে।

—আচ্ছা এই খাটে শুয়ে পড়।

ওকে ধরে ধরে খাটে শুইয়ে দিলো। শোয়ামাত্র অচৈতন্য হয়ে গেল ও। গৈরী ব্যাকুলভাবে ওকে ঠেলা দিলো ওগো—ওগো ঠাকুর শুনছো—

গুলু বলল—ঈ-খান থেকে চল বিটি। উয়ার ফিট লেগে গেইছে।

—তাহলে কি হবেক বাবু?

—সে এলাইজ আছে। তুই ঘাবড়াস না।

চারজন লোকে খাট তুলে নিল। দ্রুত পায়ে চলছে ওরা। পিছনে গুলু ও গৈরী এবং আরো জনকয়েক। গার্ড করে নিয়ে গেল।

তিলক সিংয়ের কোয়ার্টার ও তার পাশে যমুনা যাদবের ধাওড়ায় তখন রীতিমতো কাজিয়া চলছে। চানক মুখে দুজনের ডিউটি ছিল একজন কোনো ক্রমে পালিয়ে গিয়ে তিলক সিংকে খবর দিলো।

তিলক সিং ও সভিপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ তাদের ইমার্জেন্সী স্কোয়াডকে দুনম্বর চানক পুনরায় দখল করার জন্য হুকুম দিলো। ওরা ছুটে আসতে গিয়ে বাধা পেল সামনেই বোম বাজিতে। আগুনের হররা। সেই সঙ্গে ধুলো ও ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল জায়গাটা। একদল অন্য পথ ধরল কিন্তু সেখানেও বাধা। ওরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করল। তাতে কি হবে? জগদীশের একসপার্ট লোকজন ঠিক জায়গাতে ঠিক মতো মোতায়েন আছে।

তিলক সিং তথা এজেন্ট সাহেবের বন্দুকওলা পার্টি এক পা আগে যেতে পারল না। যেদিক থেকে বেরুতে চেষ্টা করে সেই দিকেই বাধা। তিলক সিং নিজেও বিভ্রান্ত। বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রেখে দাঁড়িয়ে। এ তো খুব জবরদস্ত অ্যাকশন।

খবর চলে গেছে ডি. ডি., ডি. সি., এজেন্ট সাহেবের কাছে। সেখান থেকে টেলিফোনে পুলিশের কাছে। সব দিকে ছুটোছুটি। গাড়ি দৌড়চ্ছে শাঁ শাঁ করে।

কিন্তু দু'নম্বর চানকের কাছে যখন পৌছাল তখন পাখী উড়ে গেছে। জেগে উঠেছে কলিয়ারী ধাওড়ার কুলিকামিন বাবু কারিগর। তারা শয়ে শয়ে বেরিয়ে এসে ঐ রাত্রিতেই রাস্তা অবরোধ করে শ্লোগান দিচ্ছে অনন্তবাবুর হত্যাকারী এজেন্ট সাহেবকো খতম করো।

খাদ থেকে লোক উঠে আসছে। ধাওড়াতে যেন মেলা পড়ে গেছে।

দলে দলে লোক দৌড়াচ্ছে মুনিয়া ধাওড়ার দিকে। চরিতর কিষণ লোকজন নিয়ে চবুতরাতেই ছিল। তারা বলল—অনন্তবাবুর খবর আমরা জানি না। তাকে আজ সাত দিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তোমরা এখন আপন আপন ঘরে যাও। কাল সকালে নেতাদিকে নিয়ে আসব।

ভাঙা ইঞ্জিন ঘরে হাত পা বাঁধা পাহারাদারবা তখন জেরায় জেরবার হয়ে গেছে। ওরা বলল বহুত লোক এসেছিল সাহেব। সবারই মুখ বাঁধা। কাহুকে চিনতে লেডেছি।

এজেণ্ট সাহেব বললেন—ওয়ার্থলেশ।

ডি. ডি. সাহেব বললেন—এত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল।

ডি সি. সাহেব বললেন—কিন্তু কে অ্যাকশন করল? কি করে খবর পেল।

পুলিশ দারোগা এল। কিন্তু মিছিল, শ্লোগান, লোকজনের জমায়েত দেখে কোনো অ্যাকশানে যেতে রাজী হলো না। এজেণ্ট সাহেব পুনঃ পুনঃ বললেন, মুনিয়া ধাওড়া সার্চ করলেই পাওয়া যাবে কোন দুর্বৃত্ত তিলক সিংকে হত্যা করতে বোমবাজী করে গেল।

দারোগাবাবু বললে—চোর ডাকাতের পাড়া মশায়। কোন গলি ঘুঁজি থেকে গুলি করবে তা কে জানে? আমরা কি জান দিতে যাবো? গাড়িতে যেতে যেতে ডি. সি. সাহেব বললেন—নিশ্চয় কেউ বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। না হলে জগদীশ জানবে কি করে?

এজেণ্ট সাহেব বললেন—কে সে?

—এখনি বলা সম্ভব নয়। তবে খবর আমি বের করে নেবো।

—তাই করুন। না হলে আমরা বার বার বোকা বনে যাব।

মুনিয়া ধাওড়ায় যে তুলকালাম কাণ্ড হবে তা ওদের জানা ছিল। বার বার পুলিশী হানার কারণে ওদের মনে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা জমেছিল এর পর পুলিশ আসবে, সেজন্য এক কারাগার থেকে উদ্ধার পেয়ে অন্য কারাগারে যাতে যেতে না হয় সে সাবধানতা অবলম্বন করতেই ওরা অনন্তকে ফুলমনির ঘরে রাখবার ব্যবস্থা করেছিল।

চুয়ান্ন

পরদিন রাত্রিকালে মুনিয়া ধাওড়া জমজমাট। সারাদিন হৈ-হল্লা-টেনশন-মিটিংয়ের পরেও ওদের ক্লান্তি নেই। আজ পুলিশ আসবে না। সেটাই ওদের বড় স্বস্তি। অনন্তকে নিয়ে এসেছে। ও ভালো আছে। দুপুরে গৈরীকে তুলে নিয়ে যাবার পর ওম্‌টা ভেঙে গিয়েছিল। তাই আর ঘুম হয়নি। ফুলমনি ভাত

খাইয়েছে। সন্ধ্যার পর জগদীশ ও হরেরাম সঙ্গে করে এনেছে। চলতে ফিরতে পারছে। শরীরে ধকল কেটে গেছে।

গুলুর ঘরের দাওয়াতে তালাই পেতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে। বৈশাখী, কুন্তী, ফাল্গুনী ও গৈরীর সঙ্গে আরো কিছু বৌ-বিটি জুটেছে। সামনেই উঠোন দু'তিনখানা খাট পেতে, জগদীশ ও হরেরামের সঙ্গে মুনিয়া ছোকরারা আছে। বীরত্বের ব্যাখ্যান করতে মশগুল। একটু গুলাবী নেশাও আছে। কারণ তা না হলে খুশীর খোয়াব জমে না।

অনন্ত ও গৈরীকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে। গৈরীকে ক্ষেপাতে ওদের খুব মজা লাগে। আর ও অল্পে ক্ষেপেও যায়।

বৈশাখী বলল—দেখলে জামাই! আমাদের গৈরী তোমাব চেয়ে বড লীডার বনে গেল।

অনন্ত বলল—আমি ওকে সকাল সন্ধ্যা সেলাম করব।

সবাই হেসে উঠল। গৈরীও ফুঁসে উঠল—ত্যাখ, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

বৈশাখী বলল—ক্যায়া ভাষণ! মাইক ফাটাঞে দিলেক জামাই!

কুন্তী বলল—মিটিনে চেয়ারে বসেছিল। সাহেবদের সঁথে ফটাফট এংরেজী ঝাড়ছিল।

—তুর মাথা। গৈরীকে কাঠি দিতে পেলে আর কিছু চাই না তুদের।

সবাই খি খি করে হাসছে। গৈরীর গা জ্বলছে। রাগে মুখটা ফুলে গেছে।

অনন্ত বলল—আহা! তুই রাগছিস কেন?

—তুমিই তো। তুমিই সবাইকে উসকাঞে দিয়ে মজা দেখছ।

জগদীশ বলল—বাস বাস! শান্তি শান্তি। চল খেতে দেগা।

খাবার ছিল ডাল রুটি, কাঁচা পিঁয়াজ, লঙ্কা। তাই কত আনন্দে খাচ্ছে। গৈরী ও বৈশাখী পরিবেষণ করছে। সবাইকে এক পংক্তিতে বসিয়ে দিয়েছে। জগদীশের পাশেই অনন্ত বসেছিল।

জগদীশ বলল—ত্যাখ জামাই! তোমার মতো ভালো মানুষী করে লীডারি চলে না। শ্যালা বেইমানের ঝাড় শাস্তি বুঝে না। জনকতককে খতম করে দিই।

অনন্ত আঁৎকে উঠল—আরে না না। অমন কাজও কর না।

—কি যে বল জামাই? সভিপ্রসাদ, তিলক সিং, ডি. ডি., ডি. সি. আর এজেন্ট সাহেবকে খতম করে দিলেই সব ঠাণ্ডা হঞে যাবেক। শিরিফ হুকুম দাও। কারু কোনো জিম্মাদারি থাকবে না। যা করার আমিই করব। আমার হিম্মৎ তো দেখলে।

অনন্ত হাত জোড় করে বলল—হেই দাদা অমন কাজ করো না।

—কেন করব না?

—ভোজীর জন্য করবে না। বাল বাচ্চাদের জন্য করবে না। দেখ আমি লীডার হয়ে বলছি না। তুমি গৈরীর দাদা—আমারও দাদা। তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। ভোজীর দিকে তাকাও—কত কষ্ট করে দিন কাটায়। তুমি ফেরার হয়ে থাক। কভু কখনো ঘরে আস। ওই টুকুতেই কত সুখ ওর। সেসব ভেঙে দেবে?

বৈশাখী সেখানেই দাঁড়িয়েছিল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল।

বলল—উয়াকে বুঝাও জামাই। খুনের নেশা মাথাতে চেপেই আছে।

জগদীশ বলল—কেন থাকবে না? যেদিন থেকে চাকরি গেইছে সেইদিন থেকে বনে বাদাড়ে পুরানো খাদে লুকাঞে লুকাঞে দিনরাত কাটছে। যাদের জন্যে আমার এই দশা তাদিকে শেষ করে জন্মের মতন ফেরার হঞে যাব।

বৈশাখী বলল—শুন জামাই। কথা শুন।

অনন্ত বলল—স্ট্রাইকের পর হারজিৎ যা হবার হবে। যদি টিঁকে থাকতে পারি তবে তোমার সব মামলা আমরা চালাব। কোর্টে হাজির জামিন করিয়ে প্রকাশ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করব। কি বল ভোজী?

বৈশাখী বলল—হঁ তো। জামাই ঠিক কথা বলছে।

জগদীশ বলল—অত সুখ তুর সইবেক?

—ভগবানের দয়া হলে সব সইবেক।

খাওয়া দাওয়ার পর সবাই আপন আপন ঘরে চলে গেল। অনেকদিন পর একটা সুখের রাত এসেছে। আবার কাল কি হবে কে জানে? যে যার বউকে নিয়ে একটা মিলন রজনী সোহাগে আদরে ভরে রাখবে।

হ্যারিকেনের আলোতে অনন্ত ডায়েরী লিখছে—কয়লাখনি ধর্মঘটের দিন ধার্য হয়েছে ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সাল। রাত্রি বারোটায়। অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে দিন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। তার নোটিশ দেওয়া হয়েছে দেড় মাস আগে ১লা আগস্ট। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অত্যাচার ও প্রতিরোধের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। একদিকে বেঙ্গল কোল, ইকুইটেবল, বার্ড এণ্ড হিলজার্ণ, শেরগড় কোল কোং, দামোদর কোল কোং, বরাকর কোল কোং, বীরভূম কোল কোং প্রভৃতি বড় বড় কোল কোম্পানীর মালিক, ম্যানেজার, এজেন্ট, সি. এম. ই., বাঘা বাঘা পারসোন্যাল অফিসার অন্যদিকে কয়লা কুঠির শ্রমিক সংগঠন। মার দাঙ্গা, গুপ্ত হত্যা, বে-আইনী আটক, নারী ধর্ষণ, লুঠ, অগ্নি সংযোগ, অন্যদিকে মিটিং, মিছিল, শ্লোগান, প্রতিরোধ।

সে যেন এক ঝড়। তামাম কোলফিল্ডের উপর শাঁ শাঁ করে বয়ে যাচ্ছে। সবাইকেই কোনো না কোনোভাবে তার ঝাপটা সইতে হচ্ছে। মাঝখানে পুলিশ মজা লুটছে। প্রত্যেকটি জেল হাজতে ভরে গেছে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীতে।

পঞ্চান্ন

গৌরীকে সেদিন বেশ হাসিখুশী দেখাচ্ছিল। কালী প্রতিমার মতো মুখ লাবণ্যে টস্ টস্ করছে। দেড়খানা রাত স্বামী সহবাসেই ভোল পাল্টে গেছে।

হাতে কাগজের প্যাকেট, কাঁধে ফ্লাস্ক নিয়ে হাসপাতালে জাহ্নবীদেবীর বেডের কাছে পৌঁছাল। ওঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হলো। বললেন—এসো মা।

—কেমন আছেন মা?

—ভালো।

একটু থেমে বললেন—আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে মা তোমাকে।

গৌরী একটু লজ্জা পেল। ঘোমটা টেনে হাসল।

উনি বললেন—আজ দু'দিন কেন আসোনি মা? আমি যে তোমারই পথ চাইতাম। মুখ নীচু করে ও বলল—অনেক কাজ ছিল মা।

—আমার নিজের ছেলে পর হয়ে গেছে। তাই তুমি না এলে আমি একাই পড়ে থাকি। বড় কষ্ট হয় মনে। ভাবি আমার ছেলে মেয়ে বউ-নাতি সব আছে তবু কত একা। তুমি এলে সব ভরাট মনে হয়। তোমার সেবা যত্ন—হাসি সবই সুন্দর লাগে। ওঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। গৌরীর ভিতরটা মোচড় খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বলে—আমি তো আপনারই ছেলের বউ। নাতিকে দেখবেন? কাল নিয়ে আসবো।

কিন্তু বলতে পারল না। কারণ সে জানে এই পরিচয় দেওয়ার পর তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হবে? সব সৌন্দর্য এক মুহূর্তেই মলিন।

বলল—দুধটা খেয়ে নিন মা।

টুকটাক কথাবার্তার মধ্যে দুধ খাওয়াচ্ছে তখন এল অনন্ত। স্বভাববশত ঘোমটা টেনে গৌরী বলল—আপনার ছেলে এসেছে মা।

অনন্ত ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। উনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। অনন্তর মাথায় হাত দিয়ে কান্নার সুরে বললেন—এতদিন কোথায় ছিলি বাবা? কত কি হয়ে গেল? কি করে ছিলাম তোকে না দেখে?

ওঁর কান্না বেগবতী হয়ে উঠল। বহু কষ্টে ওঁর কান্না থামিয়ে চোখের জল মুছিয়ে কৈফিয়ৎ দিল—পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আজ কোর্টে জামিন পেয়েছি। এবার রোজ তোমার কাছে আসবো। তাছাড়া এই আয়াটা তো আছে। ওকে যা বলবে—তাই করবে। সেবাযত্নের ত্রুটি রাখবে না।

—করছে বাবা। খুব করছে। সোনার মেয়ে।

গৌরী তাকালো অনন্তর দিকে। দুজনের চোখে চোখে কথা হলো।

অনন্ত বলল—ডাঃ সেনের সঙ্গে দেখা করে আসি মা। তুই তো সব জানিস। আর ডাক্তারবাবুকে বলবি গিয়ে।

ডাঃ সেনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর ওরা দুজন করিডরে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। দুজনের প্রশ্ন অতঃপর ?

অনন্ত বলল—মা, তোকে ভালো চোখেই দেখেছে মনে হয়।

—হ্যাঁ।

—আমি ভাবছি আমার জীবন একটা সুতোয় ঝুলছে। কবে যে কি হবে কে বলতে পারে ? মায়েরও এত বড অপারেশন। কি যে হবে ভগবান জানেন। আর কি লুকোচুরির মানে হয় ?

—ভেবে দেখো।

—তোর কি মত ?

—মায়ের মনটা যাচাই করে নাও।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে অন্তরঙ্গভাবে। হাসপাতালের পেসেণ্টরা কয়লা শ্রমিক। তারা অনেকেই অনন্তকে চেনে। কেউ কেউ গৈরীকেও। আজ দুজনকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে কুশল প্রশ্নাদির বিনিময় হচ্ছে। জাহ্নবীদেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদেরকে লক্ষ্য করছিলেন। ওঁর মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে যখন ওরা চোখে চোখে কথা বলছিল তখনই। আঁতি পাঁতি করে খুঁজছেন স্মৃতির পাতা। কোথায় দেখেছেন এই মেয়েটিকে। কখনো চেনা মনে হয় আবার অচেনা হয়ে যায়। কিন্তু অনন্তর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা ?

অনন্ত ওঁর কাছে এসে বলল—পরশু অপারেশনের তারিখ। পারবে মা ?

বিষাদ জড়িত কণ্ঠে উনি বললেন—পারতেই হবে।

—তুমি ভালো হয়ে যাবে মা। ডাক্তার বলেছেন।

—যা হয় হবে। আর ভাবতে পারি না। যদি মরে যাই তবে নীতু প্রীতুর বিয়ে দিস। প্রশান্তকে মানুষ করিস।

—ওদেরকে দেখবে মা ? কাল আনা করাবো ?

—হ্যাঁ বাবা। মরার আগে সবাইকে দেখে যাই। তোর পিসিকেও আনিস।

—আচ্ছা মা। আর কাউকে দেখবে ?

উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—মন তো হয়। বুকটা পুড়ে খাক হয়ে যায়। কি করলি অনন্ত ? একটা ছোটলোকের মেয়ের জন্য ঘর সংসার জাত কুটুম—সব জলাঞ্জলি দিলি।

মুখটা বিকৃত করে কেঁদে উঠলেন।

গৈরী স্তব্ধ। অনন্ত থ' হয়ে দাঁড়িয়ে। কি রকম দমফাটা মুহূর্ত!

কিছুক্ষণ পর অনন্ত বলল—ছোটলোকের মেয়ে বলে এত ঘেন্না! কিন্তু বাবা কোনোদিন মানুষকে ঘৃণা করতেন না।

—তিনি ভাগ্যবান। তাই তেমন দিন আসার আগেই চলে গেছেন।

গৈরীর অষ্টাঙ্গ কাঁপছিল। দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়েছিল।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হলে দুজনেই বেরিয়ে এল।

অনন্ত বলল—চল। কাল আবার আসতে হবে।

অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে গৈরী বলল—আমি আর কিজন্য আসবো? পরিচয় না দিয়ে ভালোই হয়েছে। না হলে মায়ের মনে আমার সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছে তাও ভেঙে যেতো।

আজ পুলিশের ভয় নেই। বহুদিন পর একটা নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ রাত্রি। কিন্তু ঘুম কই? গৈরী ডুবে আছে কান্নার সাগরে। অনন্ত'র পুনঃপুনঃ আকর্ষণে ফ্যাস ফ্যাসে গলায় বলল—আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

—কেন রে? কিসের কষ্ট?

—তুমি আমাকে প্রাণভরে ভালোবাসা দিলে। কিন্তু আমি তোমাকে কি দিলাম? তোমার সমাজ সংসার। আত্মীয় স্বজন এমন কি গর্ভধারিনী জননীর কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন করে এই আস্তাকুঁড়ে টেনে নামালাম।

অনন্ত চমকে উঠল। এ তো বড় কঠিন জিজ্ঞাসা। বলল—এইসব ভাবছিস?

—আগে তো ভাবতাম না। নিজের কথাই ভেবেছি কি করে তোমার ভালোবাসা পাবো। একবারও ভাবিনি তোমার জীবনটা কি হতে পারতো। এতোদিনে ম্যানেজার হয়ে স্বজাতি কুটুম্বের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করে গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে সুখের ঘরকন্না পাততে।

গৈরী থামল। ভিতরে গুমরে মরা কান্না প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হলো। প্রায় ভাঙা গলায় বলল—তাতো হলো না। ঝড়ে যেমন নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দেয় তেমনি তোমারও জীবনের গতিমুখ ঘুরিয়ে দিলাম। তাই তো এত যন্ত্রণা। একথা যখন ভাবছি তখন কি যে কষ্ট হচ্ছে?

অনন্ত ওকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে বলল—তুই কাঁদ গৈরী—খুব কাঁদ।

তারপর জীবন যন্ত্রণার পাকচক্রে আবর্তিত দুটি মানব-মানবী কান্নার হাটে বেসাতি করল—এক গভীর উপলব্ধি।

ছাপান্ন

সেদিন হাসপাতালে জাহ্নবীদেবীর চারটি ছেলেমেয়েই হাজির হয়েছে। তাদের সঙ্গে অনন্তের পিসিমা ও পিসেমশাই এসেছেন। তাতে খুশী হয়েছেন। টুকটাক কথা বলছেন। মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে একবার কাঁদলেন।

নীতি বড় হয়েছে। অনন্ত ও প্রশান্তের মাঝে ও। চটপটে স্মার্ট এবং সুন্দরী তরুণী। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ওর মায়ের অসুখটার জন্যেই দিনটা

পেছিয়ে গেছে। প্রীতি ছোট। টিন এজ শুরু হয়েছে। ফ্রক পরে। একটু ভাবালু গোছের চোখ দুটোতে স্বপ্ন আছে। সে তো ওদের সব ভাই বোনেরই মন স্বপ্নে ভরপুর।

গৌরী আসেনি কারণ সে এখনো নিজেকে সামলে উঠতে পারেনি। জাহ্নবীদেবী তার খবর নিলেন। অনন্ত টালবাহানা করে পাশ কাটিয়ে গেল। তখন উনি চলে গেলেন নীতির বিয়ের কথায়। ছেলেটি ভালো। বাপের বিষয় সম্পত্তি আছে। ছেলে চাকরী করে ইত্যাদি।

নীতি বলল, মা, তুমি এত কথা বলছো কেন? ওতে পরিশ্রম হয় না?

—হয় তো! কিন্তু আজ এতদিন পর এসেছিস। কথা না বলে যে থাকতে পারছি না। আজকের দিনটা বলে নিই। কাল যদি মরে যাই।

নীতি বলল—ওই কথাটি বোল না মা। তাহলে আমাদের কি হবে?

অনন্ত আছে তো। সে তোদের ফেলে দেবে না।

অনন্ত বলল, মা।

—কি রে?

—এবার চুপ কর মা।

উনি হাসলেন। খুব মলিন। মুখটা তো শুকিয়ে গেছে। চোখ দুটিই যা জ্বল জ্বল করছে। অনন্তর পিসিমা বললেন, হ্যাঁ বৌদি। চুপ কর।

উনি চুপ করলেন। খানিকপর অনন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, আয়াটি এল না কেন?

—ওর অনেক কাজ পড়ে গেছে মা।

—ওঃ বাব্বা। কি অত কাজ রে?

অনন্ত হাসল। বলল, ওকে তুমি যেমন দেখেছো তেমন মেয়ে ও নয় মা। ইউনিয়নের মহিলা শাখার সক্রিয় কর্মী। সামনে স্ট্রাইক। কত কাজ এখন।

—আজ এলে নীতু প্রীতুর সঙ্গে আলাপ হতো।

—তা হতো।

অনন্ত মুখটা ঘুরিয়ে নিল। ওর পিসেমশাইয়ের কলিয়ারীতেও স্ট্রাইক হবে। একই তো কোম্পানী। অনন্তকে ইউনিয়ন থেকে বিচ্যুতি করার জন্য ওর উপরেও চাপ এসেছিল। প্রথমে অনুরোধ উপরোধ তারপরে শাসানি। তিনি জানতেন অনন্তকে খাদে আটক করে রাখার ও তাকে উদ্ধার করার খবর।

জিজ্ঞাসা করলেন—তোকে খাদে ঢুকিয়ে রেখেছিল তা তোর বউ কি করে খবর পেল?

অনন্ত বলল—সে অনেক কথা। পরে বলবো পিসেমশাই।

—বহুত হিম্মৎ আছে মেয়েটার। বন্দুক রাইফেলের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিল।

খবরটা শুনে চমকে উঠেছিলাম। হ্যাঁ একটা খেল দেখিয়েছে।

অনন্ত হেসে বললো—আসলে ওর দাদারা দুর্ধর্ষ মানুষ। আর ওকে তো জানেনেই।

ভয় ডর বলে কিছু নেই।

ওর পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন—কার কথা বলছো গো ?

—অনন্তর বউয়ের। কোম্পানীর বন্দুক ওলাদের কাছ থেকে দাঙ্গা কাজিয়া লড়ে অনন্তকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। সে রীতিমতো লড়াকু হিম্মৎ।

জাহ্নবীদেবীর কানে সব কথাই যাচ্ছিল। কি রকম বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল ওঁর মুখটা। বললেন, আমাকে তোরা সব কথা লুকিয়ে যাস অনন্ত।

—ওর কথা কি তোমার ভালো লাগবে মা ? ছাড়ো ওর কথা।

অনন্তর পিসেমশাই বললেন, কি বলব বৌদি। সে একটা আগুন। যদি ও না থাকত তবে আজ অনন্ত তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারতো না।

—এত কথা কেউ আমাকে বলেনি।

অনন্ত বলল—এসব কথার চর্চা করে কি হবে মা।

—এটাই তো আমার দুঃখ বাবা। তোরা যে কে কি করিস তা কিছুই জানতে পারি না। একটা আয়া কত সেবা যত্ন করল। কত হাসি খুশীতে এসেছিল। যাবার সময় কাঁদতে কাঁদতে গেল। তুই এলি আর ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে গেল। তাই বুঝি ও আসেনি। কেন ? কি কারণে ?

অনন্ত একটু চুপ করে থেকে বলল—কান্না কি এমনি আসে মা ? তার মনে কোনো ব্যথা লেগেছিল।

—কে তাকে ব্যথা দিয়েছে ? আমি না তুই ?

—মা !

—মাকে মিথ্যা কথা বলা যায় অনন্ত কিন্তু মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

তোর সঙ্গে ওর যেমন অন্তরঙ্গতা দেখলাম তা তো অন্তরের টান না হলে হয় না।

অনন্ত একটু উষ্ণ হয়েছিল। বলল—অন্তরের টান তো নিশ্চয়ই আছে। না হলে আমার মায়ের জন্য তার কিসের মাথা ব্যথা ?

উনিও উষ্ণভাবে বললেন—ও কাঁদছে। তুই ওকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিস এই দৃশ্যটি যদি ওর স্বামী দেখতে পায় তবে তার কি অর্থ হবে বুঝতে পারছিস ? ওর স্বামী পুত্র আছে। তোরও স্ত্রী পুত্র আছে। আবার কি ঘর ভাঙাবি ?

অনন্ত আর্তস্বরে বলল—মা !

—একবার একটা মেয়েকে তার স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিস।

তারপরে আবার একটা বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে এমন অন্তরের সম্পর্ক কি করে পাতালি ? তোদের চরিত্রে কি ন্যায় নীতি বলে কোনো বস্তু নেই ? ছিঃ।

নিজের ভাইবোনের কাছে, পিসিমা ও পিসেমশাইয়ের কাছে অনন্ত'র চরিত্রে ন্যায় ও নীতিবোধের অভাব নিয়ে তার মা যে আক্রমণ করলেন তাতে সে মরমে মরে যাচ্ছিল। একটা মিথ্যা পরিচয় সত্যকে কেমনভাবে কলুষিত করছে। ঈশ্বর না করুন—মায়ের যদি অপারেশনের পরে জ্ঞান না ফেরে তবে সে জন্মের মতো দোষী হয়ে থাকবে। ভুল ভাঙাবার সময় পাবে না।

বিপন্ন ভঙ্গীতে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকাল।

সে বলল—দাদা ! তুমি সত্যি কথাটা মাকে বলে দাও। অনন্ত বলল—মা। তুমি রাগে ও ঘেন্নায় ওর মুখ দর্শন করতে চাওনি বলে প্রশান্ত ওর মিথ্যে পরিচয় দিয়েছে। ও আয়া নয় মা। গৈরী। আমি অন্যের বউয়ের ঘর ভাঙতে যাইনি। সে আমারই বউ। তুমি ওকে ছোটলোকের মেয়ে বলেছিলে বলেই কাঁদছিল। এখনো তার কান্না শেষ হয়নি। আমাকে বলেছে—তুমি আমাকে ত্যাগ করে মায়ের কোলে চলে যাও। বল মা—কি করব ?

অনন্ত প্রায় ভেঙে পড়ল।

ওর পিসিমা বললেন—বৌদি ! তুমি বরাবর অনন্তকে ভুল বুঝছো। বার বার ওকে আঘাত দিচ্ছ। আর কষ্ট দিও না। ওঁর ছেলে বউকে ডাকিয়ে এনে আশীর্বাদ কর।

জাহ্নবীদেবী চুপ করে রইলেন। ওঁর দু'চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল। ছেলেমেয়েরা কেউ সে জল মুছে দিলো না। মা কাঁদুন। মায়ের চোখের জল পড়ুক অবিরল ধারায়।

অনেকক্ষণ পর প্রশান্ত বলল—বৌদিকে তুমি ঘেন্না কোর না মা।

অনন্ত বাইরে লনটার ধারে দাঁড়িয়েছিল। চোখদুটো শুকনো। বুকের ভিতরটা হু হু করছে। মায়ের বিশ্বাস এমনভাবে ভেঙে গেছে ? কত অনায়াসে সন্দেহ করতে পারেন তার চরিত্র সম্পর্কে। গৈরী তার স্ত্রী বলেই একটা জবাব দিতে পারল। কিন্তু যদি তা না হতো। অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলত। এমন তো হামেশাই হয়। বৈশাখী ওর গাল টিপে দেয়। ফাল্গুনী টুপি খুলে জামা ধরে টানাটানি করে। শুচি তো মার ধাক্কা দিত। শকুন্তলা কাঁচা খিস্তি দিয়ে রসিকতা করে। তা দেখলেও তো মা সন্দেহ করবেন। কট কট করে বলবেন—একজনের ঘর ভেঙেছিস আবার একজনের ঘর ভাঙতে উদ্যত হয়েছিস।

গৈরী মেয়ে বলেই হয়ত তাড়াতাড়ি মায়ের মন বুঝতে পেরেছিল। তাই তার এত কান্না। হৃদয় ভেঙে গেছে ওর।

ওর পিসেমশাই কাছে এসে বললেন—দুঃখ করিসনে অনন্ত। একদিন তোর মায়ের ভুল ভেঙে যাবে।

অনন্ত তার উত্তর দিলো না।

ভিজিটিং আওয়ার্সের শেষে ওরা বাইরে বেরুচ্ছে। অনন্ত ও নীতি পিঠোপিঠি ভাইবোন। পরস্পরের যত ভাব ততো খুনসুটি। প্রীতি আদুরি। দুজনেই আবদার করল—বৌদিকে দেখব দাদা।

—ছোটলোকের মেয়েটাকে দেখে কি হবে?

ওর পিসিমা কড়া গলায় বললেন—অনন্ত!

অনন্ত চমকে উঠল। স্নেহ কোমল মিষ্ট ভাষিণী পিসিমা যে এমন কড়া গলায় ডাকতে পারেন তা ও আগে দেখেনি।

উনি বললেন—যাকে বিয়ে করে বউ বলে মেনেছিস তাকে ছোটলোকের মেয়ে বলে হেনস্থা করতে তোর লজ্জা হলো না। ওদের আবদার করার অধিকার আছে। তুই যদি না দেখাতে চাস ভালো করে বল।

অনন্ত সত্যিই লজ্জিত হলো। বলল—আমার ঘাট হয়েছে। আর ব'কনা পিসি।

উনি বললেন—ওদেরকে নিয়ে যা, সাধ করছে—একবার আলাপ করিয়ে দে।

—তাহলে আজ ফিরতে পারবে না। ওখানে থাকবারও জায়গা নেই। এ সব ঝামেলা চুকে যাক। তারপর প্রশান্ত একদিন নীতু প্রীতুকে নিয়ে আসবি। ততদিনে ওর কান্নাটাও থামুক। কি যে কান্না পিসি—যে তোমাকে কি বলব? মা তো ওকে আয়া বলে অনেক আশীর্বাদ করেছেন একবার অনন্তর বউ বলে আশীর্বাদ করলে কি দোষ হবে?

—আচ্ছা। আমি বৌদিকে বোঝাবার চেষ্টা করব।

পরদিন অপারেশন। তাই সকাল আটটাতেই হাসপাতালে হাজির হলো অনন্ত। ওর মা তখন অনেক শান্ত। বললেন একাই এলি?

—হ্যাঁ মা।

—মায়ের মুখের কথাটাই বড় হল। মন বলে কিছু নেই।

অনন্তর বুকটা মুচড়ে উঠল।

উনি বললেন—যত সব কুসংস্কারে মগজ ঠাসা হয়ে আছে। তাকে অতিক্রম করতে পারলাম কই? মায়ের এই কষ্টটা বুঝিস অনন্ত। আমি আর থাকব না।

—মা! তুমি এমন করে কথা বল না। আমার ভীষণ কষ্ট হয়। একেই তো বুকফাটা ব্যথায় গুমরে মরছি—তারপরে ও কথা বল না মা।

—পাগল ছেলে! সস্নেহে হাত রাখলেন ওর মাথায়।

অনন্ত টুলে বসে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। উনি বলছেন—আয়া সেজে

কত সেবাযত্ন করল। কত তার দায়িত্বজ্ঞান। মা বলে ডাকত। আমার মনটা ভরে যেত। সেই যে গৌরী একথা কেউ আমাকে বলে দেয়নি। আজ যদি ওকে নিয়ে আসতিস তবে কি আমি অপমান করতাম? তুই এত বুদ্ধিমান হয়ে ওই কথাটা বুঝলি না অনন্ত। এই জন্মে বোধহয় আমার নাতির মুখ দেখা হলো না।

অনন্তর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে।

বলল—তা কেন বলছো মা? তুমি ভালো হয়ে ওঠো তোমার নাতিকে এনে পায়ে ফেলে দেবো।

—আজ মরতে বসেছি বলে যা মনে হচ্ছে কাল ভালো হয়ে উঠলে কি তাই থাকবে? পুরানো সংস্কারগুলো তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

—যাক মা। গৌরী নামটা তোমার মনের খাতা থেকে মুছে দাও।

ওর পিসেমশাই এসে পড়লেন। সঙ্গে প্রশান্ত। জাহ্নবীদেবীর মুখটা মলিন ও বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। অনন্ত তা দেখে বড় কষ্ট পাচ্ছিল।

ওর পিসেমশাই ভরসা দিয়ে বললেন, কেন তোরা ভেঙে পড়ছিস? আমি বলছি, বৌদি ভালো হয়ে যাবেন।

একটু পর একটা ট্রলিতে চড়িয়ে ওঁকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল। একটা দমফাটা মুহূর্ত। অনন্ত নিজেকে শক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ছিল। পারল না। হাসপাতালের বাইরে এসে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

প্রশান্ত তখন ফুলে ফুলে কাঁদছে। ডাকল দাদা!

—কাঁদিসনে। মা ভালো হয়ে যাবেন।

ওর পিসেমশাই বললেন আবার কান্নাকাটি করছিস। আয় চা-টা খেয়েনে।

প্রশান্ত বলল—মায়ের যদি জ্ঞান না ফেরে পিসেমশাই।

—আবার সেই কথা। বুড়ো ধাড়ি হয়েছিস। বল বুকে নেই?

উনি না থাকলে হয়তো দুই ভাইয়ে গলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে শুরু করে দিত। তা থেকে ওদেরকে বাঁচালেন। চা-টা খেয়ে শান্ত হবার পর অনন্তকে বললেন, হ্যাঁরে! তোর মনটা এত নরম তা তো জানতাম না। মনে করতাম অনন্ত একটা লড়াকু হিম্মৎ। দুনিয়াদারীর হরেক হুজ্জুতের মোকাবিলা করার ক্ষমতা তার আছে।

অনন্ত হাসল। বলল, মানুষের সবটাই তো শক্ত হয় না পিসেমশাই। কোথাও ভেঙে যেতেই হয়।

সাঁতার

সময় বড় বলবান। অনন্তর লগ্নচক্রে কোনো গ্রহের প্রভাব কত মারাত্মক তা জ্যোতির্বিদরাই জানেন। কিন্তু সে যেন কোনো দুরন্ত ঘূর্ণির আবর্তে পাক খেতে খেতে চলে যাচ্ছে নিজের গণ্ডী অতিক্রম করে। সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে। হতে

চেয়েছিল ম্যানেজার হয়ে গেল লীডার। পাততে পারত সুখের সংসার হয়ে গেল যন্ত্রণার আগার

কবিরা প্রেমের জয়গান করেন। পদকর্তারা তাকে মহিমান্বিত করে তোলেন। জাতপাত, অস্পৃশ্যতা নিয়ে কত লেখনী সোচ্চার। মানবাধিকার নিয়ে কত মাথা ব্যথা তাদের।

কিন্তু অনন্তর মতো তাদের স্বপ্নকে কেউ যদি বাস্তবায়িত করে ফেলে তবে তার জন্য জোটে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও ধিক্কার। তাও সে সয়ে যাচ্ছে।

দিন বদলে যাচ্ছে। জীবনের ইস্যুও বদলে যাচ্ছে। এখন সংগ্রাম। বন্ধ খাদের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত যে শত্রু কত যে মিত্র তার হিসেব ও নিজেই জানে না। শ্রমিকরা টগবগ করে ফুটছে। যে কোনো সময়ে যে কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তার অজান্তেও হতে পারে। কিন্তু দায়িত্ব তারই। স্মিত চ্যাটার্জি তার ললাটে একি ছাপ মেরে দিলেন। যদি ওর চাকরি থাকতো, উনি এখানেই থাকতেন তাহলে তাঁর সহকারী হয়ে কাজ করে যেত। সেটা সম্ভব ছিল। কিন্তু এ যে বিরাট দায়িত্ব।

একদা সংগঠনের প্রথম দিকে মনে হতো ফ্রিজ থেকে তুলে আনা বাসি মাছ তরকারির মতো ঠাণ্ডা তারাই এখন জ্বলন্ত ফার্নেস হয়ে গেছে। সংগঠিত শ্রমিক-শ্রেণী এক দুর্বার শক্তি। ওদের মুষ্টিবদ্ধ হাতের নিশান, সমবেত কণ্ঠের শ্লোগান কায়েমী স্বার্থের দালালদের হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত নড়িয়ে দেয়। কিন্তু তাকে চালনা করা যে কত কঠিন তা হাড়ে হাড়ে বুঝছে।

ধর্মঘটের আর দু'দিন বাকী। আপস মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত মালিকরা দু'মুখো নীতি অনুসরণ করছিলেন। একদিকে শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার চক্রান্ত।

তারই একটি উদাহরণ তিলক সিং। এমন কত তিলক সিং তামাম কয়লা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। তাদের পিছনে মদত যোগাতে সভিপ্রসাদরা আছে। মাথার উপর মালিক ম্যানেজার এজেন্ট। ওরা সমাজের শত্রু। শ্রমিকের শত্রু দেশের শত্রু।

ধর্মঘটের আগের দিন চাঁদা মোড়ে মিটিং। জিং. টি. রোডে ট্রাফিক জ্যাম। সে এক বিপুল জনস্রোত। ট্রাকে ট্রাকে শ্রমিকরা আসছেন। পতাকা ব্যানার ও ফেস্টুনে ছয়লাপ। শ্লোগান উত্তাল।

দেবেন সেন, কল্যাণ রায়, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, জগদীশ পাণ্ডে, সুধীর রুদ্র প্রমুখ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। কল্যাণ রায়ের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে গেল। পারলে মালিক, ম্যানেজার ও এজেন্টদের গাড়ি, বাড়ি ডিনামাইটের মুখে উড়িয়ে দেবে এমনি আক্রোশ।

অনন্ত ট্রাক ভাড়া করে শ্রমিক নিয়ে গিয়েছিল। মহিলা শ্রমিকও ছিল। প্রত্যেকটি ট্রাকে ইউনিয়নের ঝাণ্ডা তো ছিলই ওদের কলিয়ারীর নাম লেখা ব্যানারও ছিল। প্রত্যেককে বলে দেওয়া হয়েছিল কেউ দলছুট হবে না। হলে এদিক ওদিক না ঘুরে ট্রাকের কাছে চলে আসবে। তাছাড়া প্রত্যেকটি ট্রাকের জিম্মায় আটজন করে স্বেচ্ছাসেবী ছিল যাদের ডিউটিই ছিল আপন আপন লোককে ঠিক ঠিক নিয়ে যাওয়া ও দেখভাল করা। এত লোক নিয়ে ওরা হিমসিম খাচ্ছিল। গৈরীর তো আরো মুস্কিল। যত সব ন্যাকা বোকা আদেখলে মেয়ে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ছে, হাঁ করে লোক দেখছে। কেউ বা হারিয়ে যাচ্ছে। তাকে খুঁজে আনাই দায়। এই অভিজ্ঞতাটা ওদের কাছে হাসি, মস্করা, আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও রসিকতার খোরাক হয়ে ছিল। গৈরী, বৈশাখী, কুন্তী ও ফাল্গুনী গায়ে গায়ে লেগেছিল। বাব্বাঃ। হারিয়ে যাবাব বড ভয়।

দেবেন সেন বক্তৃতা দিলেন। প্রত্যেক কলিয়ারীতে অ্যাকশন কমিটি আছে। কর্মীরা তিন সারিতে বিভক্ত। প্রথম সারির কর্মীরা যে কাজের দায়িত্ব নেবেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির কর্মীরা তার পূর্ণ সহায়তা করবে।

যদি প্রথম সারির কেউ গ্রেপ্তার হন বা অন্য কারণে অনুপস্থিত হন দ্বিতীয় সারির কর্মী তৎক্ষণাৎ তা পূবণ করবেন। কোনো কারণেই যেন কোনো কাজ ব্যাহত না হয়। দৃঢ় সঙ্কল্প, পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রাণপন লড়াই ছাড়া এই বিরাট ঐতিহাসিক ধর্মঘট সফল করা সম্ভব নয়।

আরো বলে রাখছি আমাদের যে নেতাদিগকে মঞ্চে দেখছেন তাঁরা যে কোনো সময় গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন। কারণ আমার কাছে খবর আছে যে পুলিশ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

তাই ধর্মঘট করা এবং তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আপনাদের। এ লড়াই আপনাদের ঘাম ও ইজ্জতের লড়াই। জীবন ও জীবিকার লড়াই। হেরে যাবেন না। আত্মসমর্পণ করবেন না। গুজবে কান দেবেন না। উস্কানিতে বিভ্রান্ত হবেন না। প্রলোভনের শিকার হবেন না।

চারিদিক থেকে শ্লোগান উঠল—পুলিচাকা বন্ধ কর।

শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস কম্পমান। সন্ধ্যা নাগাদ মিটিং শেষ হলো। তারপর যা দেবেন সেনের আশঙ্কা ছিল তাই সত্যি হলো। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম শ্রেণীর নেতারা তিনভাগে ভাগ হয়ে ঢাকা গাড়িতে জি. টি. রোডের পূর্ব, পশ্চিম এবং নিংগা শ্রীপুরের রাস্তা দিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পুলিশ ব্যারিকেডে ধরা পড়লেন।

হয়তো ধরা পড়া তাঁদের ইচ্ছাও ছিল। না হলে ট্রাকে চড়ে অগণিত কয়লা কুলির সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন।

ঘুম নেই তিলক সিংয়ের চোখে। গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবার পর

শ্রমিকদের কাছে সে দালাল ও বেইমান বলে পরিচিত হয়েছে। এখন তার বসবাস করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাকে একটা কিছু করতে হবে।

সভিপ্রসাদের সঙ্গে যে বিরোধ ছিল তা ষড়যন্ত্রের কারণেই মিটে গেছে। এখন ওরা বন্ধু। বেশ কয়েকটি চরিত্র সভিপ্রসাদের বাসায় গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। বাঁকেলাল ও রবিলাল তো ওর কাছেই আত্মগোপন করে আছে।

বাঁকেলাল বলছে—বাবুজী। আপনা ঘরকা বহু দুসরা আদমী লুট লিয়া। কিৎনা ইজ্জত কা খিলাপ হুয়া। হামলোগ ডান্টা খা কে ঘর ভাগা। লেকিন ইয়ে ডান্টা কিৎনা বদনাম চোট দিয়া উসসে বহুত গেহরা চোট দিল মে লাগা। উসি বকৃত আগর আপকা পুরা মদৎ মিলতা তো গুলুয়াকো মারকে গৈরীকো লে-যাতা। আর উ বাচ্চাওয়ালী কসবি লীডার বন গইল। তাগড়া মরদ মিল গইল। আপ জানতে নেহী হ্যায় বাবুজী ইয়ে ছোকড়ীকে লিয়ে হামরা খানদানমে কিৎনা লোকসান পৌছায়া।

সভিপ্রসাদ বললেন, জানি হে জানি। কিন্তু তখন যে তিলক সিং অনন্তবাবুর জিগরী দোস্ত ছিল। এক সঙ্গে ইউনিয়ন করেছে। পেয়ার কমতি ছিল মনে করছো।

তিলক সিং বলল, ইউনিয়ন না করলে তিলক সিংকে কে পুঁছতো গোমস্তা-বাবু? মনে মনে বলল, এখন আমি মাইনিং সরদার থেকে ওভারম্যান হয়েছি। স্ট্রাইকের সময় কলিয়ারী চালু রাখতে পারলে ডি. ডি. সাহেবের মতো সাহেব হয়ে যাবো। তার জন্য তো কিছু মূল্য দিতে হবে। বেইমানিও করতে হবে। ডি. ডি. সাহেব কমতি দাম দিয়েছে? নিজের খুবসুরৎ আওরৎকেই দিয়ে দিয়েছে।

সভিপ্রসাদ বললেন—দেখ বাঁকেলাল। অনন্তবাবুকে সাফ মার্ডার করনে হোগা। ইয়ে কাম কর শেকে গা?

—হাঁ বাবুজী। ইয়ে তো হামারা দিল কী বাৎ। বদলা তো জরুর লেনে হোগা।

লেকিন গৈরীকো ক্যা হোগা।

—তুম লোক লুট লেও।

—ঠিক হ্যায়। লেকিন খরচ খরচা?

—হম দেগা।

ওরা সেলাম করে চলে গেল।

সভিপ্রসাদ বলল—দেখবে তিলক সিং ওরা একটা কিছু করবেই।

—হাঁ। বহুত চোট খেয়েছে। রবিলাল গৈরীর সুরৎ আর জোয়ানীর খপ্পরেও পড়ে গেছে।

—কেন হবে না বল? বিয়ে করা বউ যদি পরের ঘরে চলে যায় তবে কার বুকে না আগুন জ্বলে? খ্যায়ের যো ভি হোগা আমাদের কাজ হলেই হলো।

১৬ই সেপ্টেম্বর সকাল। নেতাদের অবস্থা বার্ষিক পরীক্ষার আগে ছাত্র ছাত্রীদের মতো। সবারই বুক দুরু দুরু করছে। মিটিং মিছিল হলে বহুলোকের মধ্যে থেকে বুকে বল আসে। কিন্তু সারা কলিয়ারীতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা বলবৎ আছে। মিটিং মিছিলের জো নেই। নেতারা দলে দলে ভাগ হয়ে ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সারির নেতারা জেলে। দ্বিতীয় সারির নেতারা দায়িত্ব নিয়েছেন। সর্বত্রই কনট্রোল রুম চালু হয়েছে। দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের জন্য রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ববাকর, সাঁকতোড়িয়া ডিসেরগড, বাঁক সিমুলিয়া, জামুড়িয়া, ঝরিয়া, ধানবাদ, নিয়মা, মোগমা প্রভৃতি স্থানে টেলিফোন ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া জীপ, ট্যাক্সি ভাড়া করেছে দ্রুত যাতায়াতের জন্য। আর আছে সাইকেল করে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা। স্বেচ্ছাসেবীরা দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। রাত বারোটায় স্ট্রাইক। সকাল থেকেই সাজো সাজো রব।

অনন্তর মন তার মাকে দেখার জন্য উচাটন। অপারেশনের পর জ্ঞান ফেরার সংবাদ দিয়ে প্রশান্ত বাড়ি গেছে। অনন্ত এক রাত যেতে পারেনি। তাই দুপুরে খেতে এসে গৌরীকে বলল—একবার মাকে দেখে আসি। তুই যাবি ?

—আমি গিয়ে কি করবো ?

—বিপ্লবকে নিয়ে চল না।

—না গো।

—সেদিন আমি যখন তোর পরিচয় দিলাম তখন মা খুব কাঁদছিলেন। তারপর অপারেশনের দিন তো তোকে দেখার জন্য আশা করেছিলেন। নাতির মুখ দেখতে পেলাম না বলে আক্ষেপ করলেন। মায়ের ভিতরে একটা ভাঙা-গড়া চলছে। এমনিতেই তো তোকে স্নেহ করেন।

—শুধু তোমার বউ বলেই ঘেন্না করেন।

—আহা। সেটা ওঁর আজন্মা সংস্কার। একদিনে তো যাবার নয়।

গৌরী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আমি কখনো তোমার কথার অবাধ্যতা করি না। মাকে দেখার জন্য আমার মন কম ব্যাকুল নয়। কিন্তু তুমি বুঝে দেখো আমাকে দেখলেই মায়ের উত্তেজনা হবে। প্রেসার বাড়বে। তাতে তো কাঁচা সেলাইয়ের ক্ষতি হতে পারে।

—তা বটে! ফার্স্ট এন্ড কম্পিটিশন করে কিছু শিখেছিস।

—ঠাট্টা কোর না। এত দুঃখেও তোমার ঠাট্টা করার স্বভাব গেল না।

অনন্ত হাসল। বলল—ঠাট্টা যে করছি এতে কি মনে হচ্ছে না যে আমার প্রাণে এখনো সাড়া আছে ?

খাওয়া-দাওয়া করেই সাইকেল চড়ে বেরিয়ে গেল।

একজন সিস্টার ওকে ডাঃ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বললেন। অনন্ত ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল—স্যার। আমি আপনার কাছে বরাবরই কৃতজ্ঞ আছি! আরো একটা শক্ত বেড়ি পড়িয়ে দিলেন।

উনি বললেন, অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে বলে আমি আনন্দিত। প্রায় এক পাউণ্ড ওজনের টিউমার ছিল। যাক বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু অন্য দিক থেকে একটা আপদ এসেছে। নাও তোমাদের এজেন্টের চিঠি।

একটা চিঠি তুলে দিলেন ওর হাতে। অনন্ত পড়ে দেখল সেটা ওর বরখাস্তের চিঠি ডাঃ সেনকে কপি দিয়ে তার পেসেন্টকে চিকিৎসা না করার জন্য লিখেছেন।

অনন্ত বলল—মাই গড! তাহলে উপায়?

তুমি ভেবো না। আমি উত্তরে লিখে দিচ্ছি—অনন্তর মায়ের সিরিয়াস কেস। মানবিকতার কারণে এখুনি হাসপাতাল থেকে রিলিজ করা যাবে না। সরাবার মতো অবস্থা হলেই ডিসচার্জ করা হবে।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

—কিন্তু লোকটা কি মীন। কত নোংরা মন। ছিঃ ছিঃ।

অনন্ত খুব দুঃখিত স্বরে বলল—আমারই দুর্ভাগ্য স্যার।

—বাই দি বাই। তুমি অফ দ্যা ট্র্যাক হয়ে গেলে কি করে? আশা করেছিলাম ফার্স্ট ক্লাশ ম্যানেজার হবে।

অনন্ত হেসে বলল—তাহলে তো মিঃ শ'য়ের মতো হতে হবে।

—না! তা কেন হবে? ম্যানেজার মানে তো শোষণের পুরোহিত নয়। সেবারও দান হতে পারে। দেশকে সেবা করার আরো বৃহৎ পটভূমি পেতে পারো। এটা স্বাধীন দেশ। ব্রিটিশ জমানার তলানি ভক্ষণ করে যারা এখন বিগ বস তারা চিরকাল থাকবে না। নতুন প্রজন্ম আসবে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ হবে। ম্যানেজারের প্রফেশনকে গ্রহণ করবে মানুষের কল্যাণের জন্য। ডু ইউ এগ্রি?

—হ্যাঁ স্যার। কিন্তু আমি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি।

—জানি। তবু বলবো—এই স্ট্রাইকের পর একটা পরিবর্তন আসবে। তখন তুমি বাইরে আসার চেষ্টা করো।

—ধন্যবাদ স্যার।

অনন্ত ওঁকে নমস্কার করে চলে গেল।

আটাশ

রাত্রি বারোটা। কয়লা শিল্পের একশো বিরাশি বছরের ইতিহাসে এমন রাত্রি বারোটা এসেছে ছাপান্ন হাজার পাঁচশো পঁচাশী বার। কিন্তু ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬-এর মতো শ্রমিক সংগ্রামের এমন গৌরবময় ইতিহাস হবার দাবি নিয়ে

কেউ আসতে পারেনি। তামাম কয়লা অঞ্চলের পুলিচাকা বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক যেন মহাষ্টমীর ক্ষণ। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পঞ্জিকা মিলিয়ে সঠিক ক্ষণটিতে সেই অভূতপূর্ব ঘটনাটিই সেদিন ঘটে গেল।

অনন্ত দাঁড়িয়ে ছিল বাতিঘরের কাছে। চানক মুখে যাবার রাস্তায়। তার সঙ্গী ছিল কালো বাউরী, জগদীশ ও রাম মাঝি। একশো চুয়াল্লিশ ধারা তখনো বলবৎ। একত্রে জমায়েত হওয়া নিষিদ্ধ। তাই সারা কলিয়ারী জুড়ে পাঁচজন পাঁচজন সেচ্ছাসেবীরা দাঁড়িয়ে ছিল। প্রত্যেকটি রাস্তার ধারে, প্রত্যেকটি ধাওড়ার মোড়ে, প্রত্যেকটি চানক মুখে, বাতিঘরে ও অফিসে।

চারবাজা পালির লোকজন রাত্রি নটা থেকেই উঠতে শুরু করেছিল। সাহেবদের চোখ রাঙানিকে তোয়াক্কা করেনি। ম্যানেজার হাজরি কাটার শাসানি দিয়েছিলেন, মিঃ শ' ডুলি বন্ধ করার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু স্পষ্টতই তাঁদের আদেশ অমান্য করা হয়েছে।

যে মাইনিং সরদার ও ওভারম্যানরা লোকজনের খবরদারি করে তারাই তাদেরকে খাদের ভিতর থেকে তাড়িয়ে আনল চানকে। যে ঘণ্টাওলারা নির্দিষ্ট সময় না হলে লোকজন উঠবার জন্য ডুলি ছাড়ে না তারাই তাদেরকে ডুলিতে চড়িয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিলো। যে টালোয়ানরা হরদম চানক মুখে বোঝাই টবগাড়ি জ্যাম করে রাখত তারাই হলেজ বন্ধ করে চানক লেভেল ফাঁকা করে দিলো।

স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তুতি। যার যতটুকু করার আছে তাই করল। এজেণ্ট সাহেবের যাবতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল।

বিকেলে অনন্তর সঙ্গে একবার ঝামেলা হয়েছিল যখন ও খাদের শ্রমিকদের রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে উঠবার নির্দেশ দিয়েছিল।

মিঃ শ' বলেছিলেন—রাত বারোটা পর্যন্ত ওদের ডিউটি। তার আগে উঠে এলে আমি হাজরি দেব না।

অনন্ত বলেছিল—আপনার হাজরির চেয়ে অধিক মূল্যবান তাদের জীবন। রাত বারোটায় পুলিচাকা বন্ধ হবে। তখন কেউ খাদ থেকে উঠতে পারে না। আর একটি লোকও যদি খাদের ভিতর আটকে থাকে তবে তার দায়ী হবেন আপনি এবং তখন গণ-রোষের হাত থেকে কি করে নিজের গায়ের চামড়া রক্ষা করেন তাই দেখব। আমি অ্যাজ সেক্রেটারী অব ইউনিয়ন সার্কুলার দিয়ে দিচ্ছি রাত বারোটার আগেই লোক ওঠানোর জন্য।

ছোট সাহেবেরা বাতিঘরে বসে সিগারেট ফুঁকতে লাগলেন। একশো চুয়াল্লিশ ধারার কোথাও অমান্য নেই! কোথাও শান্তিভঙ্গ নেই। নীরবে নিঃশব্দে রাত বারোটার গভীর অন্ধকারে ঘটে গেল ঐতিহাসিক ঘটনা।

এজেণ্ট, ম্যানেজার, ডি. সি., ডি. ডি. অফিসে ছিলেন। ঘন ঘন মাথা

খুঁজছেন। অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। টেলিফোন বাজছে ক্রিরিং শব্দে। হেড অফিসের সঙ্গে কথা হচ্ছে হ্যালো হ্যালো—কোনো লোক কাজে আসেনি। নো অ্যাটেনডেন্স।

মিঃ শ' গর্জন করে উঠলেন—হোয়ার ইজ তিলক সিং? ব্লাডি বাস্টার্ড এখনো লোক নিয়ে আসছে না কেন? হোয়ার ইজ গোরখপুর কম্যাণ্ডার? অল ওয়ার্থলেশ ম্যান! কথা দিয়েছিল—কাজের জন্য লোক আনবে। আজ তারা কোথায়?

তারপর লেগে পড়লেন সভিপ্রসাদের উপর—ফাকিন্ গোমস্তা। তুম হামকো বুড়বক বানানে চাহ্তা? আভি আদমী চাহিয়ে। পুলিচাকা চালু করো।

বাঘের মতো গর্জন করছেন মিঃ শ'। সবাই থরহরি কম্পমান। কিন্তু কারো কিছু করার নেই। সদা ব্যস্ত, কর্মচঞ্চল কলিয়ারী নীরব, নিস্তব্ধ। কোথাও একটা মেসিন চলছে না। কোনো মানুষ কাজ করছে না।

অনেক ডাকাডাকির পর রাত তিনটের সময় গোরখপুর কম্যাণ্ডার এসে হাজির হলেন। মিঃ শ' তখন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছেন।

বললেন—ইউ অ্যাণ্ড তিলক সিং জবান দিয়া থা। অব বাৎ পুরা করো। আভি খাদান চালু মাংতা। ইসি বক্ত।

ও বলল—হুজুর! ক্যাম্পের গেট থেকে কলিয়ারীর চানকতক ইউনিয়ন-ওলাদের আদমী তৈয়ার আছে। লেবাররা রাতে বাহার আসতে নারাজ। তারা ভয় করছে যদি বোমবাজি করে।

—অল কাওয়ার্ড! বোমবাজি করবে? কেন তোমাদেরও বোমা আছে। যাও চার্জ করো। রাস্তা সাফ করো।

—হুজুর। সব ডরা হুয়া আদমী। কাল সুবহা জরুর লে আয়ে গা।

—তিলক সিংও এ কথা বলল। সভিপ্রসাদ ঘনঘন বাথরুম যাচ্ছেন। ওর পুরানো অম্লশূলের ব্যথা চাগাড় দিয়ে উঠেছে।

সে এক ভীষণ অস্বস্তিকর অবস্থা। চামচা, মুৎসুদ্দি ও দালালরা নাজেহাল। ডি. ডি. ও ডি. সি.-র মুখে রা নেই।

মিঃ শ' তড়পাচ্ছেন—বেইমান! সব শালা বেইমান। এতদিন লেবারদের সঙ্গে বেইমানি করেছে। আজ যখন লেবাররা এককাট্টা তখন শালারা কোম্পানীর সঙ্গে বেইমানি করছে। কিন্তু আমি বলে রাখছি কাল যদি খাদ চালু না হয় তবে সবাইকে হাবিস করে দেবো। আই শ্যাল স্যাক ইউ অল।

গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

ওঁর আর্মেনিয়ান স্ত্রী তখনও ড্রয়িংরুমে রাত জেগে বসে আছেন। মিঃ শ'য়ের গাড়ি গেট পার হতেই বেরিয়ে এলেন। মিঃ শ' তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

উনি নিজের রুটিন মতো চলেন। যেদিন বয়ক্রেণ্ডের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকে সেদিন বাংলোতে ফেরেন না। অন্যত্র প্রমোদ বিহারের জায়গা আছে। সপ্তাহে দু-দিন। বাকী দিনগুলো ছেলেমেয়েদের জন্য।

মিঃ শ'য়ের জন্য কোনো সময় ওঁর রুটিনে নেই। তথাপি আজ এই রাত্রি জেগে বসে আছেন দেখে আশ্চর্য হবেন না তো কি?

মিঃ শ' বললেন—গুড মর্নিং ডার্লিং।

—গুড মর্নিং। তোমাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

—ইয়েস। ইট্‌স এ ফেলিয়োর টু মী। ড্যাম ফেলিয়োর। সি. এম. ই.-র কাছে কি করে মুখ দেখাব?

মিসেস শ' ওঁকে ডাইনিং রুমে নিয়ে গেলেন। এক পেগ হুইস্কি দিয়ে বললেন—তুমি যদি প্রথম রাত্রে মদ খেয়ে তোমার উত্তম্যানের সঙ্গে শুয়ে পড়তে তবে কষ্ট পেতে হতো না। কেন তা করলে না?

—মিঃ শ' বললেন—আজ রাত্রে ওয়াইন, উত্তম্যান বিশ্বাদ হয়ে গেছে। ভীষণ অ্যাংজাইটি নিয়ে রাত্রি বারোটার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু যারা হাজারবার কসম খেয়ে বলেছিল—রাত বারো বাজে জরুর আদমী নিয়ে আসব—খাদ চালু করবো। তারা কেউ এল না। অল ফাকিন বদমাস! কোম্পানীর হাজার হাজার টাকা ওদেরকে দিয়েছি। তার কি হিসেব দেব? সব শালা চোর—বেইমান। ওদেরকে আমি ঠাণ্ডা করে দেব।

মিসেস একটু হেসে বললেন—বাইজোভ! তোমার এত একসাইটমেণ্ট কেন? বি কুল—বি স্টেডি—ড্যানিস—নাও।

হুইস্কির গ্লাস ধরিয়ে দিলেন।

—তুমি আমাকে মাতাল করে দিতে চাও? জানো সন্ধ্যা থেকে মদ খাইনি।

—খেলেই ভালো করতে। মদের নেশায় যারা অভ্যস্ত তাদের মদ না খেলে উত্তেজনা হয়—আবার অবসাদও হয়।

উনি ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে গ্লাসটা ঠক করে টেবিলে নামিয়ে দিলেন। মিসেস বললেন—ডোণ্ট বি সিলি ডিয়ার। এরকম বিহেভ করলে আমি চলে যাবো। মাইণ্ড ইট আমি তোমার কেপ্‌ট নই।

সেই মুহূর্তে মিঃ শ'-এর ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাগে অন্ধ মিঃ শ' বললেন—প্লিজ গো।

জলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে মিসেস শ' বললেন—ওকে। থ্যাঙ্ক ইউ!

খট্‌খট শব্দে পাশের ঘরে চলে গেলেন। অথচ উনি আজ রাত্রে তাঁর স্বামীর উদ্বেগ, অশান্তি ও উত্তেজনার কথা জানতেন। সেজন্য জেগেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ কি অভিশাপ? একটা সংলাপেই সারারাত্রিব্যাপী প্রতীক্ষার ব্যর্থ পরিণাম সগর্বে ঘোষিত হলো।

মেঘমুক্ত শরতের আকাশ নতুন দিনের বার্তা নিয়ে সূর্য উঠছে। লাল থালার মতো সূর্যের বর্ণময় দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে। চারিদিকে আলোর বন্যা। অনন্ত দাঁড়িয়ে আছে পিটটপের রেলিং ধরে সূর্যের দিকে মুখ করে। জ্যোতির্ময় সূর্যদেবকে প্রণাম করে প্রার্থনা করল—হে সবিতৃ মণ্ডল তুমি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে সৎমার্গে পরিচালিত কর।

সকাল থেকেই খবর আসতে শুরু করেছে ঘটনা ও দুর্ঘটনার। ব্যর্থতা ও সাফল্যের। ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্ত। তামাম কলিয়ারী অঞ্চলের পুলিচাকা বন্ধ হয়ে গেছে ঠিক রাত বারোটার সময়। অপ্রীতিকর ঘটনা যে ঘটেছে তা নয় তবে সাফল্যের তুলনায় নগণ্য। সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা বর্তমান।

সারারাত ধরে দাঁড়িয়ে থেকে সূর্যোদয়ের পর যেসব রিপোর্ট এল তা দেখেশুনে বাসায় ফিরল। গৈরী তখন বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে গেছে। বেচারী জগদীশের এক ধমকীতে ঘরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। না হলে ওর যা স্বভাব তাতে রাত্রেই বেরিয়ে পড়ত।

তাই তো জগদীশ ওকে ধমক দিয়েছে খবরদার—বাইরে যাস না। আমি তোকে দেখব না তোর মরদকে ?

গৈরী অবশ্য সে কথার অর্থ বুঝেছিল। তাই বেরোয়নি! কিন্তু ওর বুকটা লাফাচ্ছিল পুলিচাকা বন্ধ হওয়ার দৃশ্যটি দেখতে। ঘরে থেকেই দেখল নীরব, নিস্তব্ধ, কলিয়ারীর আরেক চেহারা। এতদিনের এত পরিশ্রম সার্থক হলো।

অনন্ত বলল—স্ট্রাইক সাকসেসফুল। স্বতঃস্ফূর্ত। সব কলিয়ারী বন্ধ।

আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে সকালটা ভালোই কাটল। অনন্ত স্নান করে খেতে বসেছে। গৈরী কাছেই আছে। একটি শ্রমিক এসে খবর দিলো তিলক সিং আর গোরখপুর কম্যাণ্ডার প্রায় চারশো লোক জড়ো করেছে। ওরা দিনপালিতে কাজ করবে। স্পেশাল পুলিশ আসবে।

শুনেই ওর মাথা ঘুরে গেল। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে খবরটা পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে কলিয়ারী গেল। তখন অন্যান্য নেতারাও এসে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুচারটে কথা! চোখে চোখে ইশারা।

চিৎকার করে উঠল—রাস্তা ব্যারিকেড করো।

ওদিকে তখন তিলক সিংয়ের স্লোগান উঠছে।

অনন্ত ছুটে গেল বয়লার হাউসে। যে খালাসীরা ইমার্জেন্সী ডিউটিতে ছিল তাদেরকে বলল—জলদি স্টিম ডাউন কর। বয়লারের স্টিম ফুঁকে দাও। ব্লো-অফ কক খুলে দাও। ঝাঁঝরি থেকে আগুন ঝেড়ে দাও। তারপরে পালাও।

ইঞ্জিন খালাসীকে বলল—তুমিও পালাও। এক মিনিট থেকো না।

স্ট্রাইকের সময় কলিয়ারীর শ্রমিকরা ম্যানেজার এজেন্টের চেয়েও তাদের লীডারের কথাকে গুরুত্ব দেয় বেশী। ওরা যথাযথভাবে নির্দেশ পালন করল।

রাস্তায় ব্যারিকেড। পুলিস ব্যারিকেড ভেঙে ইচ্ছুক শ্রমিক নামে অভিহিত দালালদের লোকজনকে পথ করে দিলো। কিন্তু কটা ব্যারিকেড ভাঙবে? পর পর ব্যারিকেড হতে লাগল। শ্রমিকরা লাঠি খেলো। রক্তাক্ত হলো। তবু মাটি আঁকড়ে দাঁত খিঁচে প্রতিরোধ গড়তে লাগল।

দু'দিক থেকে দুটি দল আসছিল। ধাওড়ার দিক থেকে ফাটকবাজার পার হয়ে তিলক সিংয়ের দল। ওদের সরদার যমুনা যাদব। আর সদর রাস্তা দিয়ে গোরখপুরী শ্রমিক। সব মিলিয়ে সংখ্যায় শ-চারেক। ওরা যখন বাতিঘরে এল তখন সেখানে বাতি দেবার জন্য কেউ নেই।

সাহেবরা নিজের হাতে বাতি দিলেন, হাজরি লিখলেন। কিন্তু বয়লারে স্টিম নেই। ইঞ্জিনের খালাসী নেই।

সে খবর যখন মিঃ শ'-এর কাছে গেল তখন উনি খেপে আগুন।

বললেন—দিস্ ইজ ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের জেণ্টেল-ম্যানস এগ্রিমেণ্ট ছিল অল ইমারজেন্সী চালু রাখার। সেফটি, সিকিউরিটি, লাইট, ওয়াটার, ইলেকট্রিসিটি, মেডিকেল ইমারজেন্সী ইউনিয়ন বন্ধ করতে পারে না। এটা আইনের খিলাপ।

কিন্তু ওঁর তড়পানিতে ওঁর দালালরাই ভয় পাবে। ইউনিয়ন কেন ভয় পাবে? তারা তাদের হাতের পাঁচ নিয়ে নিয়েছে। ইঞ্জিন বন্ধ থাকলে খাদে লোক নামবে কি করে?

অনন্ত বলল—মিঃ শ'। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন যে ব্রিটিশরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। আমাদের দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশ রাজত্বের যদি অবসান ঘটাতে পারেন তবে আমরা ব্রিটিশের বাস্টার্ড ইস্যুগুলোর চোখ রাঙানি বরদাস্ত করে নেব এটা কেন ভাবছেন? আপনারা হাজার হাজার আইনের খিলাপ করেছেন। আমরা করেছি একটা।

চীফ পারসোন্যাল ম্যানেজার ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং করার আহ্বান জানালে অনন্ত তা প্রত্যাখ্যান করে বলে পাঠাল—আমরা কোম্পানীর সঙ্গে মিটিং-এ বসতে পারি যদি খাদ চালু করার জন্য যেসব শ্রমিক আনা হয়েছে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

মিঃ শ' সেজন্য তৈরি নন। উনি বললেন—দরকার নেই ইউনিয়নের সহযোগিতার। আমাদের অফিসাররাই ইমারজেন্সী চালু রাখবে।

কলিয়ারীর ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন মিঃ সরকার। বিলেতে লেখাপড়া। হাতে কলমে কাজ করেছেন। স্টিম এনার্জীর মাস্টার। নিজের হাতে ইঞ্জিন চালাতে জানেন। তিনিই ইঞ্জিন চালাবেন। ম্যানেজার ও অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজাররা বয়লার হাউসে হাতে বেলচা ধরে ফায়ারিং করে স্টিম করতে লাগলেন।

তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভাণ্ডার সবারই মগজে গিজ গিজ করছে। কিন্তু আনাড়ি

হাতে এক চাড়া আগুন জ্বালাতে পাঁচ লিটার কেরোসিন খরচ করে ঘণ্টা পার করে দিলো। বয়লারে যখন স্টিম উঠল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অত হুজ্জত করে যে শ্রমিকদের আনা হয়েছিল তারা বেলা ডুবতে দেখেই ফুটফাট সরে পড়েছে।

মিঃ শ' হুকুম দিলেন—সব তৈয়ার রাখো। বাই এনি মীনস কাল সকালে খাদ চালু রাখতে হবে। এখুনি সমস্ত ধাওড়া ও কোয়ার্টারের জল ও বিজলী বন্ধ করে দাও। কাল থেকে ডাক্তারখানাও বন্ধ থাকবে। ইঞ্জিন বন্ধ তো সব বন্ধ।

ব্যস! সারারাত অন্ধকার।

রাত্রি দশটা। অনন্ত দাঁড়িয়ে আছে চার নম্বর পিটটপে। কংক্রীট করা মেঝের উপর টপ গাড়ির লাইন। বিলকুল ফাঁকা। বয়লার চিমনি খাড়া দাঁড়িয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে উদ্ভিদের সরল গুঁড়ির মতো। হেডগিয়ারগুলো যেন লোহার খাঁচা। ধাওড়াগুলো গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে আছে। দু-একটা গাছপালার ঝুপসি অন্ধকার তাকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে। বাবু কোয়ার্টারেও বাতি নেই। কোথাও কোনো ধাওড়ায় মিটি মিটি জোনাকীর মতো দু-একটা হ্যারিকেনবাতি জ্বলছে।

কিন্তু আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সাহেব বাংলোগুলি। ওদের লাইন কাটা হয়নি।

ব্রিটিশ আমলের বৈষম্য যেন তার চোখের সামনে ছবি হয়ে উঠেছে। দেশের স্বাধীনতা কোথায় এসেছে তা বোঝার জো নেই আজকার কলিয়ারীতে। এখানে এখনো সদম্ভে ভারতবাসীর বুকের উপর বুট চালনা করে ব্যারাকলউ সাহেবের জারজ সন্তান মিঃ শ'। এখনো তাদের শোষণের কারখানায় উৎপন্ন হচ্ছে কারেন্সী নোট। রাজত্ব গেলে কি হবে? রাজত্বের চেয়েও বেশী আমদানি করেছে ভারতবাসীর ঘাম, রক্ত ও ইজ্জত বিক্রি করে। এই যুগের অবসান চাই।'

উনষাট

গোরখপুর ক্যাম্পের আইন কানুন বেশ কড়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন শ্রমিকের চাহিদা ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল তখন গোরখপুর থেকে শ্রমিক সংগ্রহের কেন্দ্র চালু হয়েছিল। সে এক বিরাট সংস্থা। রিটায়ার্ড ব্রিগেডিয়ার র‍্যাঙ্কের অফিসার তার চীফ অফ এডমিনিস্ট্রেশন। এগারো মাস থেকে তেরো মাসের চুক্তিতে শ্রমিকদের সহি করতে হতো। তারপর তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো কোলফিল্ডে। যে কলিয়ারীর যেমন চাহিদা সেই মোতাবেক ক্যাম্প অফিসার

তাদেরকে নিয়ে আসতেন। এজেণ্ট, ম্যানেজাররা ফীজ সহ রিক্যুইজিশন দিতেন। ছুটি সিক পাওনা বাবদ শ্রমিকরা একমাস ছাড়া পেত। তার আগেই নতুন দল এসে হাজির হতো। প্রত্যেক ক্যাম্পেই একজন কম্যাণ্ডার। তাঁর অধীনে সুপারভাইজার, মুনশী, কেরানি ইত্যাদি মোতায়েন থাকত।

ক্যাম্প মানে কোনো ত্রিপল ছাওয়া টেম্পোরারি ঘর নয়। পাকাপোক্ত দালান-ঘর। বাউণ্ডারির উঁচু দেওয়ালে কাঁটা তার। যাতে কেউ পালাতে না পারে সেজন্য নানাপ্রকার সুরক্ষার ব্যবস্থা। শ্রমিকদের বন্দীজীবন। আহার, নিদ্রা, প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম ও ডিউটির বাইরে কিছু করবার জো ছিল না। দৈনিক তিনবার খাবার—ভাত কিংবা রুটি। সপ্তাহে একটি সাবান, মাথবার তেল। নগদ পাঁচসিকে পয়সা।

তাদেব রোজগারের পাই পয়সা পর্যন্ত জমা হতো গোরখপুর সেফভল্টে। চুক্তি মাফিক কাজ শেষ করে গিয়ে পুরো টাকা এক লপ্তে দেওয়া হতো। অবশ্য ওর যাবতীয় খরচ-খরচা কেটে নিয়ে। এক থোকে মোটা টাকা পেত। সেই লোভে রিক্রুটিং সেণ্টারে নাম লেখাবার হিড়িক পড়ে যেত।

সব লাহাঙ্গা জোয়ান। কাজ করত জন্তু জানোয়ারেব মতো। কত রকমের লোক থাকত তাদের মধ্যে চোর, ডাকাত, খুনী, সাধু, মূর্খ, গায়ক, যৌনরোগী, সমকামী, অগম্যাগামী এমন চরিত্র।

এইসব মাল নিয়ে সুরযপ্রসাদ সিং কাম্যাণ্ডার। স্ট্রাইকের প্রথম দিনটা ব্যর্থ যাবার জন্য শ্রমিকদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করতে খাবার জন্য লুচি মাংসের বরাদ্দ করেছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাল খাদ চালু হলে ঢালাও মদ ও লৌণ্ডা নাচের ব্যবস্থা করবেন।

সমকামী পুরুষদের কাছে লৌণ্ডা নাচ দারুণ প্রমোদ। টিন এজের ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে উদ্দাম নাচ ও ঢোলকের বাজনা ওদের রক্তে নেশা ধরিয়ে দেয়। নাচওলা ছেলেদের কচলে কাদা করে দেয়। দীর্ঘ একবছর স্ত্রী বর্জিত জীবন কাম-কামনার যন্ত্রনায় উন্মাদ হয়ে থাকে। শরীরের প্রয়োজন তো যাবার নয়। সবাই স্থূল বুদ্ধির। আত্মরতি এবং সমকামীতা ছাড়া উপায় কি ?

দলের মধ্যে যেসব শ্রমিক চলতা পুরজা নেতা গোছের তাদেরকে একটা করে লৌণ্ডা উপহার দেওয়া হবে এতদূর পর্যন্ত টোপ দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর শ্রমিকদের মধ্যে পরদিন কাজ করার বেশ একটা জোরদার ইচ্ছা জেগেছে। ওরা দেবেন সেন, কল্যাণ রায়কে চেনে না। কখনো ট্রেড ইউনিয়ন করেনি। ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জো নেই। তাহলেই চাবুকের ঘায়ে পিঠের চামড়া তুলে দেবে।

কম্যাণ্ডার সাহেবের হুকুম অমান্য করার মতো বুকের পাটা তাদের নেই।

তারা ভেড়ার পালের মতো যেদিকে নিয়ে যাবে সেইদিকেই যাবে। শ-দুয়েক আনকোরা নতুন লোক এনেছে ওরাই।

তিলক সিংয়ের তো প্রায় সবাই নতুন। যমুনা যাদব দেশ থেকে নিয়ে এসেছে—গোয়ালা, তেলি, ধোবী ও ক্যাওট ছোকরাদের। রঘুবীর মুঙ্গের জেলা থেকে এনেছে ভুঁইয়া, মশহর, দুশাদ, মুচি। নিজের দেশে ওরা বণ্ডেড লেবার। চার হাজার বছর থেকে ভূমিহীন দাস। বংশ পরম্পরায় বেগার খেটে আসছে জোতদার, জমিদার ও মহাজনদের। ঘর-গুষ্টি বন্দক পড়ে আছে। তারই মধ্যে বিবাহ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি। মালিকরা নিজের গরজেই জোয়ান ছোকরা ছুকরীদের বিয়ের নাম করে এক ঘরে ঢুকিয়ে দেয় বাচ্চা প্যায়দা করতে। ছুকরীটা যদি চোখলাগু হয় তবে মালিক নিজেই প্রাথমিক পর্বটা সেরে দেয়।

তাদের কাছে কলিয়ারী স্বর্গরাজ্য। যেদিন থেকে এসেছে সেদিন থেকে খানাপিনা ভালোই চলছে। ভাঙের সরবৎ, মুগের ডাল, আটার রুটি। তারা কি বুঝবে ট্রেড ইউনিয়নের মর্ম? খাদে কাজ করবে—নোট কামাবে, এটাই জানে। তিলক সিং মহাপুরুষ।

এইসব মাল পরের দিন সকালে ডাল-রুটি-সবজি সেঁটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু শ-কদম যেতে না যেতেই পড়ে গেল মহিলা শ্রমিকদের ব্যারিকেডের সামনে। গতকাল পুরুষ শ্রমিক দিয়ে ব্যারিকেড হয়েছিল আজ স্ট্রাটেজি বদল করে মহিলা শ্রমিক দেওয়া হয়েছে। যে শ্রমিকরা কাজ করতে যাচ্ছিল তাদের চোখ ছানাবড়া। মেয়েরা যে পুরুষদের রাস্তা আটকে দাঁড়াতে পারে এই ধারণাটা তাদের স্বপ্নের মধ্যেও নেই। ওদের মেয়েরা পুরুষমানুষ দেখলেই ঘোমটায় মুখ ঢাকে। আর এরা ঝাণ্ডা হাতে, শ্লোগান দিয়ে, হাতের চুড়ি ঝন্‌ঝন্‌ করে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। ওঃ। বহুত বে আবরু, বে-শরম জানানা, এইজন্যই লোকে বাঙাল দেশের জানানাদের এত রেয়াৎ করে।

পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে দিলো। সুরযপ্রসাদ ঠেলেঠুলে রাস্তা করে লোকগুলি নিয়ে এগোল কিন্তু ডি. ডি. সাহেবের বাংলোর সামনে সারি সারি মহিলা শ্রমিক। তাদের হাতে ঝাণ্ডা। মুখে শ্লোগান।

ঝাণ্ডা হাতে জীবন্ত ভাস্বর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বহুত জোর তকরার হলো। তাতেও যখন ব্যারিকেড ভাঙল না তখন লাঠিচার্জ শুরু হলো। মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল। গৈরীকে ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করে ভ্যানে চড়াবার চেষ্টা চলছে। ভীষণ চিৎকার। মারমুখী জনতার গোলমাল। ছুটে এল হরিহর গান্ধী, রাজকিশোর সিং। তারাও লাঠি খেল।

হঠাৎ বিউটি ছুটে এসে গৈরীকে ধরে ফেলল। বিভিন্ন সময়ে ওর সঙ্গে পুলিশ অফিসারের দেখা সাক্ষাৎ হতো। তাই বলল—ওকে ছেড়ে দিন।

পুলিশ বলল—কেন ছাড়বো? এই মেয়েটা বারবার বাগড়া দিচ্ছে।

—আর দেবে না। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

গৈরীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল—কেন ক্ষ্যাপার মতো করছিস। অতগুলো মরদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারিস?

তখন ব্যারিকেডও ভেঙে গেল। গৈরী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—পারলাম না দিদি। শেষ রক্ষা করতে পারলাম না।

বিউটি বলল—আয়—আমার ঘরে আয়। ওরা যা খুশী করুক। কিন্তু খাদ চালু করতে পারবে না। এই কথা বলে রাখলাম।

ওকে বাংলোতে নিয়ে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল—এবার নিজের দিকে তাকিয়ে ছাখ।

গৈরীর সে সময় নারীসুলভ 'লজ্জা' বস্তুটা যদি থাকতো তাহলে অমন লম্ফঝম্প করে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করত না। ওরা ওর হাত ধরেই ক্ষান্ত হয়নি। শালীনতার মাত্রাও ছাড়িয়ে গেছিল। সায়া, শাড়ি, ব্লাউজ ছিঁড়ে ফালা ফালা। চুল খুলে সারা গায়ে ছড়িয়ে। অনাবৃত স্তনে নখের দাগ। পিঠটা চিড়ে রক্ত মুখ হয়েছে। যেখানে সেখানে লাঠি পড়েছে। ঘামে ও রক্তে মাখামাখি। মুখটা রাগে লাল। গালে শিটা শিটা চড়ের দাগ। কাঁচের চুড়ি, শাঁখা ভেঙে চুরমার। আক্রোশে ফুলছে। গলগল করে ঘাম ঝড়ছে! লজ্জায় মরে গেল। বিউটির সামনে দাঁড়াতে পারছে না। দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ছেঁড়া শাড়িতে গিঁট দিয়ে লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করল।

বিউটি বলল—থাক্ তোকে আর শাড়িতে গিঁট দিতে হবে না। নে চা খা। অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এ বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই। দিদির কাছে লজ্জা কি রে?

ফ্যানের বাতাসে গৈরী প্রকৃতিস্থ হলো। বিউটি ডেটল ভেজা তুলো দিয়ে ওর ক্ষতস্থানগুলি মুছিয়ে দিলো। জিজ্ঞাসা করল—ওরা কতদূরে গেল দিদি?

—তা কি করে জানব?

একসেট শায়া, শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার এনে দিয়ে বলল—পরে নে।

—আপনার এত দামী শাড়ি আমি কি করে পরবো?

—ঢঙ করিস নে।

ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় বদল করে চুল আঁচড়ে মুখ মুছে দিলো।

আবেগে অভিভূত গৈরী বলল—দিদি!

—এই কাপড়-চোপড়গুলো ফেলে দিস না। সঙ্গে নিয়ে যা। অনন্তকে দেখা গিয়ে।

—আচ্ছা দিদি। আমি চলি তবে!

—হ্যাঁ। একটা গোপন কথা—তোদের জীবনের উপর আঘাত হবে।

গৈরী তেজের সঙ্গে বলল—সে ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা আমরা করে নেব।

—বেশি বড়াই করিস নে। ডি. সি. সাহেবের প্ল্যান। কাজ হাঁসিল করতে তোর প্রথম স্বামী রবিলালকে নিয়ে এসেছে। খুব সাবধান।

—আপনার ঋণ কি করে শোধ করব দিদি?

—দিদির কাছে আবার ঋণ কি রে? তবে স্নেহ ভালোবাসার দাম কি রইল?

অফিসের সামনে ভয়ঙ্কর অবস্থা। গোরখপুরী শ্রমিকদের ঘিরে তিন হাজার নারী পুরুষ। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। পূর্বে অফিস, পশ্চিমে রেলওয়ে সাইডিং, উত্তরে বাবু কোয়ার্টার ও সাহেব বাংলো, দক্ষিণে তিন-চার নম্বর চানক মানুষে মানুষে ছেয়ে গেছে। শুধু কালো কালো মাথা। সবাই কয়লা কুঠির কুলিকামিন।

মাইকে যত শ্লোগান হচ্ছে তার বিশগুণ অ-মাইকে গালমন্দ হচ্ছে। সব গাল মালিক, ম্যানেজার, এজেন্ট, ডি. ডি., ডি. সি., সভিপ্রসাদ, তিলক সিং, সুরযপ্রসাদ প্রমুখের নাম ধরে। কাঁচা খিস্তির বাণ ডাকছে।

সুদূর গোরখপুর থেকে যে শ্রমিকের দল কয়লা কুঠিতে কাজ করার জন্য এসেছিল তারা ভয়ে পেচ্ছাব করছে। ঘেমে নেয়ে, পেচ্ছাবে পায়খানায় তাদের দশা সঙিন। পুলিশরাও ওদের কাছ থেকে সরে অফিস বারান্দায় রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গৌরীর খবর শুনেই অনন্তর মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। তখন একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এসে নেতাদের সঙ্গে মিটিং করার প্রস্তাব দিলেন।

অনন্ত বলল—স্যার। পুলিশ ইন্সপেক্টর আমার স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করেছেন। আপনি যদি তার বিচার করেন তবেই মিটিং-এ বসব।

উনি বললেন—বিচার ব্যবস্থার অনেক আইনগত ব্যাপার আছে। সেসব খতিয়ে দেখার জন্যও মিটিংয়ের প্রয়োজন। আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসুন।

মিটিং বসল। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পুলিশ অফিসারও আছেন। এদিকে এজেন্ট, ম্যানেজার ও পারসোন্যাল ম্যানেজার। ইউনিয়নের তরফে সুমিত চ্যাটার্জী, সুনীল সেন ও রণেন গুপ্তের সঙ্গে স্থানীয় নেতারা।

অনন্ত অভিযোগ করল—স্যার। ইনিই সেই অফিসার যিনি মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছেন। মারধোর করেছেন এবং আমার স্ত্রীর শালীনতা নষ্ট করেছেন।

ইন্সপেকটর বললেন—মিথ্যা কথা। আমি কারো শালীনতা নষ্ট করিনি।

—মিথ্যাবাদী আপনি। মেয়েদের টেনে হিঁচড়ে কাপড় ছিঁড়ে যা তা করেছেন।

—না। এ অভিযোগ মিথ্যা।—

—জলজ্যান্ত সত্যি! এই ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী গৌরী শর্মা। আপনি তাকে টেনে হিঁচড়ে মাটিতে ফেলে চুড়ি শাঁখা ভেঙেও ক্ষান্ত হননি। তার

সর্বাঙ্গে নখ বসিয়ে দিয়েছেন। তাকে রেপ করার জন্য ভ্যানে চড়াতে টানাটানি করেছেন। তাকে টুইস্ট করেছেন।

পুলিশ অফিসারটি ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বললেন, দেখছেন স্যার! এত ডিজাইনবালা শাড়ি পরা ডেকোরেটিভ উওম্যানকে ম্যান হ্যাণ্ডেল করেছে বলে মনে হয়।

অনন্ত বলল—আপনি জানেন ঐ শাড়িটার দাম কত?

—তা প্রায় পঞ্চাশ টাকা।

—যার ঘরগুষ্ঠী আত্মীয় পরিজন একবছর যাবৎ চাকরীবিহীন, যে একটা বরখাস্ত খুঁটা কুলির স্ত্রী সে কখনো পঞ্চাশ টাকার শাড়ি পরতে পারে? আমাদের কাছে সাড়ে চার টাকা দামের শাড়ি জুটলেই ঢের। এই দেখুন স্যার যে কাপড়-চোপড় পরে আমার স্ত্রী নির্যাতন ভোগ করেছিল তার দশা দেখুন।

গৈরীর হাত থেকে ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলিটা খুলে মেলে ধরল। একটি একটি করে দেখিয়ে বলল—আমার স্ত্রীর লজ্জা ঢাকবার কাপড় ছিল না স্যার। ওকে অলমোস্ট নেকেড করে ভ্যানে চড়াচ্ছিল। কিন্তু এক সদাশয়া মহিলা সময় মতো তাকে উদ্ধার করে ফার্স্ট এড দিয়েছেন। নিজের শায়া, শাড়ি, ব্লাউজ দিয়ে ওর লজ্জা ঢেকেছেন। এই তো স্বাধীন ভারতের পুলিশ। জনগণের রক্ষক।

পুলিশ অফিসারটি বললেন—টানা হ্যাঁচড়ায় কাপড় ছিঁড়তে পারে কিন্তু ওর শালীনতায় কেউ হাত দেয়নি।

গৈরী ফুঁসে উঠল—মিথ্যাবাদী? গায়ে হাত দেননি? কাপড় খুলে দেখাবো?

এজেন্ট সাহেব শ্লেষ দিয়ে বললেন—তাতে তোমার লজ্জা করবে না?

—লজ্জা! আপনারা কি মানুষ যে লজ্জা করবো? সব তো শিয়াল, কুকুর, বাঘ, ভালুক। জন্তু জানোয়ারের কাছে মানুষের আবার লজ্জা কি?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—ইটস এনাফ! আমি বুঝে নিয়েছি। অনন্তবাবু, আপনার স্ত্রীর দুর্গতির জন্য আমি দুঃখিত। তুমি বস সিস্টার। শান্ত হও।

গৈরী বলল—কেন শান্ত হব?

—সংগ্রাম করতে নেমেছো তার খেসারৎ দেবে না? তোমার ফাঁড়া কমের মধ্যেই কেটে গেছে। আরো যে সর্বনাশ হয়নি সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। ইন্সপেক্টর, আপনাকে এই মেয়েটির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে!

ইন্সপেক্টর অনায়াসে বললেন—ইয়োর অনার স্যার। আই বেগ এক্সকিউজ।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—অনন্তবাবু! আমার মনে হয় এর চেয়ে বেশি কিছু করা যায় না। আসুন অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কণ্ঠস্বরে যে আন্তরিকতা ছিল তাতেই অনন্ত ও গৈরীর রাগ কমলো। দুজনেই বসে পড়ল।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—মিঃ শ' অভিযোগ করেছেন যে আপনারা কলিয়ারীর

নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য যেসব জরুরী কাজকর্ম চালু রাখা প্রয়োজন তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

স্মিতবাবু বললেন—মিঃ শ' ইউনিয়নের সহযোগিতা ছাড়াই জরুরী কাজকর্ম চালু রাখতে পারবেন বলেছেন।

—না আমি সে কথা বলিনি।

—তাহলে গতকাল যখন দেখলেন স্ট্রাইক পিসফুল অ্যাণ্ড সাকসেসফুল তখন আজ এত লোক এনেছেন কেন? অফিসাররা বয়লার ফায়ারিং করে স্টিম করেছেন, মিঃ সরকার ইঞ্জিন ট্রায়াল দিয়েছেন, প্রোডাকসন করতে লেবার এনেছেন তবে আর ইমার্জেন্সীর প্রশ্ন কেন?

হরিহর বললেন—কোয়ার্টারে জল ও বিজলি বন্ধ করেছেন। কাল সারা দিন রাত কেটেছে বেগর পানি, বেগর লাইট। আজ থেকে ডাক্তারখানা বন্ধ।

রণেনবাবু বললেন—আপনি তো ল অফ নেচারকেও নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

মিঃ শ' বললেন—আপনারা ওয়াইণ্ডিং ইঞ্জিন বন্ধ করেছেন।

অনন্ত বলল—আপনারা প্রোডাকশন করবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেই ইঞ্জিন চালু করার দায়িত্ব আমরা নেব।

—কিন্তু যারা ইচ্ছুক কর্মী তাদেরকে তো বাধা দিতে পারেন না।

—কে কর্মী? আপনি যে লোকগুলিকে এনেছেন এরা কেউ বোনাফায়েড এমপ্লয়ি নয়। সব ঝুটা আদমী।

—আপনাদের লিস্ট অফ ওয়ার্কারের খাতা বের করুন। এই লোকগুলিকে আইডেনটিফাই করে দেখিয়ে দিন।

—আমরা নতুন লোক রিক্রুট করতে পারি।

—তা কি স্ট্রাইকের দিনেই? তাছাড়া আপনারা যখন চার থেকে পাঁচশো লেবারকে ছাঁটাই করে রেখেছেন তখন নতুন লোক রিক্রুট করবেন কেন? মজুমদার'স ট্রাইব্যুনাল শ্রমিকদের চাকরির স্থায়িত্ব স্বীকার করেছেন। আপনারা সেই আদেশ লঙ্ঘন করেছেন।

নরম গরম স্বরে এই বাখেড়া চলতে লাগল ইউনিয়ন লিডার ও কোম্পানীর প্রতিনিধিদের মধ্যে।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—আপনারা অন্তহীন কলহ শুরু করেছেন। এইভাবে কি সিদ্ধান্তে আসা যাবে?

পারসোন্যাল অফিসার বললেন—কলিয়ারীতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি আছে। তা ভঙ্গ করে বিশাল জমায়েত হয়েছে অফিসের সামনে। সব রাস্তায় ব্যারিকেড। তাহলে ল অ্যাণ্ড অর্ডার কোথায় রইল?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—সে দায়িত্ব আপনাদের। অনেক কলিয়ারী দেখলাম—

যেখানে ম্যানেজার, এজেন্ট কলিয়ারী চালাবার চেষ্টা করেননি। সেখানে ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ হয়েছে। ইমারজেন্সীর কাজও চলছে।

—কিন্তু এই জনতা? এদেরকে সরিয়ে দেবার দায়িত্ব পুলিশের। কারণ একশো চুয়াল্লিশ ধারার প্রয়োগ তারাই করেছেন।

—একশো চুয়াল্লিশ ধারা সবারই জন্য প্রযোজ্য। আপনাদের লেবাররাও তার মধ্যে পড়ে। তাদেরকে আপনারা সরিয়ে নিন।

অনন্ত বলল—ইয়োর অনার স্যার। আপনার অর্ডার মেনে নিচ্ছি। আমরা লেবারদের সরে যাবার জন্য মাইকে ঘোষণা করছি। কিন্তু তারপর?

—আমিও পুলিশ তুলে নিচ্ছি? আমাদের পুলিশ স্ট্রাইক ভাঙবার জন্য বা মহিলাদের লাঞ্ছিত করার জন্য থাকবে না।

উনি উঠে পড়লেন।

—তাহলে স্যার ইমারজেন্সী কাজ চালু করার কি হবে?

—আপনারা বুঝুন। আপনাদের কলহ মেটাবার ম্যাজিক আমি জানি না। আপনারা একটা করে হাঙ্গামা করবেন আর আমরা শান্তিরক্ষার জন্য ছুটে বেড়াবো? এবার কিছু হলে ইউনিয়ন এবং ম্যানেজমেণ্ট উভয় পক্ষকেই অ্যারেস্ট করবো।

উনি অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

তা হলেও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দৃঢ়তার কারণে পুলিশকে সামনে রেখে মিঃ শ' যে লেবার দিয়ে খাদে প্রোডাকসন করবেন সে চেষ্টাতেও দারুণ আঘাত পড়ল। ইউনিয়ন নেতারা তাতেই খুশী।

ষাট

বিউটির মনটা খুব খুশী। স্ট্রাইকের তৃতীয় দিনেও খাদ চালু করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। প্রথম দুটো দিন ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। তৃতীয় দিন খাদ চালু করার কোনো চেষ্টা হয়নি। পুলিশ একশো চুয়াল্লিশ ধারা তুলে নিয়েছে। এখন সেই দমফাটা উত্তেজনা অনেকটা স্তিমিত।

কলিয়ারী যেমন ছিল তেমনি আছে। বিশেষ খবর বলতে ইঞ্জিনীয়ার মিঃ সরকার সকালে ইঞ্জিন চালিয়েছেন। ম্যানেজার ও ডি. ডি. সাহেব সেই ডুলিতে খাদে নেমেছিলেন নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি তদারক করেছেন। এখনো কিছু ক্ষতি হয়নি। তবে জল বেড়েছে। দু-একদিনের মধ্যে পাম্প চালু না করলে কোল কাটিং মেসিন, ড্রিল প্যানেল, ফেস পাম্প ডুবে যাবে।

বড় ফ্যানটা চালু আছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার পালি করে সেটা চালাচ্ছেন। খাদে গ্যাস হয়নি।

ইন্সপেকশন টিম রিপোর্ট তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ডি. ডি. সাহেব দুপুরে লাঞ্চ করতে এসে বিউটির কাছে সেসব গল্প করেছেন। তারপর আবার গেছেন পাঁচ নম্বর খাদে সেকেণ্ড শিফটের ইন্সপেকশন করতে।

আশ্বিনের বিকেলে তেজি রোদ। মোরাম রাস্তার উপর লম্বা লম্বা গাছের ছায়া। বিউটি হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে শিমুল গাছটির নিচে দাঁড়িয়ে আছে। তার মনে হচ্ছে অনন্তকে একটা অভিনন্দন পাঠায়। কি কৃতিত্বটাই না দেখাল। তেমনি বউ পেয়েছে। একজন যদি আগুন হয় তবে অন্যজন বারুদ।

বিউটি জানে মিঃ শ' ওদের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করেছেন। ডি. সি. সাহেব প্ল্যান করেছেন। কার্যকরী হবে বাঁকেলাল, রবিলাল ও তাদের দলবল নিয়ে।

কিন্তু কবে, কোথায়, কিভাবে সেই প্রেতকর্মটি অনুষ্ঠিত হবে সেইটুকুই ও জানতে পারেনি।

শিমুল গাছটি যখন নিতান্তই শিশু ছিল তখন ও এই বাংলোতে এসেছে। মন ভালো থাকলেই গাছটির ডালপালায় হাত বুলিয়ে আদর সোহাগ করে। এবড়ো খেবড়ো গাছের গুঁড়িতে ওর চিকন কোমল হাতের স্পর্শ পড়ে প্রায়ই। যে হাতের একটুখানি স্পর্শের জন্য কত নামী দামী পুরুষ কাঙাল সেই হাত কত অবলীলায় স্নেহ ও সোহাগসিক্ত হয়ে গাছটার গায়ে পড়ে। উদ্ভিদ জগতের প্রাণে যদি নারীর প্রতি আকর্ষণবোধ থাকে তবে তার ধন্য হবার কথা।

হাত বাড়িয়ে একটি ডাল ধরে দাঁড়াতেই তার ভঙ্গীটি হলো বনচারিনী নায়িকার মতো। যেন মহাকাব্যিক সুষমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নয়া মডেলের শকুন্তলা। ডি. সি. সাহেব অফিস থেকে ফিরছিলেন। তাতে ওর ভঙ্গীর কোনো পরিবর্তন হলো না। বরং উনি কাছে এসে বললেন—হ্যাল্লো বিউ। এমন মনোহারিণী ভঙ্গীতে কার প্রতীক্ষায়?

—মনে করুন যিনি সামনে এসে স্তুতি করছেন।

—ওহ্! মাই গড! এত সৌভাগ্য কি আমার হবে?

—আপনি আমাকে এত মূল্যবান মনে করেন?

—নিশ্চয়ই!

—ধন্য হলাম।

—ব্যস। ধন্য হলাম বললেই সব শেষ হয়ে গেল। আর কিছু কথা নেই? নেই কিছু দেওয়া নেওয়া?

—ডি. সি.! আপনার দেওয়া নেওয়ার অর্থ আমি জানি। কিন্তু কজনকে দিতে পারি? আমার অলরেডি দুটো ক্যাণ্ডিডেট।

ডি. সি. ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—শুধু একদিনের জন্য এসো বিউ। একটা দিন —তুমি হবে রানী। আমি বান্দার মতো সেবা করব।

বিউটির মুখে খেলে গেল বিচিত্র রহস্যময় হাসি। যত সুন্দর, তত তীক্ষ্ণ, তত অন্তর্ভেদী। সমুদ্র মন্দ্রিত ধ্বনি তরঙ্গের মতো একটি একটি শব্দ তার বাকযন্ত্র থেকে বেরিয়ে এল—সুরেলা কণ্ঠস্বরে ভীষণ অর্থবহ সংলাপ—

—যাবো ডি. সি.। যেদিন ঘোর ঘনঘটায় ছেয়ে যাবে আকাশ। অশনি সংঘাতে ফালা ফালা হয়ে ঝলসে যাবে কালো প্রেক্ষাপট। ধরিত্রীর নীল নীচোল ভেসে যাবে গৈরিক বন্যায়। অনার্য দামোদর ক্রুদ্ধ আক্রোশে ভেঙে দেবে পাহাড়! সেই দিন সেই ভীষণ নৈসর্গিক বিপর্যয়ের দিন তুমি হবে আমার বান্দা। আর আমি তোমার গুলবেগম।

স্তব্ধ বিস্ময়ে ডি. সি. ওর দিকে তাকিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—আজ তুমি আমার সঙ্গে একটা নতুন স্টাইলে রসিকতা করলে। কিন্তু মনে রাখবে তোমার বিষদাঁত ভাঙার সাঁড়াশি আমি পেয়ে গেছি।

হাসি হাসি মুখ করে বিউটি বলল—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ।

—বড্ড রেগে গেছ ডি. সি.। আমি একটু কাব্য করে একটা কথা বললাম তাতে এত রাগ কেন?

—তুমি নিজেকে বেশি বুদ্ধিমতী মনে কর। তাই এত দেমাক। কি করে দেমাক ভাঙতে হয় জানি। সেদিন তোমার ভেড়ুয়া স্বামী তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

উনি চলে গেলেন। বিউটি সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেল। সূর্যটা তখন পঞ্চকোট পাহাড়ের চুড়োর পাটে বসেছে।

ভূতবাংলোতে তখন ভূত নাচছে। জনপ্রাণীশূন্য। চরাচরব্যাপী অন্ধকার। সেখানকার আয়া, খানসামা, বাবুর্চিরাও স্ট্রাইকে যোগ দিয়েছে। চাপরাশিটা প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। বিজলির তার কেটে দিয়েছে। শুধু কানে বাজছে দামোদরের গর্জন। দরজা জানালা বন্ধ। মেন গেটে তালা দেওয়া।

মিঃ শ' গেটের মুখে গাড়ি থামিয়ে ডি. সি.-কে বললেন চাবি খুলুন।

একগোছা চাবি নিয়ে উনি গাড়ি থেকে নামলেন। একটা একটা করে তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। নির্জন বাংলোয় কেমন গা ছমছমে আবহাওয়া।

বিউটি বলল—লোকজন, আলো বাতাস না থাকলে কোনো প্লেজার নেই।

মিঃ শ' বললেন—চাপরাশিটাও কেমন বেইমান দেখ। ওর তো স্ট্রাইক করার কথা নয়। তবু ডিউটিতে আসেনি।

ডি. সি. বললেন—ও ব্যাটা পালিয়েছে। এখানে ডিউটি করতে ভয় লাগছে ওর।

—ননসেন্স।

ডি. সি. জানতেন যে ভূতবাংলোতে বাতি নেই। তাই কয়েকপ্যাকেট মোম-বাতি নিয়ে এসেছিলেন। বড় ঘরটায় চার পাঁচটা জ্বেলে দিলেন। বিউটি একটা ডিসে কাজু বাদাম ও চানাচুর এনে দিলো। হুইস্কীর বোতল খুলে তিনটি গ্লাসে ঢেলে ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে এসে বলল—নিন। সেবা করুন।

—থ্যাঙ্ক ইউ ডার্লিং। আজ তোমাকে কষ্ট করতে হলো।

—নো ডিয়ার। আমি খুব খুশীতে একাজই করছি।

মদ খাওয়া শুরু হলো। দু পেগ খাওয়ার পরই মিঃ শ'য়ের মাথাটা চনমন করে উঠল। বললেন—ইটস এ মিজারেবল ফেলিয়োর ডি. সি.। আমি আপনাদের উপর খুবই ভরসা করেছিলাম।

ডি. সি. বললেন—আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি স্যার। কিন্তু আমাদের সিক্রেট প্রোগ্রাম বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যই সব বানচাল হয়ে গেল।

—তা জানি ডি. সি.। কিন্তু কি করে গেল?

—আমি একটা সূত্র পেয়েছি।

—বলুন।

—খুবই প্রাইভেট স্যার।

—এখানে বলতে কি অসুবিধে?

তেমন কিছু নয়। তবে কথাটা দুজনের মধ্যে থাকলেই ভালো হয়।

বিউটি বলল—আপনারা প্রাইভেট কথা সারুন না। আমি পাশের ঘরে আছি।

ও চলে গেল। দুজনেই চুপচাপ। আরো এক পেগ করে হুইস্কী নিলেন।

ডি. সি. বললেন—যা বলতে চাইছি তা আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু দয়া করে শুনুন এবং বিশ্লেষণ করুন। যেটুকু সংবাদ পেয়েছি তার সঙ্গে আমার আনুমানিক হিসেব যোগ করে বলছি।

মিঃ শ' খুবই মনোযোগী হয়ে বললেন—হ্যাঁ। বলুন।

ডি. সি. নিজের মধ্যে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে বললেন—স্যার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে মিটিংয়ের দিন গৌরী যে শাড়িটা পরেছিল তা কি চেনেন?

উনি একটু ভেবে বললেন—চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু কার? ঠিক খেয়াল হচ্ছে না। অথচ—

—ইয়েস স্যার! আপনার খুব নিকট উওম্যানের?

—ইউ মিন—বিউ।

উনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ডি. সি. শান্তকণ্ঠে বললেন—ইয়েস স্যার! অনন্ত বলেছিল কোনো সদাশয়া মহিলা—ইনিই তিনি!

—মাইগড! কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়? ওর মন উঁচু। সংবেদনশীল। হয়তো গৈরীর ডিসট্রেসড কণ্ডিশন দেখে দিয়েছে।

—ডিসট্রেসড উওম্যান আরো ছিল। ওর চেয়েও নাজেহাল অবস্থা আরো দু-তিনটি মেয়ের ছিল। তাদের দিকে তো নজর যায়নি। আসলে অনন্তর সঙ্গে ওর একটা আন্তরিক সম্পর্ক আছে। আগে খুবই যাতায়াত ছিল। ইদানীং দেখা যায় না। কিন্তু গোপন আঁতাত থাকতে পারে। ব্যাপারটা আরো অনুসন্ধানের। আরো বিশ্লেষণের। আমি প্রমাণ যোগাড় করছি।

—ও কে প্রসিড

এ যেন কোষ বিভাজন। মনের পর্দা খুলছে। এর আগে বিউটি কখনোই তার মনের গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেনি। সে যেন একা। তার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের যাবতীয় ভার তার নিজেরই। এতে কাউকে অংশীদার করতে চায়নি। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছে জীবনে একজন এমন অংশীদার প্রয়োজন যে তার দরদি ও মরমি হতে পারবে। আপন পৌরুষ দিয়ে নিজের নারীর সম্মান রাখতে না পারুক—তার প্রতি সৎ থাকবে।

সন্ধ্যাকালে ভূত বাংলোতে তাকে সরিয়ে মিঃ শ' ও ডি. সি. সাহেবের গোপন আলোচনা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ডি. সি. যে তার নামে চুকলি করবে এটা জানা কথা। কিন্তু তার কার্যকলাপের হদিশ পাবে কি করে?

সেই নিয়ে ডি. ডি. সাহেবের সঙ্গে বিস্তর আলোচনা হলো।

এতদসত্ত্বেও ডি. ডি. সাহেব খুশী হলেন। এতদিনে বিউটিকে নিজের কাছে পেয়েছেন। কত দূরে ছিল ও। মনে হতো আসমানের হুরী পরী। আজ তার মনের পর্দা খুলে গেল।

বিউটিকে দেখতে পাচ্ছেন প্রতিহিংসার জ্বালায় জ্বলতে। ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষায় নিজেকে মেলে ধরতে।

আহা! বিউটি আজ বিউটিফুল ফুলের মতোই ফুটে উঠেছে।

এতদিনে নিজেকে নিয়ে গর্ব করার মতো কিছু পেলেন। এবার দেখিয়ে দেবেন তিনি কাপুরুষ নন।

মিঃ শ' তখন থেকেই ভাবছেন বিউটি তাঁকে বিট্রে করবে? নাকি এটা ডি. সি. সাহেবের রটনা? এটা কি ব্যর্থকাম পুরুষের প্রতিহিংসার প্রচেষ্টা? মিঃ শ'য়ের বুকে পিন ফুটিয়ে বিউটির প্রতি তাঁকে বিরূপ করে তোলা?

সে যাইহোক, বিউটিকে উনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করবেন।

পরের দিন বেলা দশটার সময় ডি. ডি. সাহেবকে খাদে পাঠিয়ে দিয়ে উনি ওঁর বাংলোতে এলেন। দরজা খুলে বিউটি বলল—কি সাহেব? এই অসময়ে?

বিউটির ঘরোয়া চেহারাটা মাদকতাময়ী তবে নয় রূপে লাবণ্যবতী তো বটেই। সাহেব তার দিকে তাকিয়ে বললেন, বড় দুশ্চিন্তায় আছি বিউ।

উনি সোফাতে বসলেন। বিউটি দাঁড়িয়ে রইল। বলল কেন সাহেব ?

—যা প্রোগ্রাম করছি তাই ভেস্তে যাচ্ছে। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা।

বিউটি একটু চুপ করে থেকে বলল, এটা তোমাদের সাফল্যের সময় নয় সাহেব। বৃথাই চেষ্টা করছো।

—কেন ?

বিউটি একটা চেয়ারে বসে বলল, কয়লা কুঠির ইতিহাসে যত সাফল্য তো তোমাদের নামে জমা হয়ে আছে। একবার ওদেরকে সফল হতে দাও।

—তার মানে ? তুমি চাও না যে আমরা সফল হই।

—নিশ্চয়ই চাই সাহেব। তবে তা যেন কল্যাণের পথে হয়।

—তাই বুঝি তুমি আমাদের গোপন খবর ফাঁস করে দিচ্ছো ?

বিউটি চমকে উঠল। কথায় কথায় এতদূর চলে আসবে তা ও ভাবেনি। অথবা ইচ্ছা করেই সাবধান হয়নি।

বলল—কে বলেছে তোমাকে ?

—আমার তো চোখ কান আছে।

—বুঝেছি ডি. সি. সাহেবের রটনা !

—যদি তাই হয়।

—ওর মনোবাসনা জানো ? আমাকে ভোগ করতে চায়।

দুজনেই নীরব। অনেকক্ষণ। মিঃ শ' বললেন—আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

—যদি না দিই ?

—তাহলে জানবো ডি. সি.-র অভিযোগ সত্য।

—তখন তুমি কি করবে ?

—তোমাকে ডি. সি.-র হাতেই তুলে দেব।

—আমাকে ডি. সি.-র হাতে তুলে দেবার তুমি কে সাহেব ? কি মনে কর কি ? আমি তোমার কোবালা সম্পত্তি ? নাকি গুদামের মাল ?

মিঃ শ' গুম হয়ে বসে রইলেন ? বিউটি ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অপরিসীম ঘৃণা উপচে পড়ছে তার মুখে।

মিঃ শ' বললেন, আই অ্যাম সরি। কথায় কথায় রূঢ়তা বেড়ে গেল। কিছু মনে কোর না বিউ। আমার ভুলটা ভেঙে দাও।

—আমার কিসের দায় ? না কারো গোয়েন্দাগিরি করি। সবাই জানে আমি নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ। শরীর বিকিয়ে ইনাম পাই। আমার কাছে ডি. ভি., ডি. সি, শ'-র কোনো তফাৎ নেই। তুমি আমাকে ডি. সি-র হাতে তুলে দেবে কি ? আমি একটা ইশারা করলে ঐ ডি. সি. তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে। জানো সেটা ?

মিঃ শ' ওর হাত ধরে বললেন—রাগ করো না বিউ। প্লিজ !

—ওর কথায় নেচে বেড়াচ্ছ সাহেব? কতটুকু জানো ওকে? ও তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে। কত সাহেবকে ওর জন্য কাঁদতে কাঁদতে যেতে হয়েছে।

আমি অত খারাপ মেয়েমানুষ নই।

মিঃ শ' ওর রাগ ভাঙাবার জন্য সাধন ভজন শুরু করলেন। ইহাই ছলনাময়ী নারীর কৌশল।

অনেক কলিয়ারীতে স্ট্রাইকের দিনগুলিতে খাদ চালাবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু কোথাও সফল হয়নি। সেজন্য বহু গণ্ডগোল হয়েছে। যে সব কলিয়ারীতে নিরাপত্তা, সুরক্ষা, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, চিকিৎসাকেন্দ্র প্রভৃতি চালু রাখার দায়িত্ব ইউনিয়ন গ্রহণ করেছে, সেখানে কোনো গণ্ডগোল হয়নি।

তেমন একটা কিছু করা যায় কি না তা নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করছেন মিঃ চৌধুরী। তিনি ম্যানেজার। কিন্তু মিঃ শ' এমন জবরদস্ত দাবানি দিয়ে রেখেছেন যে প্রশাসনিক ব্যাপারে তাঁর কোনো ইমেজই গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু তাঁর তো একটা দায়িত্ব আছে। এত বড় কলিয়ারীর এত এত লোকজনের দুর্ভোগ, খাদের ভিতর নিরাপত্তার দেখাশোনা করা তো কজন অফিসার দিয়ে চলবার নয়।

মিঃ সরকার ইঞ্জিন চালাবেন। ডি. ডি. সাহেব পাখা চালাবেন, দত্ত মাধব বয়লার চালাবেন, এভাবে দু' একদিন লোক দেখানো কাজ হতে পারে। বেশী দিন চলতে পারে না।

সেজন্য তিনি ইঞ্জিনীয়ার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে মিঃ ভার্মার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি মিঃ চৌধুরীর বক্তব্য সমর্থন করে বলেছিলেন—ইউ প্রসিড।

তাই সেদিন মিঃ চৌধুরী ও মিঃ সরকার অফিসারদের একটা গোষ্ঠীকে নিয়ে মিঃ শ'য়ের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

মিঃ সরকার বললেন—আফটার অল কলিয়ারীর সামগ্রিক স্বার্থে ইউনিয়নের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া খুব দরকার।

মিঃ শ' উষ্ণভাবে বললেন, সে কথা আমিও বুঝি। কিন্তু ইউনিয়ন মানেই সুমিত চ্যাটার্জীর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, কালকার ছেলে অনন্তের ধমকি এবং তার ভালগার বউটার হাতনাড়া আর চিলচিৎকার। উঃ অসহ্য।

আই ক্যানট স্ট্যাণ্ড।

মিঃ চৌধুরী বললেন, আপনার সেন্টিমেন্ট আমরা ফিল করি স্যার। কিন্তু এই জন্য কি কলিয়ারী বরবাদ হবে?

উনি ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন, ছাট ইজ মাই বিজনেস।

—আমারও দায়িত্ব আছে সারা কোলিয়ারীতে কোনো একসিডেন্ট হলে,

মাইনস ডিপার্টমেণ্ট আমাকেও ছাড়বে না। আইনত আমিও সেজন্য দায়ি অথচ স্বাভাবিক কাজ চালাবার ক্ষমতা আপনি আমাকে দিচ্ছেন না।

—কারণ আপনি আমার কাছে নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দায় দায়িত্ব প্রমাণ করতে পারেননি! শুরু থেকেই বড় কেলাস অ্যাণ্ড হোপলেস।

মিঃ শ'য়ের এত উষ্মার পরেও নার্ভাস হননি বা মেজাজ হারাননি। শান্ত কণ্ঠে বললেন, আপনার কথা বড়ই আপত্তিকর। আমি তার প্রতিবাদ করে বলছি আপনার হামবাগ গোঁয়ার্তুমির কারণেই আমি চুপ চাপ থাকতে বাধ্য হয়েছি। না হলে আমি শো রান করতে পারি।

মিঃ শ' ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আই সি! আপনি ইউনিয়নের ছোকরাদিকে তেল দিয়ে কাজ চালাতে চান নাকি?

—তেল দেবার কি আছে? তাদের সঙ্গে কর্ডিয়ালি মিটিং করতে পারি।

—আপনার কি ধারণা ঐ অবাধ্য লোকগুলিকে আপনি বোঝাতে পারবেন?

—আশা করি।

—ও কে। ওদেরকে ডেকে পাঠান।

কিন্তু অনন্ত তখনো হাসপাতাল থেকে ফেরেনি। ওকে ছাড়া অন্য নেতারা আসতে চাইলেন না। হরিহর গান্ধী আরো পরিষ্কার করে বলে পাঠালেন—এজেণ্ট সাহেবের সঙ্গে আমরা কোনো মিটিংয়ে বসব না। ম্যানেজার যদি নিজের দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তবে যেতে পারি।

মিঃ শ' ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে বললেন, দেখলেন কেমন তামাশা।

মিঃ সরকার বললেন, একবার। আপনি আমাদিকে একবার ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলতে দিন স্যার। আমরা এমন কিছু করবো না যাতে আপনার সম্মান ক্ষুন্ন হয়।

ও কে।

উনি উঠে চলে গেলেন ভূতবাংলোয়। তাঁর পিছনে পিছনে চললেন অনুগত চাটুকার ডি. সি. সাহেব। ডি. ডি. সাহেব রয়ে গেলেন। কারণ খাদের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম ইনিই করছেন।

সেই প্রথম ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং হলো মিঃ শ'কে বাদ দিয়ে। এক ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে জরুরী কাজ অবিলম্বে চালু করা হবে। বয়লার, ইঞ্জিন, ফ্যান, বাতিঘর, খাদের মাইনিং, ওভারম্যান, বিজলি মিস্ত্রী, ফিটার মিস্ত্রি, এম্বুলেন্স, ডাক্তারখানা, জল, বাতি সব চালু। শুধু প্রোডাকসন ও ডেসপ্যাচ বাদ দিয়ে ম্যানেজার যে কাজের জন্য লোক চাইবেন তাই দেওয়া হবে।

এতদিন পর একটা মিটিং সফল হলো।

অনন্ত বলল, স্যার। আমরাও তো চাই না যে জরুরী কাজ বন্ধ হয়ে থাক।

সারা কলিয়ারীতে অন্ধকার ঢেকে আছে। আমরা রাত্রে ডিউটি করি। দেখি নিষ্প্রাণ যন্ত্র-জগৎ। নিজেদেরই খারাপ লাগে।

এই একটি সিদ্ধান্তে সারা কলিয়ারীতে স্বস্তির হাওয়া বয়ে গেল। একটা দমফাটা গুমোট অবস্থার অবসান হলো। প্রত্যেকটি মানুষের প্রাণান্তকর দুর্দশা। ধর্মঘটের দরুন সৃষ্ট এই দিকটার কথা কেউ আগে ভাবেনি।

ফ্যানের একটানা গোঁ গোঁ শব্দ, পাম্পের ডেলিভারি পাইপ থেকে জল পড়ছে গর গর করে, সন্ধ্যাকালে বাতি জ্বলে উঠল! চির পরিচিত দৃশ্য ও শব্দ হারিয়ে যাওয়াতে প্রাণ আনচান করছিল।

মিঃ শ' মোমের আলোতেই মদ্যপান শুরু করেছিলেন। মাথা ঝিম ঝিম করার অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। হঠাৎ ভূতবাংলোর বাতিগুলো জ্বলে উঠল।

ডি. সি. সাহেব বললেন—বাঃ, আজ বাতি জ্বলছে।

মিঃ শ' বললেন—এতে আপনার খুশী হবার কোনো কারণ নেই ডি. সি.।

—স্যার!

—বুঝতে পারছেন না এইভাবে আমার মুখে থাপ্পর মারা হলো।

ডি. সি. সাহেব ওর কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। আর একটু পরে পিওন মারফৎ মিঃ চৌধুরীর মেসেজ এল—ম্যাটার সেটেলেড। ইমারজেন্সী অপারেশন রেসটোরড।

চিঠিটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ডি. সি. সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ননসেন্স! ব্লাডি চৌধুরী এই সেদিন ফার্স্টক্লাশ পাশ করে আজ ডিপ্লোম্যাট বনে গেল। আমাকে আউট করতে চায়। আমাকে ছাড়াই মিটিং সাকসেসফুল! এ্যজ ইফ আই য়্যাম এ ফুল!

স্তোক বাক্যের মতো ডি. সি. সাহেব বললেন—ওকে টাইট করতে কতক্ষণ স্যার। কাল অফিসে গিয়ে একটা হুঙ্কার দেবেন তো, সবাই থরহরি কম্পমান হয়ে যাবে।

—কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই। আপনি এখুনি যান। আজ রাত্রেই অ্যাকশন চাই।

—আমার সব রেডী স্যার। অর্ডার পেলেই হলো।

—ও কে। উইশ ইউ গুড লাক।

মদের গ্লাস তুলে তাকে শুভেচ্ছা জানালেন।

ডি. সি. সাহেব চলে গেলেন। মিঃ শ' একা। একবার ভাবলেন বিউটিকে ডেকে আনবেন। তারপরই মনের পরিবর্তন হলো—না। আজকের দিনটা একাই থাকি ভূতবাংলোতে ভূতের মতো।

সত্যি কি আমি ভুত হয়ে গেলাম? মিঃ চৌধুরী এত সাহস কোথায়

পেলেন যে আমার মুখের উপরে কথা বলেন। কোন উপরওলার মদত আছে ওর পিছনে? অথবা কলিয়ারীর সব অফিসারই এর পিছনে আছে? এ ষড়যন্ত্রের নায়ক কে? বিউটি কি সত্যিই বেইমানি করতে পারে? কিন্তু তা কিসের স্বার্থে? ওকে আমি কি না দিয়েছি? টাকা, শাড়ি, গয়নায় মুড়ে দিয়েছি। এত পাওনা আর কার কাছে পাবে?

তবে কি এটা ডি. সি.-র চাল? আমার মন ভাঙাতে চায়? বিউটিকে ও অনেক দিন থেকে চাইছে? তাছাড়া ওর অনুমানের পিছনে প্রমাণ কই?

হঠাৎ একটা গাড়ি ছুটে এল। তা থেকে নামলেন মিসেস শ'। পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই উনি চমকে উঠলেন। ঢুলু ঢুলু চোখ তুলে বললেন—হ্যালো! তুমি?

—তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিলাম তো।

—ওঃ ইয়েস!

মিসেস শ' বসতে বসতে বললেন—তুমি একা কেন? তোমার সাঙ্গোপাঙ্গরা কোথায়? তোমার সেই উত্তম্যান কোথায়?

কি রকম ক্লান্ত ও হতাশ ভঙ্গীতে উনি বললেন—ওদেরকে আমি স্ট্যাণ্ড করতে পারছি না। সব বেইমান। হাজার হাজার টাকা খরচ করে ওদের মদ খাওয়ালাম, ফ্রি সেক্স, ফ্রি লাইফের চার্ম দিলাম। কিন্তু কাজের সময় এভরিবডি কাট এ সরি ফিগার। অল ওয়ার্থলেশ!!

মিসেস শ' ওর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—আমি তোমার টেনসন ফিল করি ডিয়ার। সেজন্য বাইরে মন রাখতে পারছি না। একবার শপে গিয়ে ফিরে এলাম।

মিঃ শ'য়ের হৃদয় বলে কিছু থাকলে তখন তা মুচড়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু ওরা তো দো আঁসলা ফরেন মাল! মুখের ভাবে কিছুই বোঝা যায় না।

মিসেস বললেন—বাংলোয় চলো ডিয়ার। একটা সন্ধ্যা তোমার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কাটাবে। তাদের সঙ্গে ডিনার খাবে। ওরা খুব খুশী হবে।

—ও কে।

ভূতবাংলোতে চাবি দিয়ে ওঁরা চলে গেলেন।

সে রাতটা ছিল স্বস্তির রাত। সাতটা দিন রাত্রি অবিরত উদ্বেগ, অশান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটিয়ে লোকজন টান টান হয়েছিল। একটি সিদ্ধান্ত তার মধ্যে স্বস্তির হাওয়া ও বাতি জ্বালার কারণে কেমন একটা প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। সেই সঙ্গে শরীর-জুড়ে এসেছিল ক্লান্তি। ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে।

অনন্ত বাসায় এল রাত সাড়ে নটায়। এসেই গৈরীকে তাড়া দিলো জলদি ভাত দে। আমাকে আবার একবার কলিয়ারী যেতে হবে।

—কেন ?

—কোয়ার্টারে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের পাম্পটা খারাপ আছে। মেরামত চলছে।

—তবে আবার যাবে কেন ? তুমি ছাড়া লোক নেই ?

—থাকবে না কেন ? চৌধুরী সাহেব নিজেই দাঁড়িয়ে আছেন। তবে এতদিন পরে কোয়ার্টারে জল সাপ্লাই হবে তার শেষ দেখবো না ? এও তো একটা খুশী রে ! ভাবিস না আজ নিশ্চয় ঘরে থাকবো।

স্ট্রাইকের প্রথম দিনটি থেকে ও রাত্রে ঘরবাস করেনি। চব্বিশ ঘণ্টা কলিয়ারীতে ডিউটি দিয়েছে। বাতিঘরে ইউনিয়ন অফিস খুলেছে। সেখান থেকেই সব কাজকর্ম কনট্রোল করছে। স্বেচ্ছাসেবীরা পালি করে ডিউটি দেয়। ও নিজে লাগাতার পড়ে আছে।

দিনে রান্না হয়েছিল বেলা তিনটের সময়। গৈরীর মা এক হাঁড়ি ভাত সিদ্ধ করে রেখেছিল। সেই কড়কড়ে ভাত, একটু ডাল ও কচুর ঘ্যাঁট দিয়ে সপাসপ একথালা ভাত গিলে উঠোনে হাত ধুয়ে চলে গেল।

ভাইবোনদের খাওয়া হয়েছিল। তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। হেনী ঘরে বিছানা পাতছে। গুলু চরিতরের সঙ্গে চবুতরায় বসে গাঁজা টানছে। গৈরী একাই অনন্তর থালাতেই ভাত তরকারির যা অবশিষ্ট আছে সব ঢেলে নিয়ে বারান্দায় খেতে বসেছে। বিপ্লবকে পাশে শুইয়ে রেখেছে। হাতের নাগালের মধ্যে। যাতে কাঁদলেই গায়ে হাত দিতে পারে। ছেলের মায়ের কত হ্যাপা।

ওরও চোখ জুড়ে ঘুম আসছিল। কিন্তু আজ অনন্ত আসবে। তাই ভিতরে একটা উত্তেজনা গুর গুর করছে। অন্যমনস্কভাবে খাচ্ছিল ! হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে তাকাল। দুজন শ্রমিক।

জিজ্ঞাসা করল অনন্তবাবু কাঁহা ?

—কলিয়ারীমে।

—আভি দেখা ঘরমে আয়া।

—আভি চলা গিয়া।

—শালী। ঝুট কহতী হো।

অন্ধকার ফুঁড়ে তৃতীয় একজন গর্জন করে ওর দিকে এগিয়ে গেল। ওকে দেখেই গৈরীর মুখের গ্রাস হাত থেকে পড়ে গেল। এঁটো হাতেই বিপ্লবকে জাপটে ধরে চিৎকার করে উঠল—বাপু।

লোকটি ওর উপরে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। টেনে নীচে নামাল।

গৈরী আরো জোরে চিৎকার করল বাপু—বাপু—

একজন ঝট্ করে মুখ চেপে ধরল। আরেকজন হ্যাঁচকা মেরে বিপ্লবকে কেড়ে নিল। গৈরী প্রাণপনে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। হেনী ঘরের ভিতরে চিৎকার করছে।

একজন বলল, শালী। রাণ্ডিকো লে চলো।

গৈরীর বুকের রক্ত জল হয়ে গেল—এ যে রবিলাল।

কোথা থেকে একমুহূর্তের জন্য শরীরে এসে গেল আসুরিক শক্তি। এক ঝটকায় লোক দুটোর হাত ছাড়িয়ে লাফ মেরে বারান্দায় উঠল। তৎক্ষণাৎ বোম চার্জ হলো লক্ষ্য করে। ঝলেস ওঠা আগুন আছাড় খেয়ে পড়ল মেঝেতে। ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে উঠল—আ। বা—পু—

তবু সে ঘষটে ঘষটে দরজার কাছে পৌঁছাল। হেনী দু'হাত বাড়িয়ে ওকে ঘরের মেঝেতে টেনে নিল। বোম পড়ল এদিক ওদিকে। বারুদের গন্ধে রক্ত বমি হলো।

তখন চারিদিকে বোমা ফুটছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার। হ্যারিকেনটি উল্টে গড়িয়ে গেছে উঠানে। সেখানে কেরোসিন তেলে আগুন জ্বলছে। ভীষণ হৈ হল্লা। ছুটে আসছে লোকজন। পর পর বন্দুকের গুলি। ব্যস। তারপরই বোম বারুদের খেল খতম।

সব মিলিয়ে দেড় বা দুমিনিট। একটা সংসার ছারকার করে দিয়ে গেল। সবার আগে ছুটে এসেছিল গুলু ও চরিতর। তারপর বৈশাখী। তখনো ধোঁয়া কাটেনি। আবছা অন্ধকারে দেখল গৈরী উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার শরীরের অর্ধেকটা ঘরের মেঝেতে। অর্ধেকটা বারান্দায়। কোমরটা চৌকাটের উপর। ভীষণ গোঁ গোঁ করছে।

হেনী ঘরেই কাত হয়ে পড়েছে। সে গৈরীকে টেনে ঢোকাবার সময় বোমের ছিটকনা পেয়েছে। সুরেশ, মহেশ ও চম্পাও বোমের ছিটকনা পেয়েছে। গৈরীর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেছে। পেটের দিকেই বেশী। মুখ থুবড়ে বুকের উপর পড়েছিল বলে সামনে দিকের আঘাত বোঝাচ্ছে না। সবাই গোঙাচ্ছে বিপ্লবের কোনো চিহ্ন নেই।

গুলু হায় হায় করে উঠল। চরিতর মাথা চাপড়াতে লাগল। চারিদিক থেকে পিল্ পিল্ করে ছুটে আসছে। সব ধাওড়ার লোক মুনিয়া ধাওড়ার দিকে। অনন্ত ছুটে এল হাঁস ফাঁস করতে করতে। গৈরীকে দেখে আর্তনাদ করে উঠল।

গৈরীর মুখে ফ্যানা ভাঙছে। বমি, রক্ত ও লালায় লেবড়ে গেছে মুখটা। হাত দিয়ে মুখটা মুছে দিয়ে বার বার ডাকতে লাগল—গৈরী! গৈরী।

যে অনন্তর একটা ডাকে গৈরীর তাবৎ ভুবন আলোয় আলোকিত হয়ে উঠত সে ওর ডাক শুনে সারা দিলো না। অনন্তর গলা ভেঙে গেল। কেমন অদ্ভুত

ভঙ্গী করে চিৎকার করল ডাক্তার। ডাক্তার ডেকে আনো। ওর কাছে বসে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। বৈশাখী একটা কাপড় ঢাকা দিলো গৈরীর উপর।

কিন্তু বিপ্লব কোথায়? চিৎকার করে উঠল অনন্ত—বিপ্লব!

হেনীর জ্ঞান ফিরছিল। সে বলল—উ-লোগ ছিন্‌লিয়া। বাঁকেলাল বাঁকেলাল আউর আদমী।

হা-হা শব্দে হাহাকার করে উঠল—হে ভগবান। স্ত্রী-পুত্র দুটোকেই শেষ করে দিলে?

হরিহরকে দেখে পাগলের মতো ওকে ধরে বলল—হরিহর। জলদি কর। ডাক্তার ডাক। এম্বুলেন্স ডাক। গৈরীকে হাসপাতালে নিয়ে চল।

হরিহর বলল—আপনি শান্ত হোন অনন্তবাবু। রাজকিশোরবাবু গাড়ি আর ডাক্তার ডাকতে গেছে।

—কিন্তু আমার বিপ্লব। তাকে যে খুঁজে পাচ্ছি না।

—সে কি?

—হাঁ রে ভাই! আজ আমার সব ফুরিয়ে গেলো।

বিকৃত কণ্ঠে কেঁদে উঠল ও। হরিহরবাবু ওর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—হিম্মৎ রাখুন অনন্তবাবু। এটা কাঁদবার সময় নয়।

—হা-হা আমি কিছু ভাবতে পারছি না রে ভাই!

বলতে বলতে আছাড় খেয়ে পড়ল। ভীষণ অস্থিরতায় ছট ফট করছে। মাঝে মাঝে উঠে বসে চিৎকার করছে—গৈরী! বিপ্লব!

ওর সেই বুকফাটা ডাক শুনলে পাথরও ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

হরিহরবাবুর হাত ধরে বলল—দাদা! কত দুঃখের সংসার আমাদের। গৈরীকে পেট ভরে খেতে দিতে পারতাম না, পরনের কাপড় জোটাতে পারতাম না। তবু তো সব কিছুকে তুচ্ছ করে ঐ একটি শিশুর মুখ চেয়ে আমরা বেঁচেছিলাম। এক লহমায় ভেঙে গেল। এবার কি নিয়ে বাঁচব।

মুখ গুঁজে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।

এত লোক জমেছিল যে রাস্তা পর্যন্ত জ্যাম। সেই ভিড় ঠেলে রামজী এল কোলে মৃত বিপ্লবকে নিয়ে। সর্বাঙ্গ থেঁৎলে গেছে। মাথাটা ছাতু। পাথরে আছড়ে মেরেছে। এমন মানুষ ছিল না যে সেই দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠেনি। সবাই হায় হায় করে উঠল। বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন রকম শব্দ। কারো ক্রোধ, কারো হুঙ্কার, কারো অনুতাপ, কারো শোক। সব মিলিয়ে শোক, দুঃখ ও ক্রোধের ভয়াবহ গর্জন।

মৃত শিশুকোলে দাঁড়িয়ে আছে রামজী। তার মুখে রা নেই। ঠোঁটদুটো নড়ছে। সারা গা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

একদিকে গুলু অন্যদিকে অনন্তর জ্ঞান বুদ্ধি লুপ্ত। ওরা বোধের সীমা অতিক্রম করে গেছে। অসহনীয় যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত ওরা।

গাড়ি ও ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার আনবার ব্যবস্থা করে রাজকিশোরবাবু এলেন।

উনিই বললেন—রামজী। ওকে এক-পাশে শুইয়ে ঢাকা দাও। অনন্তকে দেখিয়ো না।

রামজী ওকে নিচে নামাতেই বৈশাখী ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার সঙ্গে সঙ্গে কুন্তী ফাল্গুনী ও আরো কয়েকটি মুনিয়া মহিলা। তাদের যত কান্না তত বিলাপ। বুক চাপড়াচ্ছে। টেনে টেনে চুল ছিঁড়ছে ; ঘন ঘন মাথা ঠুকছে।

রামজী বলল—গৈরীকা লেড়কা। হম লোগকো জান। শালা দুষমন ছিনলিয়া।

ইউনিয়নের নেতারা সবাই এসেছিল। তারাই চেষ্টা করে ওখান থেকে লোকজন সরিয়ে ভিড়টা পাতলা করল। মুনিয়া পাড়া শোকের তীব্র আঘাতে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

রবিলাল ! বাঁকেলাল !

দুটি নাম ওদের বুকে ফার্নেসের মতো জ্বলছে। ওদের কলিজা ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। ওদের ক্রোধ এবং বিলাপের ধ্বনি শুনে অনন্ত বেরিয়ে এল। একজায়গায় অনেকগুলি মেয়ে জড়ো হয়ে কাঁদছে। রামজী বুক চাপড়াচ্ছে।

অনন্ত ওকে ধরে বলল—বোল-বোলরে রামজী—কাঁহা মেরে জান ?

রামজী পাগলের মতো কণ্ঠস্বরে বলল—খতম হোগয়া হো-হো—

জান্তব আক্রোশ ও সুতীব্র বেদনার মিলিত আক্ষেপে প্রায় ভেঙে পড়ল। বলতে লাগল—জানসে পেয়ারা মেরে বহিন যাঁহা গয়ী হম সাথমে থা। কিসীকো হিম্মৎ নেহী হুয়া উস পর হামলা করনেকা। কোন জানতা শালা লোক ঘরমে আ-কর খতম করে গা। হমলোক বুড়বক হ্যায়—বেয়াকুব হ্যায়। ঘর সামহালনেকা তাকৎ নহী হ্যায়।

ওর দিকে একটুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে মেয়েগুলির কাছে ছুটে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিপ্লবের উপর। একদিকে বৈশাখী অন্যদিকে কুন্তী ওকে টেনে তুলল। রক্তমাখা, মাথাভাঙা শিশুটিকে দেখে বিকটভাবে চিৎকার করে উঠল ও।

বৈশাখী বলল—এমন কোর না জামাই। তুমিই যদি পাগল হয়ে যাও তবে আমরা কি করব ?

রাজকিশোর ও হরিহর দুজনে ধরে ওকে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল—অনন্তবাবু। আপনি ছুটোছুটি করবেন না। আমরা কি জন্য আছি ? সব দেখছি—ওরা ওকে বসিয়ে দিয়ে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করছে। তখন

দুটো জলন্ত উল্কার মতো এল জগদীশ ও হরেরাম। ওরা ধাওড়ায় ছিল না। হস্থনিয়া মোড়ে খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

ওদেরকে দেখেই শ্রমিকরা ক্ষেপে উঠল। উচ্চকণ্ঠে বলল—ইয়ে কাম হ্যায় শালা এজেন্ট সাহাবকো। উসীনে বাঁকেলাল-রবিলালকো ফিট কিয়া। চল—শালেকো বাংলা উড়া দেঙ্গে।

প্রবল কণ্ঠে ধ্বনি উঠলো, এজেন্ট সাহেবকে খতম করো।

খতম করো, হালাল করো, খুন পিয়েগা, ভষড়ী নিকাল দেগা ইত্যাদি শব্দ সহযোগে রীতিমতো শ্লোগান উঠে গেল।

তেরা মাকো, বহিনকো, জরুকো বেটীকো অশ্লীলতার চরমতম শব্দগুলির প্রয়োগ চলতে লাগল উন্মত্তভাবে।

নেতাদের কাছে এও এক সমস্যা। একদিকে নিহত, আহত ও শোকার্ত পরিবার, অন্যদিকে ক্ষিপ্ত জনতা। অনেক নেতাও তাদের সঙ্গে চিৎকার করছে।

জগদীশ ও হরেরামের নেতৃত্বে একটা দল অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

একি হলো?

নেতাদের মধ্যে হরিহর, রাজকিশোর, নগেন তখনো ধৈর্যচ্যুত হয়নি। তারাই ছুটে গিয়ে জোড়হাত করে দাঁড়াল।

—ভাইসব। তোমরা কি ক্ষেপে গেছো? নারীঘাতী, শিশুঘাতী এজেন্ট সাহেবের বিচার একদিন হবেই। তোমরা কেন নিজের হাতে আইন নেবে?

জগদীশ গর্জন করে উঠল শালালোক নেতা হুয়া। শাস্তি মাংতা? হাঠো হমলোগ বদলা লেগা, খুনকা বদলা খুন।

—ভাই রুখ যাও।

—নেহী। ইয়ে মেরা খানদানকো বেইজ্জৎ। যবতক খুন নেহী পিয়েগা তব তক বরদাস্ত নেহী হোগা।

ধাক্কা দিয়ে ওদেরকে সরিয়ে দিলো।

রাজকিশোর ছুটে গেল অনন্তর কাছেই।

ও তখন মাথা ঠুকছে—এখনো গাড়ি এল না কেন? ডাক্তার এল না কেন?

উনি থাকলে তো আসবেন। মিঃ শ' যেদিন হাসপাতাল বন্ধ করে দিলেন সেদিনই তীব্র অভিমানে ফ্যামিলি নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন। আজ তাঁর কাছে খবর গেছে কাল হয়তো এসে পড়বেন।

রতন চক্রবর্তী ও মানিক দাস কম্পাউণ্ডার এলেন গুচ্ছেক তুলো ব্যাণ্ডেজ ও ওষুধপত্র নিয়ে। ফার্স্ট এড দেবার জন্ত গায়ের ঢাকা খুলেই শিউরে উঠলেন।

ওর শায়া শাড়ি পুড়ে গেছে। পোড়া গা, পোড়া কাপড়, দগদগে রক্তমাংস চোখ মেলে দেখা যায় না। তবে দেহে প্রাণ আছে। দারুণ প্রাণশক্তি মেয়েটার। বোম খাওয়ার পর ঘষটে ঘষটে বারান্দা পেরিয়েছে। না হলে প্রাণের স্পন্দন থাকতো না। বোমের মুখে উড়ে যেত। এমনিতেই খাবলা খাবলা মাংস উড়ে গেছে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে।

—তোমাকে এখুনি যেতে হবে। না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—কি বাকী আছে?

বহুত বাকী আছে। লেবাররা ক্ষেপে গেছে। ওরা ডি. সি.; ডি. ডি. আর এজেণ্ট সাহেবকে খতম করতে যাচ্ছে। আমরা ঠেকাতে পারিনি। তুমি চল।

—আমার বিপ্লব? আমার গৈরী?

—ঈশ্বরের ভরসায় ছেড়ে দাও অনন্ত। হালত এত খারাপ যে ওদেরকে না আটকাতে পারলে কলিয়ারী খুনে লাল হয়ে যাবে।

অনন্তর মাথাটা ঝন্ ঝন্ করে উঠল। আমার স্ত্রী পুত্রের খুন নিয়েও শান্তি হলো না রাক্ষসী কলিয়ারীর। চল আমি যাবো। আমি যে নেতা।

যে অনন্ত একটু আগে শোকে ভেঙে পড়েছিল সে আবার ছুটে গেল উন্মত্ত জনতার সামনে। জোড় হাত করে দাঁড়াল। দু'চোখে দর দর অশ্রুধারা। চুল-গুলো ফর ফর করে উড়ছে। মুখে রক্ত লেগে আছে। বিপ্লবের রক্ত। গায়ে পোড়া কাপড় লেগে আছে। গৈরীর কাপড়। হাত পা কাঁপছে।

ক্ষিপ্ত শ্রমিকের দল স্তব্ধ। জগদীশ ও হরেরামের হাতের উদ্যত হাতিয়ার আস্তে আস্তে নেমে গেল। ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

জগদীশ বলল, ক্যা তুম আদমী হো ইয়া পাত্থর? আপনা বিবি বাচ্চাকো খুন তোমহারা দিলমে চোট নেহী দিয়া।

অনন্ত বলল, তাই কি না হয় দাদা। যে তোমাদের বোন সে আমার স্ত্রী। যে তোমাদের ভাগনে সে আমার পুত্র। এখনো একটা গাড়ি পেলাম না হাসপাতালে নিয়ে যেতে। ডাক্তার বাবু নেই। কম্পাউণ্ডাররা চিকিৎসা করছেন। তবু আমি বলতে এসেছি আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আমার স্ত্রী পুত্রের রক্তপাতটাই যেন শেষ রক্তপাত হয়। আর রক্ত ঝরিয়ো না। আমার শ্রমিক ভাইদের সংসার আছে। স্ত্রী পুত্র আছে। ওঁদের হাতেও বন্দুক রাইফেল আছে। ক্ষিপ্ত জনতার মোকাবিলা করতে ওরা গুলি করবে। পুলিশ এসে সর্বনাশ করবে। তখন কি হবে?

ভাইসব! আমার মৃত পুত্রের দিব্যি রইলো তোমরা আর এগিয়ো না। আমি বলছি শান্তির পথেই আন্দোলন সার্থক হবে।

এরপর শ্রমিকদের কারো পা চলল না। বুকের ভিতর প্রচণ্ড আক্রোশ গর্জন

করতে লাগল। চোখ থেকে আগুন ঝরল। রক্ত মাংসের শরীর ভূমিকম্পের তাড়নায় কম্পিত হলো। তবু কেউ অনন্তর মৃত পুত্রের দিব্যি পায়ে ঠেলতে পারলো না।

বাষট্টি

গৈরীর শরীরে অজস্র পাথরকুচি মাংস ভেদ করে ঢুকেছে। জানু ও পিঠের মাংস উড়ে গেছে। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। প্রাণফাটা আর্তনাদ করছে। দুজন কম্পাউণ্ডার বহু চেষ্টায় পাথরকুচি বের করে বার্নল দিয়ে ড্রেস করলেন। যেসব জায়গার মাংস উড়ে গেছে তাও ড্রেস করলেন। এ টি. এস. এবং পেনিশিলিন ইন্‌জেকশন দিলেন।

ও ছাড়াও সুরেশ, মহেশ, হেনী ও চম্পার গায়েও বোমার ছিটে লেগেছিল। তাদেরকেও ফার্স্ট এড দিলেন।

জল তেষ্টায় গৈরীর বুক ফেটে যাচ্ছিল। দু'বার রক্ত বমি করেছে। কি জানি পেটের ভিতর কিছু হয়েছে কি না? আছাড় খেয়ে পড়ার দরুন মুখটা ফেটে গেছে। দাঁত নড়ে গেছে। সারা মুখে রক্ত।

কম্পাউণ্ডার বললেন—এখনো যদি হাসপাতালে দেওয়া যেত তবে হয়ত গৈরী বেঁচে যেত।

কিন্তু গরীব লোক গাড়ি পাবে কোথায়? সাহেবদের অত গাড়ি। ওদের জন্য একটাও নেই। সাইকেল নিয়ে লোক গেছে শেরগড়ে।

অনন্ত তখন স্তব্ধ। যাবতীয় হৃদয় বেদনা বুকের ভিতর বরফের মতো জমে যাচ্ছে। সে এক নিদারুণ মানসিক অবস্থা। মাটিতে বসে পড়ল।

আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমেছে। কাল বয়ে যাচ্ছে অনিবার্য গতিতে। তিন চার ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। গৈরী গোঁ গোঁ করছে। আর বুঝি বাঁচার কোনো উপায় নেই।

যে ছোকরা দুটি গাড়ি আনতে গিয়েছিল তারা একটা জীপ গাড়ি নিয়ে এল। মিলিটারী আমলের জোব্বা জীপ। পিছনের সিটে গৈরীকে উপুড় করে শোয়ালো। অনন্ত ধরে রইল। সামনের সিটে বসলেন হরিহর ও রাজকিশোর। জীপ চলতে লাগল ঘড় ঘড় শব্দে।

শেরগড় হাসপাতালে যখন পৌঁছাল তখন রাত দুটো। হাসপাতালের অ্যাটেনডেন্ট পেসেন্টের নাম লিখতে যখন শুনল ওয়াইফ অফ অনন্ত শর্মা তখন তার কলম বন্ধ হয়ে গেল।

দুঃখ প্রকাশ করে বলল—এ পেসেন্ট তো ভর্তি হবে না। কড়া নিষেধ।

অনন্ত নিজেই মাথা ঠুকল—ওহো! এই কথাটা তো মনে ছিল না। কাল্লা হাসপাতালে চল। কিন্তু ওখানেও তো ম্যানেজারের সহি করা চিঠি চাই।

রাজকিশোর বললেন—তাহলে? কি উপায়?

—আমরা তো বরখাস্ত কর্মী। কয়লা কুঠির হাসপাতালে চিকিৎসা পাব কেন? আসানসোল গভর্নমেণ্ট হাসপাতালে চল।

আবার জীপ চলল। গভর্নমেণ্ট হাসপাতালে পৌছাল ভোর রাত্রে। কি আফশোস! যে মানুষটা কয়লা কুঠির শ্রমিকদের জন্য প্রাণ বিপন্ন করল পুত্র বলি দিলো সে তার পোড়া, ছেঁড়া, বোমা বিধ্বস্তা মুমূর্ষু স্ত্রীকে কয়লা কুঠির হাসপাতালে ভর্তি করার স্থান পেল না!

সেখানে ওকে ভর্তি করা হলো। গৈরীকে নিয়ে গেল ইমারজেন্সীতে।

রাজকিশোর বললেন—এবার কি করব অনন্ত?

—কলিয়ারীতেই ফিরে যেতে হবে।

—তুমি থাক। আমরা ফিরে যাই।

—না রে ভাই। কলিয়ারীতে হৈ হৈ পড়ে গেছে। কখন কি হবে কে বলতে পারে? পুলিশ, দারোগা, লীডার কত কি সামাল দিতে হবে। জগদীশ ভাইয়ের মাথার পোকা নড়ে গেলে আরো বিপদ। চল। ভাগ্যে থাকলে গৈরী বাঁচবে। ওকে ঈশ্বরের হাতেই ছেড়ে দিয়ে যাই। তাছাড়া বিপ্লবের সৎকার করতে হবে তো।

ওরা আবার জীপে চড়ল।

কেউ চুপ করে বসে নেই। সেই রাত্রেই খবর চলে গেছে পুলিশ, দারোগা, এস. ডি. ও., এ. ডি. এম., কোম্পানির চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, চীফ পারসোন্যাল ম্যানেজার ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির কন্ট্রোল রুমে, নেতাদের কাছে। ওরা ট্রাঙ্ককলে চীফ মিনিস্টারকে আবেদন করেছেন। টেলিগ্রাম হয়েছে প্রাইম মিনিস্টার, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, শ্রম দপ্তর ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে।

অভিযোগ করা হয়েছে—ধর্মঘট ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে কোম্পানির দালাল এজেণ্ট সাহেব ভাড়াটিয়া গুণ্ডা রবিলাল ও বাঁকেলালকে দিয়ে ইউনিয়নের সেক্রেটারী অনন্ত শর্মার বাসায় আক্রমণ করিয়েছে। তার শিশুপুত্রকে পাথরে আছড়ে হত্যা করেছে। তার বোমা বিধ্বস্তা স্ত্রীকে শেরগড় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়নি।

অনন্তরও ইন্তেকাল হয়ে যেত যদি সে আবার বাসা ছেড়ে বাইরে না যেত। প্ল্যান প্রোগ্রাম সেইরকমই ছিল। কিন্তু রাখে হরি মারে কে?

পুলিশ এসেছিল ভোররাত্রে। ওরা তো জানে কলিয়ারী এখন অগ্নিগর্ভ। জীপে চড়ে দু'পাঁচজন পুলিশ ফোর্স নিয়ে রাত্রিকালে যাওয়ার বিপদ আছে। তাই ফোর্স শক্ত না করে আসতে চায় না।

কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলার মতো কেউ ছিল না। গুলু, চরিত্তর, কিষণ ও

শুনিয়া মেয়েগুলি যেখানে সেখানে পড়ে কাঁদছিল। বিপ্লবের লাশ ঢাকা দেওয়া ছিলো। লোকজন চারিদিকে ভিড় করে আছে। সবারই মুখ শুকিয়ে গেছে। গুলু তখন পাগল। ওর ছেলেরাও আক্রান্ত। হেনী খাবি খাচ্ছে। ছোট মেয়েটি কেঁদে কেঁদে নেতিয়ে গেছে। বাকী সবাই হাসপাতালে, জবানবন্দী কে দেবে ?

চরিতর ও কিষণ দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সব দেখিয়ে ঘটনার বিবরণ দিলো। দামোদরের দিক থেকে এসে কুটুম কাঁটার বেড়া ডিঙিয়ে উঠোনে ঢুকেছে। চারিদিকে বোম মেরেছে। প্রথম বোমাটা গৈরীকে লক্ষ্য করে মেরেছিল। তখন সে আছাড় খেয়ে পড়েছিল বোমটা প্রত্যক্ষভাবে ওর উপরে পড়েনি। তাহলে তো উড়েই যেত। হাসপাতাল পর্যন্ত পৌছতে হতো না। কিন্তু খুব কাছেই যে বার্স্ট হয়েছিল তার লক্ষণ স্পষ্ট। হ্যারিকেন উল্টে অন্ধকার হয়েছিল এবং প্রচুর ধোঁয়া হয়েছিল বলে বাকী বোমগুলি আন্দাজেই ছোঁড়া হয়েছিল।

হেনী এবং গৈরী স্বচক্ষে বাঁকেলালকে ও রবিলালকে দেখেছে ও চিনেছে। বাঁকেলাল গৈরীর ছেলেটাকেও কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ও রবিলাল গৈরীকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। তৃতীয় ব্যক্তি বোম চার্জ করেছে।

গুলু ও চরিতর গৈরীর ডাক শুনে ছুটে আসছিল কিন্তু পুনঃ পুনঃ বোম চার্জ হওয়ার কারণে কাছে যেতে পারেনি। বৈশাখীও ছুটে আসছিল সে বাঁকেলাল ও রবিলালকে দেখেছে।

ঘটনার কার্যকারণের বিবরণ পরিষ্কারভাবেই দিলো ওরা। পুলিশের গতানুগতিক প্রশ্ন কাউকে দেখেছেন কি না, চিনেছেন কি না, কাকে সন্দেহ হয় এসবের কোনো প্রয়োজন রইল না। সোজা সাপ্টা জবাব পেয়ে গেল।

সকাল থেকেই জনসমাবেশ শুরু হলো। নেতারাও একে একে এসে পড়লেন। সুমিতবাবুও এলেন। ওঁকে দেখে শ্রমিকদের মুখের রাশ খুলে গেল। যে যে ভাষায় যত রকম খিস্তি যোগ করা যায় তা দিয়ে এজেন্ট সাহেব ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নামে হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব চড়াল।

ফাটকবাজারে গাড়ি থেকে নেমে গুলুর বাসা পর্যন্ত যেতে যেতে ওদের চার পাঁচজনের কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এই লোকগুলো কি করে এখনো একটা ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে দেয়নি সেইটাই বুঝে ওঠা দায়।

পরে শুনলেন অনন্ত সবারই সামনে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে তার মৃত ছেলের নামে দিব্যি দিয়ে গেছে।

সুমিতবাবু বললেন, যেমন নেতা তেমনি শ্রমিক। এত ধৈর্য এমন উদারতা কার আছে ?

শোকস্তব্ধ গুলুর ঘরের নারী ও পুরুষগুলি ওদেরকে দেখে কেঁদে ফেলল। গুলু ওঁর পায়ে পড়ল বাবুজী! আমার কি হলো?

কি সান্ত্বনা দেবেন তার চেয়েও করুণ দৃশ্য বারান্দার উপর। কাপড়ের ঢাকা খুলে দেখাল মাথা ভাঙা রক্তমাংসের পিণ্ড অনন্তের শিশু সন্তান বিপ্লব। হায় বিপ্লবের আজ এই দশা। সোনার বরণ ছেলে। খলবলে দামাল শিশু। গোটা মুনিয়া পাড়ার চোখের মণি। কোলে কোলে ফিরত। এ হাত ও হাত করতে করতে হারিয়ে যেত। বৈশাখী হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াত। প্রকৃতির রূপে রসে, আদরে সোহাগে লালিত হচ্ছিল একটি স্বপ্নের কোরক। আজ তার এই দশা।

চোখ মেলে দেখা যায় না। সুমিতবাবু বললেন—ঢাকা দাও।

চরিতর বলল, বাবুজী! এ তো আর দেখা যায় না। বলুন দামোদরে সৎকার করে দিয়ে আসি।

উনি বললেন, এখনো অনেক লোকের আসতে বাকি। তারা এসে দেখুক। তাছাড়া অনন্ত আসুক।

—হ্যাঁ বাবু!

মিঃ শ'-কে সেদিন বহু প্রশ্নের মুখে পড়তে হলো। এস. ডি. ও. সাহেব নিজে এসেছিলেন এবং একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারকে দিয়ে গেলেন তদন্ত করতে। তিনি মিঃ শ', ডি. সি., ডি. ডি., সভিপ্রসাদ, তিলক সিং প্রমুখ ব্যক্তিকে জেরায় জেরবার করে দিলেন।

সুমিতবাবু তদবির করলেন মিঃ শ'কে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ি করতে।

মিঃ শ' বললেন, আসামীদের নাম তো পেয়েছেন তাদেরকে ধরুন। এটা তাদের বিবাহ ও প্রতিহিংসার ঘটনা। গৈরী ছিলো রবিলালের বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু সে স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অনন্তকে স্যাঙ্গা করে। তারই বদলা নিয়েছে ওরা।

শ্রমিক ইউনিয়ন নিজের স্বার্থ হাঁসিল, বিপুল প্রচার এবং কোম্পানীর প্রতি বিদ্বেষপ্রসূতভাবেই এর উপর রঙ চড়িয়ে ধর্মঘট ইত্যাদির সঙ্গে গুলিয়ে দিয়েছে। আপনারা আসামীদিকে ধরুন, তাদের জবানবন্দি নিন তবেই আসল কার্যকারণ বুঝতে পারবেন। কলিয়ারীর পাঁচ হাজার শ্রমিক, পনেরো বিশ হাজার বাসিন্দার ঘরে বাইরে কার কি ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটবে তার জন্য আমরা দায়ী নই।

ডি. সি. ও ডি. ডি. সাহেব হিজ মাস্টারস ভয়েস। তাঁরাও ঐ একই কথা ইকো করলেন।

বিউটির সাক্ষাৎকার নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তদন্তকারী অফিসার।

মিঃ শ' বললেন, যীশাস ক্রাইস্ট! উনি একজন হাউস ওয়াইফ। তার সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক?

—দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আবার কি?

না করার উপায় নেই। মিঃ শ' সঙ্গে করেই নিয়ে গেলেন। কিন্তু ডি. ভি. সাহেবের বাংলোতে এসে অফিসারটি বললেন, আমি ওঁর সঙ্গে প্রাইভেট কথা বলবো।

—আচ্ছা! আমরা বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছি।

—না। আপনারা অফিসেই যান।

তাই হলো। সামান্য সৌজন্য বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো।

—বিউটি দেবী। আপনি কিছু মনে করবেন না। প্রশ্নটা ব্যক্তিগত।

—বলুন।

—আপনার সম্পর্কে অনেক বাজে কথা শোনা যায়—তা কি সত্যি?

—বাজে কথা বলতে অনেক কিছু বোঝায়। আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?

—মানে মিঃ শ'য়ের সঙ্গে আপনার অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে কানাকানি হয়।

তা কি সত্যি?

—সত্যি!

এত পরিষ্কার জবাব যে পাবেন তা আশা করেননি। পরের প্রশ্নটি যেভাবে করতেন অর্থাৎ বিউটি যে চরিত্রহীনা তা তার মুখ থেকেই টেনে বের করার জন্য যে প্রশ্নাবলী মনে মনে রচনা করেছিলেন তা ভেস্তে গেল।

উনি ভাবছেন। বিউটি জিজ্ঞাসা করল, চা খাবেন স্যার।

—না। ধন্যবাদ।

একটু থেমে উনি বললেন, অনন্তবাবুর লাইফে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল তা জানেন নিশ্চয়। আপনার কি মনে হয় এর পিছনে এজেন্ট সাহেবের হাত আছে?

—তা কি করে বলবো?

—সে কি? ভূতবাংলোতে বসে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা তৈরি হয়। আপনি সেখানকার মক্ষিরাণী। মিঃ শ'য়ের অতি নিকটে থাকেন। তবু জানেন না?

—না। কোম্পানী বা ইউনিয়ন দু'পক্ষের মধ্যে কেউই আমাকে বিশ্বাস করে না। নষ্ট মেয়েমানুষকে কে বিশ্বাস করবে?

—আই সি!

উনি থতমত খেয়ে গেলেন? আর প্রশ্ন চলে না। বিউটি কথার গুড় মেরে দিয়েছে। উনি ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লেন।

বিউটি বলল—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না তাই তো?

—সেটাই স্বাভাবিক। আপনি কাজে সহযোগিতা করলে বাধিত হব। চলি পরে আবার আসবো।

উনি চলে যাবার পর ডি. সি. সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে হুড় মুড় করে ঘরে ঢুকলেন

মিঃ শ'। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা সুরু করে দিলেন কি হলো বিউ? অফিসার কি জিজ্ঞাসা করলেন? তুমি কি বললে?

বিউটি হাসতে হাসতে বলল, অত ব্যস্ত হয়ো না সাহেব। বসো। চা খাও। বিউটির পেট থেকে কথা বের করা অত সহজ নয়।

—বেফাঁস কিছু বলে ফেলোনি তো?

—পাগল। এমন জবাব দিয়েছি যে উনি লজ্জায় পালিয়ে গেছেন।

—তার মানে?

—বললাম আপনি আমার কাছে বেশীক্ষণ থাকলে চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে।

—হাঃ হাঃ হাঃ।

ওদের ধড়ে প্রাণ এল।

মিঃ শ' বললেন, ওয়েল ডান। আমি তোমার কাছে ওবলাইজড্।

ডি. সি. সাহেব কাজের অজুহাত দিয়ে চলে গেলেন। বিউটি নিজেই ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে বলল, কি সাহেব? এতেই হবে। নাকি হট ড্রিংকসের ব্যবস্থা করবো।

—আজ এই থাক। কাল সন্ধ্যায় ভূতবাংলোয় পার্টি দেবো। তুমি আমি ডি. ডি., ডি. সি.। আর কাউকে ডাকবো না। আসবে তো?

—ওঃ সিওর।

—তোমাকে আজে বাজে প্রশ্ন করেছি কিছু মনে করোনি তো?

—না সাহেব—তোমার কত টেনশন চলছে বুঝি না।

—ওঃ মাই ডার্লিং।

ওর হাতটা ধরে চুম্বন করলেন। বিউটি হাসতে হাসতে বলল, শুধু পার্টি দিলেই হবে না সাহেব। আমাকে হীরের দুল দিতে হবে। এতবড় কিস্তি মাৎ করলে তার প্রাইজ দেবে না?

—অফকোর্স!

—তুমি যাই বলো ডিয়ার তোমার লোকগুলো অপদার্থ। একটা কাজও প্ল্যান মাফিক করতে পারে না। একসঙ্গে জোড়া পাখী শিকার করতে পারলে কত ভালো হতো। তা নয় একটা অবোধ শিশুকে।

—আঃ। ডোণ্ট সে। সেজন্য আমিও খুব খুশী হইনি। ঝামেলা তো কম পোয়াতে হচ্ছে না। অথচ আশানুরূপ রেজাল্ট এল না।

—ডোণ্ট ওরি। যা হয়েছে তাতেই অনন্তর মাজা ভেঙে যাবে। ওকে আর ইউনিয়নের ঝাণ্ডা ধরতে হবে না।

—তুমি বলছো?

—ওঃ সিওর।

—থ্যাঙ্ক ইউ ডার্লিং।

মিঃ শ' চলে গেলেন।

বিউটি মনে মনে বলল, শালা বেইমান! নারীঘাতী, শিশুঘাতী জাহান্নমের মুসাফির পুলিশ তোমাকে কিছু করবে না—তা জানি। কিন্তু রেহাই তুমি পাবে না।

তেষট্টি

সারা কলিয়ারী জুড়ে তুমুল হট্টগোল চলছে। কত রকমের মানুষ। কত তাদের ক্রোধ, হিংসা ও আবেগ। দলে দলে লোক যাচ্ছে অনন্তর ছেলেকে দেখতে। রাস্তার উপর গালমন্দ চলছে। ডি. ডি. ও ডি. সি. সাহেবের বাংলোর কাছে এসে চিৎকার করে বলছে—তোমাদের ঘরগুষ্টিকে কবর দিয়ে দেবো।

ওরা কি বুঝবে বিউটি ওরফে শোভা পালের হৃদয় বেদনা। ক্ষণকাল পূর্বে তার অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে আসল চরিত্রের কি দুস্তর ব্যবধান।

কপালে হাত দিয়ে বসে আছে। মনে মনে বলছে—তোমাদিকে আমি সাবধান করেছিলাম অনন্ত। তবু নিজেকে বাঁচাতে পারলে না। আফশোস!

গৈরীকে একবার দেখার বড় ইচ্ছে। এখনো কি জ্ঞান ফেরেনি ওর?

হায় অনন্ত! তোমার জন্য আমার দুঃখের সীমা নেই। জানি না কেন তোমাদিকে ভালোবেসেছি? বড় ভুল হয়েছে। আমার মতো হৃদয়হীনা নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে নেই। ভালোবাসার বড় কষ্ট। এমনি আমার দুর্ভাগ্য যে যাকে ভালোবাসছি তাকে নিয়েই যন্ত্রণা ভোগ করছি।

তোমরা দুটি ছিলে আমার ভাইবোন। জানি না আবার কোনো দিন আমরা সেই দুর্গাপুজোর দিনটির মতো সারা দিনরাত আগডুম বাগডুম করতে পাবো কি না?

তুই ভালো হয়ে যা গৈরী। আগামী বছর পুজোতে আমি তোকে নিমন্ত্রণ করবো। তোকে পায়েস রান্না করে খাওয়াবো। নতুন ছাঁচে চুল বেঁধে দেবো। নতুন সাজে সাজিয়ে দেবো।

কেমন করে যে পুঞ্জিভূত অশ্রুরাশি হু হু করে বইতে সুরু করল তা ও বুঝতে পারল না। ভিতরটা যেন প্যাঁচকল দিয়ে কেউ নিংড়ে দিচ্ছে। কি বেদনা।

গৈরী। তোর ছেলেটা খলবল করে হাসতো রে। দেখে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যেত। মনে হতো আমারও যদি একটা ছেলে থাকতো। শেষ হয়ে গেল। আর তাকে দেখতে পাবো না।

তোরা বুঝতে পারছিস তোদের বিউটিদি কাঁদছে। তার চোখে জল পড়ে না। কটাক্ষ করে। মদালসা ভঙ্গীর কটাক্ষ পুরুষ প্রাণে আগুন ধরায়। কচিৎ

ঝলসে ওঠে গুপ্ত আগ্নেয়গিরির অগ্নিশিখা। তার ভাষা কেউ পড়তে পারে না। মনে করে বিভঙ্গ বিলাস। আমার ভুরু দুটি নাকি ধনুকের মতো।

রাগ হয় মা বাপের উপর। এই জন্যই কি তারা আমাকে স্বপ্নের নির্য্যাস দিয়ে তিল তিল করে তিলোত্তমা তৈরি করেছিল? শালা কুমোর কুমোরী। বারোয়ারী প্রতিমা গড়তে গড়তে নিজের মেয়েটিকেও বারোয়ারী বানিয়েছো?

ওহো! মা বাবা গুরুজন। তাদেরকে আমি গালি দিলাম? ছিঃ ছিঃ। মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে মা।

মা! প্রাণ আনচান করা শব্দ। যত মিষ্ট তত ব্যঞ্জনাময়।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি যে কারো কন্যা এই বোধটা হারিয়ে গেছিল। মনে হতো আমি উর্বশী, মেনকা। আমার জন্য বিশ্বামিত্র মুনিরা তপোভঙ্গ করে আসঙ্গ পিপাসায় লিপ্ত হয়। আমার পরিচয় আমি অপরূপা! স্থির যৌবনা। আমার ঠিকানা নেই।

ডি. ডি. সাহেব ভালোবাসার শিকড় চেয়েছেন। একটি জড়। একটি প্রাণ।

কিন্তু কি হবে। ঐ তো এক নিখাদ ভালোবাসার শিকড় গজিয়েছিল অনন্ত গৈরীর দেহমন আপ্লুত করে। কি হলো? তাদের জীবনের এত সংগ্রাম এত ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্ট সহিষ্ণুতা এক লহমায় শেষ হয়ে গেল। এক ফুঁয়ে নিভে গেল হাজার বাতির ঝাড় লণ্ঠন।

কি করবে এখন ঐ শিশুর জনক জননী? রক্তাপ্লুত মাংস পিণ্ড তাথৈ তাথৈ করে নাচবে তাদের চোখের তারায়।

তবু সন্তান চাই।

কিন্তু তার আগে সরিয়ে দিয়ে যাবো নোংরা জঞ্জাল।

চোখের জল তখন শেষ হয়নি। ক্ষণে ক্ষণেই উপচে পড়ছিল। আয়ত চোখের সেই অশ্রুরাশি অপূর্ব মাধুর্যময় সৌন্দর্যের মুক্ত বিকাশ।

ডি. ডি. সাহেব ঘরে ঢুকে স্তব্ধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তখন বেলা চারটে।

সেই শিশুর শবদেহ শোয়ানো আছে বারান্দায়। স্তূপীকৃত ফুল এবং মালা পড়েছে তার উপরে ফুলের গন্ধকে ছাপিয়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে পচনশীল রক্ত মাংসের।

তাকে ঘিরে আছে একদল রমণী। তখনো মানুষ আসছে তাকে দেখতে ফুল দিতে। একটি শিশু তার পিতামাতার একনিষ্ঠ সংগ্রামের বিনিময়ে পেল মুঠো মুঠো ফুল। মরনোত্তর পুরস্কার — তবে সরকারী নয় জনগণের।

অনন্ত এসে দাঁড়াল তার সামনে। রুক্ষ, শুষ্ক, বিনিদ্রিত, অনাহারী জনক। ঈশ্বর দিয়েছিলেন এক ফোঁটা আলো। দু'জোড়া চোখের তারায় সেই আলো

নাচত। তাকে ঘিরে পিতামাতার স্বপ্ন বাসর মন্দির হয়ে উঠত। খলবল করে হামা টানতো। দস্যি দামাল ছিল পেয়ারা শিশু। বলি হয়ে গেল প্রতিহিংসার যূপকাষ্ঠে।

অনন্তর চোখে অশ্রু নেই। কণ্ঠস্বরে আবেগ বা জড়তাও নেই।

বলল—আর নয়। এবার বিপ্লবের সৎকার করতে হবে।

রণেনবাবু সঙ্গে ছিলেন। বললেন, হ্যাঁ! চতুর্দোলায় চড়িয়ে ফুলে ফুলে ছেয়ে দাও। ওকে নিয়ে শোক মিছিল বের করবো।

অনন্ত বলল, দাদা! আমার শোক আমার বুকেই থাক। অন্যকে পীড়া দিতে চাই না।

—আহা! এতে পীড়ার কি আছে?

—দাদা! আমার ছেলে শোক প্রদর্শনীর মডেল নয়। আপনারা যান। আমি আমার স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন নিয়ে তার সৎকার করব। কিছু মনে করবেন না।

রণেনবাবু আঘাত পেলেও অনন্তর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—হয়তো তোমার কথাই ঠিক। যাও। আমরা তার আত্মার শান্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব।

চরিতর, কিষণ, গুলু, জগদীশ, হরেরাম, রামজীর একটি দল দামোদরের দিকে এগিয়ে চলল। অনন্ত নিজেই ওকে কোলে নিয়েছে। পিছনে যাচ্ছে রাজকিশোর, হরিহর, কালো বাউরী, নগেন, ইয়াসিন, হানিফ, জানমহম্মদ, রাধেশ্যাম পাণ্ডে প্রমুখ ইউনিয়নের কর্মী।

দামোদরের পাড়ে শিমুল গাছের তলায় একটি গর্ত খুঁড়ল। সেই গর্তের মধ্যে বিপ্লবকে শুইয়ে দিয়ে অনন্ত স্বগতোক্তি করল—যাও পুত্র। কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যুর মতো নিজের ঘরে চলে যাও।

সবাই নীরবে তার আত্মার সদগতি কামনা করল। তারপর আবেগ মথিত-কণ্ঠে রাজকিশোর স্লোগান দিলো—বিপ্লব জিন্দাবাদ!

রাত হয়েছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, বুভুক্ষিত অনন্ত সীমাহীন শোকের পাথারে ভূমিশয্যায় শুয়ে আছে সেই স্ত্রী-পুত্রের কলরব মুখরিত ঘরটিতে। মিট্ মিট করে হ্যারিকেন জলছে। অনন্ত স্তিমিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

বৈশাখী এক গ্লাস দুধ এনে বলল—খেয়ে নাও জামাই। উপোষ দিয়ে থেকো না।

অনন্তর বুক ভেঙে গেল। যে কান্নাটাকে সে প্রাণপনে দমিয়ে রেখেছিল তাই বেরিয়ে এল ঝর্ণাধারার মতো। বলল—ভোজী! আমার যে সব শেষ হয়ে গেল।

—কি করবে জামাই ? সবই ভগবানের হাত।

—মা আমাকে ত্যাগ করেছেন, সমাজ আমাকে বহিষ্কার করেছে, সন্তান মারা গেল। স্ত্রী মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। এই হতভাগার দুঃখ তোমাদের ঘাড়েও চড়ে বসেছে। আমার জন্য আর কত দুঃখ সহ্য করবে ভোজী ?

বৈশাখীর চোখের জল ফুরোয়নি। আবার তা বইতে শুরু করল। উঠে চলে গেল। একটু পর জগদীশকে নিয়ে ফিরে এল।

বলল—দেখ—জামাইকে বোঝাও—ও যে পাগল হয়ে যাবে।

জগদীশ ওর গায়ে হাত দিয়ে বলল—অনন্ত !

অনন্ত বলল—আহা ! তোমরা কি মনে করছ ? আমি পাগল হয়ে গেছি ?

—খেয়ে নাও ভাই।

—আচ্ছা দাও।

একটু একটু করে দুধটা খেল। বলল—একটা বিড়ি সিগারেট কিছু দিতে পার ভোজী। বৈশাখী কয়েকটা বিড়ি এনে দিলো। হ্যারিকেন বাতিতে বিড়ি ধরিয়ে দুজনে টানতে লাগল। একটু দূরে থেকে বৈশাখী তাকিয়ে আছে দুটি ঝড়ে ভাঙা মহীরূহের দিকে। সে জানে এই মুহূর্তে তার স্বামী কি ভাবছে ? কিন্তু সে কথা অনন্তকে বলা যাবে না। কারণ সে বলেছে—আমার ছেলের রক্ত-পাতেই যেন রক্তের খেলা শেষ হয়।

তাই কি হয় ? দুনিয়া গোষ্ঠীর ঘরে এসে তাদের শিশুকে হত্যা করে গেছে এই বিষাক্ত আঘাত ওরা সইবে কি করে ?

সেই ভয়ে বৈশাখীর বুক দুরুদুরু কাঁপে।

অনন্ত বলল—খবর পেয়েছিলাম জগদীশ ভাই। গৈরীও জানত বাঁকেলাল রবিলাল কিছু একটা খৎরা জরুর করবে। তবু সাবধান হইনি। তোমাকেও কিছু বলিনি।

জগদীশ বলল—কে তোমোকে খবর দিত অনন্ত ?

—তার নামটা বলা যে বারণ

—না বললে কি করে জানব যে তার জান যেন খৎরা না হয়।

অনন্ত চমকে উঠল। বলল—তুমি কি ভাবছ জগদীশ ভাই ?

—আমার ঐ নামটা খুব দরকার।

—বলতেই হবে ?

—হ্যাঁ। তার ভালোর জন্যই।

—গোপন রাখবে জগদীশ ভাই।

—জরুর।

—ডি: ডি. সাহেব ও বিউটিদি।

—হে রাম !

জগদীশ চমকে উঠল। সামলে নিয়ে বলল—আমরা উল্টা বুঝেছি। নামটা বলে ভালো করলে। না হলে সত্যিই ওদের খতরা হয়ে যেত।

অনন্ত বলল—হেই ভাই খুনখারাবি কোর না।

—অনন্ত! তোমার বউ বেটার জন্য শাস্তিদেবীকে ফুল জল দাও। আমাদের জন্য ভেবো না। আমরা যা করব তা আমার বহিনের জন্য। আমার জাত-গোষ্ঠীর ইজ্জতের জন্যে।

জগদীশ উঠে চলে গেল।

অনন্ত বলল—ভোজী। জগদীশ ভাইয়ের কি মতলব আছে?

—তুমি কি জানবে জামাই? তুমি তো আর আমাদের জাত নও। কি বুঝবে তার মর্ম? ভালোবাসার জোরে বুকের ভিতরে ঢুকে গেলে। তাই জানো না—এরা তোমাকে ভালোবাসে! কিন্তু নিজের জাতের ইজ্জতের থেকে বেশী নয়। যারা একাজ করেছে তারাও ইজ্জত খিলাপের জ্বালাতেই করেছে। কাজেই এ নিয়ে তুমি ওদের সঙ্গে কথা বোল না।

এঁটো গ্লাসটা ভোজী নিয়ে চলে গেল।

অনন্ত একা। অনন্ত শোকের পারাবার। সেই সঙ্গে জ্বালা। কিসের শাস্তি? কাকে শাস্তি বলে? আজ বুকজোড়া হাহাকার। পুত্র শোকের জ্বালা। স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। কি দোষ করেছি আমি? মানুষের অধিকার আদায় করবার জন্য সংগ্রাম করছি। তার জন্য এই শাস্তি। এর পরেও শাস্তির প্রহসন।

তার চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ এই অনার্য গোষ্ঠীর জীবনচর্যা। যারা বোঝে খুনের বদলা খুন। ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা।

গৈরীকে ভালোবেসেই এক অনার্য গোষ্ঠীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে আগে চিনতে পারেনি। আজ বোধহয় নতুন করে চিনছে।

নীরব, নিস্তব্ধ রাত্রি ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে। কানের পাতায় একটা গুড় গুড় শব্দ আছাড় খেয়ে পড়তে শুরু করল। বোধহয় দামোদরে নতুন করে বাণ ডাকছে। বড় বড় ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে যাচ্ছে পাড়।

বারান্দায় গুলু বসে আছে গালে হাত দিয়ে। কাল তার সব ছিল। আজ কিছু নেই। নিস্তব্ধ শোকপুরীতে সে বেচারীর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নিপাট ভালোমানুষ সে। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের প্রতীক। তার সংসারে এই বিপর্যয়। অথচ সে কখনো কারো ক্ষতি করেনি। কারো সঙ্গে চড়া গলায় কথা বলেনি। অতি বশংবদ দায়িত্বসচেতন ঘণ্টাওলা। তার জীবনে কখনো কোনো ভুলিতে একসিডেন্ট হয়নি। কখনো কাজ কামাই হয়নি। কখনো দেরি হয়নি। তবু তার চাকরিতে জবাব হয়ে গেছে। তবু তার জীবনে চাপ চাপ অন্ধকার।

অনন্ত কাৎ হয়ে পড়ে আছে। তার চোখে ঘুম নেই। এইখানে গৌরী শুত। এইখানে বিপ্লব। ঘুমের ঘোরে হিসি করত। কখনো বা ওর গায়েই। গৌরী বকত, মারত। ছেলেটা কাঁদত। তখন অনন্ত ওকে বুকে নিয়ে বাইরের খোলা বাতাসে বেড়াতে নিয়ে যেত।

ফুরিয়ে গেল। এখন শুধু স্মৃতিটুকুই আছে। স্মৃতিপটে গৌরী ও বিপ্লবের কত রকমের মূর্তি ছাপা আছে। গৌরী ওর উপরে রাগ করত, অভিমান করত আবার যদি দুদিন না আসত তবে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াত। মধ্যবিত্ত লজ্জা, ভয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব ওর ছিল না। সে কি আবার ফিরে আসবে?

কার হাতের স্পর্শ লাগল মাথায়। রুক্ষ ও কর্কশ হাতের পাঞ্জা। কিন্তু কি অপার মমতাময়? চোখ মেলে তাকাল। একটি দাড়িভরা মুখ। মোটা মোটা ঠোঁট। জটার মতো চুল।

ওদের জীবনে এই বুঝি প্রথম গুলু তার জামাইয়ের গায়ে হাত দিলো। সে তার ভদ্রলোক জামাইয়ের সঙ্গে একটা ব্যবধান রেখেই চলত। একজন খনি শ্রমিক যেমন ছোট সাহেবকে দেখতে অভ্যস্ত অনেকটা তেমনি।

আজন্ম লালিত দাস মনোবৃত্তির এই আচরণ অনন্ত ভেঙে ফেলতে পারেনি। তার শ্বশুর শাশুড়িকে সম্ভ্রম করেছে ঠিকই কিন্তু ব্রাহ্মণের অহংকার ত্যাগ করে প্রণাম করতে পারেনি। স্বজাতি, কুটুম্বের ছেলে ঘরের জামাই হলে যতটা আপন ও নিকট হতে পারে তাও হয়নি।

সেই গুলু যখন ওর মাথায় হাত দিলো তখন ওর বুকটা তোলপাড় করে উঠল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল—কি হয়ে গেল বাপুজী?

গুলু এমনিতেই চুপচাপ থাকে। কেমন করে কথার পিঠে কথা যোগ করতে হয় তা জানে না। তারপরে বুকজোড়া তীব্র হাহাকার। গলাটা রুদ্ধ হয়ে আছে। তাই সে ড্যাপ ড্যাপ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

অনন্ত বলল—বাবুজী! আপ সুরেশ, মহেশ ঔর মাতাজীকো দেখিয়ে। আমি ঠিক আছি।

গুলু বলল—ব্রামহণের লেড়কা তুমি। আজ আমার ঘরে মাটিতে শুয়ে কাঁদছ। এই দুঃখ আমি সইতে পারছি না।

—এসব ভাববে না তো। যাও—একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। কাল সকালে হাসপাতালে যাব।

গুলু উঠে এসে বারান্দায় শুয়ে পড়ল। দু'চোখ ভরা জল। সে নিজের জন্য যত না ব্যথিত তার বেশী অনন্তর জন্য। নিজের ছেলেরা যন্ত্রণায় কাতর। স্ত্রী ব্যথায় হু-হু করছে। সব ও বুক পেতে সহ্য করেছে। পিতৃ হৃদয়ের মমতা ওর মতো মূর্খ মানুষকেও অনেক বিদ্বান ব্যক্তির চেয়ে বেশী অনুভূতিশীল করে তুলেছে। সে নিজের মধ্যে ডুবে গেছে। হেনী, গৌরী, সুরেশ, মহেশ, চম্পা—

সবারই সত্তা ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সবারই যন্ত্রণা নিজের বুকে নিয়ে বনস্পতির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ মনে হলো গৌরী ডাকছে ভীষণ আর্তস্বরে—বাপু—

চৌষট্টি

গৌরীর জ্ঞান ফিরছে। অতল অন্ধকার থেকে উঠে আসছে ক্ষীণ চন্দ্রলেখা। অনুভূতির একটা আলাদা জগৎ। ব্যাথা বেদনাকে অতিক্রম করে চৈতন্যের নতুন অভ্যুদয়। ভ্রষ্ট স্মৃতির আঁতি পাঁতি খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা। সব এলোমেলো হয়ে গেছে।

কে সে? কোথা থেকে আসছে? কোথা যাবে? কেন যাবে? কি হয়েছে? ইত্যাদি আপাতসরল গূঢ় প্রশ্নাবলী তার মগ্ন চৈতন্যের গভীরে কিলবিল করছে। কোথায় যেন ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বিরাট জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে আদিগন্ত শস্যক্ষেত্রে। কি একটা হয়েছে? গৌরী ঠিক বুঝতে পারছে না।

অনেকক্ষণ পর নাকে ওষুধের গন্ধ লাগল। গোটা শরীর জুড়ে চাপবাঁধা ব্যথা। একটু নড়তে গেলেই জ্বালাময় দাহ। যেন সারা শরীর আগুনে পুড়ছে। পোড়া মাংসের গন্ধ উঠছে।

হঠাৎ ঝলসে উঠল হলুদ আগুনের লকলকে শিখা। নীল হলুদ সাদা আলোর ফুলঝুরি। তার সামনে, পশ্চাতে, ডাইনে, বাঁয়ে। আগুনের ফোয়ারা এবং ঘন ঘন বারুদ বিস্ফোরণের মধ্যে সে একা। এবং তার বিপ্লব।

গোঙানির শব্দ উঠছিল। কিন্তু কে দেখবে? কার এত গরজ? ধীরে ধীরে জেগে উঠল যন্ত্রণার বিরাট বিরাট তরঙ্গ। কোনো অঙ্গ মুচড়ে যাচ্ছে। কোনো অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।

গোঙানির শব্দ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পাশের বেডের রোগিনীর ঘুম ভেঙে গেল। উনিই ডাকাডাকি শুরু করলেন। তখন একজন অ্যাটেনডেন্ট এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কি কষ্ট হচ্ছে?

গৌরী ওর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাল। মুখটা ব্যথায় কুঁচকে গেল অ্যাটেনডেন্ট একজন নার্স ডেকে এলেন। তিনি তাকে ঘুমের ইনজেকশন দিলেন।

এক—দুই—তিন—চার—যন্ত্রণাময় অনুভূতির জগৎ থেকে আবার ফিরে গেল অতল অন্ধকারের জগতে।

দিনগুলোও খুব দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। স্ট্রাইকের নবম দিন ২৫শে সেপ্টেম্বর বিপ্লবের মৃত্যুও তৃতীয় দিনে পড়ল। অনন্ত ও গুলু হাসপাতালের পথে

দুজনেরই বুক দুরু দুরু করছে। গৌরীকে ওরা ঈশ্বরের ভরসায় ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাকে কেমন রেখেছেন তা তিনিই জানেন।

ওরা কায়মনে প্রার্থনা করছে—হে ঈশ্বর আজ যেন গৌরীর লাশ বয়ে আনতে না হয়।

ঈশ্বর বোধ হয় তাদের প্রার্থনা শুনলেন। তাই ওরা হাসপাতালে পৌছেই খবর পেল রাত্রে গৌরীর একবার জ্ঞান ফিরেছিল। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল বলে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দিনে বড় ডাক্তার এসেছিলেন। দুজন সার্জন ছিলেন। তাঁরা ওঁর ক্ষত-স্থানগুলি যথাসম্ভব অপারেশন ও ড্রেসিং করে দিয়েছেন। আঘাত খুবই মারাত্মক। পা, জানু ও কোমরের উপর থেকে মাংস উড়ে গেছে। সারা শরীরে ছোট বড় মিলিয়ে বাইশটি ক্ষত। বাম অঙ্গের উপর ভর দিয়ে এদিক ওদিক যোগান করে ওকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মুখটি বড়ই মলিন। গায়ের রঙটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখের পাতা বোজা। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

অনন্ত ও গুলু ওকে দেখল। অনন্ত বলল, ঘুমোক। আমরা বাইরে বসিগে। করিডরে সিমেন্টের বেঞ্চে ওরা বসল। অনেকক্ষণ পর অনন্ত বলল, বাপু। আপনি বাড়ি যান। ওখানেও তো সবাই পেসেন্ট। আমি এখানে আছি।

গুলু ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। উঠে দাঁড়িয়ে গামছাটি মাথায় জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল। অনন্ত একাই বসে আছে। আকাশ পাতাল ভাবছে। কি হবে এবার? স্ট্রাইকেরই বা কি পরিণতি হবে? সেই থেকে কোনো খবরই রাখতে পারেনি। আবার কি নুতন ষড়যন্ত্র হচ্ছে, কে জানে?

হঠাৎ ওর সামনে প্রায় দেবদূতের মতো হাজির হলো সুবীর ও কমলেন্দু। অনন্ত ওদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। কেমন অভিযোগের সুরে বলল—তোরা এত দেরি করে এলি? সব যে শেষ হয়ে গেল।

সুবীর ওর গায়ে হাত দিয়ে বলল—বি স্টেডি অনন্ত। ডোণ্ট লুজ ইয়োর-সেল্ফ।

কমলেন্দু বলল—কাল সন্ধ্যায় খবর পেলাম রে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। রাত্রেই সুবীরের কাছে গেলাম। তারপর আসবার বাস্ পেলাম না।

যাক্ গে ওসব কথা। চল গৌরীকে দেখে আসি।

ওরা তিনজনে গৌরীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আবার সেই জ্ঞান ফিরে আসার অনুভূতিতে চঞ্চল অস্থিরতা। তবে এবার

বিস্মৃতির অতল থেকে উঠে আসা নয়। ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা। সুবীর ওর কপালে হাত রাখল। মৃদু স্বরে ডাকল গৌরী! মাই সিস্টার।

স্তিমিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল গৌরী।

তিনজনেই ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

গোঙানি শুরু হলো। অসহ্য যন্ত্রণার গোঙানি। কথা বলতে পারল না। চোখ দিয়ে জল পড়ল দু'গাল ভাসিয়ে। ঠোঁট নড়ল থর থর করে। অনন্তর মনে হলো তার হাড় পাঁজরগুলো আখ মাড়াই পেনিয়নে পিষে দিচ্ছে।

এটা ভিজিটিং আওয়ার্স নয়। একজন নার্স অনন্তকে বললেন, আপনি থাকলেই পেসেণ্টের ইমোশান বেড়ে যাবে। তাতে ক্ষতি হবে।

ওরা বাইরে এল। সুবীর বলল, চল ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

অনন্ত বলল—তোদের কি ধারণা গৌরী বাঁচতে পারে?

—অফকোর্স! লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট। তুই ভেঙে পড়িস না অনন্ত।

ডাক্তারবাবু এলেন বেলা দশটার সময়। তখন ওঁরা ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

উনি বললেন—আঘাত খুবই মারাত্মক। কোনো কোনো ভাইট্যাল অরগ্যান নষ্ট হয়েছে, শিরা, নার্ভ টেনডাম ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে। আমি যতদূর সম্ভব করেছি। শরীরে রক্ত চলাচল হচ্ছে। তবে বার্ণ ইনজুরী সেরে উঠতে বড্ড সময় লাগে। টিটেনাসেরও ভয় আছে।

অনন্ত বলল, বাঁচবে তো স্যার।

আশা করি। পেসেণ্ট কতটা স্ট্যাণ্ড করতে পারে সেটাই কথা। বার্ণ ইনজুরিতে এক মাস পরেও মারা গেছে এমন ঘটনাও আছে। তবে পেসেণ্টের প্রাণশক্তি আছে। না হলে বাইশক স্পট ডেথ হতে পারত। শক্ত আছে।

—ধন্যবাদ স্যার। ওরা বাইরে এল। তখন পর প্রর দুটো জীপ এসে দাঁড়াল। একটাতে বোঝাই হয়ে আছে তার সহকর্মী ও কেন্দ্রীয় কমিটির অস্থায়ী সভাপতি। অন্যটাতে পুলিশ ও তদন্তকারী অফিসার।

অনন্তর কাছে খবরাখবর নিয়ে ওঁরা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। উনি বললেন—দফে দফে দু'তিনজন গিয়ে দেখে আসতে পারেন কিন্তু দয়া করে পেসেণ্টের সঙ্গে কথা বলবেন না।

তদন্তকারী অফিসার বললেন—ওঁর একটা স্টেটমেণ্ট নিতে হবে যে।

—তা সম্ভব হবে না। আপনি কাল আসুন।

আবার লোক। এবার কলিয়ারীর কিছু কর্মী। অনন্তর বন্ধুবান্ধব। সাহেব সুবো। ক্রমাগত লোক আসছে গত দু'দিন যাবৎ। ডাক্তারবাবু খুব বিরক্ত হচ্ছেন। অনন্তকে বললেন—কি ব্যাপার? এত লোক কেন?

—সব দেখতে আসছে স্যার।

—আপনি বুঝি কলিয়ারী ইউনিয়নের নেতা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার স্ত্রীও ?

—হ্যাঁ।

—তাই বুঝি বারোটি ঘণ্টা বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকল। এখন ওরা কিজন্য আসছে ? আদিখ্যেতা। এই সব সফিসটিকেটেড জেন্টলম্যানরা শব-দেহে মাল্যদান করার জন্য হাজির হন কিন্তু মরার আগে একফোঁটা জল দিয়েও সাহায্য করেন না। আফশোস !

—সবাই তো তা নয় স্যার। ওদের মধ্যে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীও আছেন।

—এবার আপনি ভিড়টা কম করতে বলুন।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর ! ওরা তিনজনে বাইরের সিঁড়িতে বসে আছে। তিন-জনেই চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর সুবীর বলল—অনন্ত ! তোকে কি বলে সান্ত্বনা দেবো ? তুই আমাদের চেয়ে অনেক শক্ত ধাতের মানুষ। ঈশ্বর তোকে সহ্য করার শক্তি দিন।

অনন্ত বলল, আমার জন্যে ভাবিস নে। সবাই একসঙ্গে কষ্ট করে পড়ে থাকারও যুক্তি নেই। কমলেন্দুর সেকেণ্ড শিফ্ট ডিউটি আছে।

কমলেন্দু বলল, আমি ক্যাজুয়েল ছুটি নেবো।

—কি দরকার ? একদিনেই তো শেষ হবে না। আরো আসতে হবে। আজ আমি সারাদিন রাত আছি। কাল পরশু তোরা আসিস।

সুবীর বলল—এটা যুক্তির কথা।

কমলেন্দু বলল—ও-কে।

তাপরপর পকেট থেকে একগোছা দশ টাকার নোট বের করে অনন্তকে দিয়ে বলল—এটা রাখ।

—এ কি রে ! টাকা কেন ?

—কত রকমের খরচ হবে। তা সামলাবি কি করে ?

—তাই বলে তোর কাছে টাকা নেবো ?

—হ্যাঁ। নিবি শালা। এখনো তোর ভ্যানিটি গেল না।

—কিন্তু—

—অনন্ত ! গৌরী আমার বোন। তার চিকিৎসার জন্য দিলাম। দরকার হলে আরো দেবো। চিকিৎসার অভাবে গৌরীর ক্ষতি হয়েছে এটা যেন শুনতে না পাই।

সুবীর বলল, কমল ঠিক বলেছে অনন্ত। টাকাটা তুই রাখ।

—আচ্ছা ! কি করে যে তোদের ঋণ শোধ করব ?

—গৌরী ভালো হয়ে গেলেই জানবো ঋণ শোধ হয়ে গেছে।

—আর আমার ছেলে ? বিপ্লব ?

—বিপ্লব মরে নারে। সে আবার নতুন শক্তি নিয়ে তোদের মধ্যে আসবে। চলি। পরশু আসবো।

ওরা চলে গেল।

বেলা চারটের সময় বিউটি এল। গেটের বাইরে রিক্শা থেকে নেমে আস্তে আস্তে হেঁটে এল ? ওর রূপের দেমাকে, যৌবনের ঝলকে, গায়ের সুগন্ধে, চলার ছন্দে হাসপাতালে ভিজিটিং আওয়ার্সের ভিড় চঞ্চল হয়ে উঠল।

অনন্ত ছুটে গেল ওর কাছে। বলল—দিদি তুমি ?

—দিদির কথাটা কানে গেল না তখন ?

—ভুল হয়ে গেছে দিদি। তারই খেসারত এত মর্মান্তিক।

—চল গৈরীর জ্ঞান ফিরেছে ?

—জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে আছে।

—কথা বলছে ?

—খুব কম।

—কি করলে অনন্ত ? নিজেই নিজেকে পুড়িয়ে দিলে। এত অসাবধান।

—আর বোল না দিদি। মাথা ঠুকে মরছি।

ওরা দুজন গৈরীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বিউটি ওর মাথায় হাত দিয়ে ডাকল—গৈরী !

ওকে দেখে গৈরীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর জলে ভরে গেল। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু সেই গোঙানির মধ্যেই বার বার বিকৃত উচ্চারণে বিপ্লবের নাম ধরে ডাকল।

বিউটির বুকটা ছ্যাং করে উঠল। অনন্তর দিকে তাকাল। সে ওকে চোখের ইশারায় বারণ করল।

বিউটি বলল—বাচ্চা ছেলে এখুনি এনে কি হবে ? তুই ভালো হয়ে ওঠ—তারপর গৈরীর চোখ দুটো আবার জলে ভরে গেল। বিউটি ওকে অনেক সান্ত্বনা দিলো। ভালো হলে ওকে নিয়ে তোপচাচির ঝিলে পিকনিক করতে যাবে, পুজোর সময় ভালো শাড়ি কিনে দেবে, স্ট্রাইকের পর সবারই চাকরি হবে, বেতন বাড়বে। ওদের নাম যশ হবে। ইত্যাদি মন ভুলানো কথা বলে একঘণ্টা কাটাল।

যাবার সময় ওর পাংশু মুখে আলতো চুমু খেল।

যেতে যেতে অনন্ত জিজ্ঞাসা করল—দিদি তুমি যে এলে ওরা কিছু মনে করবে না ?

—জানবে কি করে ? সেজন্য তো বাসে এসেছি। আর জানলেই বা কি ? স্ট্রাইকের পর আমরা অন্য কলিয়ারীতে চলে যাবো। ডি. ডি. একটা কোম্পানীতে

কথা ফাইন্যাল করেছে। তুমিও যদি যেতে চাও তো বলবে। গৈরী ভালো হলে ওকে নিয়ে আলাদা ঘর বাঁধো। শ্রমিক ইউনিয়ন করে অনেক পাওনা পেয়েছো। এবার অন্যভাবে বাঁচবার কথা ভাবো।

অনন্ত চুপ করে রইল। একটু পর বলল তাহলে বাসেই ফিরবে ?

—হ্যাঁ। তুমি ?

—আমি এখানেই থাকবো। গৈরী মাঝে মাঝে ভয়ে চমকে উঠছে। বিপ্লবকে বারবার চাইছে। ওকে কি বলবো দিদি ?

বলতে বলতে অনন্তর গলা ধরে গেল।

বিউটি বলল—তুমিও ছিঁচ কাঁদুনে হয়ে উঠলে দেখছি। নিজেকে শক্ত রাখো। তুমি যে কাঁদছো এটা যেন কেউ বুঝতে না পারে।

সারাদিন ধরে কত অজস্র মানুষ এসেছিল সাক্ষাৎ করতে। তাদের কেউ শ্রমিক, কেউ নেতা, কেউ সাহেব। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দিনটা কেটে গেল।

রাস্তার ধারে একটা দোকানে গরম গরম রুটি তরকারি বিক্রি হচ্ছিল। তাই দেখে ওর পেটে ক্ষিদে চন্ চন্ করে উঠেছিল। কাল রাত্রে তাকে বৈশাখী ভোজী কত না সাধাসাধি করেছিল এক গ্লাস দুধ খেতে। তারপর তা ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। সুবীর ও কমলেন্দু হোটেলে খাবার জন্য বলেছিল। খায়নি। এখন ক্ষিদে লেগেছে। প্রকৃতির তাগিদেই সে চারটি রুটি তরকারি কিনে খেল। এক গ্লাস জল খেয়ে হাসপাতালের সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চে বসল।

তখন রাত হয়ে গেছে। অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে। সারাদিন ধরে নানা রকমের লোকজন যাতায়াত করেছে ঐ একটি পেশেণ্টকে দেখার জন্য তাই অনন্ত যে নগণ্য কেউ নয় তা ওরা বুঝতে পেরেছে।

যে পেশেণ্টের যত বেশী দর্শনার্থী তার তত ইম্‌পরট্যান্স। লোকে তাই মনে করে। উনি ওকে রোগীদের খাট বিছানার উপর একটি কাচা চাদর পেতে শোবার জায়গা করে দিলেন। তারই উপর শুয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত লীলা কৌতুক দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল থেকেই আকাশে মেঘ ডম্বরু বাজছে। ঝম ঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। শাঁ শাঁ বাতাস বইছে। দামোদরে বান ডাকছে গুড় গুড় শব্দে।

দুপুরে লাঞ্চ সেরে সোফায় বসে আড়মোড়া ভাঙছে বিউটি। ভঙ্গীটি অলস। ডি. ডি. সাহেব বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বললেন—বিউ! আমি কলিয়ারী যাচ্ছি।

—কলিয়ারী গিয়ে কি হবে ?

—যা বৃষ্টি হচ্ছে। দেখে আসি কোনো খাদে জল ঢুকছে কি না ?

—জল ঢুকলে তোমার কি ?

—বাঃ রে ! খাদে জল বেড়ে যাবে।

—তার জন্য ম্যানেজার, এজেন্ট, গণ্ডা গণ্ডা ছোট সাহেব আছে। তুমি কি একাই কলিয়ারীর ঠিকা নিয়েছো নাকি ? আজ বেরিয়ো না। কাজ আছে।

—বাঃ রে ! তুমি বেশ বলছো। খাদ যদি জলে ডুবে যায়।

—তাতে তোমার কী ? একবার বললে কথা বুঝতে পারো না ?

বলতে বলতে বিউটি উঠে পড়ল। ড্রেস মেক-আপ সারতে একঘণ্টা লাগল। কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে গায়ে রেন কোট দিয়ে বলল চলো।

—এই বৃষ্টিতে ?

—হ্যাঁ। বৃষ্টি আজ থামবে না। দেখছো না সাইক্লোন হচ্ছে।

ওরা বেরিয়ে পড়ল। রাস্তার উপর জল বইছে। ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দে চলছে ওরা। একে স্ট্রাইক তাই সাইক্লোন। পথে জনপ্রাণী নেই। ওরা সর্ট কাটে গিয়ে রেল লাইন ধরল। স্ক্রিনিং প্ল্যান্টের পাশ দিয়ে, বালি তোলার হলেজ লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাঁ দিকে মোড় ফিরতেই ভূতবাংলোর মোরাম দেওয়া পথ। তার উপরেও জল চলছে। দামোদর ফুলছে। আদিগন্ত জল চক্‌ চক্‌ করছে। পাহাড় ভাঙার গর্জন উঠছে।

রেন্‌ কোট বাইরে খুলে রেখে ভূতবাংলোর ঠেসানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ওরা। তখন সেখানে দুই মহাপ্রাণী টপ ভুজঙ্গ হয়ে বসে আছেন।

মিঃ শ' বললেন—হ্যাল্লো বিউ ! তুমি এসেছো ?

—ওঃ শিওর। তুমি আসতে বলেছো।

—ভুল হয়ে গেছে। আমার উচিত ছিল গাড়ি নিয়ে তোমাকে তুলে আনা। কিন্তু তুমি তো খবর দিতে পারতে।

—আমি জানি যে এখন তোমার ড্রাইভার নেই। তাই কষ্ট দিলাম না।

—ভিজে তো গেলে।

—ও কিছু না। বরং ডি. ডি.-র শরীরটা খারাপ চলছে !

—কেন ? কি হয়েছে।

—কাল রাত্রে একটু জ্বর হয়েছিল। এই সর্দি কাশি আর কি ?

বলতে বলতে ডি. ডি. সাহেব বসলেন। বোকার মতো হাসলেন। ওর প্যাণ্ট শার্ট সবই ভিজে গিয়েছিল। বিউটির অত সাধের মেকআপ জলে ধুয়ে গেছে। পাতলা ফিন ফিনে শাড়ি ভিজে গিয়ে ওর শরীরের ত্বক মাংস জেল্লা দিচ্ছে।

মিঃ শ' ওর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—ওঃ ডারলিং। বড্ড ভিজে গেছো।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর ঘাড় গলায় বুলিয়ে দিলেন। বিউটি হাসতে হাসতে ওর হাত থেকে ওটা নিয়ে বলল, ওঃ সাহেব। তোমাকে এত ব্যস্ত হতে হবে না।

ডি. সি. সাহেবের চোখে টর্চ জ্বলছে। বিউটির ভিজে শরীরটা গিলে খাচ্ছেন। টেবিলের উপর মদের গ্লাস নামানোই ছিল। মিঃ শ' ওর মুখের কাছে তুলে ধরে বললেন, জাস্ট এ সিপ্‌ ডারলিং।

—থ্যাঙ্ক ইউ!

এক চুচুক দিয়ে গ্লাসটা রেখে ডি. ডি. সাহেবকে বললো—তুমি ভিজে কাপড়ে বসে থেকো না। বেডরুমে এসো কাপড় চোপড় ছেড়ে একটু রেস্ট নাও।

ওকে টেনে তুলল এবং মিঃ শ'কে বলল, জাস্ট এ মিনিট! ডি. ডি.-র ব্যবস্থা করে দিই।

ওকে বেড রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, রেডি হয়ে থাকবে। ডাকলেই হাজির হবে।

—আচ্ছা!

ডি. সি. বললেন—স্যার! এই চিড়িয়ার কি দেমাক ভাঙবে না?

—বি স্টেডি ডি. সি.। আজ তোমার দিন। এনজয় কর।

—যদি রাজী না হয়।

একটা ভালগার উওম্যানকে কি করে রাজী করাতে হয় তাও কি বলে দিতে হবে?

—ও. কে. স্যার! আপনার পারমিশন পেলেই হলো।

বিউটি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বলল—তোমরা ফুস্‌ ফুস্‌ করে কি বলছো?

—ও নাথিং। ডি. সি. বলছিল—সে তোমাকে খুব ভালোবাসে। তুমি পাত্তা দাও না।

বিউটি ঠোঁট উল্টে বলল, ভালোবাসা পেতে হলে কিছু মূল্য দিতে হয়। ও ফোকটেই সব কিছু পেতে চায়।

ডি. সি. ব্যগ্রভাবে বললেন—কি মূল্য চাও বল।

—অন্তত হীরের লকেট বসানো একটা নেকলেস। বেশী বললাম কি? মিঃ শ' অমন কত দিয়েছেন। তাড়া তাড়া নোট—সোনার গয়না কত কি? ডি. ডি.-র মতো হ্যাগার্ডও হামেশা এটা সেটা কিনে দেয়।

ডি. সি. যেন মরমে মরে গেল। তেমনিভাবে বলল—ওহো! এদিকটা আমি একবারও ভাবিনি। অলরাইট। কালকেই তোমাকে নেকলেশ কিনে দেব।

—থ্যাঙ্ক ইউ!

ডি. সি.-র দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। যেন স্বর্গের অপ্সরা এসে ওঁর বাহুতে

ধরা দিয়েছে তেমনি ব্যগ্রতায় দু'হাত দিয়ে ওঁর হাতটা চেপে ধরলেন। ঘন ঘন চুম্বন দিলেন।

—আঃ। ডোণ্ট বি একশাইটেড।

চতুরিকা বিউটি নিপুণ কৌশলে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বড় টেবিলটার কাছে গেল। গ্লাসে মদ ঢালল! দু'হাতে দুটি গ্লাস নিয়ে ওঁদের সামনে দাঁড়াল মনোমোহিনী ভঙ্গীতে ওঁরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। গ্লাস হাতে নিয়ে ওঁরা তারিয়ে তারিয়ে খেলেন। বিউটি বড় আয়নার সামনে বসে আলতো-ভাবে প্রসাধন করে নিল। আবার দুটো গ্লাস ভর্তি করে এনে দিলো।

মিঃ শ' বললেন—কাল তুমি যাতে নেকলেস পাও তার গ্যারাণ্টার আমি।

বিউটি বলল—তুমি, আমাকে খুব লোভী মনে করছো না তো ডি. সি. ?

—না—না। আমি এদিকটা ভাবিনি বলে নিজেরই মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করছে।

বিউটি নিজেও এক গ্লাস মদ নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বলল—আমি তোমাদিকে নিজের কথা ঠিকমতো বলতে পারিনি। আমার একটা প্ল্যান আছে। তোমরা যদি সাহায্য কর তবে বলবো।

ওরা তখন বিউটির জন্য সর্বস্ব দিতে পারেন। বললেন—সিওর।

—যৌবন তো চিরকাল থাকবে না। তোমরা আছো বলেই ডি. ডি. আমাকে নিয়ে সংসার করে না হলে তাড়িয়ে দিত। তোমরা বোঝ তো ?

মিঃ শ' বললেন—ও তোমাকে ভালোবাসে না ?

—উচ্ছিষ্টা নারীকে কোনো পুরুষেই ভালোবাসে না সাহেব। সেজন্য আমি ভাবি না। আমি চাইছি একটা বাড়ি করে জন কয়েক মেয়ে এনে রাখবো। তোমাদের মতো বাছাই কাস্টমার নিয়ে ব্যবসা করবো। আমার কিছু সোর্স আছে। তোমরা কিছু দেবে। কি বলছো—প্ল্যানটা খারাপ হবে ?

মিঃ শ' বললেন—গ্র্যাণ্ড। তোমার মতো মক্ষিরানীর উপযুক্ত কাজ।

—সেজন্যই টাকা কড়ি গয়নাগাঁটির যোগাড় করছি। দেখবে দু'তিন বছরের মধ্যে তোমাদের জন্য ফ্রেশ উওম্যান এনে দেবো।

নেশার ঘোরে ডি. সি.-র মাথাটা ঝুঁকে আসছিল। হঠাৎ সোফা থেকে নীচে বিউটির পায়ের কাছে বসে ওর কোমর ধরে বললেন—বিউ তোমাকে আমি বরাবর ভুল বুঝেছি। মনে করতাম দেমাক দেখাচ্ছো।

মুখটা ওর কোলে গুঁজে দিলেন।

বিউটি ওর মুখটা তুলে ধরে বলল—অমন হ্যাংলামি করো না ডি. সি. ! সোজা হয়ে বোসো। আমি তো আছি। সারাটা রাত পড়ে আছে।

ডি. সি. আবার সোফায় বসলেন : নেশা খুব জম্পেশ হয়েছে। ওদের চোখে আগুন জ্বলছে। দুজনেই বিউটিকে চাইছে।

বিউটি উঠে পড়ল। শাড়ির আঁচলটা খসে পড়ল। ও ভ্রূক্ষেপ করল না। আরো দু'গ্লাস মদ নিয়ে ওদের কাছে দাঁড়াল মূর্তিমতী কামনার মতো। ওদের হাতে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে নিজেও নিল।

বলল—এখনকার মতো এবং এই শেষ। মনে কর আমি ক্যাবারে ড্যান্সার। একটি একটি করে কাপড় খুলে ফেলছি। এই পেগ শেষ হলেই শেষ আবরণটিও খুলে দেব। ও. কে.! দিস ইজ গেম!

—ফাইন!

বিউটি সত্যি সত্যিই ওর শাড়িটা খুলে দিলো। ব্লাউজের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, দেখতে পাচ্ছো ডি. সি.। আজ প্রকৃতি কত উদ্দাম। কথা দিয়েছিলাম এমনি দিনে তোমার কাছে আসবো। তাই এসেছি।

ডি. সি.-র চোখ জুড়ে আসছে। মিঃ শ'য়ের মাথাটা বার বার ঝুঁকে পড়ছে।

বিউটি বলল—এবার চোখ ধাঁধানো সীন। গ্লাসটা শেষ কর। না হলে এ দৃশ্য সইতে পারবে না।

সত্যিই অসহ্য দৃশ্য। শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি চোখের মণিতে কেন্দ্রীভূত করে তাকিয়ে আছেন। বিউটি দাঁড়িয়ে আছে মিটি মিটি হাসছে। অনাবৃত ত্বক মাংস ঝলক দিচ্ছে। শেষ দৃশ্যের জন্য তৈরি। গ্লাস নিঃশেষ করে বললেন, আঃ! হোয়াট এ বিউটি!

তারপরই চোখের জ্যোতি ফিউজ হয়ে গেল ওদের। দুজন একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে ওকে ধরতে গেলেন। বিউটি টুক করে সরে গেল। ওঁরা দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

বিউটি কাপড় চোপড় গুটিয়ে পাশের ঘরে গেল। সেখানে ডি. ডি. সাহেব ছিলেন। ওর সাহায্যে দ্রুত কাপড় পরে ফিরে এল।

সাহেবরা তখন টলমল করে উঠছেন।

মিঃ শ' গর্জন করে বললেন—নো ডি. সি.! ডোণ্ট টাচ।

—ইউ হ্যাভ প্রমিসড স্যার।

—সি ইজ মাই উওম্যান।

—নো। মাই উওম্যান।

—শাট আপ।

মিঃ শ' শপাটে একটি ঘুষি চালালেন ওঁর মুখে। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেলেন। ডি. সি. সাহেব একটা লাথি মারলেন কিন্তু তিনিও ভারসাম্য হারিয়ে পড়লেন।

মিঃ শ' ডাকলেন—বিউ!

—এই যে সাহেব। আমি তোমার কাছেই আছি।

ডি. সি. গর্জন করে বললেন—শালা বেজন্মা—বেইমান। বলেছিলে অনন্তর সংসার ছারখার করে দিতে পারলে বিউটিকে দেবো।

খল্ খল্ করে হেসে উঠল বিউটি। বলল—ওরে শয়তান! বিউটি কারো বাপের নয়। তোমরা দুজন দুনিয়ার পাপ। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন মানুষের সুখ শান্তি নষ্ট করবে। শিশু হত্যা, নারী হত্যা, শ্রমিক হত্যা করবে। মেয়ে মানুষের রক্ত খাবে, শ্রমিকদের হাড় মাংস চিবিয়ে খাবে। পৃথিবীতে তোমাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।

ওরা সবই শুনতে পেলেন কিন্তু চোখের পাতা এত ভারী যে তাকাতে পারলেন না। হাত পা অবশ তাই পিস্তল বের করতে পারলেন না। এক ছলনাময়ীর ছলনায় শোচনীয়ভাবে হেরে গেলেন। একটু একটু করে গভীর সুপ্তির অতলে গেলেন।

ডি. ডি. সাহেব থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বললেন—মারা গেল নাকি?

—না। ঘুমিয়ে পড়েছে। মদের সঙ্গে শ্লিপিং ড্রাগ মিশিয়ে দিয়েছি। আমার মাংস খাবার লোভে খেয়েও নিল আকালের মতো। এখন চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্চিন্ত। নাও। সব গুটিয়ে ফেলো।

মদের গ্লাস, বোতল, এঁটো থালাবাসন, অর্ধভুক্ত খাবার-দবার সব ব্যাগে পুরে, ভালো করে টেবিল, সোফা, মেঝে মুছে দিলো।

ডি. ডি. সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—এদের কি হবে?

—দামোদরে বিসর্জন। দেখছো না দামোদর ক্ষেপে গেছে। অনার্য দেবতা আর্য মানুষের লাশ পেলে খুশী হবেন। নাও নিকাশের কাজ শুরু কর।

তখনো ওদের নাড়ি চলছিল। হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন ছিল। ধরে তুলবার সময় মিঃ শ' নড়ে উঠলেন। দুটোই বিরাট লাশ। দুজনে ধরে গাড়িতে তুলতে হিম সিম খেয়ে গেলো। আপন আপন রেন কোট গায়ে নিল।

সামনের সিটে ওদেরকে বসে থাকার ভঙ্গীতে রাখল যদিও নেতিয়ে যাচ্ছিল। ঘরদুয়ার সাফ সুতরো করে, ঘষটে নিয়ে যাবার দাগ, পায়ের ছাপ সব মুছে তালা চাবি লাগিয়ে চাবিটা মিঃ শ'য়ের পকেটেই রেখে দিলো।

মিঃ শ'য়ের গাড়ি। বিউটি তা চালাতে জানে! হেডলাইট না জ্বেলে ডি. ডি. সাহেবের হাতে যে টর্চ ছিল তারই সামান্য আলোতে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল।

দামোদরের জল তখন ভূতবাংলোর গেট পার হয়ে গেছে। লনটার উপর একফুট জল। বিউটির রাস্তাঘাট মুখস্থ। বহুবার এসেছে বহু রকমভাবে দেখেছে। প্ল্যানটা তো হঠাৎ নয়। দীর্ঘদিনের। সেই রকম প্রস্তুতি ছিল শরীরে ও মনে।

যেখানে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়েছে সেখানে বাঁয়ে মোড় নিয়ে ও থামল। এখান থেকেই রাস্তার ঢালু সুরু হয়েছে। পিছন থেকে রাস্তার জল এসে গাড়িকে ধাক্কা দিচ্ছে। বিউটি নামল। ইঞ্জিন চলছে। মিঃ শ'য়ের শরীরটা টেনে স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসিয়ে দিল। ওর পা-টা একসিলারেটারে চড়িয়ে দিয়ে দ্রুত হাতে দরজা লাগিয়ে দিলো। গাড়ি একটা ঝটকা খেয়ে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে ওরাও ঠেলে দিলো। গাড়ি গড়িয়ে গেল। পাহাড়ের মতো উথাল পাথাল ঢেউ এসে ধাক্কা মারল। গাড়িতে গতি সঞ্চার হলো। এবং মুহূর্তে এক বিশালাকার ঢেউ এসে লাউয়ের খোলের মতো গাড়িটিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

জানুতক জলে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল অনার্য দামোদরের আক্রোশ। ব্যাগের ভিতর যেসব সামগ্রী ছিল তাও ডি. ডি. সাহেব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

জলে ভিজে, ঘামে নেয়ে ওরা জল থেকে উপরে উঠল। একে অপরকে জড়িয়ে ধরল প্রচণ্ড আবেগে।

ড্রপসিন পড়ল সেক্স অ্যাণ্ড ক্রাইম ড্রামার রুদ্ধশ্বাস দৃশ্যে। দুটি জীবন্ত পাপ পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

ছেষট্টি

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬। প্রচণ্ড সাইক্লোনে রাঢ় বঙ্গ ভেসে যাচ্ছে। একটানা বৃষ্টির সঙ্গে শাঁ শাঁ বাতাস। সেই নৈসর্গিক বিপর্যয়ের ক্ষণে বিউটি যখন পাপ নিকাশ করতে ব্যস্ত অনন্ত তখন হাসপাতালে পড়ে আছে অকূল পাথার ভাবনা নিয়ে।

তার ছাব্বিশ বছরের জীবন পরিক্রমায় এত বৃষ্টি কখনো দেখেনি। না জানি এই বৃষ্টিতে কত বন্যা হবে। হয়তো ওদের মাটির বাড়ি অজয়ের বানে ডুবে যাবে। মা তাহলে বড় আতান্তরে পড়বেন। নীতির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। একবার পেছিয়ে গেছে মায়ের অসুখের জন্য। আবার অঘ্রাণ মাসে হবার কথা আছে। ঘর ভেঙে গেলে কি হবে?

মায়ের জন্য বড়ই ভাবনা হলো। গতবছর এমনি দিনে মা তাকে তীব্র ভং'সনা করে বাড়ি গিয়েছিলেন। তারপর দেখা হলো হাসপাতালে। কিন্তু এমন দুর্দৈব যে ভালো করে রোগ সারিয়ে যে ফিরবেন তাও হলো না। মিঃ শ' তাঁকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়েই দিলেন।

মা এখন কেমন আছেন? একটা চিঠি লিখবে মাকে? তাকে কি গৈরীর খবরটা দেবে? কি প্রয়োজন? গৈরী যখন হাসপাতালে আয়ার ভূমিকা অভিনয় করতো তার দাম ছিল। যে মুহূর্তে অনন্তর স্ত্রীর ভূমিকায় এসে গেল সেই মুহূর্তে সে অচ্ছুৎ। তার খবরে দরকার কি?

অথচ বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তবে সমাজ সংসারের ভয়ে ঘরে হয়তো নিতে পারতেন না। কিন্তু আশীর্বাদ করতেন। তিনি ছুঁৎমার্গকে ঘৃণা করতেন। সেই মানুষের শুচিবায়ুগ্রস্তা স্ত্রী।

বাবা! আপনি মানুষকে সমান ভাবার মন্ত্র কেন দিয়েছিলেন? কেন বলতেন সবাই ঈশ্বরের সৃষ্টি। আপন পর ভেদাভেদ নেই। মানুষকে ঘৃণা কোর না। অস্পৃশ্য কেউ নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হাড়ি, ডোম, চণ্ডালকেও হরিনাম দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী মুচি, মেথর, চণ্ডালকে হরিজন বলতেন।

আপনার বাক্য আমি কায়মনে বিশ্বাস করেছি। মেনে নিয়েছি। হাড়ে হাড়ে তার ফল ভোগ করছি! আমার অপমানিতা স্ত্রীকে কোনো দিনই সম্মানিতা করতে পারতাম না। তাই বুঝি সে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে বলছে—তোমার মুরোদ দেখে নিলাম। যাকে সম্মান দিতে পারো না তাকে বিয়ে করবার তুমি কে?

হাসপাতালের পরিত্যক্ত খাটিয়ায় শুয়ে উদাসীন ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছে। ক্ষিধেয় পেট কল্ কল্ করছে। মন পুড়ে যাচ্ছে অপমান ও আত্মগ্লানিতে।

আগের দিন রাত্রে চারটি রুটি খেয়েছিল। আজ সকালে এককাপ চা খেয়েছে। ব্যস। কোনো দোকান খোলেনি খাবে কি?

সকালের দিকে আউটডোরে কিছু পেশেণ্ট এসেছিল। তারপর থেকে ফাঁকা। অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে সময় কাটছে ওর। আর এই তো সময় যখন মানুষকে আত্মগ্লানিতে পেয়ে বসে।

হাসপাতালে সেকেণ্ড শিফটের ছোকরাটির নাম শিবরতি দাস। এই বৃষ্টিতেও সে ডিউটি এসেছে তিনমাইল হেঁটে। সে বলে ডিউটি বড় পবিত্র কর্ম। এতে কখনো অবহেলা করতে নেই।

রোগীদিকে খাবার দেবার সময় সে বলল, বাবুজী! আপনার তো কিছু খাওয়া হয়নি?

অনন্ত হাসল। ও বলল, কিচেনে জল ঢুকে গেছে। তাই রাত্রে রান্না হয়নি। রোগীদের জন্য দুধ পাউরুটির ব্যবস্থা হয়েছে। আপনি খাবেন?

—সেকি! রোগীদের ভাগ কেটে আমি কেন?

—আপনিও তো রোগী।

অনন্ত আবার হাসল। মলিন অনুকম্পা জাগানো হাসি। দেখলেই মানুষের বুক টন্ টন্ করে। বলল, তা বটে। আমাকেও ভর্তি করে নিও।

ও চলে গেল। একটু পরে হাফ পাউণ্ড রুটি ও এক গ্লাস দুধ এনে দিয়ে বলল—খান দরকার হলে আরো একটা পাউরুটি দেবো।

—না। তার দরকার হবে না।

অনন্ত খাচ্ছে। শিবরতি ওর কাছেই বসে আছে।

বলল—আশা করি কাল বৃষ্টি থামবে। তখন বাড়ি যেতে পারবেন।

অনন্ত কি রকম উদাস ভঙ্গীতে বলল—বাড়ি কোথায় শিবরতি? আজ আমার বলতে ঐ আধপোড়া বউটা। পুরোটা পুড়ে গেলেই নাঙ্গা ফকির হয়ে যেতাম।

—অমন বলবেন না বাবুজী। আপনার জানানা জরুর ভালো হয়ে যাবে।

—ঈশ্বরের কৃপা!

—বাবুজী! কয়লা কুলির জন্য আপনি এত করলেন তবু কেন এত দুঃখ? সাধু সন্তরা বলেন মানুষের মঙ্গল করলে নিজের মঙ্গল হয়। এই কি তার নমুনা?

অনন্ত চুপ করে রইলো ঈশ্বর এবং মানুষ; অশরীরীর সঙ্গে শরীরীর দ্বন্দ্ব নিয়ে বিতর্ক করার মতো মন মেজাজ ওর নেই। শুধু কপালে হাত দিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিলো। এও এক প্রকার হতাশার মুদ্রা

শিবরতি আরো পাউরুটি এনে দিলো।

অনন্ত বলল—আবার কেন?

—খান ববুজী।

—আসলে কি জানো—মানুষের সহনশীলতার একটা সীমা আছে। যা পার হলেই অনুভব শক্তি হারিয়ে যায়। আমারও বুঝি তাই হয়েছে। সারা দিন তো ক্ষিদেতে পড়ে আছি। কই খাবার ইচ্ছে তো জাগেনি।

—অনেক সহ্য করেছেন বাবুজী। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ক্ষিদে পেটে খাবার পড়তেই অনন্ত শরীরে বল পেল। তখন ভাবল—খাদ্যই প্রাণ। একবার গৈরীকে দেখার প্রবল ইচ্ছা জাগল। কিন্তু ওকে কি এই রাত্রিকালে ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকতে দেবে?

শিবরতিকে সে কথা বলতেই বলল—আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সেই ওয়ার্ডের নার্সকে অনুরোধ করল। উনিই ওর কাছে নিয়ে গেলেন।

গৈরী ঘুমোচ্ছে। ডাক্তাররা ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। জেগে উঠলেই যন্ত্রণায় ছটফট করে। মুখটি খোলা। চোখ দুটি বোজা, মুখের রঙ ফ্যাকাশে, অমন সুন্দর লাবণ্য ভরা টস টসে মুখ চুপসে গেছে। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক। নাকের দু'দিকেই ছেঁদা ছিল দু'নাকে নাকছাবি পরত বলে। বিউটি একটা নাকছাবি খুলে দিয়েছে। বলেছে এসব দেহাতি আদৎ।

বিউটি ওর গা থেকে অনেক কিছুই খুলে দিয়েছে। রূপোর বিছে। কাঁচের চুড়ি। পায়ের মল, লাল ফল গাঁথা বাজু বন্ধ, গায়ের ফতুয়া। সে নিজে ছাড়িয়েছে বিড়ি, মদ, যেখানে সেখানে থুতু ফেলা, ঝন্ ঝন্ করে কথা বলা।

পুরানো খোলস ছেড়ে এতদিনে মেয়েটি সভ্য ভব্য হয়েছিল। শাড়ি ব্লাউজ পরতে, খোঁপা বাঁধতে, সাজ সজ্জা করতে ও কথা বলতে শিখেছিল। চলাফেরায়

স্বচ্ছন্দ সাবলীল একটা ভঙ্গী এসেছিল। অনন্তর পাশে তাকে বেশ মানাতো। আগেকার মতো বে-খাপ্পা, বে-মানান মনে হতো না শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে ফেলেছিল। সেই সময়েই এই বিপর্যয়।

স্ট্রাইকের প্রচণ্ড টেনশ্যানে নিজস্ব সুখ দুঃখকে বেবাক ভুলে ছিল। এখন তাই শত সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কি মলিন, শুষ্ক, রক্তহীন, পাংশু বর্ণ গৈরীর মুখ।

অনন্তর বুকটা টন টন করে উঠলো। ওর মুখে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিলো। ফিরে এল সেই শয্যাটিতে যেখানে পুঞ্জীভূত শোক, গ্লানি, দুর্ভাবনা ও একটি ক্ষীণ আশা নিয়ে গতরাত্রি থেকে বসে আছে।

বিপ্লব নেই।

শব্দ দুটি এক ব্যাপক অর্থ নিয়ে ওর বুকে ধাক্কা মারল। এই যে তামাম কোলফিল্ডের ধর্মঘট, গণআন্দোলন, বিপ্লবের স্বপ্ন সবই তার কাছে অর্থহীন মনে হলো। বিপ্লব ওর ছেলে না। এ এক ভাবনা। যা প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী মানুষের বুকে থাকে। তা নেই। কি মর্মান্তিক এই বোধ!

পরদিন সকালে রোদ উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল নানা দুর্ঘটনার সংবাদ। ইস্টার্ন রেলের মেন লাইন ভেঙে গেছে, জি. টি. রোডে সিঙারণ ব্রিজ ভেঙেছে, আরামবাগ ডুবে আছে, বর্ধমান রাজবাড়িতে বান ঢুকেছে, সারা শহর জলমগ্ন। অজয়ের বাঁধ ভেঙে ইলামবাজার থেকে গুসকরা ভেসে গেছে। বহু কয়লা খনিতেও জলপ্লাবন হয়েছে। তার মধ্যে বড় ধোমা অন্যতম। সেখানে খাদের ভিতর বহু শ্রমিক জলবন্দী হয়ে আছে। কারণ এই কলিয়ারীতে ধর্মঘট হয়নি।

অনন্ত দিনের বেলাটা হাসপাতালে থেকে, সন্ধ্যার মুখে হসুনিয়া মোড়ে বাস থেকে নেমে ধীরে ধীরে কলিয়ারী ফিরল। মেসেই ঢুকল। ওর সিটটা তখনো খালি ছিল। তাই অসুবিধা হলো না।

সাতষট্টি

কত যে কাজ অনন্তর জন্য অপেক্ষা করে ছিল তার ইয়ত্তা নেই। সেই সঙ্গে মানুষজন। সকালে ইউনিয়ন অফিসের টালির ঘরটিতে বসামাত্র পিল্ পিল্ করে লোক আসতে শুরু হলো। কুশল প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর অভাব অভিযোগ—জল নেই, কয়লা নেই, ভাত নেই, কাপড় নেই, অসুখ, বিসুখ এমন কত।

অনন্তর কান ঝালাপালা। সে যেন সবারই মুস্কিল আসানের ঠিকা নিয়েছে। সবারই সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া এবং প্রতিকার করার উপায়—আবার ভাবতে ভাবতেই বেলা গড়িয়ে গেল।

রাজকিশোর, হরিহর, নগেন, কালো বাউড়ী প্রভৃতি সক্রিয় কর্মীরা সেখানে হাজির ছিল কিন্তু ভাতের অভাব কে পূরণ করবে?

সেদিন সুমিতবাবু এসেছিলেন। শ্রমিকদের দারিদ্র্য দেখে ঘাবড়ে গেলেন। বললেন—এই লোকগুলো কি? আজ তিনমাস ধরে বলা হচ্ছে ধর্মঘট হলে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, মারদাঙ্গা, রক্তপাত, দমন, পীড়ন সবকিছুরই মোকাবিলা করতে হবে। তা এত বলার পর দশটা দিন ঘরে ভাত নেই। এ বড় মুস্কিলের কথা। দান খয়রাৎ চাঁদা, সাহায্য যা পাচ্ছি তাই ভাগ করে দিচ্ছি আর কোথায় পাব?

সমস্যাটা যে এইভাবে একদিন প্রকট হয়ে উঠবে। তা হিসেবের মধ্যে ছিল। শ্রমিকদিকে পুন পুন হুঁশিয়ারীও দেওয়া হয়েছিল। যাদের পরিবার বাড়িতে পাঠাবার সুযোগ আছে তারা তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ধর্মঘটের আগের সপ্তাহে পেমেণ্ট হয়নি। এটা কোম্পানীর একটা চাল। তার ফলও শ্রমিকদের কাছে মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো দোকানে জিনিসপত্র নেই। থাকলেও ধার দিতে নারাজ।

অনন্ত বলল—দাদা! লেবারদিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখছি। আপনি দেখুন যদি কিছু চাল-গম যোগাড় করতে পারেন।

—তুইও চল। ভিক্ষা মাগতে হবে তো।

দুপুরেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। কয়েক বস্তা চাল গমের আশ্বাস নিয়ে গভীর রাতে ফিরল। আবার ভোরেই বেরুল সেসব সংগ্রহ করতে। সেদিনও ফিরতে সন্ধ্যা হলো। তবে শুধু হাতে না।

পর পর দু'দিন হাসপাতাল যাওয়া হলো না। পরের দিন সকালে উঠেই দেখে গুলু দাঁড়িয়ে আছে। কি জানি কি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে সেই আশঙ্কায় বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

গুলু জানাল—গতকাল সে হাসপাতাল গিয়েছিল। গৌরী কথা বলছে এবং বাচ্চাটাকে দেখতে চাইছে।

অনন্তর মুখ শুকিয়ে গেল। বলল—ওকে কিছু বলনি তো?

—না।

—ওকে বলো না বাপুজী।

ও ঘাড় নেড়ে চলে যাচ্ছিল। অনন্ত ওকে ডেকে পাঁচটি টাকা দিলো। ব্যস। ওরও হাত খালি। ভাগ্যিস সেদিন কমলেন্দু ওর হাতে এক গোছা নোট ধরিয়ে দিয়েছিল। তাই খরচ চলল। এদিকে পার্টি ফাণ্ডের টাকাও শেষ। যাদের চাঁদা নিয়ে পার্টি ফাণ্ড সেই লেবাররাই খেতে পাচ্ছে না। চাঁদা দেবে কি? তিলক সিং ক্যাশিয়ার ছিল। সে যদি অত টাকা হড়প না করত তবে এতটা অভাব হতো না।

যাক সে। এ ভাবনাটা পরে ভাবলেও চলবে। আপাতত রেশনটা

সুষ্ঠুভাবে বিলি ব্যবস্থা করতে হবে। দু'তিন দিনের খোরাকি তো বটে।

সেদিন দেখল এমন কিছু ছেলেমেয়ে রেশনের লাইনে দাঁড়িয়েছে যারা ভদ্রলোক বলে পরিচিত। অনন্তর চোখ কর কর করছিল। এই মেয়েরা আজ দু'সের চালের জন্য লাইন দিয়েছে। দারিদ্র্য এমন সর্বনাশা, ক্ষুধা এমন সর্বগ্রাসী। ওদের সামনে দাঁড়াতে পারল না।

যেদিন থেকে ফিরেছে তারপর একদিনও ন্নিয়া ধাওড়ায় যায়নি। বড অন্যায় হয়ে গেছে। ওদের ভালোবাসায় তো ঘাটতি নেই। তাহলে কেন দেখা করল না? সময় নেই? সেকথা বলতে পারে। কিন্তু গৈরী থাকলে তো ওরই মধ্যে সময় হতো।

ভর দুপুরে মেসে না ফিরে ন্নিয়া ধাওড়াতে গেল। সেখানে তখন বৈশাখীকে ঘিরে ওদের আট দশটি ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়ে। উনুনে ভাত ফুটছে। বৈশাখী ওদেরকে ভুলোচ্ছে—আর একটু বোস। ভাত নামলেই ফ্যান ভাত দেব।

অনন্তর বুকটা মুচড়ে উঠল। এইজন্যই ধর্মঘট ডেকেছিল? এই ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েদের মুখে ফ্যান ভাত যুগিয়ে দেবার মুরোদ ফুরিয়ে দেবার জন্য। না জানি সারা কয়লা অঞ্চলে কত সহস্র জননী ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করা ছেলে-মেয়েদের সামনে এক থালা ফ্যান ভাতও দিতে পারছে না।

বৈশাখী ওকে দেখেই মাথার ঘোমটা টেনে ফিক্ করে হাসল। মলিন মুখের হাসিটি অমলিন আন্তরিকতায় পূর্ণ। কিন্তু লাজ ঢাকা বড দায়। ছেঁড়া ফাটা শাড়ি নিয়ে সে বড়ই বিব্রত।

বলল—দেখেছ। এরা আমাকে পাগল করে দেবে।

অনন্ত বলল—ভোজী! দোষ আমাদের। এখন মনে হচ্ছে ধর্মঘট করাটা হঠকারিতা। ক'দিন থেকে ধাওড়ায় ধাওড়ায় দারিদ্র্য ও অনাহারের চিত্র দেখে মনটা বড় দমে গেছে। আবার ভাবি—কিছু মূল্য তো দিতেই হবে। সংগ্রাম তার মূল্য উশুল করে নেবেই।

বৈশাখী বলল ওসব কথা থাক। প্রতিদিন তোমার জন্য ভাত রেঁধে প্রহর রাত পর্যন্ত বসে থাকতাম। এই আসছে—করে পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ক্ষিদে তেষ্টা নিয়ে আসবে তাই ছেলেদের মুখের আহার কেটে তোমার জন্য রাখতাম! তবু একবার মনে পড়ল না। আমরা এত পর?

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল বৈশাখী।

অনন্ত মরমে মরে গেল। হাত জোড় করে বলল—দোষ হয়ে গেছে ভোজী। মাফ কর।

—হ্যাঁ। মাফ কর বলেই খালাস। আমাদের কষ্ট বুঝবে কেন? তুমি বামহনের ছেলে। আমাদের আপন হবে কেন? আমার হাতে খাবার রুচি হবে কেন।

—আঃ ভোজী! এমন আঘাত দিয়ে কথা বলবে তো আমি চলে যাবো। অনন্ত উঠে পড়ল। ফাল্গুনী এসে ওর হাতে ধরে বলল, ওঃ খুব রাগ হয়েছে জামাইয়ের। ভোজী যে কেঁদে মরছে সেটি দেখতে পাও না।

বৈশাখী কেঁদে ভাসিয়ে দিলো—আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ। কি বলতে কি বলেছি তাতে তুমি রাগ করছো?

অনন্ত আবার বসে পড়ল। ঘাট হয়েছে ভোজী। কান্না থামাও।

বৈশাখী ফিক্ করে হেসে ফেলল। অশ্রুমুখী রমণীর হাসি এক বিশেষ মাত্রা নিয়ে অনন্তর অন্তরে গেঁথে গেল।

বলল—দু দিন ধরে কি রেঁধে রেখেছো দাও—খেয়ে যাবো।

—ক্ষুধার রাজ্যে কি ভাত যোগানো থাকে? বাচ্চাদিকে দিয়ে দিয়েছি তুমি বস। গরম ভাত খেয়ে যাবে।

কথায় কথায় অনেক বেলা হলো—অনন্ত সেইখানে খাওয়া দাওয়া করে বলল চলি—ভোজী। মেসেই থাকবো। কিছু মনে কোর না।

—আরো কিছু কিছু রেশন পাঠিয়ে দেবো। আমি যতদিন আছি ততদিন তোমাদিকে উপোষ দিতে দেবো না।

—আহা রে কত দরদ।

বৈশাখী হাসল। এই আসল বৈশাখী যে শত দুঃখেও হাসতে পারে। প্রথম থেকেই যাকে সদা হাস্যমুখী দেখছে সে। চলে যাচ্ছিল।

বৈশাখী পিছু ডাকল—জামাই।

—কি ভোজী?

—কিছু মনে করবে না তো? একটি কথা বলবো।

বল।

—আমাকে তিনটি টাকা দেবে?

অনন্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। বৈশাখী কখনো ওর কাছে টাকা চায়নি।

আজ হঠাৎ চাইল কেন? নিশ্চয় খুবই জরুরী।

—সন্ধ্যা নাগাদ পাঠিয়ে দিলে হবে তো ভোজী?

—তাহলে আজ আর যাওয়া হবে না।

—কোথায়?

—গৌরীকে দেখতে। বুকটা টন্ টন্ করছে। এইটুকু থেকে মানুষ করেছি। সেই যে হাসপাতালে গেল আর চোখের দেখা দেখিনি। তাই আমি, কুন্তী, ফাল্গুনী তিনজনে যাবো ভেবেছিলমে। একটাকা করে বাস ভাড়া লাগবে।

—কাল যেয়ো ভোজী। আমি তোমাদিকে নিয়ে যাবো।

—বেশ।

নারী হৃদয়ের মমতা মেহের স্নেহ ভালোবাসার ক্ষণ স্মৃতি বুকে নিয়ে হাঁটতে

হাঁটতে ইউনিয়ন অফিসে হাজির হলো। তার অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে। ধর্মঘট চলছে। এ সময়ে কি নেতাদের ফুরসৎ থাকে?

দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা হলো। তারপর রাত। একাই হাঁটতে হাঁটতে মেসে ফিরছিল। গৈরী, ধর্মঘট, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ইত্যাদি ভাবনার সঙ্গে নূতন ভাবনা জুটেছে হরিহরের মেয়েকে নিয়ে। ওর জামাই বড় ধেমো কলিয়ারীতে কাজ করত। বন্যার দিন খাদে জলপ্লাবন হয়েছে। অনেকের মধ্যে সেও খাদে আটক পড়ে গেছে। সহজ বুদ্ধিতে অনুমান করলে খাদের ভিতর সলিল সমাধির কথাটাই বড হয়ে দেখা দেয়।

অনন্তর মতো অতিরিক্ত আশাবাদীরা মনে করে বেঁচেও তো থাকতে পারে। হয়তো কোনো বন্ধ সুড়ঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। জল অতদূর পৌঁছায়নি। সেখানে কিছু বাতাস এবং অক্সিজেন আছে।

বিভিন্ন সময়ে মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যই তার এমন ধারণা হয়েছিল। ও মনে করে মানুষের জীবন যত ক্ষণস্থায়ী তত অলৌকিক জীবনী শক্তির আধারও বটে। না হলে গৈরী বেঁচে থাকতো না।

কিন্তু হরিহরের মেয়েটি যে পাগল হয়ে গেছে। তিন বছর আগে বিয়ে হয়েছে কোলে একটি বাচ্চা। সে বেচারী কি করে সহ্য করে? হরিহর সেখানে গেছে। ওকেও একবার যেতে হবে। ওরা তো কয়লা খনির শ্রমিক।

ডি. ডি. সাহেবের বাংলোর সামনে বিউটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন বোধ করল। তাই সে গেট খুলে ঢুকে পড়ল। বিউটি ওকে ভালোভাবে আপ্যায়ন করল এবং অভিযোগও করল, কেন সে আগে আসেনি?

অনন্ত ভাবল—এই এক মেয়েলি স্বভাব। সে দেহাতিনীই হোক বা আধুনিকাই হোক কৈফিয়ৎ না দিয়ে ছাড়ান নেই।

বিউটি ওকে বসিয়ে দিয়ে কিচেনে গেল। মিষ্টি ও সিঙাড়া নিয়ে এসে বলল—খাও।

অনন্ত খাচ্ছে। বিউটি জিজ্ঞাসা করল—তোমার তো চাকরি বাকরি আয় উপার্জন নেই তাহলে খরচ পত্র চলছে কি করে?

—কমলেন্দু পাঁচশো টাকা দিয়েছিল। তাই চলল।

—তার পর?

—আমার বন্ধু ভাগ্যটা ভালো। সুবীর ও কমলেন্দু বলেছে গৈরীর যাবতীয় চিকিৎসার খরচ ওরা দেবে!

—আর আমি যদি দিই তাহলে নেবে না?

অনন্ত হাসল। বলল—নেবো না কখন বলেছি? আমাকে তো এবার চেয়ে চিন্তেই চালাতে হবে। কিন্তু এ যে কি কষ্টের তা তোমাকে কি বলব দিদি? কারো কাছে কখনো হাত পেতে কিছু চাইনি, আজ তাই আমার

বিধিলিপি হয়ে দাঁড়াল। গৈরী হতচ্ছাড়ি একেবারে যদি মরে যেত তবে আমার হাড় জুড়োত।

বিউটি ধমকের স্বরে বলল, আঃ অনন্ত! ওকে কেন দুষছো?

অনন্ত আত্মসংবরণ করে বলল—কেন যে এমন কাল বাক্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কে জানে? কিন্তু সত্যিই তো আমি ওর মৃত্যু কামনা করি না। আমি চাই ও বেঁচে থাক। প্রবলভাবে আমার কাছে ফিরে আসুক।

বিউটি ওর কাছ থেকে উঠে গেল এবং পাঁচশো টাকা এনে দিলো।

—ধন্যবাদ দিদি!

—অনন্ত! আমি তোমার দিদি। এ সম্পর্ক আজকার না। তোমার বাবা এ সম্পর্ক বেঁধে দিয়ে গেছেন। তোমার যা প্রয়োজন আমাকে বলবে। লজ্জা দ্বিধা কোর না।

—আচ্ছা দিদি!

পরদিন হাসপাতালে বৈশাখী, কুন্তী ও ফাল্গুনীর সঙ্গে অনন্তকে দেখে গৈরীর স্তিমিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপরই বিষণ্ণ উদাস গলায় বলল—আমার বিপ্লবকে নিয়ে এলে না কেন?

সবাই এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। গৈরী অনন্তকে বলল—তুমি যে ওকে নিয়ে আসবে বলেছিলে—আজ তো ভোজী এসেছে—আনলে না কেন?

বৈশাখী শব্দ করে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়ামের স্বর ঝঙ্কারের মতো কুন্তী ও ফাল্গুনীও সুর মিলিয়ে দিলো। অনন্ত বড়ই বিপন্ন বোধ করল। মনে মনে বলল—ধন্য মেয়ের জাত! একটা কথা পেটে রাখতে পারে না। যে সিন্ করল তাতে কি গৈরীর বুঝতে বাকী থাকবে?

—তোমরা কাঁদছ কেন? তবে কি বিপ্লব—

—আঃ গৈরী! তুই এত ছটপট করছিস কেন?

একজন সিস্টার ছুটে এসে ওদেরকে ধমক দিতে শুরু করল—যাও। বাইরে যাও! একি হচ্ছে অনন্তবাবু? এটা কি কান্নার হাট?

অনন্ত থ' হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মেয়েগুলির কান্না সটকে গেল। চোখ মুছে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আর মুখে কথা নেই।

গৈরীর ভিতরটা থর থর করে কাঁপছে। ক্ষতস্থানগুলিতে অজস্র বিষ কাঁকড়া হুল ফোটাচ্ছে। চোখে যেটুকু জ্যোতি ছিল তাও ম্লান হয়ে এল। ভীষণ যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল।

এত যে ওষুধ, ইনজেকশন তবু ওর গা থেকে পচা মাংসের দুর্গন্ধ উঠছে। পোড়া ঘায়ের ব্যাপারই এই। এক ঠাঁই থামে না। চারিয়ে চারিয়ে বাড়তে থাকে। মাংস পচে দুর্গন্ধ ওঠে।

নার্সটি যাবার সময় শাসিয়ে গেল—পেশেণ্টের কাছে কান্নাকাটি করবে না। আর কেউ কাঁদবে না। চোখে কাপড় বেঁধে রাখবে। বুকটা ভহুল বিকল করুক। পাথর চাপা দিয়ে রাখবে। বড়ই ক্ষুণ্ণ মনে চলে গেল ওরা।

অনন্ত গৈরীর মাথায় হাত দিয়ে বলল—কান্নাকাটি করিস নে গৈরী। যা গেছে তা ফিরবে না কিন্তু যা আছে তা যেন হারিয়ে না যায়।

গৈরী ফ্যাসফেসে গলায় বলল—কথাটা স্পষ্ট করে বল না গো। এমন তিলে তিলে দগ্ধাচ্ছো কেন ?

—বিপ্লব নেই রে গৈরী।

বলতে বলতে অনন্তেরও গলা কেঁপে গেল। গৈরীকে ধরে বলল—না। একদম নড়িস নে। সিস্টার আসছে। যা তা অপমান করবে।

—হুঁ। ছেলে মরার খবর এনেছো। আবার মান-অপমান। তুমি একটি পাথর। মায়া দয়া বলে কিচ্ছু নেই।

—আঃ। চুপ কর গৈরী।

গৈরী চুপ করল। কারণ তার কথা বলার ক্ষমতা নেই। খবরটা শুনেই সে মৃগী রোগীর মতো তড়পে উঠেছিল। অনন্তর কথার জবাব দিয়েছিল ঘোরের বশে। তারপরই জ্ঞানহীন হওয়ার অবস্থা হয়ে গেল। ক্ষতস্থানগুলিতে রক্তপাতের জ্বালার সঙ্গে যুক্ত হলো পুত্রশোকের জ্বালা। মুখটা বেঁকে চুরে বীভৎস হয়ে গেল।

সে দৃশ্য সহ্য হলো না অনন্তর। দীর্ণ-বিদীর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে ওর কাছ থেকে সরে এল। কড়িডর পেরিয়ে বৈশাখীর সঙ্গে দেখা হলো।

বৈশাখী বলল—গৈরী খুব কাঁদছে জামাই ?

—কাঁদলে তো বেঁচে যেত ভোজী। তোমরা কলিয়ারী ফিরে যাও। আমি রাত্রে হাসপাতালেই থাকব। যদি এ যাত্রা টিকে যায় তবে কাল সকালে যাব।

—সে কি জামাই ? অবস্থা এত খারাপ ?

—জানি না ভোজী। তোমরা যাও।

অবসন্ন ভঙ্গীতে হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে গেল। অনন্ত তাকিয়ে রইল উদাস দৃষ্টিতে।

গৈরী কি আজকের ধাক্কা সহ্য করতে পারবে ?

আটষট্টি

গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে সেই রাতটা অনন্ত জেগেই কাটাল। শিবরতির সাহায্যে ওর থাকা খাওয়ার অসুবিধা হয়নি। কিন্তু যার স্ত্রী ঐ অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে তার কি ঘুম হয় ?

সকালে কলিয়ারী ফিরবার আগে গৈরীর সঙ্গে দেখা করল। না করলেই ভালো করত। কারণ সে ওকে দেখেই কাঁদতে লাগল। অনন্ত ওকে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করল। তখন আবার গৈরীর অন্য কথা। আমার জন্য রাত জেগে কতদিন হাসপাতালে পড়ে থাকবে গো ?

—আমার জন্য ভাবিস না গৈরী। তোকে ভালো করে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাবো তবেই আমার শান্তি।

তখন হৈ হৈ পড়ে গেছে চিনাকুড়ির ঘাটে।

কয়লা কুঠির আদি পর্বে ফেরিঘাটে নৌকোতে কয়লা বোঝাই হতো। দামোদরের স্রোতের টানে নৌকা ভেসে যেত হাওড়া জেলার মহীসভা ঘাটে। সেখান থেকে উলুবেড়িয়া ক্যানেল দিয়ে কলকাতায়।

সেই সব ফেরিঘাটে এখন ব্যাপক স্যাণ্ড স্টোরিং ব্যবস্থা। নদীতে ফানটুন বসিয়ে তাতে পাম্প বসানো জল ও বালি পাম্প করে তুলবার জন্য। নদীর বানে ফানটুন যাতে ভেসে না যায় সেজন্য রীতিমতো এনকারিং করা থাকতো।

কিন্তু জল স্রোতের ক্ষমতার তুলনায় মানুষের হিসেবী ক্ষমতা যে কত তুচ্ছ, উনিশ শো ছাপ্পান্ন সালের বন্যায় তা প্রমাণ হয়ে গেল। চিনাকুড়ির ঘাটে তারই প্রদর্শনী দু'খানা ফানটুন এনকারিংয়ের দড়িদড়া ছিঁড়ে একটা ঘূর্ণিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার উপরে শিকড় বাকড় শুদ্ধ আরও একটি গাছ, বহু ডালপালা এবং কুঁড়ে ঘর আটকে আছে। তারই মধ্যে মিঃ শ'য়ের ডজ গাড়িখানা।

বানের জল সরে যাবার পর স্থানীয় কলিয়ারী কর্তৃপক্ষ ফানটুন উদ্ধার করতে গিয়ে এতগুলি যন্ত্রদানব ও উদ্ভিদের সমাবেশ দেখে ক্রেন দিয়ে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করেন।

মিঃ শ'য়ের কাঁচ ভাঙা, তাল ত্যাপড়া গাড়িটির সামনের সিটে দুটি পচা মাংস লাগা দুর্গন্ধযুক্ত লাশও উদ্ধার করা হয়। লাশ দুটি প্রায় কঙ্কাল হয়ে গেছে। মাছ ও জলজ প্রাণীরা রক্ত মাংস খুবলে খেয়ে ফেলেছে। চিনবার জো নেই। তবে গাড়ি ও তাদের শরীরে জামা, কাপড়ের ছিন্ন খণ্ডাংশ, ঘড়ি, আংটি, বেল্ট, রিভলভার ইত্যাদি অভিজ্ঞান তাঁদেরকে চিনিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট।

পুলিশ, দারোগা, সাহেব সুবো, কুলি মজুর, নেতা, চাপারশি, গ্রাম্য চাষী, ব্যবসায়ী, জেলে, ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি হরেক লোকের মেলা বসেছে। সারা নদীঘাট লোকে গিজ গিজ করছে। এত বড় খবর সমসাময়িক যুগের মানুষদের হজম করা শক্ত।

শুধু সহজ হলো তদন্তকারী অফিসারের কাজ। তিনি অনায়াসে রিপোর্ট লিখলেন বন্যায় গাড়ি ড্রাইভ করার সময় ভারসাম্য হারিয়ে বানের তোড়ে গাড়ি সমেত ভেসে গেছেন।

জনতার মুখেও সেই কথা। শালারা মাতাল ছিল। দামোদরে ডুবে গেল।

অনন্ত বাস স্ট্যাণ্ডে নেমেই সে খবর পেল। তারপর তাকে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো ডি. সি. সাহেবের পরিবার ও কল্যাণীর জন্য। মৃতদেহ তুলে দাহ করা পর্যন্ত সব কাজই সে করল।

ওদের কান্নাকাটি, ফিট হয়ে পড়া ইত্যাদি ব্যাপারেও সামাল দিতে হলো। কল্যাণী ভেঙে পড়েছিল। সেই তাকে হাতে ধরে খাড়া রেখেছিল।

কলিয়ারী ট্রেড ইউনিয়নের নেতা হিসেবে মিঃ শ'য়ের শেষকৃত্যে হাজির থাকতে হলো। শোকসভাতে অংশগ্রহণ করল।

সেই সভাতে মিসেস শ' একটা কথা বলেছিলেন—আমার স্বামী মায়ের পেটে থাকতে মদ খেতে স্থরু করেছে। যতই মদ খাক সে মাতাল হয়ে দামোদরের বন্যায় গাড়ি ভাসিয়ে দেবার মতো মাতাল নয়।

অনন্তর সহনশীলতার সীমা ইলাসটিকের মতো বেড়েই যাচ্ছে। এক রাত্রি শ্মশানভূমিতে রাত জেগে পরের দিন দুটো ইউনিয়নের মিটিং ও একটি শোকসভা সেরে রাত্রিকালে মেসে এল শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে টাল খেতে খেতে। একটু ঘুমুতে পারলে যুত হতো। তার জো কি? যত রাজ্যের স্বপ্ন মিছিল করে আসতে লাগল, আর বার বার ঘুম ভাঙিয়ে দিলো।

দুটি বীভৎস মৃতদেহ ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে চোখের তারায় নাচছে। কোনো এক প্রেতিনী তা থৈ তা থৈ নৃত্যে দুটি নরকঙ্কালকে নৃত্যের জগতে নিয়ে যাচ্ছে। প্রেতিনী কখনো মনোরমা নারী হয়ে তাদেরকে চুম্বন করছে। কিন্তু নারী বা সাপ যে মূর্তিই ধরুক তার রূপে অন্ধকারে আলো ফুটছে। অজস্র হীরা মুক্তা ও মাণিক্য তার সর্বাঙ্গে ঝলক দিচ্ছে।

অনার্য দামোদর ভীষণ ক্রুদ্ধ। এগিয়ে আসছে লক্ষ ফণা ধরে।

উনসত্তর

১৬ই অক্টোবর, ১৯৫৬। অবসান হলো একমাস যাবৎ খনি ধর্মঘটের। অ্যাপিলেট ট্রাইবুন্যালে মামলা চলার জন্য বে-আইনী ঘোষিত হলো।

ধর্মঘট ভেঙে গেলে কি হবে? তা ছিল শিল্প বিরোধের ঝড়। আর ঝড় যখন বয়ে যায় তখন অনেক কিছুই ভেঙে চুরে দিয়ে যায়। কয়লা শিল্প তার ব্যতিক্রম নয়। সে ঝড়ে অনেক রথী মহারথী ধরাশায়ী হয়েছে। পট পরিবর্তন হয়েছে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার জীবনীশক্তি কয়লা। তাপ থেকে যদি বাষ্প উৎপন্ন না হয় তাহলে প্রাইম মুভার ঘোরে না।

কয়লা কুঠিতে ধর্মঘট মানে যে কয়লা শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা বা মালিকদের মুনাফা কামানো বন্ধ তাই শেষ কথা নয়, এর সঙ্গে দেশের অর্থনীতির সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। রেল, তাপ বিদ্যুৎ, সিমেণ্ট, ফার্টিলাইজার, শিল্প উৎপাদন—সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাই নতুন পটভূমিকায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নির্ণয়ের সময় এসে গেছে। ব্রিটিশ জমানা শেষ হয়েছে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে পারলেই মালিক পক্ষের মঙ্গল।

নতুন এজেণ্ট এসেছেন রঘু বংশ শুকুল। মৈথিলী ব্রাহ্মণ। মোটাসোটা মানুষ। তাঁর স্ত্রী কলকাতায় লেখাপড়া শিখে বাঙালি হয়ে গেছেন।

লেবার সাহেব এসেছেন রামনারায়ণ সিন্‌হা। উত্তর প্রদেশের লালা কায়েত। সফিসটিকেটেড জেণ্টিলম্যান। টাই না বেঁধে বাংলো থেকে বের হন না।

উপর তলায় ম্যানেজমেণ্টেরও খোল নলচে বদলে গেছে। সি. এম. ই. সাহেবকে অবসর নিতে বলা হয়েছে। চীফ পারসোন্যাল অফিসারকে বদলি করা হয়েছে। মিঃ ভার্মা প্রমোশন পেয়ে চীফ হয়েছেন। ধর্মঘটের সময় বহু ঘটনা ও দুর্ঘটনা দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন, বড় বড নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন বৈঠকে কূটনৈতিক তৎপরতা দেখিয়েছেন, ধর্মঘটকে বে-আইনী ঘোষণা করার জন্য ফিচেল উকিলের মতো আর্গুমেণ্ট করেছেন তাই কোম্পানী তার যোগ্যতার পুরস্কার দিয়েছেন।

অনন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা, উৎসব-অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি, ইউনিয়নের বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা সহজ হয়েছিল। হাসপাতালের পথে হসুনিয়া মোড়ে বৈশাখীর অশ্রুভরা কণ্ঠস্বরে যে গভীর উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল তাতেই সে সমস্যার গুরুত্ব নতুনভাবে উপলব্ধি করল। সেই থেকেই সে ভাবছে। আইনের হাত অনেক লম্বা, সময়ও বহু দীর্ঘ। কোম্পানী যদি ট্রাইবুন্যালে লড়াই করার মতলব করে তাহলে আরো যে কত সময় লাগবে—তা কে জানে? ততদিনে হয়ত ওরা মরে হেজে যাবে। সার্থক অর্থেই সতীত্ব বিক্রি হয়ে যাবে। বৈশাখীর না হলেও আরো তো অনেক যুবতী রয়েছে। তাদের মনের জোর নাও থাকতে পারে। সে কি অবস্থা না বুঝেই এমন কথা বলেছে?

কিন্তু কার কাছে যাবে? আঁধার ঘরে কোথায় বা সাপ ধরে বেড়াবে? এই সময়েই মিঃ ভার্মার প্রমোশনের খবর এল। অনন্ত মনস্থির করে নিল—নিজে ছোট হয়েও যদি ওদের সমস্যার সমাধান করতে পারে তবে তাই করবে।

পিওন মারফত স্লিপ পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে ওর ডাক পড়ল।

—গুড আফটারনুন স্যার।

—গুড আফটারনুন অনন্ত। কাম ইন। সিট ডাউন।

অনন্ত ধন্যবাদ দিয়ে বসল। উনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

অনন্ত বলল—আমাকে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেওয়াতে খুব বাধিত হয়েছি স্যার। এখন আমার বক্তব্য বলার জন্য একটু সময় দিলে কৃতজ্ঞ হব।

উনি মুচকি হেসে বললেন—এত এটিকেট দুরস্ত কখন থেকে হলে অনন্ত? তোমাকে তো উদ্ধত এবং অমার্জিত নেতারূপেই দেখেছি। অবশ্য তোমার যুক্তির ধার আছে। আর সেই নাটকটা—অগ্নি সংস্কার আমার খুব ভালো লেগেছে। এমন কয়েকটা একসেলেণ্ট মোমেণ্ট ছিল যা দীর্ঘদিন মনে রাখার মতো।

—সত্যি?

—ওঃ ইয়েস! বল—তোমার কি সমস্যা? তোমার স্ত্রী কেমন আছে?

—টিকে আছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

—আমি খুবই দুঃখিত অনন্ত যে তোমার স্ত্রীর চিকিৎসা শেরগড় হাসপাতালে হলো না। এখন যদি তুমি চাও তবে ব্যবস্থা করতে পারি।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। ওখানে ডাক্তারবাবুরা যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন।

দু'চারটে কথাবার্তার পরই অনন্ত মূল প্রসঙ্গে এসে পড়ল। একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল—আপনি তো জানেন স্যার ওয়াগন লোডাররা এক বছরের উপর বসে আছে। একটা বিরাট শ্রমশক্তি নষ্ট হচ্ছে।

দিনের পর দিন যত দুঃখ দুর্দশা বাড়ছে তত ওরা হতাশ হচ্ছে। ন্যায় অন্যায় বুঝবার সাধ্য নেই। স্বভাবে হিংস্র। কবে কি করে দেবে সেই আমার ভয়। নেহাত আত্মীয়তা আছে বলেই দাবিয়ে রাখতে পেরেছি। না হলে ধ্বংসাত্মক কাজ করতে কতক্ষণ।

—কিন্তু অনন্ত ওদের কেস যে ট্রাইবুন্যালে আছে।

—মিউচুয়্যাল সেটেলমেণ্ট হলে আমরা কেস তুলে নেবো।

—তুমি ওদের জন্য কি চাও?

—চাকরী।

—কিন্তু কেসে জিতলে ওরা এতদিনের বেতন পাবে।

—সে ক্ষতি আমরা স্বীকার করবো। তবে আপনাদের তরফ থেকে সুবিচার আশা করি।

—কিন্তু যে কলিয়ারীতে ম্যানুয়ালী ওয়াগন লোডিং হয় না সেখানে কি করে চারশো জন শ্রমিককে কাজ দেবো।

—শ্রমিকের প্রয়োজন আপনাদের ফুরোবে না। ওদেরকে যে ওয়াগন লোডিংয়ের কাজই দিতে হবে তাতো বলছি না।

উনি অনেকক্ষণ ভেবে বললেন—আই কিল ফর ইউ। আমাদের কোম্পানীর

ইচ্ছা ছিল ট্রাইবুন্যালে এমনভাবে কেস লড়বো যাতে ক্ষতিপূরণ দিয়ে চারশো জনকে ছাঁটাই করতে পারি। এখন তোমার কথা রাখতে হলে গোটা ব্যাপারটা পুনরায় রিভিউ করতে হবে। তুমি এক কাজ কর। নতুন এজেন্ট তোমাদের ইউনিয়নের সঙ্গে দু'চারদিনের মধ্যেই মিটিংয়ে বসবেন। শ্রমিকদের দাবি দাওয়া নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে পারো। এই ইস্যুটার উপর জোর দিও। আমি সিনসিয়ারলি ভেবে দেখবো।

খুব তাড়াতাড়িই কাজ শেষ হয়ে গেল অনন্তর। এতটা আশা করেনি। মিঃ ভার্মার সঙ্গে কথা বলে ও তৃপ্তি পেল। কাজ হোক বা না হোক ওর বক্তব্য উনি ধৈর্য ধরে শুনেছেন।

মেসে ফিরে দেখল প্রশান্ত বসে আছে। অনন্ত ঘাবড়ে গেল। মায়ের কোনো দুঃসংবাদ আছে নাকি? সেই কথাটাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করল। প্রশান্ত বলল—না। মা ভালো হয়ে গেছে।

অনন্তর বুক থেকে একটা স্বস্তির শ্বাস বইল। খাটে বসে জুতো খুলল।

প্রশান্ত বলল—পিসিমার চিঠিতে জানতে পারলাম বৌদিকে বোমা মেরেছে। মা বলল কেমন আছে দেখে আয়। মুনিয়া ধাওড়াতে গিয়ে সব খবর পেলাম। বিপ্লবকে পাথরে আছড়ে মেরেছে। বৌদি যমের মুখে পড়ে আছে। তবু একটা চিঠিতেও জানালে না দাদা?

উদাসীন কণ্ঠে অনন্ত বলল—কি হবে জানিয়ে?

প্রশান্ত হকচকিয়ে গেল। তবে তুমি আমাদিকে কিছুই জানাবে না?

—জেনে কি করবি? মাকে বলে দিস—আমাকে যেন খরচের খাতায় তুলে দেয়।

প্রশান্ত জ্বলে উঠল—এমন কথা বলতে পারলে দাদা? তুমি কি হয়েছো বলো তো? মায়ের দিকটা দেখবার চেষ্টা কর।

—আমাকে আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিস না প্রশান্ত।

প্রশান্ত চুপ করে গেল। খানিকপর বলল—দিদির বিয়ে ঠিক হয়েছে। ওরা অগ্রহায়ণ হবে। কিছু জমি বিক্রি না করলে টাকা যোগাড় হচ্ছে না তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছে।

—এটা তো আমারই দায়িত্ব। জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি—পরিবারের দায়-দায়িত্ব বহন আমারই কর্তব্য। কিন্তু তা পারলাম না, কত অপদার্থ আমি। ওঃ! এসব কথা যখন মনে হয় তখন ভিতরটা পুড়ে খাক্ হয়ে যায়।

বলতে বলতে অনন্ত এত বিচলিত হয়ে পড়ল যে দু-হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। প্রশান্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। ওকে ধরে বলল, দাদা!

অনন্ত বলল—প্রশান্ত! তোর বৌদিকে নিয়ে গ্রামের সমাজে আমার ঠাঁই

হবে না তাহলে পৈতৃক বিষয় আশয়ের মোহ কিসের জন্য? বোনের বিয়ে আমার অংশ বিক্রি করেই করতে বলবি। কোর্টে গিয়ে আমি সহি দিয়ে আসবো। দলিল রেডি করতে বলিস।

—কিন্তু দাদা—

—কোনো কিন্তু নেই। পরের বোনটার বিয়েও আমার অংশ বিক্রি করে হবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তোর নামে কোবালা দলিল করে দেবো। তুই পড়াশোনা করে মানুষ হ।

প্রশান্ত অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বলল—তুমি এমনি করে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে চাও তো? কিন্তু পারবে না। আমরা তোমার মুখের উপর কথা বলি না বলে মনে করেছো যা খুশী বলবে? তোমার কোনো কথাতে আমার সায় নেই।

দু'ভাই দু'দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ পর প্রশান্ত জামা কাপড় পরে তৈরি হয়ে বলল—যাবার পথে হাসপাতালে বৌদিকে দেখে যাবো।

—না। ওর মাথার ঠিক নেই। তোকে দেখলে কেঁদে ককিয়ে কি আবোল তাবোল বকবে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো।

—তোমার কথাতেই? কি মনে করেছো তোমার বাধা মেনে আমি ফিরে যাবো।

—তবে যা। সহ্য করতে পারবি না।

সহসা প্রশান্ত কেঁদে ফেলল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, তুমি কেন এমন হয়েছো দাদা? আমরা চার ভাইবোন কি আলাদা? আমরা কি তোমার পর? তোমার দুঃখ কষ্ট আমাদের কিছু নয়? তোমার স্ত্রী আমাদের বৌদি নয়? আমরা কি তাকে কম ভালোবাসি?

প্রশান্তর আবেগ ও অশ্রুজলে অনন্তেরও হৃদয় প্লাবিত হয়ে গেল। সেও কাঁদতে লাগল। তারপর চোখ মুছে বলল—আচ্ছা আচ্ছা—আর কাঁদিস নে।

প্রশান্ত ওকে প্রণাম করে চলে গেল। অনন্তও বেরিয়ে পড়ল উদ্দেশ্যহীন-ভাবে। মনের ভিতরটা তছনছ হয়ে গেছে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। এ সময়ে প্রশান্তকে যেতে না দিলেই হতো। কলিপাহাড়িতে পিসিমার কাছে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।

কিন্তু ওর কেন এমন হলো? প্রশান্তকে আঘাত দেবার কি প্রয়োজন ছিল? সে বেচারী গৌরীর জন্য সত্যিই ভাবে। ওদের মধ্যে একটা স্নেহ ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বিপ্লবকেও দারুণ ভালোবাসে। কাজেই ও তো মনে কষ্ট পেয়েছে। তার উপরে সে বোঝা বাড়িয়ে দিলো। নিজেকেই ধিক্কার দিলো অনন্ত।

একটু পর আত্মস্থ হয়ে ইউনিয়ন অফিসে ঢুকল। সেখানেই কিষণ ও

চরিতরকে ডেকে পাঠাল। আরো কিছু কর্মী ছিল। তাদেরকে নিয়ে মিটিংয়ে বসল—নতুন এজেন্টের সঙ্গে মিটিংয়ের সময় কি কি দাবি-দাওয়া নিয়ে তারা আলোচনা করবে?

কিষণ ও চরিতরকে জিজ্ঞাসা করল—ট্রাইবুন্যালে মামলার রায় বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না কি আপোস মীমাংসা করবে? ভালো করে ভেবে জবাব দাও।

ওরা ছুদিন সময় চাইল।

অনন্ত বলল—বেশ। তারপরেই মিটিংয়ের দিন ধার্য হবে।

রাত নটা পর্যন্ত আলাপ আলোচনা করে উঠে পড়ল। তখন কিষণ বলল ধাওড়াতে যে যাও না জামাই।

—আচ্ছা কাল যাবো।

অনন্তর এখন কাগজ কলমটাই বেঁচে থাকার অবলম্বন। ঘুম আসে না। কাজ কর্মের একটু বিরতি দিলেই হাজার ভাবনা কাঁকড়া বিছের মতো কামড় বসাতে থাকে। গৌরী এসে দাঁড়ায় মনের দরজায়।

কাগজ কলম নিয়ে বসলে কিছুটা রেহাই পায়। শৈলেন থার্ড ইয়ারের ছাত্র। আগামী বছর সেকেণ্ড ক্লাস পরীক্ষা দেবার জন্য পড়াশোনা করে। অনন্ত ডায়েরি লেখে।

সে লিখেই চলেছে কি পরিণতি হলো এত বড় একটা সর্বাত্মক ধর্মঘটের? আমার মতো ছুর্ভাগাদের কথা বাদই দিলাম, সাধারণ শ্রমিকদের কি হলো? ক্ষয় ক্ষতির চূড়ান্ত। নিজস্ব আর্থিক সম্বল যার যা ছিল সব শেষ। রোগ, শোক, দারিদ্র, অনাহার নিত্যসঙ্গী। যে জীবনে কোনোদিন আদালত দেখেনি তার নামে পাঁচটা ফৌজদারি মামলা। যে রক্ত দেখলে মূর্ছা যায় সে হলো দাঙ্গাবাজ, খুনের আসামী। যে পরের জিনিস লোষ্ট্রবৎ মনে করে তাকে তৈরি করা হলো ডাকাত। জেল ভরে গেল খনিশ্রমিকে। হাসপাতাল ভরে গেল আহত শ্রমিকে। বাস্তুচ্যুত ও চাকরিচ্যুত মানুষের সংখ্যা হাজার হাজার।

আর্থিক ক্ষতির এখনো পুরো হিসেব হয়নি। তবে স্ট্রাইকের একমাস কেউ বেতন পাবে না। সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ছুটি কোয়ার্টারের বোনাস গেল। প্রতি তিনমাসে ছেষট্টি দিন হাজিরা হবে না। সময়টাও ছুটি কোয়ার্টারের মধ্যবর্তী হওয়ায় ছু'কোয়ার্টারই গেল। বার্ষিক সবেতন ছুটি বরবাদ হলো কারণ এখানেও সেই বাৎসরিক হাজিরার ব্যাপার আছে।

দেশে যাবার গাড়ি ভাড়াও মার পড়ল।

যাদের চাকরি গেছে তারা তো আগাম দরিয়ায় পড়ে আছে। ট্রাইবুন্যালে এত কেস জমেছে যে তার ফয়সালা হতে ছু'চার বছর লাগবে। ওয়াগন লোডারদের কেসটাই এক বছর যাবৎ শুনানী করতে পারেনি। হচ্ছে, হবে, আগামী মাসের দশ তারিখে শুনানি, আর তা হলেই জজ সাহেব শ্রমিকদের

ডিক্রি লিখবার জন্য কলম বাগিয়ে বসে আছেন, এমনি সব স্তোকবাক্য আর কত শোনা যায়। আন্দোলন কর, সংগ্রাম কর, ধর্মঘট শ্রমিকের হাতিয়ার এই একই কথা কানে বাজছে। সে হাতিয়ার প্রয়োগ করাও হলো। তাতে অমৃতের চেয়ে গরল উঠল বেশী। শুরু হয়েছে ভাঙনের পালা। যেমন মালিকদের মধ্যে, উর্দ্ধতন অফিসার ও কর্মচারীদের তেমনি ইউনিয়নের নেতাদের মধ্যে। সর্বদলীয় ট্রেড ইউনিয়নের কো-অর্ডিনেশন কমিটি কার্যত অচল। কল্যাণ রায় কমিউনিস্ট, দেবেন সেন প্রজা সোশ্যালিস্ট, কেশব নারায়ণ কংগ্রেস—আর এক প্ল্যাটফর্মে নেই। আপন পার্টি পতাকা নিয়ে আলাদা সংগঠন তৈরি করেছেন, কমিউনিস্টরা এগিয়ে আসছে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি ভাঙছে। ওরা ক্রমশই শ্রমিকদের আস্থা হারিয়ে ফেলছে।

তিলক সিং ফেরার। বেচারী শ্রমিকদের রোষে পড়ে ছেলেমেয়েদের ছেড়েই পালিয়েছে। ওর স্ত্রী কান্নাকাটি করছিলেন তাই রাজকিশোর সিংকে দিয়ে ওদেরকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ভেঙে গেছে সন্তিপ্রসাদের সাধের গোলদারী। মিঃ শ'য়ের ইন্তেকাল হয়ে যাবার পর উনি তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়েছেন। শ্রমিক শোষণের রস নেই তো মহাজন কি জন্য বসে থাকবেন।

বাঁকেলাল ও রবিলালের পাত্তা নেই। আমার চোখের আলো কেড়ে নিয়ে নিজেরাও অন্ধকারে ডুবে গেছে হয়তো বা দামোদরের গর্ভেই। মুনিয়ারা যে আমার এত কাছের মানুষ তবু কিছুতেই কবুল করছে না। কিন্তু ওদের ভিতরে যে ক্রোধ হরদম টগবগ করে ফুটত তা এখন নেই।

আগামীকাল জগদীশ, হরেরাম ও অন্যান্য মুনিয়া ছোকরাদিগকে নিয়ে কোর্টে যাবো। কিছু টাকার সংস্থান হয়েছে এবং উকিল বাবুদের সঙ্গে কথাও হয়েছে। আসামী হাজির হলেই জামিন পাবে। তাহলে ওরা ঘরবাস করতে পারে।

কিন্তু সব ভাবনা ছাপিয়ে উঠছে বৈশাখী ভোজীদের চাকরি। বরফ অনেকটা গলেছে। দেখা যাক কি হয়? আমি ওদেরকে বলে দিয়েছি চাকরি না হলে সবাই মিলে অনশন ধর্মঘট করে মর। তাতে ওরা রাজী। এখনো যে ওদের লড়াকু হিম্মৎটা আছে এটাও দেখার মতো।

এ নিয়ে কল্যাণদার সঙ্গেও কথা হয়েছে। উনি পুরো মদৎ করবেন।

ইহ বাহ্য! আমার ভবিষ্যৎ কি? আমি কি নেতাগিরি করবো? শ্রমিকদের কাছে চাঁদা আদায় করে রোজগারের পথ দেখবো? নাকি পরীক্ষায় পাশ করে ম্যানেজার হব?

সবই ভবিষ্যতের গর্ভে। এ লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারবো না।

আজ নীতির বিয়ে। এতক্ষণ আমাদের বাড়িতে বিয়ের ভোজ চলছে। নীতি বসেছে বিয়ের পিঁড়িতে। আমার আদরের ছোট বোন। আমিই উপস্থিত হতে পারলাম না। প্রশান্ত ছেলে মানুষ। কি করে এত সব সামলাচ্ছে?

বংশের কুলাঙ্গার আমি। কত বড় দায়িত্বের দিকে পিছন ফিরিয়ে বসে আছি। আমার যাওয়া খুবই জরুরী ছিল। কিন্তু যদি কুটুমজনদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তাতে বিয়ে বাড়ির আনন্দ কোলাহল বিঘ্নিত হবে। নতুন কুটুম কিভাবে নেবে কে জানে?

এ আমি কি করলাম? মায়ের কাছে ক্ষমা চাইবারও মুখ রইলো না।

আজ কি মা তার হতভাগ্য জ্যেষ্ঠ সন্তানের অভাব বোধ করছেন? তার জন্য অশ্রুজল ফেলছেন? কি জানি? কিন্তু আমার চোখদুটি যে জলে ভরে যাচ্ছে। খাতার পাতায় কলম সরছে না। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বুকটা কর কর করছে। আঃ কি যন্ত্রণা!

মাগো তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

দু'চোখ-ভরা জল নিয়ে অনন্ত খাতা বন্ধ করল। চোখ মুছে বাথরুম থেকে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

শৈলেন বলল দাদা, আপনার চোখে জল দেখলে বড় কষ্ট হয়।

—তোকে যে বলেছি আমার কথা ভাবিস নে। শুয়ে পড়। বাতি নিভিয়ে দে।

চোখ থেকে জল পড়লে ভিতরটা বুঝি হাল্কা হয়। অনন্ত ঘুমিয়ে পড়ল। বিড়ম্বিত নায়ক এখন বড়ই ক্লান্ত।

ডি. ডি. সাহেব চলে যাচ্ছেন। অনন্ত তাদেরকে বিদায় জানাতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—স্যার। আপনি ফার্স্ট ক্লাস ম্যানেজারের মতো স্ট্যাটাস এনজয় করতেন। তা ছাড়লেন কেন?

উনি বললেন—তোমার দিদিকে জিজ্ঞাসা কর।

রিউটি বলল—তোমার কি জানতে বাকী আছে?

—তা আছে বৈকী!

—আমি এবার শোভা হব। সেই ছোট বেলাকার নাম। যে তোমার বাবার পাঠশালায় বই শ্লেট বগলে নিয়ে পড়তে যেতো। সেই নামটাই নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলবো। বাক্যে এবং কর্মে।

একথার অর্থ অনন্ত বোঝে। তবু বলল—এখানে কি তা হতো না।

—না। হতো না। এখানে আমার পরিচয়ের একটা লেবেল আঁটা হয়ে গেছে। লোকে আবিল দৃষ্টিতে তাকায়। ভাবে—নর্মসহচরী। এখানে আমি জীবনে কখনো সম্মান পাবো না। মাথায় ঘোমটা নিয়ে বধূ হতে পারবো না।

জননী হবার সাধও মিটবে না। তাই অনেক দূরে চলে যাচ্ছি যেখানে আমাদিকে কেউ চেনে না। সেখানে নতুন করে জীবন গড়বো, নতুন করে বাঁচবো। আমি বধূ হব। মা হব।

বেশ আবেগ দিয়েই কথাগুলো বলল ও, অনন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। গত একমাস যাবৎ যে গুজবটা ছড়িয়ে ছিল তাই আজ সত্যি হলো। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনন্ত আশা করেছিল ওঁরা থাকবেন। কারণ মিঃ ভার্মাও একবার ডি. ডি. সাহেবকে ডেকে অনুরোধ করেছেন। বিউটি তাঁর কাছেও পৌঁছে ছিল এবং বলেছিল আপনাদের টাকা ও বাংলোর চেয়ে আমার সম্মানের দাম বেশী। সাহেবদের মনোরঞ্জন করার জন্য আমার জীবন নয়। কিন্তু ওরা সেইভাবেই আমাকে এক্সপ্লয়েট করেছে। প্লিজ। ডি. ডি.-কে ছেড়ে দিন।

ওদের গাড়ি চলে যাওয়া পর্যন্ত অনন্ত রইলো। তারপর ক্ষুণ্ণ মনে মেসে ফিরল। তখন সেখানে দুটি মানিকজোড় তার জন্য অপেক্ষা করে বারান্দায় বসে আছে। জগদীশ ও বৈশাখী ; হরেরাম ও কুন্তী। ফুস ফুস করে বিড়ি টানছে। ওকে দেখে বৈশাখী ও কুন্তী তাড়াতাড়ি পা দিয়ে বিড়ি নিভিয়ে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

ব্যাপার কি ? আবার কিছু দুঃসংবাদ নাকি ? কালই তো ওদেরকে জামিন করিয়ে নিয়ে এসেছে। তার পরে কিছু ঘটল নাকি ? এদের যে কখন কি হয়, কি যে করে বসে তার হিসেব পাওয়া দায়।

বলল—কি খবর ?

বৈশাখী ও কুন্তী উঠে দাঁড়াল। পরনে ছেঁড়া ফাটা শাড়ি। মলিন মুখ। বৈশাখী বলল—তুমি খুব নিষ্ঠুর জামাই।

—বলবেই তো! মরদগুলিকে জামিনে ছাড়িয়ে এনে পাশে শুইয়ে দিলাম কিনা তাই সারারাত আমোদ ফুর্তি করে আমাকে নিষ্ঠুর বলছো।

জগদীশ খিক্ খিক্ করে হাসল। হরেরাম ও কুন্তী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল। বৈশাখী প্রথমে থতমত খেয়ে তার পরেই প্রবল বিক্রমে ওর বাহু ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। অনন্তর ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।

বৈশাখী আবার বলল—তুমি নিষ্ঠুর।

অনন্ত হেসে ফেলল। বলল—ব্যাপারটা বলবে তো ?

গৌরী যদি মরে তো তোমার জন্যই মরবে।

—বাঃ। আমি ওকে বোমা মেরেছি ? নাকি ওর বিয়ালা পুরুষে মেরেছে ?

—সেকথা নয়। তুমি আজ কতদিন যাওনি ? বেচারী কেঁদে হাপসে গেছে।

আমরা কাল গিয়েছিলাম। কি কান্না। আসবার সময় হাত ধরে বলল, ওকে একবার পাঠিয়ে দিও।

অনন্ত গুম্ হয়ে থেকে বলল, সে না হয় যাবো। তবে কি এই যে জুড়ি বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছো এমন সুখের দিন নাও থাকতে পারে।

—সে কি জামাই ?

—হ্যাঁ। আমি ছু'একদিনের মধ্যেই অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দিচ্ছি। তোমরা তৈরি হও গে। বাল বাচ্চা বুড়ো বুড়ি নিয়ে খোলা আসমানের নীচে অনশন শুরু হবে। ঘরে বসে মরে হারিয়ে কেঁদে কেটে চোখের জল ফেলে কিছু হবে না। সবাই একসঙ্গে আত্মাহুতি দাও। কয়লা কুঠির ইতিহাসে এক নতুন নজীর তৈরি কর। পারবে ?

—পারবো জামাই।

কণ্ঠস্বর নীচু কিন্তু দৃঢ়। জগদীশ ও হরেরামের মুখ ছুটি কঠোর। কুন্তীরও চোখ জ্বলছে। ওরা সংগ্রামকে ভয় পায় না।

অনন্ত পকেট থেকে কুড়িটি টাকা বের করে জগদীশকে দিয়ে বলল—ভোজীদের জন্য ছুটি শাড়ি আর চম্পাকে একটা ফ্রক কিনে দিও। দেখো মদ খেয়ো না।

—ছিঃ। কি যে বলো। চল গে বহু !

ওরা চলে গেল।

কঠিন প্রতিজ্ঞায় অনন্তর মুখটাও কঠিনতর হয়ে গেল। ঘরে ঢুকেই অনশন ধর্মঘটের নোটিশ ড্রাফট করতে লেগে গেল। আর পথ নেই।

কিছু টাকার দরকার। পরদিন সকালেই গুলুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল বাপু! গৈরীর গয়নাগুলো আছে ?

সে বলল—রূপোর গয়না সবই বিক্রি হয়েছে। সোনাগুলো আছে। তুমি নিয়ে যাও।

—বিউটি ওকে আদর করে পরিয়ে দিয়েছিল। আজ বড় ছুঃসময়ে তা কাজে লাগল।

আংটিটা রেখে বাকী সব বিক্রি করল। কিছু টাকা গুলুকে দিলো চাল গম কিনতে। বাদবাকী রইলো অনশন ধর্মঘটের প্রস্তুতির জন্য।

সত্তর

ছু'দিনের মধ্যে সবকিছু তৈরি করে ফেলল। তারপর হাজার খানেক কুলি-কামিনের একটা মিছিল নিয়ে এজেন্ট সাহেবের অফিসে এসে নোটিশ দিলো। তার কপি রেজিষ্ট্রি পোস্টে পাঠিয়ে দিলো রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকে, লেবার কমিশনার অফিসে, দেবেন, কল্যাণ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও কোম্পানীর সি. এম. ই. থেকে বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্সের কাছে। আসানসোল পোস্ট অফিস থেকেই এসব কাজকর্ম চুকিয়ে হাসপাতালে গেল।

মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর। ভিতরে ঝড় বইছে। কি বিরাট ঝুঁকি সে নিয়েছে তা সে ভালোই জানে। গৈরী ওর মুখ দেখেই ভয় পেয়ে গেল। বলল—কি হয়েছে গো?

অনন্ত বলল—তোর কি বাঁচার সাধ আছে?

গৈরী থমকে গেল। অনন্ত কয়েকদিন না আসার জন্য যে অভিমান ও অভিযোগ পুষে রেখেছিল তা চুপসে গেল।

বলল—আমার সাধ আহ্লাদ, বাঁচা মরা সবই তোমাকে নিয়ে। নিজের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

—বেশ। তবে মরার জন্য তৈরি হ।

—তাই হবে। কিন্তু কেন?

—কোম্পানীর সঙ্গে অনেক মিটিং হলো। শুধু ধানাই পানাই টাল বাহানা করে সময় নষ্ট করছে। ওয়াগন লোডারদিকে ওরা চাকরি দেবে না। তাই আমি আজ অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দিয়ে এলাম। তোকেও তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে শুইয়ে দেব। মরতে হয়ত একটা মহৎ কারণের জন্যই মর।

স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গৈরীর চোখ দুটিও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল—সেই ভালো। তিল তিল করে দগ্ধে মরার চেয়ে ঐভাবে মরাই ভালো।

—তা বলে যে আসবে তার কাছেই কান্নার হাট বসিয়ে দিস না। সবাইকে এক কথা—ও আসছে না—ও আসছে না। আমি কি ওখানে বসে আছি? নাকি কল্যাণীর সঙ্গে প্রেম করছি?

—আর খোঁটা দিও না তো। তুমি এত জান—এত বোঝ—আমি যে কখন কি বলেছি তাই ধরে বসে আছ।

—আচ্ছা। ধৈর্য ধরে থাক। আমার এখন অনেক কাজ। প্রশান্ত তো প্রায়ই আসে। সুবীর কমলেন্দুও আসে। কোনো খবর থাকলে ওদেরকে বলে পাঠাস।

—মন যে মানে না গো। তোমাকে দেখলেই বুকে বল পাই। না হলেই জগৎ অন্ধকার। কান্না কি এমনি আসে?

অনন্ত ওকে আরো কিছু সান্ত্বনা দিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে চলে এল। ফিরেই ওকে মুনিয়া ধাওড়া যেতে হবে।

পরদিন সকাল দশটা। মেস ফাঁকা। সবাই ডিউটিতে গেছে। ঠাকুর রান্না করছে। ঝি তরকারি কুটছে। ঘরে একা অনন্ত। কাঠের বাকসো দিয়ে তৈরি টেবিলে কাগজপত্র মেলে নিমগ্ন হয়ে আছে মিটিংয়ের প্রস্তুতির জন্য।

হঠাৎ একটি ঝকঝকে তরুণী এসে ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। অনন্ত

বিহ্বল হয়ে তাকাল ওর দিকে। সারা গায়ে নতুন গয়না ঝলমল করছে। সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর। পরনে সিল্কের শাড়ি। মিট মিট করে হাসছে।

বিস্মিত কণ্ঠে অনন্ত বলল—নীতু—তুই ?

—হ্যাঁ দাদা।

—বোস বোস। আর কে এসেছে ?

—এই যে।

ও বলতে না বলতেই নীতির স্বামী সুনীল ওকে প্রণাম করল।

অনন্ত ওকে জড়িয়ে ধরে বলল—আরে! আমাকে প্রণাম করছ কেন ?

—বাঃ। আপনি দাদা।

—হলেই বা। আমি তো ব্রাহ্মণত্ব হারিয়ে ফেলেছি।

—দ্বিজত্ব পেয়েছেন দাদা। কয়লা কুঠির বৈপ্লবিক চরিত্র।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই অনন্ত চেঁচিয়ে উঠল—মা। তুমিও! ব্যস্ত হয়ে প্রণাম করল। উনি ওর মাথায় হাত রাখলেন।

অনন্ত ওর কাগজপত্র গুটিয়ে টেবিলটা সরিয়ে দিলো। দুটি খাটে ওরা মুখোমুখি বসল। ঠাকুরকে পাঠাল মিষ্টি আনতে।

অনন্ত বলল, তোমরা এসেছো দেখে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে। তুমি ভালো আছ তো মা ?

—সে খবরে তোর কি দরকার ?

—মা!

—নীতুর বিয়েতে যে গেলি না ?

অনন্তর মুখেও দুষ্টু কথা বেরিয়ে এল—তুমিই তো বারণ করেছিলে মা।

—ওঃ। সেই কথার এতদিনে শোধ নিলি।

অনন্ত চুপ করে রইল। নীতি বলল—এই সব কথা বলতে এসেছো মা ?

তবে যে কেঁদে ভাসাচ্ছিলে।

—আমি এখনো কাঁদছি। আমার কান্নার কি শেষ আছে ? না মায়ের কান্নার দাম আছে ? জমি বিক্রির দলিলে সহি করেই বড় ভাইয়ের কর্তব্য শেষ —এই ছেলে!

অনন্ত সে কথারও জবাব দিলো না। আত্মমগ্নভাবে আবার সেই কাগজগুলিই নাড়াচাড়া করতে লাগল।

সুনীল একজন সার্ভেয়ার। গত বছর পাশ করে রাণীগঞ্জ ফিল্ডে একটা কলিয়ারীতে কাজ করে। কোয়ার্টারে থাকে। অনন্তর নাম সারা কোলফিল্ডে। কিন্তু কখনো চোখে দেখেনি। সেজন্য অদম্য কৌতূহল ছিল ওকে দেখার। নীতিকে সেকথা বলতেই ও বিগলিত হয়ে উঠল। দাদার চেয়ে বউদিকে দেখার

কৌতূহল আরো বেশী। মায়ের অসুখের সময় যদি ওর একটা স্বামী থাকত তবে অনন্ত ঠেকাতে পারত না। আজ ওর কত আফশোস। সেই দুরন্ত চরিত্রের বউদি মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে। ছেলেটিও মারা গেছে।

সুনীল অষ্টমঙ্গলা করতে এসে প্রোগ্রাম করেছিল দুজনে বেরুবে, দাদা বৌদির সঙ্গে দেখা করবে, কোয়ার্টারে মধুচন্দ্রিমা যাপন করবে তারপর নীতিকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে।

নীতি খুব খুশী। স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাবে সুখ যেন ধরে না। কিন্তু সে তার মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে দেখতো তাই বলেছিল, দাদা বউদির সঙ্গে দেখা করতে যাব তুমি যাবে নাকি মা ?

যে মাকে সাধ্য সাধনা করে টলানো যায় না তিনি এক কথায় রাজী হলেন। অথচ এখানে এসে কথার পিঠে কথা বাড়ছে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর জাহ্নবীদেবী বললেন, তুই এতো দুষ্টু কি করে হলি অনন্ত ? নিজের বোনের বিয়ে। একবার ছাদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলি নে।

অনন্ত মরমে মরে যাচ্ছিল। বলল—সেজন্য আমার যে কি অনুশোচনা ভোগ হয়েছে তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু না যাওয়ার পিছনেও কারণ ছিল মা।

উনি গলায় জোর দিয়ে বললেন—কি কারণ তাই বলতে হবে।

অনন্ত একটু থেমে বলল—আমার লজ্জা সংকোচ নিয়ে কুটুমজনের সামনে দাঁড়াতে ভয় হয়েছিল। পাছে কেউ হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। পাছে কেউ জাত তুলে খাবো না বলে।

—কাপুরুষ! যে কাজ করে লজ্জায় মাথা তুলতে পারিস না তা করেছিস কেন ?

কাপুরুষ শব্দটা অনন্তর বুকে বুলেটের মতো লাগল। ঘাড় নীচু করে অনেকটা দুর্বিনীত ভঙ্গীতে বসে রইল।

মেসের ঠাকুর মিষ্টি, সিঙাড়া ও কেটলিতে চা নিয়ে এল। নীতি উঠে সেসব ডিশে সাজিয়ে দিলো। ওর মাকে দুটো মিষ্টি দিয়ে বলল—নাও মা।

উনি ইতঃস্তত করছিলেন। নীতি বলল—তুমি গতবারে কিছু খাওনি মা। এবার না খেলে দাদাকে অপমান করা হবে।

অনন্ত বলল—কি বলছিস নীতু ? ওতে কি অপমান যায় ?

জাহ্নবীদেবী না করলেন না। খাওয়া দাওয়ার পর নীতি এঁটো গুটিয়ে বাইরে রেখে এল।

ওর মা জিজ্ঞাসা করলেন—গৌরী কেমন আছে ?

—ভালো নয়। মরলেই খালাস পায়।

নীতি চমকে উঠল। সুনীলও।

ওর মা বললেন—ছেলেটাকেও মেরে দিয়ে গেল। লোকের সঙ্গে এতো দুশমনি করে রেখেছিলি। সেই যদি অপারেশনের সময় ওদের মা-বেটাকে নিয়ে আসতিস তবে তোর কি মান যেত? নাতির মুখটা পর্যন্ত দেখতে দিলি না—এত দুষ্টু তুই।

যে অনন্তর জিভের ডগায় বারুদের মতো কথার ফোয়ারা সে তার মায়ের তিরস্কার নীরবে নত মস্তকে হজম করে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপ চাপ থাকার পর আবার উনি বললেন, তোর চাকরি চলে গিয়েছিল। আবার পেয়েছিস।

—না।

—চাকরি নেই। রোজগার নেই। তবে এখানে পড়ে আছিস কেন?

—কোথায় যাবো মা?

—কেন? বাড়ি যাবি।

অনেকক্ষণ পর দূরাগত সমুদ্র কল্লোলের মতো বুকভাঙা কণ্ঠস্বরে অনন্ত বলল—যাবো মা। ছেলেটা তো গেছে। বউটাও মরুক তবেই ওর শ্রাদ্ধ শান্তি চুকিয়ে, গঙ্গাস্নান করে তোমার কাছে যাবো।

উঠে বাইরে চলে এল। তীব্র সঞ্চারী আবেগের তাড়নায় আত্ম-সংবরন করতে না পেরে বারান্দার সিঁড়িতে বসে হু হু শব্দে কেঁদে ফেলল।

সুনীল ওর কাছে এসে বলল—দাদা! আমি একটা বৈপ্লবিক চরিত্র দেখতে এসেছিলাম। তার চোখে অশ্রু জল দেখতে নয়।

—পারছি নারে ভাই। দুঃখের পর দুঃখ, আঘাতের পর আঘাত আমাকে ভেঙে চুরে তছনছ করে দিচ্ছে।

—উঠুন। বারান্দায় বসে কাঁদলে লোকে হাসবে।

ওকে টেনে ঘরে নিয়ে এল।

নীতি বলল—মা। যখনই আসো তখনই দাদাকে কাঁদিয়ে দাও। কি যে তোমার মতিগতি তাও বুঝি না। বৌদিকে তুমি গ্রহণ করতে পারবে না তা আমরা জানি। সেকথা তোমাকে বলতেও যাবো না। সেও কোনো সাধারণ মেয়ে নয় যে কেঁদে ককিয়ে করুণা ভিক্ষা করবে। তারও নিজের জগতে প্রচুর মান সম্মান আছে। সে একটা সংগ্রামী মেয়ে। জাত-পাত যদি না দেখতে যাও তাহলে কিন্তু সে দাদার যোগ্যা স্ত্রী।

নীতির এ বক্তৃতাটা কার মনে কেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল কে জানে সবাই চুপ করে রইল।

আর কিছুক্ষণ পর খাওয়ার ডাক পড়ল। তখন অন্যান্য ট্রেনিরাও এসে

পড়েছে। অনন্ত বলল—মা। তোমার জন্য ফল মিষ্টি দুধের ব্যবস্থা করেছি এই ঘরেই দিতে বলছি।

—তাই বল।

ওঁকে ভিতরে দিয়ে আর সকলের সঙ্গে অনন্ত, সুনীল ও নীতি পাশাপাশি বসে খেল। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকতে প্রায় দেড়টা বাজল। ওরা যাবার জন্য তৈরি।

জাহ্নবীদেবী বললেন—আমরা গৈরীকে দেখে যাব।

—ওকে আর কি দেখবে মা?

—বাঃ রে! ও আমার অসুখের সময় এত সেবা করল আর আমি তাকে দেখতে যাব না?

অনন্ত ফট করে জবাব দিলো—একটা সেবাদাসীকে অনুকম্পা দেখাতে যাবে তো মা।

জাহ্নবীদেবী ওর মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—মাকে এত নীচ মনে করিস? তোর মনটা এত ছোট হয়ে গেছে।

নীতি বলল—আবার শুরু করলে। মা-বেটাতে অডি-ষষ্টি। একটা কিছু লাগলেই হলো।

—তোর দাদাকে বল।

অনন্ত বলল—ঘাট হয়েছে মা।

—তুই আমাদের সঙ্গে যাবি তো?

—না—মা। আমার মিটিং আছে।

নীতি বলল—তাহলে আমরা কি করে চিনব?

—সাতষট্টি নম্বর বেড। মা চেনে ওকে।

—বেশ।

তখন ভিজিটিং আওয়ার্স। রোগিণীদের আত্মীয় স্বজনেরা আসা যাওয়া করছে। গৈরী একদিকে কাৎ হয়ে আচ্ছন্নের মতো শুয়ে আছে। এমনি করেই থাকতে হয়। চিৎ হতে পারে না। তাহলে দগদগে ঘায়ে চাপ পড়বে।

কারো আসবার কথা ছিল না তাই তার প্রতীক্ষাও ছিল না। সীমাহীন দুঃখ যন্ত্রণা বুকে চেপে রেখেছে। শরীরের কয়েকটা জায়গায় মাংস পচে গেছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন—আবার অপারেশন করতে হবে। অর্থাৎ পচা মাংস ছুরি দিয়ে চেঁচে তুলে দেবেন। ভাবতেও গা শির শির করে। এমনিতেই অজস্র জালা যন্ত্রণা তারপরে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

কি জন্য যে বেঁচে আছে তাই ভাবে। এখন তো দুনিয়ার একটা আবর্জনা। অনন্তর জীবনের বোঝা। অমন একটা সরল, সুন্দর, সৎ মানুষ ভেঙে চুরে

একাকার হয়ে গেল। সে যদি মরে যেত অনন্ত কষ্ট পেত ঠিকই কিন্তু কালের পলি পড়ে সে ক্ষত একদিন সেরে যেত। আবার সে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারত। সেই ওকে দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে টেনে নামিয়েছে।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে ওর মৃত্যু ভাবনার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি খাড়া করেছিল। সেই কারণেই সে ক্রমাগত ক্ষয়ে যাচ্ছিল। তারপর যেদিন অনন্ত ওকে মরার জন্য প্রস্তুত হতে বলে গেল সেদিন থেকে ও মৃত্যুরই স্বপ্ন দেখছে।

হঠাৎ একটা স্নেহ কোমল হাতের স্পর্শ পড়ল ওর কপালে। খুব স্বস্তি বোধ করল। আত্মগত ভাবেই বলল—আঃ।

—বউ মা!

এমন মিষ্টি, এমন আন্তরিক ডাক সে জীবনে কখনো শোনেনি। বউমা বলে কোনো শব্দ বাংলা অভিধানে আছে তাই বুঝি ও জানে না। শব্দটি তার কানে ঢুকল। সুষুম্না কাণ্ড বেয়ে নিচে নামল। ইড়া পিঙ্গলাকে স্পর্শ করল। মূলাধার আলোড়িত হলো। যেন ধীরে ধীরে জাগ্রত হলো কুলকুণ্ডলিনী।

এক অদ্ভুত অনুভূতিতে সারা মন ছেয়ে গেল। চোখ খুলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। শব্দ ও স্পর্শের স্বাদ বহুক্ষণ যাবৎ হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুভব করল। তারপর চোখ মেলল। সামনেই একজোড়া ঝকঝকে, তকতকে যুবক যুবতী। কি সুন্দর দেখতে!

জাহ্নবীদেবী মাথা শিতানে ছিলেন। তাই প্রথমটা দেখতে পায়নি। উনি যখন দ্বিতীয়বার ডাকলেন—বউমা! তখন ওর আচ্ছন্ন চেতনায় নিবিড় অনুভূতির জগৎ অপসৃত হলো।

অস্ফুট কণ্ঠে বলল—মা! আপনি?

—হ্যাঁ মা! কেমন আছ?

—কি করে যে বেঁচে আছি তাই জানি না মা। বিপ্লবের শোকে মারা যাচ্ছি।

করুণ বেদনার্ত কণ্ঠস্বর। কারো মুখে উত্তর জোগাল না। ক্ষণকালের নীরব অশ্রু বিসর্জন।

নীতি বলল—আমাদিকে চিনতে পারলে না বৌদি? আমি তোমার ননদ নীতি। এই তোমার নন্দাই।

গৈরী একটা শীর্ণ হাত ওর দিকে বাড়িয়ে বলল—আপনার দাদার কাছে শুনেছি আপনার বিয়ের কথা। আপনারা ভালো আছেন?

ওর হাতটা ধরে নীতি বলল—তুমি অমন আপনি—আপনি করছ কেন বৌদি? ওতে যে পর পর মনে হয়। তুমি বল।

—তাই বুঝি। গৈরী হাসল। মলিন মুখে অমলিন হাসি।

বলল—মা। আপনি সেরে উঠেছেন তো?

—হ্যাঁ মা। তুমি তখন জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলে বলে বেঁচেছি।

—মা। পরমায়ু আপনার। আমরা কি করতে পারি?

—তোমার সেবা এবং দায়িত্ব পালনের কথা ভুলব না মা।

গৈরী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—ঐটুকু সুকৃতির জন্য আজ আমাকে আশীর্বাদ করুন মা—যেন তাড়াতাড়ি মরে খালাস পাই।

—বউমা!

—আপনার ছেলে মুক্তি পাবে। আমাকে নিয়ে ওর যে কত যন্ত্রণা তা আমিই জানি। আর কেউ না। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। অত বড় একটা হৃদয়বান মানুষকে আমিই টেনে নামিয়ে দিয়েছি। আজ সে আমার জন্য সমাজ সংসারে মুখ দেখাতে পারে না। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এই দুঃখ আমাকে ভোগ করতে হবে। আমাকে আশীর্বাদ করুন মা।

জাহ্নবীদেবীর নাড়ীতে নাড়ীতে পাক দেবার বেদনা। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত কোনো জীবন্ত সরীসৃপের দ্রুত সঞ্চারনের সুতীব্র আলোড়ন।

এই তার পুত্রবধূ। যাকে ছোটলোকের মেয়ে বলে ঘেন্না করেছেন। তার এক একটি কাজ ও কথা অলৌকিক মাত্রা নিয়ে হাজির হচ্ছে।

বললেন—না বউমা। সে আশীর্বাদ আমি তোমাকে করব না। গৈরীর মুখটা মলিন হয়ে গেল। আবার সে চোখ বুজল। একরাশ জলবিন্দু গাল বেয়ে পড়ল। আঁচল দিয়ে যত্ন করে ওর মুখ মুছে দিয়ে বললেন—তুমি ভালো হয়ে ওঠো মা। অনন্তর জীবনকে আলোকিত কর। আমি হিয়া খোলসা করে আশীর্বাদ করছি—তুমি ভালো হবে—আবার তোমার কোলে সন্তান আসবে।

—আবার আমার কোলে সন্তান আসবে?

—হ্যাঁ মা! নিশ্চয় আসবে?

—আমার যে বাঁচতে ইচ্ছে করছে মা।

—বাঁচো মা। তুমি বাঁচো—অনন্তকে বাঁচাও—নতুন করে সমাজ গড়। তোমরা আমার স্বামীর আদর্শ পেয়েছো। তোমাদের তো জিৎ হবেই।

তীব্র আবেগে গৈরীর সারা গা কাঁপছিল। দেখতে দেখতে কান্নার বাঁধ ভেঙে গেল। সেই ধাক্কাটা সামলে নেবার পর গৈরী একটু স্বাভাবিক হলো।

নীতিকে বলল—মা আমাকে বাঁচবার আশীর্বাদ দিলেন আর ওদিকে তোমার দাদা আমাকে মরবার জন্য প্রস্তুত হতে বলে গেছে।

নীতি অবাক হয়ে বলল—সে কি? না—না। দাদা তোমাকে মরতে বলবে না। এটা তুমি ভুল বুঝেছো বৌদি।

গৈরী হাসল। বলল—না—না। তুমি যা ভাবছো তা নয়। তোমার দাদা

১৫ই ডিসেম্বর থেকে অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছে। তাই বলেছে—এখানে মরবি কেন ? মরতে হয় তো অনশন ধর্মঘট করে আত্মবলি দে।

—তুমি রাজী হয়েছ ?

—হ্যাঁ।

গৌরীর কণ্ঠস্বরে গভীর আত্মপ্রত্যয়। ওরা মুখ চাওয়াচায়ি করল। নীতি বলল—শুনেছো মা ? বৌদি এই শরীরে অনশন ধর্মঘট করবে। দাদাকে তুমি বারণ কর গে মা।

—ও কি বারণ শুনবার ছেলে ? আমার হাড় মাংস জ্বালিয়ে দিলো।

একাত্তর

তখন অনন্তর সামনে দুজন জবরদস্ত অফিসার। খুব কায়দা মাফিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মগজ ধোলাই চলছে।

—তুমি বুঝে ছাখ অনন্ত, তোমার স্ত্রী অসুস্থ। তার জন্য ভালো চিকিৎসার প্রয়োজন। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর দীর্ঘদিন শুশ্রূষার প্রয়োজন। রান্নাবান্না, ঘর গৃহস্থালীর কাজ করতে অনেক সময় লাগবে। এ সময় তোমার একটা আশ্রয়, নিশ্চিত উপার্জন এবং শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামের প্রয়োজন। আমরা তোমার দিকটা খুব ভালো করে ভেবেই প্রস্তাবটা দিয়েছি।

মিঃ ভার্মার বলা শেষ হলে মিঃ শুকুল শুরু করলেন—তুমি ডি. ডি. সাহেব নও। তা কোনোদিন হতেও পারবে না। আনকোয়ালিফায়েড অ্যাসিস্ট্যান্ট হবার জন্য তোমার জীবন নয়। তুমি ফার্স্ট ক্লাস পাস করে আমাদের পোস্টে আসবে। কাজেই ডি. ডি. সাহেবের পোস্ট সাময়িক।

অনন্ত বলল, স্যার। আমার জন্য যে এতটা ভেবেছেন এ জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করছি। কিন্তু মূলে তো ম্যানেজমেণ্টের একটাই উদ্দেশ্য তা হচ্ছে আমাকে শ্রমিক সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

মিঃ ভার্মা কলমটা নিজের নাকে ঠেকিয়ে বললেন—তুমি সত্যই বুদ্ধিমান অনন্ত। কিন্তু আমরা যা ভাবছি তার পুরোটাই প্রিটেনশ্যান নয়। তোমার দিকটা তুমি এখন বুঝতে পারছো না—পরে পারবে।

—আমি এখুনি বুঝতে পারছি স্যার। যে অসুবিধার মধ্যে আছি তাতে ডি. ডি. সাহেবের পোস্ট এবং বাংলো আমার কাছে স্বর্গসুখের সমান। কিন্তু যাদের জন্য আমি এসেছি তাদের অসুখ বড়ই মারাত্মক। ওদের জন্য কি করবেন তাই বলুন স্যার।

মিঃ ভার্মা একটা ফাইল দেখতে দেখতে বললেন, তোমার চটজলদি অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া ঠিক হয়নি। আমরা তো এজন্য স্কিম তৈরি করছি।

তাতে তোমারও সহযোগিতা চাই, বোর্ড অফ ডাইরেকটার্সেরও অনুমতি চাই। তাই সময় দিতেই হবে।

১৫ই ডিসেম্বরের আগে কোনো কারণেই সম্ভব নয়।

—জানুয়ারি মাস পর্যন্ত লেগে যাবে।

—স্কিমটা কি?

—ট্রান্সফার নিতে হবে চার পাঁচটা কলিয়ারীতে। ভাগ করে কাজ দেবো। কিছু লোককে রিটায়ার করাতে হবে। যারা মারা গেছে তাদের বদলি কাজ দিতে পারি আণ্ডার গ্রাউণ্ডে।

—আমাকে এই স্কিমটার কথা পুনরায় ভাবতে হবে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। দয়া করে স্কিমের একটা কপি দিন এবং আমাকে লিখিতভাবে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময় সীমা ধার্য করার চিঠি দিন। তাহলে আমিও তারিখ বদল করবো।

—ও. কে.। কিন্তু তারপরে আমরা তোমাকে অফিসার হিসেবে দেখতে চাই। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসেবে নয়।

—কেন স্যার? এই ইস্যুটার উপর এত জোর দিচ্ছেন কেন?

—আমরা শ্রমিক ইউনিয়ন খতম করে দিতে চাই না। ওটা থাকবে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অলঙ্কৃত আসন হিসেবে। মাঝে মাঝে মিছিল ও তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লোগান হবে। নরম গরম আলোচনা হবে। শ্রমিকদের দাবি সরব, সদম্ভ, উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি হয়ে উঠবে। এভরিথিং লাইক স্পোরটস। সেখানে তোমার মতো নেতা যে নাকি তার মরণাপন্ন স্ত্রীকে হাসপাতাল থেকে তুলে এনে অনশন ধর্মঘটে শামিল করে দিতে চায়! তাকে সহ্য করব কি করে।

অনন্ত অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, বুঝেছি স্যার। আমি নিজেই নিজেকে সহ্য করতে পারি না আপনারা কি করে করবেন? আমাকে তিন দিন সময় দিন। তার মধ্যে আপনাদের স্কিম আমাদের পক্ষে কতটা গ্রহণযোগ্য তা এবং আমার নিজেরও সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবো।

—ও. কে.।

পরদিন সকালে সুমিতবাবু এলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন—কি হলো অনন্ত?

—ওরা আমাকে ডি. ডি. সাহেবের পোস্ট অফার দিয়েছিল দাদা। আমি তা রিজেক্ট করেছি।

সুমিতবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এত বড় লোভনীয় প্রস্তাব কেউ ছাড়তে পারে? বললেন, তোর মতোই কাজ করেছিস। কিন্তু আমরা যে মরে গেলাম অনন্ত। শ্রমিকরা নেতাদের কাছে অভাব অভিযোগের কথা বলে। নেতারা কার কাছে বলবে? কি কষ্টে যে আমার দিন কাটছে তা তোকে কি বলবো?

বস্তুত পুনর্বহালের জন্য সুমিত চ্যাটার্জী ও স্বপ্না চ্যাটার্জীর নাম ফাইন্যাল অর্ডারের মুখে এসে গিয়েছিল। অনন্তর শ্বশুর শাশুড়ি সহ তেমন কর্মীর সংখ্যা ছিল ছাপান্ন জন। অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দেবার পর সেসব অর্ডারগুলিও বন্ধ করে রেখেছে। নোটিশটা যদি আর দু'দিন পরে দিত তাহলেই ওরা ডিউটি জয়েন করে যেত। অনন্ত তা জানে। তবু দু'দিন সবুর করেনি। কারণ ওরা চাকরি পেলেই তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন আন্দোলনের ধার কমে যাবে।

অনন্ত বলল, দাদা আর দু'দিন অপেক্ষা করুন। সব কিছু নির্ভর করছে আমার একটা সিদ্ধান্তের উপরে। আমিও সে সিদ্ধান্তের জন্য তৈরি হয়েছি।

—বাঁচালি ভাই। তুই আমার গর্ব অহঙ্কার। যাই, তোর বৌদি এই খবরটার জন্য ছটফট করছে।

—পরশু বিকেলে এই মিটিংটাতে আসুন দাদা। আপনিই এই ইউনিয়নের হোতা। আপনাকে বাদ দিয়ে কিছু হতে পারে না। একটা কাজ আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে করেছি বলে অপরাধ নেবেন না।

—নারে না। তুই আমার ভাই।

শীতের অপরাহ্নে চরিতরের চবুতরায় বসে সেই বুকভাঙা সিদ্ধান্তটিই তাদেরকে নিতে হলো। সব ওয়াগন লোডার জমা হয়েছিল। তাদের কাছে কোম্পানীর তৈরি স্কিমটি পড়ে শোনাল অনন্ত। কোথাও টুঁ শব্দ নেই। সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনছে। রামকানালীতে কোম্পানীর নতুন কোয়ারী খাদান হচ্ছে। সেখানে পাথর কাটার জন্য দু'শোজন কুলিকামীন যাবে। আলু ডি কলিয়ারীতে নতুন সাইডিং লাইন হচ্ছে সেখানে আপাতত অন্যান্য কাজের জন্যে ও পরে ওয়াগন বোঝাই করার জন্য বাহাত্তর জন, বনবহাল কলিয়ারীতে তিপান্ন জন এবং এই কলিয়ারীতে দিন হাজারীর কাজে আটচল্লিশ জন ও খাদে লোডারের কাজে যাবে বাইশ জন। সাকুল্যে তিনশো পঁচানব্বই জন। আটজন মারা গেছে। তাদের ছেলেদিকে লোডারের কাজে এই কলিয়ারীতেই রাখা হবে।

তোমরা সব রাজী তো?

কে জবাব দেবে? কেউ দু'পুরুষ, কেউ তিন পুরুষ, যাবৎ এই কলিয়ারীতে কাজ করছে ও ধাওড়াতে আছে। তাদের শিকড় গজিয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের বিয়ে থা হয়ে ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে। কারো বা প্রেম প্রীতির সম্পর্ক আছে। দোকানদারি, রিকশা টানা, জনমজুরি কাজকর্মে আত্মীয় স্বজনরা করে খাচ্ছে।

সে সব ছিঁড়ে খুঁড়ে ডেরা ডাণ্ডা নিয়ে অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়া কি সহজ কথা? সব চুপ করে আছে।

অনন্ত বলল—চুপ করে থাকলে তো চলবে না। আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে কলিয়ারীতে মেসিনে ওয়াগন বোঝাই হচ্ছে

সেখানে আমি চারশোজন শ্রমিকের বোঝা—কোম্পানীকে রাজী করাবো কি করে? এই যে হয়েছে তার জন্যও আমাকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। তোমরা বল। চুপ করে থেকো না।

তখন নেপথ্যে কয়েকটা চুড়ির শব্দ হলো। কিষণ ও চরিতর উঠে গেল। একটু পর ফিরে এসে বলল—রাজী না হয়ে উপায় কি বল? অনেক দগদন হয়েছে। কষ্ট পেয়েছি। রোজগার থাকলে বনেও বাস করা যায়। আমরা রাজী আছি।

ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে ওরা। দরিদ্র শ্রমজীবী গোষ্ঠীর পক্ষে বৎসরাধিক কাল ভুখ পিয়াসে লড়াই করা সহজসাধ্য ছিল না। এরই মধ্যে কত দুর্ঘটনা, জন্ম মৃত্যু ঘটে গেছে। আরো কি পারে?

সেদিন মিটিংয়ে অনন্তর সঙ্গে সুমিতবাবু, রাজকিশোর সিং, কিষণ, চরিতর ও কেন্দ্রীয় কমিটির দুজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ভার্মা, মিঃ শুকুল, মিঃ দীক্ষিত ও ডেপুটি সি. এম. ই. হাজির ছিলেন কোম্পানীর তরফে। তিন ঘণ্টা আলোচনার পর এক-আধটু ওলট পালট করে ঐ স্কিমটা কার্যকরী করার জন্য বোর্ড অফ ডাইরেকটার্সের কাছে পাঠানো স্থির হলো। সি. এম. ই. সাহেব তখন কলকাতায় গিয়েছিলেন। তাই ওঁর সহিটা পরে হবে বললেন।

জনপ্রতি পাঁচশো টাকা অনুদান মঞ্জুর করারও সুপারিশ হলো। তবে সব কিছুই বোর্ড অফ ডাইরেকটার্সের অনুমোদন সাপেক্ষ।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনন্ত অনশন ধর্মঘটের তারিখ এক মাস পিছিয়ে ১৫ই জানুয়ারি ১৯৫৭ সালে রাখল। যে ছাপান্নজন বরখাস্ত কর্মীর পুনর্বহালের কথা হয়েছিল তা অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য তৎক্ষণাৎ চিঠিপত্র সহি সাবুদ করে ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। বাকী রইল একজন। সে অনন্ত। কোম্পানী তাকে তাদের কোনো কলিয়ারীতে অফিসারের কাজ দিতে রাজী, কিন্তু সাধারণ কর্মী হিসেবে তাকে নেবেন না। এটা ওরা জলের মতো পরিষ্কার করে দিলেন। অনন্ত তা নিয়ে চাপ দিলো না। বরং বলল—আমাদের এই জেণ্টেলম্যানস এগ্রিমেণ্ট কার্যকরী হলেই আমি পদত্যাগ করব। আপনারা দয়া করে বরখাস্তের নোটিশটা তুলে নেবেন।

—ও. কে.।

—কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই রয়ে গেল অনুমোদন সাপেক্ষ। যদি বোর্ড অফ ডাইরেকটার্স অনুমোদন না দেন তাহলে?

মিঃ ভার্মা বললেন—একটা ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

মিঃ দীক্ষিত বললেন—আপনাদের ট্রাইবুন্যালের মামলা তো আর তুলে নেননি। কাজেই কোনো কিছুই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বললেন—হ্যাঁ। আমাদের হাতের সব তাস এখনো

ফেলে দিইনি। তাছাড়া অনশন ধর্মঘটের নোটিশ তো রইল। তারিখটা শুধু পেছিয়ে গেল।

অনন্ত বলল—সেটাও কম ক্ষতি নয়। একবার মানসিক প্রস্তুতি ভেঙে গেলে পরে তাকে তৈরি করা শক্ত।

মিঃ ভার্মা বললেন—ম্যানেজমেণ্টকে এতটা সন্দেহ করলে চলে না অনন্ত। লেট আস টেক ইট স্পোরটিংলি ?

—ও. কে. স্যার।

দিনের পর দিন কাটছে। দীর্ঘ শীত রজনী দীর্ঘতর হচ্ছে। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ঘুম হচ্ছে না। অনুমোদন আসতে যত দেরি হচ্ছে তত তার উৎকণ্ঠা বেড়ে যাচ্ছে।

অথচ বাইরে সব ঠিক ঠাক আছে। তেমনি কলিয়ারী চলছে। দিন দিন রেজিং বাড়ছে। সাহেবরা ক্রমশই শক্তভূমির উপর দাঁড়াবার জায়গা করে নিচ্ছে।

ওদিকে শ্রমিক সংগঠনে চলছে ভাঙনের ঢেউ। বহু কলিয়ারিতে ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কোম্পানীগুলি নেতা ক্রয়ের বাণিজ্য করছে। আজকাল নেতাদের খাদে ডিউটি করতে হয় না। তবু তাদের প্রমোশন ও ইনক্রিমেণ্ট হচ্ছে। ক্রমশই ভোল পাল্টে যাচ্ছে এদের।

এসব দেখে খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছে ও। যে পঞ্চান্নজন বরখাস্ত কর্মী ডিউটি জয়েন করেছে তারা সবাই বশংবদ হয়ে উঠেছে। হয়তো এটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন যাবৎ অসীম ক্লেশ ভোগ করার পর একটু সুখের মুখ দেখেছে তাই।

তার শ্বশুর বেচারী গুলু ঘণ্টাওলা রোজ একবার মেসে এসে তার খবর নিয়ে যাবেই। কোনো কথাবার্তা নেই। আসে, ওকে দেখে আর চলে যায়। যেদিন গৌরীকে দেখতে যায় সেদিন এসে খবরটা দিয়ে যায়। ঈশ্বরের কৃপায় সে এখন সেরে উঠছে। গতবার গিয়ে চলাফেরা করতে দেখে এসেছে।

দু'চারদিন পরে পরেই দুনিয়া ধাওড়াতে যায়। রোজই একই কথা—আজও কোনো খবর নেই ভোজী।

তা শুনে ওদের মলিন মুখ আরো মলিন হয়। বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বয়। ওদের দিকে তাকাতে পারে না অনন্ত।

এই করতে করতে ১৯৫৬ সাল শেষ হয়ে গেল। কয়লা কুঠির ইতিহাসে একটি লাল অক্ষরে লিখে রাখার মতো বৎসর। সারাটা বছর কাটল টান টান উত্তেজনার মধ্যে। ১৯৫৭ সালের গর্ভে কি আছে কে জানে ?

তখন একটা গুজব উঠল ওদের স্কিমটা মঞ্জুর হয়ে গেছে। দু-একদিনের মধ্যে চিঠি এল বলে। কিন্তু কোথাকার কি ? দিন কয়েক অপেক্ষা করে হেড

অফিসে গেল। মিঃ দীক্ষিত বললেন—আমি তো শুনেছি কথাবার্তা হয়ে গেছে। চিঠি কেন আসছে না তাতো বুঝতে পারছি না।

১৩ই জানুয়ারি অনন্ত সোজা মিঃ ভার্মার চেম্বারেই ঢুকে পড়ল। ওঁর মুখে সেই হাসিটি লেগেই আছে। বললেন—বোসো অনন্ত।

একটা চেয়ারে বসে অনন্ত বলল—স্যার। আমাদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আজ আমাকে নিশ্চিত করে বলুন কি হয়েছে বা কি হবে?

উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—অনন্ত। কথাটা বলতে আমার দুঃখ হচ্ছে। আমাদের সি. এম. ই. সাহেব পুরো প্রপোজালটাই নাকচ করে দিয়েছেন।

থর থর করে কেঁপে উঠল অনন্ত—রাগে ক্ষোভে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ওর চোখ মুখ সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছিল তার লক্ষণ।

মিঃ ভার্মা বললেন—উত্তেজিত হয়ো না অনন্ত। আমি যে কত আঘাত পেয়েছি তা তোমাকে কি বলব?

আমাকে আগে বলেননি কেন স্যার?

—এই তো গতকাল ওর অফিস থেকে ম্যাটার ফিরে এল। আমি ভেবেছিলাম বোর্ডে চলে গেছে কিন্তু ওটা ওর অফিসেই আটকে ছিল।

—মাই গড। আমাকে আপনি সুইসাইড করবার পথ দেখিয়ে দিলেন স্যার।

—আমি খুবই লজ্জিত। তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারছি না। কিন্তু কি করব? ইউরোপীয়ান সি. এম. ই. ভারতীয় শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা বোঝে না।

অনন্ত জ্বলে উঠল। গলায় জোর দিয়ে বলল—উনি কি মনে করেছেন এখনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আছে? জানেন না—আমি একটা ডাক দিলে আপনার কলিয়ারীর পুলিচাকা বন্ধ হয়ে যাবে।

—আহা! ট্রাইব্যুন্যাল তো চালু আছে। আমি না হয় সেখানে তোমাকে সহযোগিতা করব।

—আর আপনার সহযোগিতার দরকার নেই। শ্রমিকদের যদি ক্ষমতা থাকে তবে তারা নিজের ক্ষমতাতেই দাবি আদায় করে নেবে। আপনারা দয়া করে কাউকে কিছু দেননি, দেবেন না। দিন কয়েকের জন্য আমাকে বোকা বানালেন। কিন্তু এখানে শেষ নয়!

গট গট করে বেরিয়ে এল।

অফিসের ঘড়িতে দেখল বিকেল চারটে। এখনো সময় আছে। ও তাড়াতাড়ি বাস স্টাণ্ডে গিয়ে আসানসোলের বাস ধরল।

অনন্ত এল হাসপাতালে। শিবারতিকে দিয়ে গৌরীকে ডেকে পাঠাল। ও এল ব্যস্ত হয়ে।

—কি গো—এত রাত্রে? কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো?

—বোস। সব বলছি।

শিরারতি নিজের অফিসে ওদেরকে বসতে দিয়ে বাইরে চলে গেল। গৈরী একটা চেয়ারে বসল। ওর বাম অঙ্গটিই সার। ডান অঙ্গে ভর দিয়ে শুতেও পারে না বসতেও পারে না। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে।

অনন্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করার পর বলল—এবার আমি মুখ দেখাবো কি করে? চাকরি হবে বলে যারা দেশে গিয়েছিল তারা ফিরে এসেছে। বদলি হয়ে অনত্র চলে যেতে হবে তাই সাত আটটা ছেলেমেয়ের গাওনা করিয়ে দেব বলেছি। তারা নতুন জীবনের জন্য দিন গুনছে। কাকে কি বলব?

টেবিলে ভর দিয়ে গৈরী উঠে দাঁড়াল। অনন্তর কাছে এল। ওর মাথার এলোমেলো চুলগুলো গুছিয়ে দিতে দিতে বলল—তুমি আমাকে মরবার জন্যে প্রস্তুত হতে বলেছিলে। দেখ আমি এখনো প্রস্তুত আছি।

অনন্ত উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর কাঁধে হাত দিয়ে ডাকল—গৈরী!

—ভেঙে পড়ো না। অনশন ধর্মঘট শুরু কর। আমি যাব তোমার সঙ্গে শেষ লড়াইয়ে জীবন দিতে।

—গৈরী! এত তোর মনের জোর?

—জীবন ভর তো নিন্দা বদনামই কুড়োলাম। অন্তত একবার মরার মতো মরি।

অনন্ত ওকে জড়িয়ে ধরল। বুক ভাঙা কণ্ঠস্বরে বলল—তুই আমার আঁধার মানিক রে।

বাহাত্তর

১৫ই জানুয়ারি ১৯৫৭ সাল।

সূর্যোদয়ের প্রাক মুহূর্তে একটা বিরাট মিছিল নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে অনন্ত এগিয়ে গেল অফিসের দিকে। ভোরের আকাশ মুহুর্মুহু স্লোগানে কম্পিত হয়ে উঠল। অফিস প্রাঙ্গনে শিশির ভেজা ঘাসের উপর শতরঞ্চি পেতে বসে পড়ল অনশন ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী বাইশজন শ্রমিক। তার মধ্যে সতেরোজন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলা। গৈরীর জন্য একটা বিছানা পেতে দিলো। বাঁদিকে ভর দিয়ে সে শুয়ে রইল। অনন্ত রইল তার পাশে। তাছাড়া কিষ্ণ ও চরিতর ছিল সস্ত্রীক এবং শকুন্তলা ও ফুলমণি। বাকী সব ওয়াগন লোডারদের বিভিন্ন দল থেকে।

বেলা যত বাড়তে লাগল শ্রমিকের সংখ্যাও তত বাড়তে লাগল। জনকয়েক খুঁটি পুঁতে উপরে খাদের ত্রাটিশয়থ দিয়ে ছাউনি করে দিলো। চারিদিক ঘিরে

দিলো। আপন আপন ঘর থেকে তক্তা নিয়ে এসে তাতে বিছানা পেতে অনশনকারীদের শোবার বসবার জায়গা করে দিলো। মাইক ও লাইট হলো।

অনন্ত ভাবতে পারেনি ওরা এমন স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাবে। মাইকে শ্লোগান ও বক্তৃতা চলছে। বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তু কোম্পানী কেমনভাবে বেইমানি করেছে তার সবিস্তার বর্ণনা। মাঝে মাঝে সি. এম. ই.-কে মুর্দাবাদ ধ্বনি।

বেলা বারোটা পর্যন্ত খুব জোর চলল। তারপর কিছুক্ষণের জন্য বিরতি। হাল্লাবাজদেরও তো স্নানাহার আছে।

অনন্ত গৌরীর মুখের দিকে তাকাল। দুজনের চোখাচোখি হতে দুজনেই হাসল। গতকাল রাত্রে ঘুম হয়নি। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তো ছিলই। তাছাড়া দীর্ঘদিন পর দুজনে মেসের ঐ ঘরটিতে একসঙ্গে ভূমিশয্যায় শুয়ে রাত কাটিয়েছিল। কত কথা জমেছিল দুজনের বুকে। কত ব্যথা কত কান্না। কখন ভোর হয়ে গেল ওরা বুঝতেই পারেনি। দুজনেই স্নান করল।

তখন গৌরীর মুখটি ছিল ফোটা ফুলের মতো। এরই মধ্যে মলিন হয়ে গেছে। ওর পোড়া ঘাগুলো এখনো সারেনি। সেজন্য ডাক্তারবাবু বকাঝকা করেছেন। তা ওরা স্নেহের শাসন বলে মেনে নিয়েছে।

বলেছেন—ওষুধ খেতে হবে।

গৌরী বলেছে—না দাদা অনশনে আবার খাওয়া কি ?

—তাহলে ইনজেকশন দেবো।

—তাই দেবেন।

দুপুরে ফাঁকা সময়ে এজেণ্ট ও ম্যানেজার এলেন। ওঁদের ইচ্ছা অনন্তকে আলোচনায় বসার জন্য রাজী করাবেন।

কিন্তু অনন্ত বলল—না স্যার। আপনাদের সঙ্গে আর আলোচনা নয়। সি. এম. ই. যদি কালকেও বলতেন তবে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম। কিন্তু এখন আলোচনা করতে হলে ওঁকে এখানে আসতে হবে।

মিঃ শুকুল বললেন—তা কি করে হয় অনন্ত ? উনি একজন সি. এম. ই.। তিনি কি আসতে পারেন ?

···কেন ? মানে লাগবে ? অত কিসের অহঙ্কার ? উনিও তো সাত সমুদ্র পার হয়ে দাসত্ব করতে এসেছেন ! আমরাই বরং দাঁড়িয়ে আছি আমাদের মাতৃভূমিতে।

তারপর আর কথা চলে না। ওঁরা চুপ করে আছেন।

অনন্ত বলল—আমার অনার্য স্ত্রীটিকে তো আগে দেখেননি স্যার। এই সেই।

গৌরী নমস্কার করল। উনি বললেন—আমি তো দেখেই বুঝতে পেরেছি। একে তুমি অনার্য বল অনন্ত ? এ যে মা লক্ষ্মী।

কিছু মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ওঁরা চলে গেলেন।

অনন্ত বলল—এই শালা সাহেব জাতটা কঠিন ধুরন্ধর। শক্ত লোকের কাছে এমন মিষ্টি কথা বলবে—এমন প্রশংসা করবে যে মনে হবে আহা অমায়িক ভদ্রলোক। কিন্তু শালারা হাড় বজ্জাত। নরমের যম।

গৈরী বলল—তুমি তো সাহেব হওয়ার জন্যই এসেছিলে, আমার পাল্লায় না পড়লে আজকে ছোট সাহেব হয়েও যেতে। কি মনে হয়—আমি তোমার ভালো করিনি।

—তুই যে আমার কি করেছিস সে হিসেব বোধহয় এজীবনে করতে পারব না।

দুজনেই হাসল। পারস্পরিক হাসি ঠাট্টার মধ্যেই প্রবল উৎকণ্ঠা পীড়িত সময়কে পার করে দিতে লাগল।

রাত্রে এল একদল স্বেচ্ছাসেবী ওদের হাতে সবরকম অস্ত্রশস্ত্র মজুত এবং যে কোনো রকম হামলার মোকাবিলা করার জন্য তৈরি। ওরা জগদীশের লোক। অনশনকারীরা যাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় সেকথা বলে দিয়ে গেল। প্যাণ্ডেলের সামনে দুটো বড় বড় আগুনের চারা জ্বালা হলো। শীতের রাত।

পরদিন সকালেই এসে হাজির হলো সুবীর ও কমলেন্দু। দুজনেই ক্ষুব্ধ।

অনন্ত বলল—আয়! আয়।

ওদের বসবার জন্য জায়গা করে দিলো। সুবীর বসতে বসতে গৈরীর মাথায় হাত দিয়ে বলল—কেমন আছিস?

—ভালো আছি দাদা।

—হ্যাঁ। খুব ভালো আছিস। এই শালা সবাইকে জ্বালিয়ে দিলো।

গৈরী একটু হেসে বলল—ওকে কেন গাল দিচ্ছেন দাদা?

—দেবো না? কি করল ও? সব দুর্ভোগের মূলে ও নিজে। বিউটিদি আমাকে সব বলেছে—ষড়যন্ত্রের কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল ওকে। তখন শালা সাবধান হতে পারেনি। আজকে আবার মরতে বসেছে।

অনন্ত ওর রাগের মুখে মিন্ মন্ করে বলল—সংগ্রামের ময়দানে নেমে পড়ার পর কি পিছনে যাওয়া চলে?

—কে তোকে পিছে হটতে বলছে? আপনা জান কবুল করে লড়ে যা। কোরবানি করে দে। তোর নামে শহীদ মিনার বানাবো। কিন্তু গৈরীকে তুই হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলি কেন?

কমলেন্দু বলল—অনশন ধর্মঘট দু-চারদিনে মিটবে না। যদি দশ বিশদিন লেগে যায় তো সে লড়াই তুই করতে পারবি। গৈরী কি করে পারবে? দু-পাঁচ-দিনেই শেষ হয়ে যাবে। তখন কি নিয়ে লড়াই করবিরে?

অনন্ত বলল—তোদের রাগের কারণ আছে। স্নেহ দিয়ে, সামর্থ দিয়ে তিল

তিল করে ওর জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করেছিস। তাই আজ তোদের বুকে ব্যথা লাগছে। কিন্তু গৈরী না হলে যে আমি আমরণ অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্তই নিতে পারতাম না।

সুবীর বলল—বেশ তো। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এবার গৈরীকে ছেড়ে দে। আমরা আবার ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিই গে।

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ।

গৈরী বলল—তা হয় না দাদা।

সুবীর ফেটে পড়ল—তোদের সঙ্গে কে পারবে? আমরা হেরে গেলাম। কিন্তু দেখিস যেন তোর মড়া পোড়াতে আমাদের না আসতে হয়।

দুজনেই চলে যাচ্ছিল।

অনন্ত বলল—রাগ করে যাস না।

—যাব কোথায়? তোদের শেষ না দেখে কি যেতে পারি? এখন মেসে যাচ্ছি। মাথাটা গরম হয়ে গেছে।

কলিয়ারীর উর্ধ্বমুখী উৎপাদন ঝপ্‌ করে নেমে গেল। সেদিন হলো অর্ধেক, তারপরদিন হলো আরও অর্ধেক। ছুটি, সিক, বিনা নোটিশে কামাই ইত্যাদির কারণে হাজিরার সংখ্যা অর্ধেক। আবার যারা আছে তাদেরও কাজে মন নেই। পিট টপ, পিট বটম, খাদের গোলাই থেকে শুরু করে চাঙ্‌নি আয়তন পর্যন্ত শুধু কোম্পানীর বেইমানির কথাই আলোচনা হচ্ছে। অনশন ধর্মঘটকে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করে।

মিঃ শুকুল, মিঃ শ' নন যে হম্বিতম্বি করে বেড়াবেন। সুরযপ্রসাদ গোরখপুর কম্যাণ্ডারেরও সে জোস নেই যাতে করে ক্যাম্পের লঙ্গরখানায় লুচি মাংস খানা-পিনা দিয়ে ও লৌণ্ডা নাচ দেখিয়ে তার শ্রমিকদের তাতিয়ে তুলবেন।

ম্যানেজারের লাঠি, বাতি, টুপির রেওয়াজ উঠে গেছে। গোমস্তা সত্তিপ্রসাদ এখন আর ইচ্ছা করলেই দু-পাঁচশো তাজা ছোকরা এনে খাদে নামিয়ে দিতে পারে না। তাহলে যে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটবে তার সামাল দেবে কে?

অতঃপর নানাভাবে চেষ্টা চলতে লাগল অনন্তকেই বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনশন থেকে বিরত করা। কোম্পানীর উপর মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে গেল। কিন্তু কল্যাণ রায় পর পর দুদিন এসে বলে গেলেন তোমরা চালিয়ে যাও। আমরা পার্লামেণ্টে এই প্রশ্ন তুলবো। প্রাইম মিনিস্টারকে বলব।

ওদিকে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দিল্লী থেকে প্লেনে করে উড়ে এলেন। জরুরী মিটিং-এ বসলেন। ওয়াগন লোডারদের ইস্যু নিয়ে যে প্রোপোজাল তৈরি হয়েছিল তা নিয়ে সি. এম. ই.-কে কলকাতা অফিসে ডেকে

পাঠালেন। তারে তারে খবর চলছে, গাড়ি দৌড়চ্ছে, পেট্রল পুড়ছে। অবিলম্বে একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে।

পঞ্চম দিনে অনশনকারীদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। পুলিশ প্রহরা বসেছে। এস. ডি. ও., এ. ডি. এম. এসেছেন। একটা মেডিকেল ইউনিট ভ্যান নিয়ে হাজির হয়েছে অনশনকারীদের স্বাস্থ্য রক্ষার কারণে। আর কলিয়ারীর সমস্ত শ্রমিক অতন্দ্র প্রতীক্ষায় অবস্থান করছে। কলিয়ারীর উৎপাদন কার্যত বন্ধ।

জাহ্নবীদেবী এলেন প্রশান্তকে সঙ্গে নিয়ে। অনন্ত নির্জীব হয়ে শুয়েছিল। মাকে দেখে চোখ পিট পিট করে তাকাল। ওর মা কাছে এলেন। ওর মাথায় হাত রাখলেন। ভীষণ স্বস্তি বোধ করল ও। আরামে চোখ বুজল। উনি গৌরীর কপালে হাত রাখলেন। মৃদুস্বরে ডাকলেন—বউমা!

গৌরীর চোখ দুটো করকর করছিলো। বলল—কি মা?

—তুমি যে সেদিন বলেছিলে মরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি সেই কথাটাই সত্যি করে দেবে মা?

গৌরী তার উত্তর দিলো না।

উনি অনন্তকে বললেন—অনন্ত! আমি তোর মা! এ দৃশ্য কি করে সহ্য করব?

—কেন কষ্ট পেতে এলে মা? না এলেই পারতে।

—অনন্ত! কোনো মা ঘরে বসে থাকতে পারে রে?

—মা। আমি তোমাকে সারা জীবন ব্যাপী যন্ত্রণাই দিলাম। এই শেষ। আমাকে জন্ম দিয়েছ। সেই কারণে শোক দুঃখ যন্ত্রণা একবারই ভোগ করে নাও। তারপর জাতিভ্রষ্ট, সমাজভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট কুলাঙ্গার সন্তানের কথা একেবারে ভুলে যেও।

উনি অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন—মায়ের উপরে কত অভিমান তুই পুষে রেখেছিস অনন্ত। আমি গোঁড়া হিন্দু বিধবা। ক'দিন বা বাঁচব। তাও তুই আমার মুখের কথাটা এত ভারী মনে করছিস।

অনন্ত কোনো উত্তর দিলো না। বাইরে তেমনি শ্লোগান চলছে। কোলাহল উঠছে। কিন্তু কিছুই যেন ওদের কানে ঢুকছে না।

জাহ্নবীদেবী গৌরীকে বললেন—বউমা! তোমারও তো সন্তান ছিল। তাকে হারিয়ে কি ব্যথা হয়েছিল তা তো জানো। আজ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে সেই শোক দিতে চাও।

গৌরী বলল—মা! আমার স্বামীই আমার ভগবান! তিনি যে পথে যাবেন আমিও সেই পথে যাবো।

তোমরা তাহলে জলগ্রহণ করবে না?

—না মা।

—প্রশান্ত। তুই যা। তিনজনের শ্রাদ্ধের আয়োজন কর গে। আমিও আর জল গ্রহণ করবো না। অনন্ত ও গৈরী একসঙ্গে বলল—মা!

সুমিতবাবু কাছেই ছিলেন। তিনি বললেন—মাসীমা। এটা সংগ্রাম। এর মধ্যে আপনি কেন আসছেন? আপনি ফিরে যান।

—আমি অনন্তের মা। এত জিদ সে কোথায় পেল? আমার কাছেই তো। সবাই চুপচাপ। কারো মুখে কথা নেই। কেমন একটা বুক চাপা নীরবতা। জাহ্নবীদেবী সবারই মুখের দিকে তাকালেন। গৈরীর গায়ে হাত দিয়ে মুখ নীচু করে বসে আছে প্রশান্ত। অনন্তর পাশে সুবীর ও কমলেন্দু। সুমিতবাবু ওঁর কাছেই।

উনি বললেন—সুবীর তোমরাও কি চাও ওরা মরে যাক?

সুবীরের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো। কেমন কান্না ভাঙা গলায় বলল—কি বলব মাসীমা আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছে। এই গৈরী। বোনের মতো ভালোবাসি। হাসপাতালের সব দেখাশোনা আমরা করেছি। অনন্ত ওকে শুধু কাঁদিয়েছে। আমরাই চোখের জল মুছে দিয়েছি। কিন্তু একদিন রাত্রে কি যে ফুসমন্তর ওর কানে দিলো—তারপরেই দেখি কি না হাসপাতাল থেকে চলে এসেছে। আমরা তো পর। কেন কথা শুনবে?

অনন্ত বলল—তুই এখনো রেগে আছিস?

—মাসীমা। আমরা ওদের কাছে হেরে গেছি।

হঠাৎ প্রশান্ত ওর মায়ের দিকে তর্জনী তুলে বলল—তুমিই এর জন্য দায়ী। বৌদি তোমার ঘৃণার আগুনে জ্বলে গেছে। দাদা হারিয়ে ফেলেছে জীবনের স্বাদ। যার দুধের ছেলেকে পাথরে আছড়ে মেরে দেয়, মায়ে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় তার কাছে জীবন মৃত্যুর পার্থক্য কি? তাই শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। জিতলে বিজয় মঞ্চের নায়ক নায়িকা, হারলে শহীদ। তুমি এখন ছেলে বৌয়ের জন্য কাঁদছো কেন? গাছের গোড়া তো আগেই কেটে দিয়েছো।

গৈরী ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল—মাকে গঞ্জনা দিও না প্রশান্ত।

প্রশান্ত ওর হাতটা দু'হাতে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলল। ডুকরে ডুকরে বলল—তুমি মরে যেও না বৌদি। আমি দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি, পিসিমাকে বলেছি। তুমি ভালো হয়ে ওঠো। তোমাকে আমরা বাড়ি নিয়ে যাব। দাদার বন্ধুরা বলেছে—অমন একটা বৈপ্লবিক চরিত্রের আবার জাত কিরে? বল বল বৌদি তুমি মরবে না তো!

হৃদয়ে স্থিত স্নেহ ভালোবাসার সুকোমল তন্ত্রীগুলিতে যেন ঝঙ্কার উঠলো। কেমন একটা মধুর ব্যথা। পরম স্নেহে প্রশান্তের মুখে হাত বুলিয়ে দিলো। ওর

মনে হলো বিপ্লব যেন বড় হয়ে গেছে। জাত পাতের সংস্কার ভেঙে দেবার সংগ্রামে নেমেছে।

আস্তে আস্তে বলল—না ভাই মরবো না। আমরা জিতবো। সবাই চুপচাপ বসে আছে। যেন সব কথা বলা হয়ে গেছে।

সপ্তম দিনের সকালে গৈরীর গায়ে হাত দিয়ে জাহ্নবীদেবী ব্যাকুলভাবে ডাকতে ল্যাগলেন—বউমা! বউমা!

কিন্তু গৈরীর কোনো সাড়া নেই। তার ধাত ডুবতে বসেছে। নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ। অনুভবই করা যায় না। হৃৎপিণ্ড চলছে ধুক ধুক করে।

উনি আর্তকণ্ঠে বললেন—অনন্ত! তোর মনোবাসনাই পূর্ণ হলো। একবার হাত দিয়ে ছাখ—বউমার যে সাড়াশব্দ নেই।

অনন্তর আচ্ছন্ন চেতনা ভেদ করে যেন ডংকা বেজে উঠল—গৈরীর সাড়া শব্দ নেই। তার মানে একটা প্রদীপ তেলের অভাবে নিভে যাচ্ছে।

কিরকম বিকৃত কণ্ঠস্বরে বলল—গৈরী! তুই আমার আগেই চললি? যা। অনেক দুঃখ পেয়েছিস। এবার মুক্তি পাবি। আমি তোর পিছনেই যাবো।

—অনন্ত! তুই কি বলছিস?

ওকে যেতে দাও মা। ও বড় দুঃখী। দুঃখের অবসান হোক।

মেডিকেল ইউনিট তৈরি ছিল। গৈরীর স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে তাকে স্ট্রেচারে চড়িয়ে হাসপাতালে পাঠাল।

অনন্ত নির্বাক হয়ে দেখল। অনেকক্ষণ পর ডাকল—সুবীর, কমলেন্দু। ওরা কাছে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

অনন্ত বলল—তোরা গৈরীর জন্য অনেক করেছিস। শেষ কাজটাও করে দিস। সুবীর বলল—কি বলতে চাইছিস?

—আলতা সিঁদুর পরিয়ে দামোদরে ওর সৎকার করিস। প্রশান্ত যেন মুখাগ্নি করে।

—আঃ অনন্ত। গৈরী বেঁচে আছে।

—মিথ্যা স্তোক বাক্যে কি লাভ? ওকে আমি বলি দিলাম। কয়লা কুঠির কালো যবনিকায় বলি দিলাম আমার জীবন সঙ্গিনীকে। গৈরী শহীদ হলো। সেলাম। লাল সেলাম।

সেলাম করার ভঙ্গীতে হাত তুলল। প্রশান্ত ভেঙে পড়ল ওর বুকে।

বিষণ্ণ, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনন্ত। সে যেন কাউকে চিনতে পারছে না। কারু কথা শুনতে পাচ্ছে না। কোনো অনুভূতি অবশিষ্ট নেই।

বুকফাটা কণ্ঠস্বরে জাহ্নবীদেবী ডাকলেন—অনন্ত! অনন্ত!

বেলা দশটার সময় পর পর কয়েকটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ওদের মঞ্চের কাছে

মিঃ ভার্মা নামলেন। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন বড় দরের অফিসার এবং এজেন্ট সাহেব। এসে দাঁড়ালেন ধর্মঘটীদের সামনে।

গত কয়েকদিন ধরে চলেছে চরম তৎপরতা। বিরোধীরা লোকসভা তোলপাড় করেছেন। কল্যাণ রায় দরবার করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তিনি শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে বলেছেন। তারপরে বৃটিশ কোম্পানীর সাহেবদের ভ্যানিটি গোল হতে বাধ্য।

অনন্তর সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ ভার্মা বললেন, তোমরা জিতেছো অনন্ত। কনগ্রাচুলেশান।

ওর হাতটা টেনে ধরলেন। অনন্ত যেন কোনো দৈববাণী শুনছে। তেমনিভাবে তাকিয়ে রইলেন।

উনি একটা বড় খাম ওর হাতে দিয়ে বললেন—এই তোমাদের স্কিম। ম্যানেজিং ডাইরেকটার অ্যাপ্রুভ করে সহি করেছেন।

খামটা হাতে ধরারও ক্ষমতা নেই অনন্তের। হাতের মধ্যে থরথর করে কাঁপছিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—ধন্যবাদ স্যার।

—এবার অনশন ত্যাগ কর।

—করবো স্যার।

—তোমার ওয়াইফ কোথায়? স্যা ওয়াইল্ড হিরোইন।

অনন্ত আস্তে আস্তে আকাশের দিকে হাত তুলল।

উনি চমকে উঠলেন—মাইগড!

ডাক্তারবাবু বললেন—না স্যার। এটা অনন্তের মনের ভ্রম।

ওকে যখন থেকে মেডিকেল ইউনিট তুলে নিয়ে গেছে তখন থেকেই এই ভ্রমটা মনের মধ্যে ঢুকেছে—আমরা এত বলেও বোঝাতে পারছি না যে ওর স্ত্রী বেঁচে আছে।

—আই সি।

কাঁধটা স্রাগ করে বললেন—শুনছো অনন্ত তোমার স্ত্রী বেঁচে আছে।

অনন্ত সেকথা কতটা বুঝল কে জানে। কিন্তু সে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে উপবাসী কলিজা ফাটিয়ে ধ্বনি দিলো—ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

অনন্ত থর থর করে কাঁপছে। দু-চোখ ঝেঁপে জল আসছে। গলা বসে গেছে। শরীরের সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে বসল। বলল—মা। তোমার পা দুটো কই? প্রণাম করি।

মায়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আর উঠতে পারল না। ঐখানেই জ্ঞান হারাল। ওর মা চিৎকার করে উঠলেন অনন্ত।

ডাক্তারবাবু বললেন, ভাববেন না মাসীমা। এটা সাইকোলজিক্যাল ট্রমা। এতবড় জয়ের সংবাদে তো শক্ কম নেই।

গভীর রাত। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরছে অনন্তের। যেন কোনো অতল সমুদ্রে ডুবেছিল। যেখানে গহীন কালো অন্ধকার। তার বুক চিরে এক ফোঁটা আলো পড়ল চোখে। সেই আলোর ইশারা পেয়ে ব্যাকুল প্রচেষ্টা চালাল উঠে আসবার। তারপর আস্তে আস্তে জেগে উঠল একটি সবুজ দ্বীপের শ্যামলিমা। নীলাভ আকাশ। বলাকার সারি। রৌদ্রস্নাত বেলাভূমিতে ঝিক্‌মিক্‌ করছে ঝিনুক এবং অভ্র। লাবণ্যময়ী জলরাশি তরঙ্গ ভঙ্গে চঞ্চল।

ক্রমাগত উদ্বেগ, অশান্তি শোক ও দুঃখে জর্জরিত নায়ক জয়ের তীব্র স্বাদ সহ্য করতে পারেনি। তার মগ্ন চৈতন্যের ওপার থেকে কতই না যাদুকরী শব্দ ও দৃশ্যের মিছিল ছুটে যাচ্ছে।

জ্ঞান ফিরে দেখল তার গর্ভধারিণী জননী অসীম উৎকণ্ঠায় ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। আবেগ ভরে ডাকল—মা।

—অনন্ত!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল—যায় জন্য এত লড়াই সেই গৈরীর কানে এতবড় খবরটা পৌঁছাল না মা।

—কেন পৌঁছাবে না বাবা? এই তো তোর গৈরী। হাতটা বাড়িয়ে ওকে ছুঁয়ে ছাখ—সে জীবিত আছে। তার জ্ঞান ফিরেছে।

অনন্ত হাত বাড়াতেই পাশের বেডে শুয়ে থাকা গৈরীর হাতটা পেল। ওর মা ওকে আরো কাছে সরিয়ে দিলো।

অনন্ত বলল—গৈরী সত্যিই বেঁচে আছে মা?

—হ্যাঁ বাবা। ওকে যে বাঁচতেই হবে। না হলে পৃথিবীতে সততা ও সংগ্রামের মূল্য থাকবে কি করে?

আস্তে আস্তে জীবনের ছন্দ ফিরে এল। খুশী এল। কত মানুষ এল ওদেরকে অভিনন্দন জানাতে। তাতে তারা আপ্লুত হলো। গৈরীর মুখে বুলি ফুটল। নীতি ও প্রীতিকে জড়িয়ে ধরে কত আদর, কত সোহাগ, কত কথা। জ্যোৎস্না রাতে দামোদরের বালুকা বেলায় রোমাঞ্চকর প্রণয়কাহিনী থেকে বন্ধম হাতে রোমহর্ষক দাঙ্গা লড়ার গল্প শোনাল দুই ননদিনীকে। ওরা ওকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলল।

তারপর হাসপাতাল থেকে সবাই ছাড়া পেল, গৈরী বাদ। তার বোমা বিধ্বস্ত শরীরটার আরো চিকিৎসার প্রয়োজন। সেজন্য ওর বড্ড মন খারাপ।

বিকেলের দিকে অনন্তকে ওরা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। গৈরীর ভিতরটা উথাল পাথাল করছে। আবার তাকে একাই হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে। সেই কষ্টের কথা স্মরণ করে ওর গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। ব্যথায় মোচড় দিচ্ছিল হৃদয়ের সুকোমল তন্ত্রীগুলি।

জাহ্নবীদেবীকে প্রণাম করে বলল—আমি আপনার কাছে চির অপরাধিনী মা। আমাকে ক্ষমা করুন।

উনি ওকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—আর ও কথা কেন মা? মনে কোনো কিন্তু রেখ না। আমি মা। ক্ষমা তো করবই। কিন্তু তোমরা আমাকে নাতির মুখ দেখতে দাওনি সে দুঃখ আমার আছে। যেদিন তোমার কোলে সন্তান আসবে সেদিন এ দুঃখ যাবে।

—আশীর্বাদ করুন মা!

—আরেকটা কথা। ছাড়া পেয়ে অনন্তর সঙ্গে একবার বাড়ি আসবে। আমাদের কুলদেবতাকে প্রণাম করবে। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে নতুন সংসার পাতবে। বিপদে আপদে তিনিই রক্ষা করবেন।

ওঁরা চলে গেলেন। গৈরী একা। হাসি ছিল, খুশী ছিল, প্রাণের মানুষ ছিল। আবার কবে সেইদিন ফিরে আসবে?

একমাস বারোদিন পর হাসপাতাল থেকে ছুটি পেল গৈরী। অনন্ত ওকে ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়ে এল। এখন ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখদুটি উজ্জ্বল। গাল দুটি ভরাট। স্তন ও নিতম্বের ভোল ফিরেছে। রঙটা খুব পরিষ্কার হয়েছে।

অগ্রদূত মেসে উৎসবের হাওয়া বইছে। খাবার হচ্ছে লুচি, মাংস, পায়েস, মিষ্টি। নাচগান কমিক নকশায় সন্ধ্যাটা জমাট হয়ে উঠল। ট্রেনি ছোকরারা ওদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বলল—আজ দাদা বৌদির ফুলশয্যা!

দীর্ঘ অমা রজনী বিদীর্ণ করে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। দিক চক্রবালে বিন্দু চন্দন ঝরে পড়ছে। ওরা বোধহয় এই সুখ রজনীর জন্যই এতদিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছে।

গৈরী যখন হাসপাতালে তখন অনন্তর কালঘাম ছুটে গেছে চারশোজন শ্রমিকের পুনর্বাসনের কাজে। জড় শিকড় উপড়ে এক একটি দলকে নিয়ে যাওয়া, ঘরবাড়ি নির্মাণ, কাজে যোগদান করানো, ছেলেমেয়েদের বিয়ে, গাওনা, পরিশেষে গ্যালন গ্যালন অশ্রুজল মাড়িয়ে ফিরে আসা। সে কি কম কাজ?

তারপর যেসব সহকর্মীদের সঙ্গে জীবন মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে, সততা বিশ্বাস, স্নেহ ও ভালোবাসার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাদেরকে ওরা ভুলবে কি করে? রামধনি ও বাসমতী, গুরুনাম ও প্রেমা কাউরের মতো কত জুড়ির সঙ্গে ওদের প্রাণের সম্পর্ক। এতোয়ারী রাম, ঝমন লাল, জান রাজকিশোর সিং, হরিহর গান্ধী, নগেন মণ্ডল, ফুলমনি, শকুন্তলা, কালো বাউরী, শম্ভু বাউরী, জান মহম্মদ, ফৈজু সিংয়ের মতো কত মানুষ জান কবুল করে দিয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল বাবু, ভেইয়া, লেবার, কারিগড়, মিস্ত্রী ও কুলি কামিনদের।

কে গৈরী ; কি তার জাত ? কোন কুলে কালি দিয়ে সে বিয়ালা পুরুষ ছেড়েছে, বামুনের ছেলে মুনিয়া ঘরে জাত দিয়েছে এসব প্রশ্নের কোনো গুরুত্বই ছিল না। এক কণ্ঠের বাণী সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। নতুন যুগের নতুন মানসিকতা পুরানো ধ্যান ধারণা বদলে দিচ্ছে। তাই তো ওরা ছিনিয়ে এনেছে জয়। প্রমাণ করেছে জীবন অনেক বড়।

বড় তীব্র, বড় রোমাঞ্চকর এই আস্বাদন। সব দুঃখ নিমেষে মুছে যায়। সেই আশা নিয়েই তো মানুষ বেঁচে থাকে।

পরদিন ধাওড়ায় ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাজকিশোর সিংযের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করল। শান্ত, সুন্দর বয়স্ক এই মানুষটির সংসার নানা সমস্যায় জর্জরিত কিন্তু কখনই তিনি তাঁর সমস্যা অন্যকে বুঝতে দেননি। হরিহরেরও তাই। এই দুটি চরিত্র সদা সর্বদা তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। সব সময়ে সৎ পরামর্শ দিতেন। কাজের ইশারা পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

তাদের কাছে বিদায় নিতে বুক ফেটে যাচ্ছিল। কত যে অশ্রুজল মাডাতে হলো তার হিসেব নেই। আলু-ডিতে চরিতর কিষণের দলকে নতুন মুনিয়া ধাওড়ায় থিতু করে যেদিন ও ফিরে এসেছিল সেদিন তাদের কান্নায় মাটি পিছল হয়ে গেছিল। ওঃ মানুষের ভালোবাসা যে এমন তীব্র সঞ্চারী বেদনার স্রোত হয়ে বইতে পারে তাও জানত না। সেই লবনাক্ত অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে ও বুঝল জীবন দেবতা বড়ই নিষ্ঠুর। বড়ই রসিক এবং স্নেহময়ও।

অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে সুমিতবাবু ও স্বপ্না নতুন কোয়ার্টারে এসেছেন। গুরু ও গাইড, ফ্রেণ্ড ও ফিলজফার এই ব্যক্তিটির সঙ্গে অনন্তের সম্পর্ক বড়ই আন্তরিক ছিল। শুধু একবারই ওদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল তারপর ঠিক হয়ে গেছে। ওঁর হাতে ইউনিয়নের চার্জ বুঝিয়ে দিলো।

এবার ওকেও যেতে হবে। কমলেন্দু ওর জন্যে মাইনিং সরদারের চাকরি ঠিক করে রেখেছে। ওঁর বাসাতে চা খেয়ে সন্ধ্যাকালে মেসে ফেরার রাস্তা ধরল। চলতে চলতে অনন্ত বলল আজ শুধু একজনের জন্য বুকটা চড় চড় করছে।

—কার কথা বলছো গো ?

—বিউটি দি। ওদের ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না। অথচ মানুষ তাদেরকে চিনল না। আবিল পরিচয়ের অন্তরালে রয়ে গেল মহৎ প্রাণ।

মেসে ফিরে অনন্ত বসল ডায়েরীর খাতা নিয়ে। গৈরী গোছগাছ করছে। অনন্তর বই, খাতা, পত্র পত্রিকা ও স্থানীয় খবরের কাগজে প্রকাশিত অনন্তর ফটো, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, খবর, কবিতা প্রভৃতি গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আচ্ছা, বারো খানা ডায়েরী লিখেছো কখন ?

অনন্ত বলল, লিখছি তো যেদিন প্রথম এখানে এসেছি সেদিন থেকেই। কিন্তু

সবচেয়ে বেশী লিখেছি তুই যখন হাসপাতালে ছিলি ! রাত্রে ঘুম হতো না। বুক-চাপা কষ্ট। খাতার পাতাতেই উজাড় করে দিয়েছি। তবে সবই ভুষিমাল নয়। কয়লা শিল্পে অগ্নিগর্ভ সময়ের দলিলও বটে।

বিস্ময় বিমুগ্ধ কণ্ঠে গৈরী বলল সত্যি ! তুমি একটা বিরাট মানুষ।

বাকসো নিয়ে বসলো। অনন্তর গোলাপ ফুল আঁকা সুটকেশটা তখনো আছে। সেটা ভর্তি হবার পর নিজের বাকসোটি খুলল। ওর বাবা দ্বিরাগমনের জন্য কিনে দিয়েছিল। চরিতর কিষণের সঙ্গে বদলি নিয়ে ওরাও চলে গেছে। জাত কুটুম ছেড়ে থাকতে চাইল না বলে। যাবার সময় বাকসোটি অনন্তকে দিয়ে গেছে। তাতেই গৈরীর কাপড় চোপড়, গয়না গাঁটি, টুকিটাকি মেয়েলি জিনিসপত্র থাকতো। গয়না গাঁটি বিক্রি হয়ে গেছে। কাপড় চোপড় পরতে পরতে ছিঁড়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে বিয়ের শাড়ি ও গাঁটছড়াটি আর অনন্তর পুরানো গায়ের চাদরটা। তাতে ওর ঘামের গন্ধ লেগে আছে। শুঁকে দেখল।

বাকসোটা উপুড় করে দিলো। দুমড়ানো মুচড়ানো একটি কাগজের প্যাকেট বের হলো। সাতপুর কাগজের ভাঁজ খুলে বেরুল একটি সোনার আংটি। মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাতে চুমু খেয়ে বলল, ওগো দেখো দেখো তোমার দেওয়া সেই আংটিটা এখনো আছে। এত অভাবেও আমার মা বাবা এটা বিক্রি করেনি।

অনন্ত তা জানে। সেই তা রেখে দিয়েছিল। গৈরীর খুশী দেখে বলল, প্রথম প্রেমের স্মৃতি তো। তাই তোর মা বাবা জাগিয়ে রেখেছে।

গৈরী বলল—হ্যাঁ গো ! একবার যাবে না ? সবাইকে দেখতে মন হচ্ছে।

—তা তো হবেই।

—কবে যাবে ?

—কাল সকালে একটা কাজ আছে। বিকেলে নতুন কলিয়ারীতে যাবো নতুন সংসার পাততে। কমলেন্দুর বাংলোতে জিনিসপত্র রেখে পরশু মাকে প্রণাম করতে বাড়ি যাবো। মা তোকে নিয়ে যেতে বলেছেন। আমার গ্রামের বন্ধুরাও তোকে দেখতে চাইছে। নীতি, প্রীতি, প্রশান্ত কত খুশী হবে সে তো বুঝতেই পারছিস। দু'একদিন থাকবো। ফিরতি পথে আলু-ভির নতুন মুনিয়া ধাওড়া। ব্যস ! মাল ফাল টেনে ভোজীদের সঙ্গে দমে নাচবি। গৈরী ওকে পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি মাদল বাজাবে তো ? হিপীড় ডিপীড় বাজনা। বুকে হড়পা বান ডাকিয়ে দেবে।

ওরা হেঁটে যাচ্ছে দামোদরের দিকে। অনন্তর কাঁধে একটি ঝোলা ব্যাগ। গৈরীর খালি হাত। পা টেনে টেনে চলছে। পথে কত চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কত কুশল বিনিময়। কত শুভ কামনা। অফিসে ঘন্টাখানেক লাগল। সুমিতবাবু চেষ্টা চরিত্র করে ওর জন্য কিছু টাকা আদায় করিয়ে দিলেন।

ওরই পাওনা। এতদিন আটকে ছিল। যাবার দিনে এজেন্ট, ম্যানেজার বিনা দ্বিধায় ভাউচার সহি করে দিলেন।

ফাটক বাজারে এসে আধঘণ্টা দাঁড়াতে হলো। এখানেই দাঙ্গা হতো। সেখানে লোকজনদের কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেল।

বাঁ দিকে মোড় দিয়ে পুরানো নামো ধাওড়ার পাশ দিয়ে রাস্তা। গৈরী সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনটা উদাস বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল। এই ধাওড়া হরদম ছেলে পুলে, মানুষ জন, শুয়োর, কুকুর, ছাগল, হাঁস মুরগিতে গিজ গিজ করতো। আজ প্রাণী শূন্য ঝুপড়িগুলো ভেঙে ছত্রখান। গরুতে খড় টানছে! চবুতরার ঝকমকে জায়গাটা গু, গোবর, নোংরা আবর্জনায় ভরে গেছে। রাজমিস্ত্রী লেগেছে গোল ঘরের কোয়ার্টারগুলো ভাঙতে। যে টালির ঘরে গৈরীর আশৈশব কেটেছে তার কাঠামো খুলে ফেলা হয়েছে। কোম্পানী এখানে নতুন কোয়ার্টার বানাবে।

গৈরী সেদিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কি ছিল কি হলো?

অনন্ত বলল, ওদিকে তাকাসনে গৈরী। চল, আগে চল।

চলতে চলতে দামোদরের ঘাটে নামবার রাস্তায় ওর মুখে হাসি ফুটল।

আঙুল বাড়িয়ে বলল ঐ জায়গাটা না? তুমি বই পড়ছিলে।

—হ্যাঁ।

—কি দস্যি ছিলাম তখন।

বালিতে পা দিয়ে অদ্ভুত ভাবান্তর হলো ওর। এমনভাবে বেড়াচ্ছে যেন বৈশাখের জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রিগুলি ফিরে পেয়েছে। আরব্য রজনীর জিন পরীদের মতো নেমে এসেছে স্নান করতে। তেমনি ছলবল করে বেড়ালো। গা ডুবিয়ে স্নান করল। এখানকার প্রতিটি বালুকণায় ওদের সুখ স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাইতো মনটা আনন্দে নেচে উঠেছে।

শুকনো কাপড় পরে একটা শিমুল গাছের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে লাগল। গৈরী বলল—ঘাটের রাস্তা এদিকে।

—হ্যাঁ তো! ঐ তো সেই শ্যাওড়া গাছটা। বর্ষার রাতে জোনাকি পোকায় ছেয়ে থাকতো। ঐখানেই তো তুমি আমার মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিলে।

—হ্যাঁ।

মাটির ঢালু পাড় বেয়ে উঠবার সময় অনন্ত ওর হাত ধরে টেনে তুলল। একটা শিমুল গাছের নীচে দাঁড়াল। চারিদিকে রোদ। গাছের নীচে জাফরি কাটা ছায়া। ধু ধু করছে দামোদরের বালু বেলা। উত্তরে কলিয়ারীর হেডগিয়ার, চিমনি প্রভৃতি যান্ত্রিক চালচিত্র।

অনন্ত বলল—গৈরী ঠিক আছিস তো?

ও একটু একটু হাঁফাচ্ছিল। বলল, হ্যাঁ।

অনন্ত ফুলগুলো পকেট থেকে বের করল। গৈরীর একটা হাত ধরল। বড় বড় চোখে তাকাল ও।

অনন্ত বলল, আমাকে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়া।

—কেন গো ?

মন থেকে সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে বলল—আজ বিপ্লবের জন্মদিন।

—হ্যাঁ।

—এই খানটায় ওকে পুঁতে দিয়ে গিয়েছিলাম। আজ তার জন্মদিনে জীবনে শেষবারের মতো ফুল দিয়ে যাবো। সেজন্যই তোকে এনেছি।

অনন্ত যা ভেবেছিল তাই হলো। গৈরীর আর্তনাদ এবং তার টাল খেয়ে পড়ে যাওয়া শরীরটা ও সতর্কভাবে ধরল। আস্তে আস্তে বসিয়ে দিলো। গৈরী আকুল হয়ে কাঁদছে।

সবুজ শ্যামল ঘাসের আস্তরণ কেটে যে গর্তটা করেছিল তা আবার ভরাট করে ঘাসের চেলা বসিয়ে মাটি থেকে একটু উঁচু করে দিয়েছিল। এখন তা মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। গৈরীর ত্বক মাংসে যেমন ক্ষত চিহ্ন আছে মাটিতেও তেমনি ক্ষতচিহ্ন আছে। ঘাস শুকিয়ে গেছে। প্রকৃতি নিজেই তার উপর ফুল বিছিয়ে দিয়েছে। শিমুল ফুলের অজস্র পাপড়িতে ছেয়ে আছে।

এটা হবে, বছর বছরই হবে। ফাগুনে ওর জন্ম। মধুমাস ফাগুন ফুলের মাস। মধুর মাস। সে ফুল না দিলেও প্রকৃতি তাকে ফুল দেবে।

ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত পলাশ গাছগুলোয় অজস্র ফুল। কালো বোঁটায় লাল ফুল যেন কালো অন্ধকার কেটে লাল সূর্য ওঠার প্রতীক।

অনন্ত বলল, কাঁদিস নে গৈরী। বিপ্লব মরে না রে। বিপ্লব চিরঞ্জীবী। তুই আমি তো জগতের একটা পিতামাতা নই। আমরা অনেক। অনেক পিতামাতা বিপ্লবের মাথায় ফুল চড়ায়। দে ফুল দে।

গৈরী চোখ মুছে স্বাভাবিকভাবে বলল, কোথায় দেবো ?

—এই যে যেমনভাবে আমি দিচ্ছি তেমনিভাবে তুই দিবি। ঠিক পাশে পাশে। একটি সাদা একটি লাল।

অসীম ধৈর্যে কাঁপা কাঁপা হাতে অনন্ত গৈরী ছেলের সমাধির উপর ফুল সাজাল। ফাল্গুনের বাতাস বইল মৃদুমন্দ গতিতে।

অনার্য দামোদর প্রসন্ন প্রবাহে ছল্ ছল্ শব্দে আবহ সঙ্গতের সুর বাজিয়ে চলল। বাতাসে ভেসে এল উদাসী ঘুঘুর ডাক। কলিয়ারীর যান্ত্রিক শব্দমালা। গাছতলাটি ফুলের সুগন্ধে ছেয়ে গেল।

দিগন্তের বুকে নীল ট্রাপিজিয়মের মতো পঞ্চকোট পাহাড় রচনা করল সৌন্দর্যময় চালচিত্র। পরপারে শ্যামল বনভূমি।

গৌরীকে টেনে তুলল অনন্ত, পাশাপাশি দাঁড়াল পরস্পরের হাতে হাত রেখে। অপলকে তাকিয়ে রইল সেই ফুলসজ্জার দিকে।

মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্যালোকে লাল ও সাদাফুল দিয়ে সজ্জিত একটি যুগান্তকারী শব্দ গতি ও মুক্তির প্রতীক হয়ে মাটির বুকে ফুটে উঠলো—বিপ্লব।

★